দ্বাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬১।

৫৬১ সংখ্যা ১৮১২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

নববর্ষ।

অদ্য এই নববর্ষের প্রাতঃসমীরণ কোথা হইতে শান্তি-সুধা আনয়ন করিয়া আমাদের আত্মাতে নবজীবনের সঞ্চার করিতেছে? কোথা হইতে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ অবতীর্ণ হইয়া আমাদের শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক সন্তাপ হরণ করিতেছে? আমাদের চর্ম্ম-চক্ষু তাহার কিছুই দেখিতেছে না, আমাদের বাহ্য জ্ঞান তাহার কিছুই জানিতেছে না। অদৃশ্য এবং অনির্ব্বচনীয় স্নেহের আকর্ষণে দূরস্থিত বৎস নানা গাভীর নানা আহ্বান-ধ্বনির মধ্য হইতে আপন মাতার আহ্বানধ্বনি সর্ব্বাগ্রে শুনিতে পায় এবং তাহা শুনিবামাত্র সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিক্‌বিদিক্-শূন্য হইয়া তাহারই অভিমুখে ধাবমান হয়; তেমনিই এক প্রবল অথচ অদৃশ্য আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া আমরা অদ্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। সূর্য্য চন্দ্র ওষধি বনস্পতি, মাস পক্ষ ঋতু সম্বৎসর, জ্ঞান প্রেম ধর্ম্ম, কোমল শৈশব সরস যৌবন পরিপক্ক বার্দ্ধক্য, অজর অমর আত্মা, সমস্তই সেই অদৃশ্য আকর্ষণের তাড়িত বার্ত্তাবহ।

কিন্তু জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রেমের সম্বন্ধ তাহা কোনো বার্ত্তাবহেরই অপেক্ষা রাখে না; তাহা গভীর অন্তরের বস্তু—তাহা বাহিরে প্রদর্শন করিবার বস্তু নহে। জীবাত্মা তাহার অন্তরের ভাব বাক্য মন দ্বারা ব্যক্ত করিতে পরাভব মানে; অথচ ভক্তবৎসল পরমাত্মা তাহা অবলোকন করেন; আবার, অসীম বিশ্ব-চরাচর একত্র যোটবদ্ধ হইয়াও জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার প্রেম ব্যক্ত করিতে পরাভব মানে, অথচ জীবাত্মা তাহা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করে। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রকৃতির মধ্যস্থতা কেবল একটা বাহ্য উপলক্ষ। এমন কি বস্তু কোথায় আছে—মনুষ্যের আত্মা যাহা জানে না, প্রকৃতি যাহা জানে; আত্মার যাহা নাই এমন কি বস্তু প্রকৃতি আত্মাকে প্রদান করিবে? প্রকৃতির আত্মা নাই—প্রকৃতি দীন হীন দরিদ্র; মনুষ্যের আত্মা আছে—মনুষ্য অসীম ধনে ধনী—মনুষ্য অমৃতের পুত্র অমৃতের অধিকারী। মনুষ্যের ভিতরে যাহা আছে—প্রকৃতি তাহারি দর্পণ-স্বরূপ হইয়া তাহারই প্রতি

মনুষ্যের চক্ষু ফুটাইয়া দেয়—প্রকৃতি মনুষ্যকে নূতন কিছুই দিতে পারে না। আত্মার ভিতরে যাহা নাই এমন কোনো নূতন সমাচার প্রকৃতি আত্মাকে অবগত করিতে পারে না। তবুও সূর্য্য চন্দ্র ওষধি বনস্পতি কেহই এক নিমেষের জন্যও নীরব নহে। সূর্য্য যেরূপ অপরাজিত উদ্যমে পরমাত্মার মঙ্গল মুখজ্যোতি জীবাত্মার নিকটে ব্যক্ত করিতেছে—তাহা ছাড়া আর কিরূপে কে তাহা ব্যক্ত করিবে? পূর্ণিমার চন্দ্র, বসন্তের বনশ্রী, কোকিলের কণ্ঠ-ধ্বনি, পুষ্প-লতার লালিত্য এবং সৌকুমার্য্য তাঁহার মধুর সৌন্দর্য্য যেরূপে ব্যক্ত করিতেছে—তাহা ছাড়া আর কিরূপে কে তাহা ব্যক্ত করিবে? জগতের শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় ভীষণ বজ্র বিদ্যুৎ তাঁহার মহতী শক্তির ইঙ্গিত মাত্র ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে—তাহা ছাড়া আর কিরূপে কে তাহা ব্যক্ত করিবে? প্রকৃতির এই যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা—ইহা কিসের চেষ্টা? প্রকৃতি নানা রাগে, নানা ছন্দে নানা কৌশলে কেবল এই কথাটি মনুষ্যকে বুঝাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে যে, তাহার অভ্যন্তরে সর্ব্বশক্তিমান্ ন্যায়বান্ রাজাধিরাজ, বরাভয়দাতা মঙ্গলদাতা করুণাময় জনক জননী, সর্ব্ব-সন্তাপহারী প্রেমময় প্রাণসখা জাগ্রত জীবন্ত রহিয়াছেন।

কিন্তু নিখিল-বিশ্বময়ী প্রকৃতি অষ্ট প্রহর এই যে গভীর প্রাণের কথা ব্যক্ত করিতেছে, সূর্য্যের উদয় হইতে সূর্য্যের অস্ত পর্য্যন্ত, বৎসরের আদি হইতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত, মহান্ প্রভু দীনবন্ধু বিশ্ববিধাতার মহিমা-গানে দিক্ বিদিক্ মন্ত্র-মোহিত করিতেছে;—আমরা যদি মনুষ্য হইয়া—অমৃতের পুত্র হইয়া—তাহা শুনিতে না পাই তবে আর কে তাহা শুনিবে? প্রস্তর পাষাণ তরু লতা পুষ্প পল্লবের কি কর্ণ আছে যে, তাহারা তাহা শুনিবে? না পশু-পক্ষীর রাগ-রাগিণী-বোধ আছে যে, তাহারা তাহার গভীর মর্ম্মরস আস্বাদন করিবে! হায়! মনুষ্যের মধ্যেও অনেকেই তাহার প্রতি বধির! কিন্তু যে কোনো শুভ মুহূর্ত্তে যে মনুষ্য যখনই তাহা শুনিতে পায়, তখনি তাহা তাহার কর্ণে কত যেন যুগ-যুগান্তরের চির-পরিচিত জন্ম-ভূমির অর্দ্ধ-স্ফুট স্বর্গীয় সমাচার আনয়ন করিয়া তাহার প্রাণের নিভৃত প্রদেশে বিন্দু বিন্দু সুধাবারি সিঞ্চন করিতে থাকে। যে মনুষ্য অকৃত্রিম সরল স্বর্গীয় প্রকৃতির মুখে পরমারাধ্য পরম-দেবতার গুণ-সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়াছে—তাহার কর্ণে আর কোনো সঙ্গীতই ভাল লাগে না; যে মনুষ্য সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের অস্ফুট প্রেমমুখচ্ছবি যবনিকার আড়ালে একবার দেখিয়াছে—তাহার চক্ষে বাহিরের কোনো সৌন্দর্য্যই ভাল লাগে না। সেই মনুষ্যের অন্তঃকরণ হইতেই এইরূপ গগন-ভেদী খেদোক্তি ধ্বনিত হইয়া উঠে যে

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"।

যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা কর। পশু-পক্ষীদিগের কি? অল্প লইয়া তাহারা প্রগাঢ় সন্তোষে কাল-যাপন করিতেছে! অল্পেই তাহাদের পরম সুখ; যাহা অল্প নহে তাহা তাহাদের কিছুই নহে! পশু-পক্ষীদিগের চারি-দিকে জড়তা এবং মূঢ়তার অভেদ্য প্রাচীর সমুত্থিত রহিয়াছে; সেই প্রাচীরের সংকীর্ণ পরিধির অভ্যন্তরে তাহারা স্বস্ব স্বভাবোচিত পূর্ণতা অবলীলাক্রমে উপার্জ্জন করে এবং তাহার বাহিরে তাহারা একবারও উঁকি দিয়া দেখে না!

তাহাদের সমস্ত আশা-ভরসার পৃথিবী হইতেই উৎপত্তি এবং পৃথিবীতেই নিবৃত্তি। পশু পক্ষীরা ভূমিষ্ঠ হইবার কিয়ৎ কাল পরেই জীবন-নির্ব্বাহ-কার্য্যে পূর্ণ পরিপক্কতা লাভ করে; কিন্তু মনুষ্য যাবজ্জীবনেও সেরূপ অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য জীবন-নির্ব্বাহ-কার্য্যে চিরকালই অসম্পূর্ণ; কিন্তু তাহার সে অসম্পূর্ণতার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দেওয়া নাই; পূর্ণতার মহান্ আদর্শ তাহাকে চারিদিক্ হইতে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; অসীম আকাশ হইতে পূর্ণতা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে এবং আত্মার গভীর হইতে পূর্ণতা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; মনুষ্য অতীব অপূর্ণ জীব, কিন্তু তাহার ভয় নাই; সে পূর্ণ পরামাত্মার ক্রোড়ে বসিয়া আছে—এবং তাঁহার অমৃত সংস্পর্শ অন্তরে উপলব্ধি করিতেছে—ইহাতেই সে স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছে। এই জন্যই অল্প কোনো কিছুতে মনুষ্য তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না—পৃথিবীর একাধিপত্যেও নহে—স্বর্গের ইন্দ্রত্বেও নহে—কিছুতেই সে তৃপ্তি-লাভ করিতে পারে না। যে অমৃতের অধিকারী, সে ক্ষণভঙ্গুর পদার্থে কিরূপে তৃপ্তি লাভ করিবে?

মনুষ্য কোনো পরিমিত পদার্থেরই অধীনে থাকিতে চাহে না—ইহাই—স্বাধীনতাই—মনুষ্যের প্রগাঢ় অতৃপ্তির মূল কারণ। এইরূপ অতৃপ্তি এবং অসন্তোষই যদি মনুষ্যের যথা-সর্ব্বস্ব হয়, তবে মনুষ্যের ন্যায় এমন হতভাগ্য জীব আর পৃথিবীতে জন্মে নাই। আরণ্যক পশুদিগের যাহার যাহা নির্দ্দিষ্ট পরিধি, তাহার অভ্যন্তরে সে পরম সন্তোষে কালযাপন করিতেছে; মনুষ্যই কেবল কি যেন এক উত্তপ্ত রোগ-শয্যায় অহর্নিশি এপাশ ওপাশ করিয়া সারা হইতেছে। মাতা যখন শিশুকে ছাড়িয়া দিয়া কপাট বন্ধ করিয়া গৃহ-মধ্যে লুকাইয়া থাকে, তখন শিশুটির অবস্থা যেরূপ হয়; ঈশ্বরকে চতুর্দ্দিকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া মনুষ্যের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। মনুষ্য স্বাধীন—মনুষ্যের হস্তে কোনো প্রকার অবলম্বন-যষ্টি নাই যে, তাহার উপরে সে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, অথচ সে তাহার প্রাণ-সখাকে—জীবনের একমাত্র সম্বলকে—কোনো স্থানেই খুঁজিয়া পাইতেছে না। কিন্তু শিশুকে অসহায় ছাড়িয়া দিয়া মাতা কতক্ষণ কপাট বন্ধ করিয়া লুকাইয়া থাকিতে পারে? পরম মঙ্গলালয় বিশ্বের জনক জননী মনুষ্যের স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই—সেই দ্বারে তিনি অলক্ষিত পদ-সঞ্চারে আপনি আসিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বিষয়ারণ্য হইতে চক্ষু ফিরাইলেই আমরা তাঁহার দর্শন পাইয়া সমস্ত পাপতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি; কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা বিষয়ারণ্যে অবলম্বন-যষ্টি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি এবং গভীর হইতে গভীর-তর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পথ ভুলিয়া গিয়া হাহাকার করিতেছি। কিন্তু এখনো পরমাত্মা আমাদের প্রতি করুণা বিতরণে এক মুহূর্ত্তও কাতর নহেন; তিনি প্রকৃতিকে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে ইঙ্গিত করিয়া দিতেছেন—আর অমনি সমস্ত প্রকৃতি গীত-ধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠিতেছে; কখনো বা আনন্দের গীত গান করিতেছে, কখনো বা প্রেমের গীত গান করিতেছে, কখনো

বা ভয়ের গীত গান করিতেছে; নানা প্রকার কৌশলে পরমাত্মার প্রতি আত্মার চক্ষু ফুটাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

পরমাত্মাই আমাদের আত্মার আকাঙ্ক্ষার ধন; পরমাত্মা যেমন মহান্ যেমন অতলস্পর্শ, আমাদের আত্মার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি মহান্, তেমনি অতলস্পর্শ। সমস্ত প্রকৃতি অপেক্ষা আত্মার আকাঙ্ক্ষা অসীম বড়;—আত্মা পরমাত্মাকে যতক্ষণ না দেখিতে পায়, ততক্ষণ তাহার সেই অসীম আকাঙ্ক্ষা অসীম দুঃখের জননী হইয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্যও সুস্থ থাকিতে দেয় না। কিন্তু মনুষ্যের সেই অসীম আকাঙ্ক্ষা যখন পরমাত্মাতে সংযুক্ত হয়—তখন তাহাব সেই আকাঙ্ক্ষা যেমন অপার এবং অতলস্পর্শ তাহার আনন্দও তেমনি অপার এবং অতলস্পর্শ হইয়া উঠে। পূর্ব্বে আত্মার আকাঙ্ক্ষা যত বড় ছিল—তাহার পরে পরমাত্মার সংস্পর্শে সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইয়া আত্মা স্বয়ং তত বড় হইয়া উঠে; এত বড় হইয়া উঠে যে, চরাচর প্রকৃতি তাহাকে নাগাল পায় না।

যাঁহারা প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মাকে ভুলিয়া সংসারারণ্যে বিচরণ করেন, তাঁহারা আত্মা অপেক্ষা প্রকৃতিকে অসীম বড় মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, সূর্য্য আকাশের এক কোণে মৃতবৎ পড়িয়া আছে—মেঘ সমস্ত আকাশ আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে; অতএব মেঘের আয়তন সূর্য্য অপেক্ষা অসীম বিস্তৃত। তেমনি, প্রকৃতির পাষাণ অপেক্ষাও সুকঠিন বক্ষ এবং বজ্র অপেক্ষাও দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়া, ঈশ্বরপরাঙ্মুখ মনুষ্যের মনে হয় যেন—আত্মার আকাঙ্ক্ষা অগাধ রসাতলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে; অন্ধ প্রকৃতির বিশ্ব-বিজয়ী পরাক্রমের প্রখর সূর্য্যালোকে আত্মার খদ্যোত-জ্যোতি যেন একেবারেই নির্ব্বাণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল, পরমাত্মার প্রতি যাঁহার অন্তশ্চক্ষু ফুটিয়াছে তিনিই প্রকৃত বৃত্তান্তটি বুঝিতে পারেন—তিনি বুঝিতে পারেন যে, সমস্ত আকাশব্যাপী এত বড় এই যে মেঘের বিস্তার, ইহা সূর্য্যের অযুত কোটি অংশেরও একাংশ নহে; বুঝিতে পারেন যে, ব্রহ্মানন্দ-পরিপ্লুত আত্মার তুলনায় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র একটি হিম-বিন্দুও নহে। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, প্রকৃতি পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় মহিমা-গানে দিবারাত্র ধ্বনিত হইতেছে; জীবাত্মা যখনই পরমাত্মার জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছে—সেই মধুময় সঙ্গীত শুনাইয়া প্রকৃতি দেবী তখনি তাহাকে থামাইয়া রাখিতেছে; জীবাত্মার অপরিপক্ক অবস্থায় প্রকৃতিই তাহার ধাত্রী। বীণা-যন্ত্রের শুদ্ধ কেবল উপাদান-সমষ্টির প্রতি যদি লক্ষ করা যায়, তবে তাহা কিছুই নহে; একটি কাষ্ঠ-দণ্ড, দুইটি অলাবু-খণ্ড এবং চার পাঁচ গাচি তন্ত্রী, এ বই আর কিছু নহে; কিন্তু তাহা হইতে যখন মূর্ত্তিমান্ রাগ-রাগিণী বিনিঃসৃত হইয়া শ্রোতার অন্তশ্চক্ষুতে স্বর্গের দ্বার অপাবৃত করিয়া দেয়, তখন তাহার যে কি অনুপম মূল্য—তাহা শুনিয়া যে ব্যক্তি মোহিত হয় সেই ব্যক্তিই তাহা বুঝিতে পারে। জগতের উপাদান-সমষ্টি বীণার দণ্ড কমণ্ডলু তন্ত্রী অপেক্ষা অধিক কিছুই নহে; জল বায়ু মৃত্তিকা অগ্নি আকাশ—এই বই নহে; কিন্তু এই মৃণ্ময় ধাতুময় প্রস্তরময় জগৎ হইতে যে এক সুধাময় সঙ্গীত-লহরী নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, তাহার সহিত ঐ সকল উপাদান-রাশির কোনো সাদৃশ্যই নাই। প্রকৃতির

মোহিনী বীণা শুনিতে শুনিতে কোনো এক শুভ মুহূর্ত্তে যখন আত্মার চক্ষু পরমাত্মার প্রতি ফিরিয়া যায় তখন আত্মা প্রকৃতির হস্ত হইতে বীণা কাড়িয়া লইয়া এরূপ অনির্ব্বচনীয় মধুর স্বরে পরমাত্মার গুণ-গান আরম্ভ করে যে, চরাচর প্রকৃতি তাহা শুনিয়া পুলকে স্তব্ধ হইয়া যায়—এবং পাষাণ হৃদয়ও অশ্রুবারিতে দ্রবীভূত হইয়া যায়। প্রকৃতির গীত অপেক্ষা আত্মার গীত অনেক উচ্চ গ্রামের এবং উচ্চ স্বরের গীত; সে গীতের প্রত্যেক হিল্লোলে অনন্ত সত্যের অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত মঙ্গলের তরঙ্গ-লহরী প্রবাহিত হইয়া চরাচর প্রকৃতিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে! এখন দেখিতেছ যে,প্রকৃতি প্রধান গায়ক, মনুষ্য তাহার অনুগায়ক; কিন্তু এই মর্ত্ত্য মনুষ্য যখন ঈশ্বরের ভাবের ভাবুক হইয়া অমর্ত্ত্য হইয়া উঠিবে—তখন দেখিবে যে,মনুষ্যই প্রধান গায়ক—প্রকৃতি তাহার অনুগায়ক মাত্র। এখন দেখিতেছ যে, মনুষ্য প্রকৃতির অনুকরণ করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে; কিন্তু মনুষ্য যখন ঈশ্বরের অনুরক্ত ভক্ত হইয়া ঈশ্বরের কার্য্যে কায়-মনোবাক্যে ব্রতী হইবে, তখন দেখিবে যে, মনুষ্যকে অনুকরণ করিবার জন্য সমস্ত প্রকৃতি চেষ্টা করিয়া সারা হইতেছে—কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। অদ্য আমাদের বিশেষ রূপে এইটি স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, আমরা প্রকৃতির অধীনস্থ প্রজা নহি—কিন্তু প্রকৃতির আমরা অধিকারী! আমরা ঈশ্বরের পুত্র অমৃতের অধিকারী। আমরা কোনো বিদেশী রাজার অধিকারে উপস্থিত হই নাই—আমরা আমাদের পরম-পিতা এবং পরম মাতার ভবনে—আমাদের চিরন্তন পৈতৃক ভবনে উপস্থিত হইয়াছি। তাহার নিদর্শন আজ আমাদের অন্তরে বাহিরে দেদীপ্যমান! আমরা আজ কত যেন অজ্ঞাত অপরিচিত বিদেশ হইতে কি যেন এক সুধাময় শান্তি নিকেতনে—আপনার হইতেও আপনার নিকেতনে—উপনীত হইয়াছি? দেবতারা যেন আমাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন—"মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে!" বিশ্বের আরাধ্য পরম-দেবতা আজ আমাদের পূজা গ্রহণ করিতেছেন—আজ আমাদের কত না আনন্দ!

হে পরমাত্মন্! এই বৎসরের প্রারম্ভ-দিবসে আমরা আজ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার প্রসাদ-বারির জন্য তৃষাতুর চিত্তে এখানে সমাগত হইয়াছি। তোমার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতি তুমি আজ আমাদের সমক্ষে প্রকাশ কর—তাহাই আমাদের সম্বৎসরের ধ্রুব তারা হইবে। মাতা পিতা গুরু বন্ধু তুমি আমাদের সবই; তোমাকে নিকটে দেখিলে আমরা কোনো ভয়েই ভীত হই না—কোনো দুঃখেই কাতর হই না, কোনো সুখেই মুগ্ধ হই না। তুমি যখন আমাদের আশ্রয় এবং নেতা তখন আমাদের কিসের ভয়—কিসের অভাব! তুমি যখন আমাদের প্রিয়তম সুহৃৎ তখন আমাদের সুখ-সৌভাগ্যের সীমা কোথায়? তখন ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য আমাদের করতলে। তোমার মত এমন আমাদের নিজস্ব ধন থাকিতে—কেন আমরা পথে পথে হাহাকার করিব? আজ তুমি আমাদের তৃষিত নয়নে তোমার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতি প্রকাশ কর—আমাদের তৃষিত হৃদয়ে তোমার প্রেমামৃত বিন্দু প্রদান কর—সম্বৎসরের মধ্যে তোমার দর্শনের এমন শুভ অবসর আর আমাদের সহসা মিলিবে না। তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া

আমরা সম্পদে বিপদে অটল থাকিয়া তোমারি কার্য্য সাধন করিব—তুমি আমাদিগকে প্রেম দেও বল দেও জ্ঞান দেও ধৈর্য্য দেও, তোমার পদতলে আমাদিগকে স্থান দেও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রহ্মপূজা।*

অদ্য আমাদের কি আনন্দের দিন। প্রশান্ত গম্ভীর সায়ং সময়ে অপার অগম্য অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য আমরা একত্র হইয়াছি। আজ বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম সমাজের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব। এই নগরে যে দিন ব্রহ্মজ্ঞানরূপ দীপ্তিমান সূর্য্য নানাবিধ উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকা ভেদ পূর্ব্বক অভ্যুদিত হইয়াছিল, সেই পবিত্র দিনের স্মরণার্থে অদ্য আমরা বন্ধু বান্ধবে আনন্দ মনে প্রফুল্ল হৃদয়ে এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি। এই ভারতভূমি চিরদিন ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ। ধর্ম্মই এই জাতির একমাত্র সম্বল। এই আর্য্য ভূমিকে ধর্ম্মের জন্য কত না বিপ্লব আন্দোলন সহ্য করিতে হইয়াছে। এক এক দেশ এক এক বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। আমাদের ভারতবর্ষ জ্ঞান ধর্ম্মের নিমিত্তই চির প্রসিদ্ধ। আমাদের শরীরের রক্ত মাংস যেমন পুরুষপরম্পরা হইতে আমরা লাভ করিয়াছি আমাদের জ্ঞানধর্ম্ম মনুষ্যত্বও সেই প্রকার পূর্ব্ব-পুরুষ দিগেরই সম্পত্তি। আমরা এখন দেহ মনের যতই উন্নতি করি না কেন, আমরা প্রাচীন হিন্দুজাতির বংশধর ইহা আর অস্বীকার করিবার যো নাই। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম আজকার উজ্জ্বল শতাব্দীতে যতই উন্নত আকার ধারণ করুক না, তাহার মূল ও প্রাণ যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য ভাব কি? অপক্ষপাতে হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে যে একমাত্র ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য ভাব। বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্রাদি সমুদায় শাস্ত্রেই ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন মুক্তি নাই এই কথা সমুদায় হিন্দুশাস্ত্র সমস্বরে প্রতিপাদন করে। পুরাণাদি শাস্ত্রে কনিষ্ঠাধিকারীদের জন্য মূর্ত্তিপূজা ও ব্রহ্মের নানা অবতার কল্পিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান ধারণাতে অক্ষম, সেই সকল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা দেবার্চ্চনাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলে ক্রমে তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। ঋগ্বেদাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন কালে বৈদিক ঋষিগণ হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে প্রকৃতির পূজা করিতেন।

শং নোমিত্রঃ শং বরুণঃ শং নোভবত্বর্য্যমা শংনোবৃহস্পতিঃ।”

সূর্য্যদেব আমাদের সুখ বর্দ্ধন করুন, বরুণ ও আদিত্য আমাদের মঙ্গল করুন, বৃহস্পতি আমাদের কল্যাণ করুন। “হে অগ্নি! হে নরগণের প্রতিপালক! তুমি সকল জগতের রক্ষক ও অমৃতস্বরূপ, আমি তোমার স্তব করি।* ঋগ্বেদের নানাস্থানে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির স্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নবোদিত সূর্য্যের স্বর্ণাভ-কিরণমালা, পূর্ণকল চন্দ্রমার বিমল শোভা, পবিত্র উষার মনোহর সৌন্দর্য্য, অগ্নির প্রচণ্ড প্রভা ও মেঘের শ্যামল কান্তি

* বর্দ্ধমান ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এই বক্তৃতা করেন।

* ঋগ্বেদ সংহিতা ১ম মণ্ডল ৯ম অনুবাক ১ম সূক্ত।

প্রকৃতির সর্ব্বত্রেই ঋষিরা জীবন্ত ভাব কল্পনা করিতেন। যাহা কিছু প্রভাবশালী, যাহা-কিছু বিস্ময়জনক, যাহা কিছু তাঁহাদের কল্যাণ বিধান করিত, কবিত্বরসে উদ্বেলিত হইয়া ঋষিরা তাহারই স্তবস্তুতি করিতেন, আপনাদের সকল প্রকার অভাব মোচনের জন্য সরল হৃদয়ে তাহাদের উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, সূর্য্যের অধিদেবতা, চন্দ্রের অধিদেবতা, মেঘ ও বায়ুর অধিদেবতা স্বতন্ত্র। কেবল হৃদয়ের প্রভাবে আদিম আর্য্য ঋষিগণ প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা অবলোকন করিয়া প্রকৃতিকেই জীবন্ত জাগ্রত বলিয়া পূজা করিতেন। তাঁহাদের সরল হৃদয়ে প্রকৃতি জীবন্ত মঙ্গলময় মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইত। ক্রমে যখন বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ হইল, ঋষিরা প্রকৃতির কার্য্য-কলাপ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন, তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানে জানিতে পারিলেন যে, একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অধিষ্ঠানে এই বিশ্ব নিয়মিত হইতেছে।

"সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।"

নিমেষে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা সেই বিদ্যুতসমান দীপ্তিমান পুরুষ কর্ত্তৃক হইতেছে।

"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ"

(তৈত্তিরীয় শ্রুতি)

যিনি এই পুরুষে, যিনি এই আদিত্যে তিনি এক।

"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"

ব্রহ্ম এক মাত্র অদ্বিতীয়।

"সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"

(তৈত্তিরীয় শ্রুতি)

ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ। বৈদিক ঋষিদের সমুদায় স্তোত্রের ভিতরে ব্রহ্মের এই অনন্তভাব স্ফুরিত হইয়াছে। ইন্দ্র বরুণের শক্তিতে তাঁহারা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও অনন্ত মহিমা পরি-চ্ছিন্ন ভাবে দেখিতেন, কিন্তু অনন্ত ঈশ্ব-রের আভাস তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, তাই কখন কখন বলিয়াছেন,

"যো জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে যো জাগার তমু সামানি যন্তি যো জাগার তময়ং সোম আহ।"

(ঋগ্বেদ সংহিতা)

যিনি জাগিয়া আছেন, ঋক সকল তাঁ-হাকেই কামনা করিতেছে, যিনি জাগিয়া আছেন সাম সকল তাঁহাকেই প্রাপ্ত হই-তেছে, যিনি জাগিয়া আছেন সোম যাগ তাঁহারই কথা কহিতেছে। এইরূপে এক-মাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে আর্য্য সন্তানেরা পূর্ব্বআরাধিত অগ্নি সূর্য্য বরুণ প্রভৃতি দেবতাকে ঈশ্বরের এক একটি নাম বলিয়া প্রচার করিলেন।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথোদিব্যঃ সসুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

সদ্বিপ্রেরা এক দেবতাকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, গরুড় যম ও মাতরিশ্বা এইরূপ বহু-প্রকার করিয়া বলেন।

"তদ্যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবং এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হোব সর্ব্বে দেবাঃ।"

অতএব ইহাঁকে পূজা কর ইহাঁকে পূজা কর এইরূপ যদি এক এক দেবতার উল্লেখ হয়, তাহা এই, এক দেবতারই পূজা, এই একই সকল দেবতা। এই প্রকারে আমাদের পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষেরা প্রকৃতির উপাসনার মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন।

"য আদিত্যমন্তরো যময়তি এষত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ"

(শ্রুতি)

যিনি সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া সূর্য্যকে

নিয়মিত করিতেছেন, সেই অবিনাশী তোমার অন্তর্যামী আত্মা হয়েন।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ"

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে।

"ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ"

ইহাঁর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উদয় হইতেছে। একো-বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, এই সকল শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একমাত্র ব্রহ্মকে সর্ব্বভূতের অন্তর্যামীরূপে ঋষিরা দেখিতেন।

ব্রহ্মের উদ্দেশেই তাঁহারা সমুদায় যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন।

"যো দেবানামধিপো যস্মিল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশেস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।"

(শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি)

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি যাঁহাতে লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ তাবৎ প্রাণীদিগকে শাসনে রাখেন, তিনি ব্যতীত আমরা আর কাহার উপাসনা করিব। এতদিন ঋষিদের দৃষ্টি বহির্জগতেই নিবদ্ধ ছিল, ঈশ্বরের দীপ্যমান মঙ্গলভাব ও মহিমা বাহিরেই অন্বেষণ করিতেন। পরে অন্তর্দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইল, উপনিষৎকাল আরম্ভ হইল। এতদিন ঋষিরা ব্রহ্মকে সূর্য্যের অভ্যন্তরে চন্দ্রমার অভ্যন্তরে গ্রহতারকার অভ্যন্তরে, মেঘ ও বিদ্যুতের অভ্যন্তরে অবলোকন করিয়া প্রকৃতির স্তুতিগানে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেন, তাহাতে তৃপ্তিলাভ না করিয়া অবশেষে আপনার আত্মার অভ্যন্তরে উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে প্রাণ স্বরূপ আনন্দ অমৃতময় ঈশ্বরকে লাভ করিয়া আপ্তকাম হইয়া বলিলেন, ঈশ্বর "প্রাণস্য প্রাণম্" প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন।

"রসোবৈ সঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"

(তৈত্তেরীয় শ্রুতি)

পরমাত্মা রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু, তাঁহাকে লাভ করিয়াই জীব আনন্দিত হয়েন।

"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ"।

কেবা শরীর চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। এইরূপে উপনিষৎকালে যখন ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা প্রাচীন আর্য্যসমাজে প্রবল হইয়া উঠিল, তখন আত্মজ্ঞানের পবিত্র আলোকে ঋষিরা জানিতে পারিলেন যে, অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞ সকল বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয়. তাই অমনি বলিয়া উঠিলেন,

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন লোকে জুহোতি জযতে তপস্তপাতে বহূনি বষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তত্ভবাত। (বৃহদারণ্যক)

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফলপ্রাপ্ত হয় না। ঋষিগণ যতই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করিতে লাগিলেন, যতই একনিষ্ঠ ভাবে ব্রহ্মার্পিত চিত্তে ধ্যান ধারণাতে মগ্ন হইলেন, ততই ব্রহ্মজ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম নিগূঢ় তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া উপনিষৎ আকারে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বেদ শিরোভাগ উপনিষদেই ব্রহ্মের যথার্থ জ্ঞান প্রকাশিত রহিয়াছে। পৃথিবীর কোন গ্রন্থেই ব্রহ্মতত্ত্বের এত গূঢ় মীমাংসা আর নাই। উপনিষৎকালই ভারতের গৌরবের কাল, উপনিষৎ শাস্ত্রই ভারতে গৌরবের শাস্ত্র।

স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর আপনি জীবের অন্তরে কৃপা করিয়া প্রকাশিত না হইলে, কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানপিপাসু পবিত্রহৃদয় আর্য্য ঋষিদের অন্তরাকাশে ব্রহ্মসূর্য্য আপনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন। জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দ্বিবিধ। অন্যের নিকটে শুনিয়া যে জ্ঞান তাহা পরোক্ষ, আর আপনার আত্মাতে প্রত্যক্ষ অনুভূতিই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

"একাত্মপ্রত্যয়সারং" "একঃ জগৎকারণং ব্রহ্মাস্তীতি আত্মনঃ প্রত্যয়ঃ সারং প্রমাণং যস্যাধিগমে তৎ একাত্মপ্রত্যয়সারং।"

একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। উপনিষৎকার ঋষিগণ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াই ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। ব্রহ্ম কি? না যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনিই ব্রহ্ম, কোন ক্ষুদ্র পরিমিত বস্তু ব্রহ্ম নহে। "যোবৈ ভূমা তৎ সুখং" যিনি ভূমা যিনি মহান্ তিনিই সুখস্বরূপ। ব্রহ্মের লক্ষণ কি? শাস্ত্রানুসারে লক্ষণ দুই প্রকার, তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ। একবস্তুকে অন্য বস্তু দ্বারা জানানই তটস্থ লক্ষণ। আর যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করাই স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর ইন্দ্রিয়ের অতীত, তাঁহার নির্দ্দেশ কি প্রকারে হইতে পারে, এই নিমিত্ত ভগবান ব্যাসদেব স্বীয় শারীরক সূত্রে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ এই বিশ্বের জন্মস্থিতিভঙ্গ যাঁহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম, এই প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।"

(শ্রুতি।)

যাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা কর্ত্তৃক জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম। ইহাই তটস্থ লক্ষণ। আর যে লক্ষণ লক্ষ্য বস্তুর সহিত অভিন্ন তাহাই স্বরূপ লক্ষণ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ। "রসোবৈ সঃ" তিনি রসস্বরূপ ইহাই স্বরূপ লক্ষণ। সত্য জ্ঞান অনন্তত্ব এবং আনন্দ ব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু নহে, ব্রহ্মেরই স্বরূপ। মহাগৃহস্থ শৌনক ব্রহ্মবিৎ আঙ্গিরসের নিকট যথাবিধানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! এমন কি বস্তু আছেন যাঁহাকে জানিলে সমুদায় জানা যায়?

"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।"

(মুণ্ডকশ্রুতি।)

আঙ্গিরস বলিলেন, ব্রহ্মবিদেরা বলেন, বিদ্যা দুই প্রকার, পরা ও অপরা। ঋক যজুর্ব্বেদাদি বেদ চতুষ্টয় এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, আর যাহার দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যাই সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। আঙ্গিরস বলিলেন,

"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।"

(মুণ্ডকশ্রুতি।)

সেই যে ব্রহ্ম তিনি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয় বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর জন্মরহিত রূপরহিত চক্ষু শ্রোত্র বিহীন হস্তপদাদি অবয়ব শূন্য জন্মমৃত্যুবর্জ্জিত নিত্য স্থিতিশীল সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী অতিসূক্ষ্ম স্বভাব ক্ষয়রহিত সর্ব্ব-

ভূতের যোনি অর্থাৎ কারণ স্বরূপ, সেই পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন। তলবকার শ্রুতিতে আচার্য্য বলিতেছেন, যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, হে শিষ্য! তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যাহা কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে। "প্রাণো-হ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি" ইনি প্রাণ স্বরূপ সর্ব্বভূতে যিনি প্রকাশ পাইতেছেন। আর্য্য ঋষিরা প্রকৃতির অভ্যন্তরে এবং আপনার প্রাণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ধ্যান ধারণা ও সাধনবলে দেশ কালের অতীত সকল জ্ঞানের মূল জ্ঞান সকল কারণের মূল কারণ সকল শক্তির মূল শক্তি জ্ঞানশক্তিসমন্বিত মহান পুরুষকে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই মহান পুরুষকেই সকল গতি হইতে চরম গতি সকল সম্পদ হইতে পরম সম্পদ্ এবং সকল আনন্দ হইতে পরম আনন্দরূপে আত্মাতে সম্ভোগ করিয়া বলিয়াছেন,

"তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং"

তাঁহাকে যে ধীরেরা আপন আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদের তাহা কদাপি হয় না। যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি" যাঁহারা ইহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন, তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি" ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। আত্মাতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার উপদেশ একমাত্র উপনিষদেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে আর্য্যেরা ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া যে সকল অধ্যাত্ম তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেশ আজ পর্য্যন্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সময়ে ভারতীয় আর্য্যসমাজ উন্নতির অত্যুচ্চ অবস্থাতে উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু দেশের আপামর সাধারণ লোক আরণ্যক ঋষিদিগের উন্নত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় কালক্রমে অধিকার ভেদে ধর্ম্মযাজনার নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইল। পুরাণকারেরা বৈদিক ধর্ম্মকে নানা আখ্যায়িকার আকারে সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোক শূদ্র ও পতিত ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত জ্ঞানালোচনায় অনধিকারী ছিল। তাহারা পুরাণবর্ণিত ব্রতনিয়ম ও অবতারপূজা আরম্ভ করিল। হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তাদের উপদেশ এই যে, যাহারা ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন ও কামনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা ফলকামনা করিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিলেও কালে তদ্দারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া নিষ্কাম প্রীতিতে পরমাত্মার উপাসনা করিতে অধিকারী হইবে, এই জন্য কনিষ্ঠ অধিকারী লোকের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বাহ্য ক্রিয়ার আবশ্যকতা। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মে চির-বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানের উপদেশ এই, যাহা সত্য ও সার বলিয়া জান, তাহাই অনুষ্ঠান কর। জ্ঞানী বলেন, পার্থিব ও স্বর্গের সুখভোগ অসার, ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা ঈশ্বর প্রেমের আনন্দ নির্ম্মল ও শ্রেষ্ঠ, তাই তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে হৃদয়ের স্বাভাবিক ভক্তিভরে পরমাত্মার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হয়েন। বিষয়বন্ধন অতিক্রম করিয়া নিরন্তর ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইবার

জন্যই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞান বলেন, বিচার করিয়া হৃদয়ের অনুভবে কার্য্য কর* আর কর্ম্মের আদেশ এই যাহা বিধি, তাহারই অনুসরণ কর, বিধির যেন কোন অঙ্গহানি না হয়, প্রাণে অনুভব কর আর না কর, সে জন্য কোন ভাবনা নাই। যজমান ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত ভৃতিভুক্ পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াই আশ্বস্ত। এই বিধিসিদ্ধ যাগযজ্ঞাদি ব্রতানুষ্ঠান কেবল ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত। কেহ পুত্রের আশায়, কেহ স্বামীর আশায়, কেহ ধনের আশায় কেহ কেবল যশের আশায় ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বর্গ ভোগের কামনায় ধর্ম্ম করে, তাহার কামনা আবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ধর্ম্ম কার্য্যে এখন যদি যৎসামান্য ব্যয় করি, স্বর্গে তাহার কোটিগুণ সুখ সৌভাগ্য লাভ হইবে, এই আশাতে ফলকামীরা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ভারতীয় আচার্য্যগণ সকলপ্রকার অধিকারীর উপযোগিতা অনুসারে উপদেশ করিয়াছেন, কেহই ধর্ম্মকর্ম্ম হইতে একেবারে বঞ্চিত না থাকুক, এই তাঁহাদের অভিপ্রায়। এই বিষয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। "অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ" অধিকারী প্রভেদেতে শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্মতত্ত্বে কোন মতে প্রীতি নাই এবং সর্ব্বদা অনাচারে রত হয়, তাহাকে অঘোর পথের আদেশ করেন, তদনুসারে সেই ব্যক্তি কহে যে "অঘোরান্ন পরো-মন্ত্রঃ" অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে বিমুখ এবং পানাদিতে রত তাহার প্রতি বামাচারের আদেশ করেন, এবং সে কহে যে "অলিনা বিন্দু মাত্রেণ ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ" বিন্দু মাত্র মদিরা দ্বারা তিন কোটি কুলের উদ্ধার হয়। আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রীসুখাদি বিষয়ে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহার প্রতি স্ত্রী পুরুষের ক্রীড়াঘটিত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে,

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃনুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ" ইত্যাদি

যে ব্যক্তি ব্রজবধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ এবং বর্ণন করে সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরম ভক্তি হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্তি হয়। আর যাহারা হিংসাদি কর্ম্মেতে রত হয়, তাহার প্রতি ছাগাদি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে, মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভগবতী প্রীতা হয়েন। এ সকল অপরা বিদ্যা হয়, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মতত্ত্ব বিমুখ সকল যাহাদের স্বভাবতঃ অশুচি ভক্ষণে মদিরাপানে স্ত্রীপুরুষসেবিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয়, তাহারা নাস্তিক রূপে এই সকল গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্বলিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এই সকল কর্ম্ম যেন করে, যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয়।

হিন্দুশাস্ত্র জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড উভয় ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মীরা কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সকল অবলম্বন করিয়া কর্ম্মেরই প্রাধান্য

* বেদান্তশাস্ত্রে জ্ঞান বলিতে আত্মার অভেদ জ্ঞান বুঝায়। এই জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের চির বিরোধ। কর্ম্ম কর্ত্তৃসাধ্য আর যে অকর্ত্তা জ্ঞান তাহারই হয়, এই কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্ব লইয়াই বেদান্ত শাস্ত্রে জ্ঞান কর্ম্মে বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে। সং

কীর্ত্তন করেন, নানাবিধ ফলশ্রুতির প্রলোভনে ভোগাভিলাষী ব্যক্তিগণকে যাগযজ্ঞাদিকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। জ্ঞানীরা জ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্মকাণ্ডের অলীকতা উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানযোগে পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা পরমানন্দে মগ্ন হয়েন। বেদশিরোভাগ বেদান্ত স্বরূপ জ্ঞানকাণ্ড উপনিষৎ ও গীতা এবং পুরাণ ভাগবতাদিতেও কাম্য কর্ম্মের যথেষ্ঠ নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতা কাম্য কর্ম্মের নিন্দাতে পরিপূর্ণ। যদিও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লোক সংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকাম কর্ম্মের উপদেশ নহে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগই গীতাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত রহিয়াছে, গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। যে সকল যাগ যজ্ঞ পূজা অর্চ্চনাদির আরম্ভেই সংকল্প, ভোগাভিলাষ পুত্র ও বিত্ত কামনা ব্যতীত যাহা অনুষ্ঠিতই হয় না, পরজন্মে বা স্বর্গলোকে ধন, মান ও বিবিধ ইন্দ্রিয় সুখদ বস্তু লাভের আশায় যে সকল ব্রত অনুষ্ঠিত হয় ব্রহ্মোপাসক আপনার জ্ঞান বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সমাজরক্ষা বা লোকরক্ষার জন্য কি প্রকারে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন আমরা বুঝিতে পারি না। ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য, ধর্ম্মের পুরস্কার স্বয়ং পরমেশ্বর। প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা দ্বারা যে সুখ উপার্জ্জন করা যায়, সেই সুখ যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য হয়, তবে আর ধর্ম্মের মহত্ত্ব কি। মহাভারতে দ্রৌপদীকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, আমি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করি না, আমি দাতব্য বলিয়া দান করি, যষ্টব্য বলিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকি, ফল থাকুক আর না থাকুক, গৃহধর্ম্ম পালন করিতে আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহাই করি। যাহারা স্বর্গাদি ফললাভ লোভে ধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা ধর্ম্মবণিক ও অতি মূর্খ। সেই ধর্ম্মবণিকেরা ধার্ম্মিক সমাজে ঘৃণিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে,

> "এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
> ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি"।

বেদের তাৎপর্য্য যে মোক্ষ তাহা না জানিয়া কুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল আপাততঃ রমণীয় যে ফলশ্রুতি তাহাকেই পরম ফল কহিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত বেদজ্ঞেরা এ প্রকার কহেন না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলেন পণ্ডিতেরা মূর্খদিগকে কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন না। তিনি ভাগবতের এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,

> "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্মহি।
> ন রাতি রোগিণেঽপথ্যং বাঞ্ছতেপি ভিষকৃতমঃ"॥

আপনি মুক্তিসাধন পথকে জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে কাম্য কর্ম্ম করিতে কহিবে না। যেমন কুপথ্য আহারেচ্ছু রোগীকে সৎ বৈদ্য কদাপি কুপথ্য দেন না। লোক সমাজের গভীর অজ্ঞানতা দেখিয়া আর্য্য ঋষিরা মনে করিলেন যে, সাধারণ জনগণ জ্ঞানমার্গানুসরণ করিয়া পরমাত্মার উপাসনাতে সক্ষম হইবে না, এই জন্য তাঁহারা সাধারণ শ্রেণীর নিমিত্ত যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা করিলেন এবং ঐ সকল ক্রিয়া নিষ্কাম হইয়া করিলে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অধিকারী হইবে এই প্রকার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হৃদয়শূন্য বাহ্য কর্ম্মকাণ্ডই এদেশের সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া পড়িল। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপূজা গৃহস্থভবন পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগের আশ্রমভূমি আশ্রয় করিল। ফলত কর্ম্মের

দ্বারা কর্ম্ম কখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। কাম্য-বস্তুর উপভোগে কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে। যযাতি রাজার এই আক্ষেপোক্তি অতিমাত্র সত্য। যাহারা সকাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধির প্রত্যাশা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা ঘৃতাহুতি দ্বারা জ্বলন্ত পাবককে নির্ব্বাণ করিতে ইচ্ছা করেন।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোন্যত্র লোকোয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"।

ঈশ্বরের উদ্দেশ বিনা যে কর্ম্ম তাহাই জীবের বন্ধনের কারণ। বেদান্তশাস্ত্র পঞ্চদশীতেও কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা প্রতিরুদ্ধ হয়, এইরূপ উপদেশ রহিয়াছে। অনেকে বলেন, অগ্রে দেবদেবীর পূজা ও কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন কর, তার পর ব্রহ্মোপাসনা। ভগবান বাদরায়ণ শারীরকের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। এই প্রথম সূত্রে চিত্তশুদ্ধির পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মূর্ত্তি পূজা বা যাগযজ্ঞের পর একথা বলেন নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যে লিখিয়াছেন,

"ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি অধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ।"

কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বেও যে ব্যক্তি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। আসল কথা এই যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলেই বুঝিতে হইবে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, কেননা কার্য্য থাকিলেই কারণ অনুমান করিতে হয়। ব্রহ্মউপাসকদিগের যে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার কোন প্রয়োজন নাই, হিন্দু শাস্ত্রে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে চরিত্র সত্যনিষ্ঠা ও সম দম প্রভৃতি আন্তরিক সাধনই যজ্ঞস্থানীয়। মহাভারতের অনেক স্থলে চরিত্রকে প্রধান যজ্ঞ বলা হইয়াছে। ক্ষমাও যজ্ঞ ইহাও মহাভারতের উপদেশ।

"অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধ সহস্রাত্তু সত্যমেকং বিশিষ্যতে"।

মহাভারত।

এক সহস্র অশ্বমেধ আর এক সত্য ইহার মধ্যে কে অধিক কে ন্যূন ইহা বিবেচনা করিতে এক সত্যই গুরুতর হইলেন। মনু বলিয়াছেন,

"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমেচ স্যাৎ বেদাভ্যাসেচ যত্নবান।"

দ্বিজোত্তম ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত যাবদীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে এবং প্রণব ও উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন।

"জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা"॥

মনু।

আর কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা, গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তাঁহারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্মাত্মক হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় যজ্ঞ সিদ্ধ হয়।
(মহাত্মা রা, মো, রায়)

শঙ্করাচার্য্য "আত্মানাত্মবিবেক" গ্রন্থে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে অজ্ঞানতা নাশ হয় কি না, এই সন্দেহ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, "ন কর্ম্মাদিনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ" কর্ম্মাদি দ্বারায় অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না। কি জন্য হয় না, না, "কর্ম্মাজ্ঞানয়োর্বিরোধো ন ভবেৎ" কর্ম্ম আর অজ্ঞান এই উভয়ের বিরোধ হয় না। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় জ্ঞান

কোথা হইতে হয়? না,"বিচারাদেব ভবতি" বিচার হইতেই হয়। যাঁহারা বিচার বিতর্ক শাস্ত্রচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ কাম্য কর্ম্মের যাজনা করেন, তাঁহারা চিত্ত-শুদ্ধি লাভ দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর কর্ম্ম-বন্ধনে জড়িত হইয়া ঘোর অজ্ঞানতাতে নিমগ্ন হয়েন। এই অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞানযোগে পরব্রহ্মের উপাসনা সাধারণ মধ্যে প্রচারিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই।

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। ভারতীয় আচার্য্যেরা একান্ত মূঢ় ব্যক্তিদের চিত্ত-স্থিরের জন্য নামরূপবিশিষ্ট মূর্ত্তিপূজার কল্পনা করিয়াছিলেন, নচেৎ মানুষ চির-কাল বাল্যলীলা করুক শাস্ত্রকারদের এপ্রকার অভিপ্রায় নহে। পুরাণাদি শাস্ত্রে সাকার উপাসনার বিধি আছে, আবার সেই পুরাণতন্ত্রেই এই সকল যে কেবল লোকরঞ্জনের নিমিত্ত কল্পনামাত্র, ইহাও কথিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

ইংরাজী কবি শেলী।

ইংরাজী কবি শেলী যখন তাঁহার Queen Mab কাব্যরচনা করিয়া প্রকাশ করেন তখন তাঁহার স্বদেশস্থ ব্যক্তিরা তাঁহাকে নাস্তিক মনে করিয়াছিল। কিন্তু ঐ কাব্যের অন্তর্গত বিশ্বাত্মার স্তোত্র যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহাকে কি প্রকারে নাস্তিক বলা যাইতে পারে? মেকলে বলিয়াছেন কবি কখন নাস্তিক হইতে পারে না। শেলীর নাস্তিকতা সত্ত্বেও তাঁহার আস্তিকতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে।' উপরে উল্লিখিত বিশ্বাত্মার স্তোত্রের প্রথম পংক্তি মাত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

"বিশ্বাত্মা! কি মনোহর তোমার পৃথ্বী! চতুর্দ্দিকে কনকবর্ণ শস্য জন্মি-তেছে, জ্যোতির অক্ষয় প্রস্রবণ সূর্য্য আ-লোক সর্ব্বস্থানে বিতরণ করিতেছে, সকল বস্তু শান্তি, সামঞ্জস্য ও প্রেমে পরিপূর্ণ। সৃষ্টি-ছাড়া মনুষ্য ব্যতীত যে সকল বস্তুই প্রেম ও আনন্দের কার্য্য করিতেছে, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ বাগ্মিতার সহিত ইহা ঘোষণা করিতেছে। মনুষ্য কেবল নিজের শান্তি-নাশকারী তরবারি সৃজন করিয়াছে। মনু-ষ্যই কেবল হৃদয়-দংশন-কারী সর্প সকল হৃদয়ে পোষণ করে। তাহার দুঃখে যে অত্যাচারী রাজার আনন্দ, তাহার যাত-নায় যে অত্যাচারী রাজার আমোদ, সেই রাজাকে মনুষ্যই কেবল আপনার শিরো-ভূষণ করে। তোমার ঐ সূর্য্য কেবল কি ধনাঢ্যদিগকে আলোক প্রদান করে? তা-হার রজত কিরণ রাজার শোভন নিকে-তন অপেক্ষা দরিদ্রের পর্ণকুটীরের উপর কি কম মধুর ভাবে শয়ান? যে সকল সংখ্যাতীত মনুষ্য মাতা বসুন্ধরার উদার দান বিতরিত হইবার পূর্ব্বে তাহা গলদ্-ঘর্ম্ম পরিশ্রমে অর্জ্জন করে তাহাদিগের প্রতি কেবল কি সেই বসুন্ধরা বিমাতা স্বরূপ,আর যাহারা সুখ স্বচ্ছন্দতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া অন্য মানবদিগকে বাল-ক্রীড়ন-স্বরূপ ব্যবহার করে এবং যে শান্তির মর্য্যাদা কেবল প্রকৃত মনুষ্যেরাই অনুভব করিতে সক্ষম সেই শান্তি গর্ব্বিত বালসুলভ চাপল্যের সহিত যাহারা বিনাশ

করে তিনি কি কেবল তাহাদিগেরই মাতা? বিশ্বাত্মা! এমন কখনই হইতে পারে না। তোমার ব্যাপনশীল পবিত্র সত্তা প্রত্যেক মানব হৃদয়ে স্পন্দন করিতেছে। তুমি সেখানে তোমার বিচারালয় স্থাপিত করিয়াছ, সে বিচারালয় হইতে অন্য কোন স্থানে আপিল নাই। তুমি সেই বিচারপতি যাহার সামান্য ভ্রুভঙ্গীর সমীপে পার্শ্বচারী মৃদুমন্দ বায়ু যেমন ক্ষমতাবিহীন মনুষ্যের সামান্য ও ক্ষীণ শক্তি তেমনি ক্ষমতাবিহীন। অসংখ্য জীবের জীবন বিশ্বাত্মা! যে সকল বিশাল লোক-মণ্ডল দ্যুলোকের গভীর নিঃস্তব্ধতার মধ্য দিয়া অপরিবর্ত্তনীয় পথে গমন করে তুমি যেমন তাহাদিগের প্রাণ স্বরূপ নিদাঘ কালের একটী সূক্ষ্ম সূর্য্যকিরণ যে ক্ষুদ্রতম কীটের নিবাসভূমি সে ক্ষুদ্রতম কীটেরও তুমি সেইরূপ প্রাণ স্বরূপ। মনুষ্যও এই সকল কর্ত্তৃত্ববিহীন জীবের ন্যায় তোমার ইচ্ছা আপনার অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করিতেছে। কাল ঐ সকল জীবের যে অশেষ শান্তির অবস্থা ক্রমে পরিণত করিতেছে সে অশেষ শান্তির অবস্থা যেমন তাহাদিগের সম্বন্ধে নিশ্চয় শীঘ্র আসিবে মনুষ্যের সম্বন্ধেও তাহা আসিবে এবং যে দোষ ও অপূর্ণতা তোমা দ্বারা পরিব্যাপ্ত জগতের সৌষ্ঠবের হানি করিতেছে সেই দোষ ও অপূর্ণতা তাহা হইতে তিরোহিত হইয়া নিরুপম সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিবে।"

এই স্তোত্রটি একেবারে দোষশূন্য নহে কিন্তু যে ব্যক্তি এই স্তোত্র রচনা করিয়াছেন তাঁহাকে কি প্রকারে নাস্তিক বলা যাইতে পারে? ইহা যথার্থ বটে যে উল্লিখিত "কুইন ম্যাব" কাব্যে একটী নিজরচিত টীকায় শেলী বলিয়াছেন "There is no God" কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে ঈশ্বর আদোবে নাই। তাহার অর্থ এই যে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মে বর্ণিত ঈশ্বর নাই। উক্ত ঈশ্বরকে তিনি তাঁহার বক্ষ্যমাণ কবিতার একস্থানে দৈত্য শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন যে যে ঈশ্বর পরিমিত পাপের জন্য নিত্য শাস্তি প্রদান করেন তাঁহাকে দৈত্য না বলিয়া কি বলা যাইতে পারে। শেলী হিন্দুদর্শন আদোই পড়েন নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মমত বাইবেল অপেক্ষা উক্ত দর্শনের সহিত অনেকটা মিলে। তিনি ঐ কুইন ম্যাবের অন্য এক স্থানে বিশ্বাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"সর্ব্বশক্তিমৎ বিশ্বাত্মা! জগতের প্রসূতি নিয়তি! মনুষ্যের স্তুতি বন্দনা তোমার আবশ্যক নাই। মানব হৃদয়ের পরিবর্ত্তনশীল রিপু সকল যেমন তোমাতে নাই তেমনি তাহার ক্ষীণ ইচ্ছার অব্যবস্থিততাও তোমাতে নাই। যে ব্যক্তি রিপুর ক্রীত দাস,যাহার ভয়ঙ্কর রিপু সকল কেবল পৃথ্বীমণ্ডলে দুঃখ ক্লেশ বিস্তার করে এবং সেই সাধু পুরুষ যিনি আপনার কৃত পুণ্য কর্ম্মের শুভফল চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত দেখিয়া পবিত্র গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়েন; বিষবৃক্ষ যাহার ছায়াতলে ঔদ্ভিদ জীবন একেবারে বিশীর্ণ হইয়া যায় এবং সুন্দর ওক্ বৃক্ষ যাহার শাখাপল্লববিনির্ম্মিত মন্দিরের নিম্নে দম্পতী পবিত্র প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়; উভয়ই তোমার চক্ষে সমান। তুমি রাগদ্বেষবর্জ্জিত। বৈরনির্য্যাতন প্রিয় পাত্রের প্রতি অন্যায় আসক্তি এবং অপবিত্র যশোলিপ্সা কি তুমি জান না। যাহা কিছু এই বিস্তীর্ণ জগতে আছে তাহা তোমার হস্তে যন্ত্রস্বরূপ। তুমি সকলকে পক্ষপাতশূন্য সমান চক্ষে দেখ। এই সকল জীবের

সহিত তোমার সমদুঃখসুখতা নাই যে-হেতু তুমি মানব জ্ঞান নহ, যেহেতু তুমি মানব মন নহ। যখন কালঝটিকা সকল প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ একেবারে বিধ্বংস করিবে এবং যে দৈত্য তোমার নাম ও পূজা অপহরণ করিয়া ধর্ম্মের নামে অসংখ্য নরনারীর শোণিতপাত দ্বারা আপনার অর্চ্চনাবেদী সকল কলুষিত করিয়াছে সেই সকল শুষ্ক কঠিন শোণিতাক্ত অর্চ্চনাবেদী কালরূপ মহাপ্লাবনে যখন কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যাইবে তখনও তুমি নির্ব্বিকার ও অপরিবর্ত্তনীয়রূপে বিরাজ করিবে। তোমার প্রকৃত মন্দির সর্ব্বদা উন্নত মস্তকে অবস্থিতি করিতেছে। তাহা কালের ঝটিকা ও প্লাবন বিনাশ করিতে সক্ষম নহে—সে এই জীবনপূর্ণ বিশ্ব-মন্দির—সেই আশ্চর্য্য ও নিত্য মন্দিরে সুখ দুঃখ মঙ্গলামঙ্গল যুক্তভাবে নিয়তি স্বরূপ তোমার বলবৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে।

এই প্রস্তাবটী হিন্দু দার্শনিক ভাবে পরিপূর্ণ। শেলীর প্রথম বয়সে নীরস জ্ঞানের আধিক্য ছিল। এই বয়সে তিনি কুইন ম্যাব রচনা করেন। এই জন্য এই বয়সে রচিত প্রবন্ধে দার্শনিক ভাবের এত প্রাবল্য এমন কি স্থানে স্থানে সংশয়াত্মক দার্শনিক ভাবও লক্ষিত হয়। তাঁহার বয়স যখন বৃদ্ধি পাইয়াছিল দার্শনিক ভাব তিরোহিত হইয়া ভক্তি ও প্রীতির ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার ঐ বয়সে রচিত কি গদ্য কি পদ্য সকল প্রকার গ্রন্থের কোন কোন স্থানে এমন প্রগাঢ় ভক্তি ভাবের চিহ্ন পাওয়া যায় যে ঐ সকল স্থান আমাদিগের ভগবদ্গীতার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রায় কাছাকাছি বোধ হয়। বিশেষতঃ তাহার প্রণীত "Adonais" এবং Hymn to Intellectual Beauty" নামক কবিতাদ্বয়ে এই ভক্তিভাব সর্ব্বাপেক্ষা দেদীপ্যমান। তাঁহার গদ্য গ্রন্থের একস্থানে আছে—What is love? Ask him that lives. What is life? Ask him that adores what is God." "প্রেম কাহাকে বলে যদি জানিতে চাহ তবে যে জীবিত আছে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। জীবন কি? যে ঈশ্বরের উপাসনা করে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর জীবন কি?' তাঁহার ঐ বয়সে রচিত পদ্য গ্রন্থের এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—

"The meanest worm beneath the sod
By love and worship blends itself with God."

"ঘাসের চাপড়ার নিম্নস্থ অতি অধম কীটও প্রেম ও উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে।"

আর একস্থানে বলিয়াছেন যে "সেই জগদ্ব্যাপী সর্ব্বপোষণকারী প্রেম "Cunsuming the last clouds of cold mortality." হিম মানবত্বের শেষ মেঘ বিনাশ করত আমার উপর এক্ষণে দীপ্তি পাইতেছে।" মানবত্বে হিম বিশেষণ কি উপযোগী। এমনি হিম যে ব্রহ্মাগ্নি তাহাতে আদবেই ধরে না। মানবত্বে মেঘের প্রয়োগও কি চমৎকার! মোহমেঘই আমাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ। শেলী যেমন মতে উদার তেমনি স্বভাবেও উদার ছিলেন। তিনি মৎস মাংস খাইতেন না, প্রধান গুণ ঋজুতা তাঁহাতে দেদীপ্যমান ছিল এবং তিনি সকল ভূতে দয়া করিতেন। সাহিত্যের পুরাবৃত্তে সেইরূপ কোমল দয়ার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। তাঁহার প্রথম জীবন যাহা হউক তাঁহার অধিকাংশ জীবন যে পবিত্র ও মহৎ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রী করুণমেবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখক্ষমী॥"

এই শ্লোকে যে সকল গুণের উল্লেখ হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্তের পরাকাষ্ঠা শেলী আপনার চরিত্রে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। *

ঈশ্বরের প্রতি দীনাত্মার নিবেদন।

হে দীনদয়াল পরমেশ্বর! তুমি প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষুঃ আত্মার আত্মা হইলেও তোমাকে আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না। আমি দীন অতি দীন, জ্ঞান হীন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটানুকীট হইয়া তোমার স্বরূপ মহিমা ও কার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব কি প্রকারে অবগত হইব? কিন্তু এই নশ্বর শরীর ধারণ করিয়া তোমাকে জানিতে যদি চেষ্টা না করিলাম তবে এই শরীর ধারণ বৃথা। তুমি মহতো মহীয়ান্ হইলেও যে তোমাকে প্রার্থনা করে, তাহাকে তুমি হৃদয়ে দেখা দাও। তুমি সাধুর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যোগীর হস্তামলক ভক্তের প্রিয়তম সর্ব্বস্বধন। আমি যদি একান্ত মনে তোমাকে ডাকি, তাহা হইলে কি তুমি আমাকে দেখা দিবে না? তুমি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, পিতা, ভবসংসারের কাণ্ডারী পরম সুহৃৎ ও বন্ধু ও একমাত্র শরণ্য। তোমার সহিত আমার কত মধুরতর সম্পর্ক। এজন্য আত্মা তোমাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য সহজেই ব্যগ্র হয়। তুমি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা আমার অন্তর্নয়নকে সমুজ্জ্বল কর যাহাতে আমি তোমাকে ইহলোকে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা জানিতে পারি ও পরলোকে অনন্তকালে তোমার তত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে জানিতে সক্ষম হইব, এই আশাতে যেন কলেবর পরিত্যাগ করি।

ভক্ত জ্ঞানীরা এই বিশ্বে তোমার সহস্র সহস্র বাহু কর পদ উদর আনন নেত্র সন্দর্শন করেন। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র তোমার অদ্ভুত নেত্র সমূহ, নদ নদী সকল তোমার শিরা ও ধমনী, আকাশ তোমার নাভিসরোবর, পর্ব্বত সকল তোমার অস্থি। দিবাকর ও হুতাশনের দুর্নিরীক্ষ্য তেজে তুমি, সুধাকরের সুধাময় জ্যোৎস্নায় তুমি, মেঘ বৃষ্টি বায়ু শস্য পল্লব তৃণ শিশির সমস্ত পদার্থেই তুমি। এইরূপ বিরাটরূপে তুমি সমস্ত বিশ্বে বিদ্যমান। তুমি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি আপনার অনির্দ্দেশ্য মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য ইচ্ছা মাত্রে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। যত দূর অনুমান হয়, জীবের মঙ্গল বিধান করাই তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তুমি অসংখ্য জীবকে সৃষ্টি করিয়া উদার সদাব্রত প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহাদিগকে নিয়ত অন্ন পান পরিবেশন করিতেছ। তুমি জড় ও প্রাণিজগতের অধিপতি, তুমি এই স্থাবর জঙ্গম হইতে স্বতন্ত্র কিন্তু এই স্থাবর জঙ্গমের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ। তুমি স্বয়ং সূর্য্য চন্দ্র নহ, কিন্তু সূর্য্য চন্দ্রের অন্তরাত্মা হইয়া তাহাদিগকে সঞ্চালিত করিতেছ, সূর্য্য চন্দ্র তোমাকে জানে না। সূর্য্যের তেজে তুমি বিরাজমান, তাই সূর্য্য প্রফুল্লকর কর বিতরণ করিয়া জগতের প্রাণ বর্দ্ধন ও পোষণ করে। সুধাময় পূর্ণ চন্দ্রে তোমার আবির্ভাব তাই চন্দ্র সুধা বর্ষণ করিয়া প্রাণিমাত্রকে আনন্দাভিষিক্ত করে। পিপাসার জলে তুমি অধিষ্ঠান কর, তাই জল পিপাসা হরণ করিয়া তৃপ্তি দান করে। নাথ! মুক্তাফল

---

* কোন কোন ব্যক্তি অন্যের নির্ম্মল যশঃশশাঙ্কের কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া মিথ্যা অপবাদ ঘোষণা করে। মহাত্মা শেলী এরূপ শত্রু-বিরহিত নহেন।

সদৃশ শিশিরকণা, বিকশিত সুগন্ধি কুসুমরাজি, নবীন শ্যামল শস্য বা তৃণ পত্র প্রভৃতি তোমার অতুলন হস্তের রচনা দেখাইয়া তুমি আমাদিগের প্রাণ মনঃ হরণ করিয়া তোমার দিকে আমাদিগকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছ!

নিখিল সৃষ্টি তোমার মহিমা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে, তোমার প্রেম দয়ার পরিচয় নিয়ত প্রদান করিতেছে কিন্তু সৃষ্টি তোমাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তুমি এই সৃষ্টিরূপ যবনিকার অভ্যন্তরে থাকিয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার সম্পাদন করিতেছ কিন্তু অভিনেতা যে তুমি তোমাকে কেহ দেখিতে পায় না। তবে তোমাকে আত্মাতে গিয়া অনুসন্ধান করি। তুমিই কি আমার আত্মা? এই ক্ষুদ্র মলিন পঙ্কিল আত্মা—যাহার জ্ঞান প্রাণ পবিত্রতা যাহা কিছু সকলি তোমা হইতে—তাহা কি তোমার সহিত অভিন্ন? কখনই নহে। তুমি আত্মার আত্মা। যে আপনাকে তোমার আশ্রিত ও তোমাকে পরমাশ্রয় বলিয়া জানে, তোমাকে জীবনদাতা পিতা জানিয়া তোমার কার্য্যে আপনাকে সমর্পণ করে তুমি তাহার হৃদয়ে আসিয়া দেখা দাও। তুমি তাহাকে জ্ঞানের পর জ্ঞান উন্নতির পর উন্নতি প্রদান কর, তুমি প্রেম অন্ন দ্বারা তাহাকে নিয়ত পরিপোষণ কর ও তোমার অমৃত পথের আলোক প্রদর্শন কর। নাথ! যে তোমাকে চায়, সে তোমাকে পায়, তোমার জন্য স্পৃহা যত বলবতী হয়, তুমি আপনাকে দিয়া সেই স্পৃহাকে চরিতার্থ কর। যে তোমার সহিত আত্মাতে সংযুক্ত হয়, সে ব্রহ্মানন্দ লাভ-করিয়া কৃতার্থ হয়।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

পরে ওখান হইতে শিবনারায়ণ কাশ্মীর আসিলেন এবং কাশ্মীরে এক রাত্রি থাকিয়া সেখান হইতে বরাবর চলিয়া আসিয়া বারমুলা ছাউনির পথ ধরিয়া সাঙ্গাবে আসিলেন। বারমুলা ছাউনির প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে একটা মুদির দোকান রাস্তার নিকটে আছে। সেই দোকানে হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তি কোন গ্রামের দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা দুই জনে এক খানি খাটের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। এমত সময় সেই দোকানে দুইজন অশ্বারোহি মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেইখানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ দুই জনকে খাটের উপর হইতে নামিতে বলিল। তাহাতে তাহারা বলিল যে আমরা ব্রাহ্মণ। এই কথা শুনিয়া দুই দিক হইতে দুইজন মুসলমান অশ্বের চাবুক লইয়া সেই ব্রাহ্মণ দুই জনকে মারিতে আরম্ভ করিল। এবং সেই দুই জন ব্রাহ্মণ এই বলিয়া অত্যন্ত চিৎকার করিতে লাগিল যে আমাদের অপরাধ মাপ করুন। তাহাতে সেই মুসলমানদের দয়া হইল না, তাহারা আরো মারিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে আমাদের সম্মুখে তোরা খাটের উপর বসিয়া এবং শয়ন করিয়া থাকিস্? তোরা কাফের। আমাদের অপেক্ষা নীচ জাতি, তোরা হিন্দু অর্থাৎ হীনবল ও তেজোহীন এবং মানেও হীন। অতএব তোরা কিরূপে আমাদের সম্মুখে খাটের উপরে বসিবি। এই বলিয়া আরো মারিতে লাগিল। দুইটি ব্রাহ্মণ মার খাইতে খাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তৎকালে সেই দোকানের মুদি আসিয়া

করযোড়ে বলিতে লাগিল যে হুজুর মাপ করুন। সেই মুদিও হিন্দু। সেই মুদি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বলাতে তাহারা সেই মুদিকেও মারিতে আরম্ভ করিল এবং মার খাইতে খাইতে সেই মুদিও অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

শিবনারায়ণ তৎকালে সেই দোকানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া হিন্দুদিগকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া মুসলমানদিগকে ডাকিয়া প্রীতি পূর্ব্বক উভয় পক্ষকে শান্তভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তোমরা বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া দেখ তোমরা কে? না বুঝিয়া পশুবৎ তোমরা বিবাদ করিয়া মরিতেছ। দুইজনের মধ্যে কাহারও শান্তি নাই এবং তোমরা এমন বিচার করিয়া দেখ না যে মুসলমান বস্তুটা কি? লাল, কাল, হরিদ্রা না পীত বর্ণ? হাড় চামড়া না মাস? যদ্যপি তকচ্ছেদ করাকে মুসলমান বল তবে তাহা যথেষ্ট নহে। প্রথমে তো সকলেই হিন্দু হইয়া জন্মিয়াছ। হিন্দুরাই তোমাদের আদি বীজ। তাহা তো তোমরা প্রত্যক্ষ জান। তাহাদের তবে কেন তোমরা দেখিয়া জ্বলিয়া মর। আর ঐ গরিব ব্রাহ্মণদিগকে বিনা অপরাধে কেন মারিয়া অনর্থক কষ্ট দিলে। যদ্যপি তাহাদের বল থাকিত তাহা হইলে তোমাদের যদি উহারা মারিত তাহা হইলে তোমাদের কত কষ্ট হইত। সকলেই তো খোদার অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ। মারপিট এরূপ করিতে নাই, বিচার করিয়া শান্তভাবে চলিতে হয়। মুসলমান দুই জন বলিলেন আপনি যথার্থ বলিতেছেন মহারাজ, আমরা কি করিব যেমন মৌলবীরা বলিয়া দেয় আমরা সেইরূপ করি। আমরা জানি যে হকের নাম মুসলমান, কিন্তু দেখিতে পাই আমাদের মুসলমানের মধ্যে কত জন মিথ্যা বলিতেছে কিন্তু আমরা ঠিক জানি না, যে কাহাকে মুসলমান বলে।

অনন্তর শিবনারায়ণ সিন্ধু নদী পার হইয়া পেশওয়ারে যাইলেন। পেশওয়ার কেল্লার সম্মুখে একটা কূপ আছে। সেই কূপের নিকটে তিনি বিশ্রাম করিলেন। সেইখানে বাগানে একটা কুণ্ড আছে। সেখানে একজন ব্রহ্মচারী থাকিতেন। সেই ব্রহ্মচারী আসিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, যে আপনি রাত্রিতে এখানে থাকিবেন না। সহরেতে যাইয়া থাকুন, যদ্যপি এখানে থাকেন তাহা হইলে মুসলমানেরা আসিয়া আপনার গলা কাটিয়া ফেলিবে, নতুবা শুনুর করাইয়া মুসলমান কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া দিবে, জাত মারিয়া ফেলিবে। আমরা দিবসে এখানে থাকি, রাত্রিতে সহরের মধ্যে থাকি, এবং ইংরাজদিগকে দিবসে সিপাহীরা পাহারা দেয়, রাত্রি হইলে কপাট বন্ধ করিয়া রাখে। নতুবা উহাদিগকে বাহিরে পাইলে কাটিয়া ফেলে। শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আমি সকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সকল জাতি আমাতে প্রবেশ করিবে, যেরূপ সমুদ্রেতে সকল নদীর জল যাইয়া পড়ে সেইরূপ। শিবনারায়ণ এই কথা ব্রহ্মচারীকে বলিয়া রাত্রিতে সেইখানে বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রাম করিয়া সেখান হইতে কাবুলের দিকে দুই তিন দিনের পথ যাইয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পরে পেশোওয়ার হইতে পঞ্জাবাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় এক গ্রামের বাহিরে বৃক্ষের তলায় বসিয়া ছিলেন। সেখানে একজন হিন্দু মুদির দোকান ছিল। সেই গ্রামের

মধ্যে সকলেই মুসলমান, কেবল মাত্র দুই তিন জন হিন্দু ছিল। একজন হিন্দুর একটি কন্যা ছিল। অপর গ্রামের কতকগুলি মুসলমান আসিয়া বল পূর্ব্বক তাহার কন্যাকে তাহাদের পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার জন্য হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তখন সেই কন্যাটি অত্যন্ত চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পিতা মাতা হায় হায় করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল এবং সেই মুসলমানদিগকে বলিতে লাগিল যে, আপনারা দয়া করিয়া ছাড়িয়া দেন। মুসলমানেরা দয়া না করিয়া তাহাদিকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। শিবনারায়ণ মুদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে একি ঘটনা হইতেছে? মুদি বলিল মহারাজ! এদেশের হিন্দুদের দুর্দ্দশার কথা কি বলিব, কোন বিচারক রাজা নাই। হিন্দুরা নালিশ করিলে মুসলমানেরা কাহারও কথা শুনে না। তাড়াইয়া দেয়, বলে,যে তোর কন্যাকে তো অপর যায়গায় বিবাহ দিতিস্,না হয় আমরা ধরিয়া আনিয়া আমাদের পুত্রের সহিত বিবাহ দিব। আমরা মুসলমান, বড় জাতি। মহারাজ, এদেশে সকলই মুসলমান। কোন কোন গ্রামে দুই তিন জন করিয়া হিন্দু থাকে। তাহাদের কন্যারা রূপবতী হইলেই মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের পুত্রের সহিত বিবাহ দেয়। কিম্বা যে কন্যার বিবাহ হইয়াছে এবং সুন্দরী তাহাকে পথ ঘাটে যদি দেখে তাহা হইলে তাহার অলঙ্কারাদির সহিত তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। দুই চারি মাস তাহাদের বাটিতে রাখিয়া সেই কন্যার পিতা মাতাকে পত্র লেখে যে তোমরা দুই শত অথবা পাঁচ শত যাহার যেরূপ ক্ষমতা সেই অনুযায়ী টাকা দিয়া তোমাদের কন্যাকে লইয়া যাও। মাতা পিতা অথবা শ্বশুর শাশুড়ি যে কেহ থাকে তাহারা টাকা দিয়া সেই কন্যাকে মুসলমানদের বাটি হইতে লইয়া আইসে। কিম্বা যে গ্রামে দশ পোনের ঘর হিন্দু আছে সেই গ্রামে দুই এক বৎসর বাদে মুসলমানেরা আসিয়া তাহাদের যাহা কিছু অর্থ থাকে হিন্দুদিগকে বাঁধিয়া সেই সমস্ত কাড়িয়া লয় ও তাহাদের ঘরে যে সকল সুন্দর সুন্দর স্ত্রীলোক থাকে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

কিন্তু হিন্দুস্থানে যে ইংরাজ রাজা আছেন তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিই। কেননা তাঁহারা গরিবের দুঃখ শুনেন এবং তাঁহাদের শাসনে বলবান ব্যক্তি গরিবদিগকে বলপূর্ব্বক কোন কষ্ট দিতে পারে না। যদ্যপি কষ্ট দেয় তৎকালে নালিশ করিলে বিচার করিয়া কষ্ট নিবারণ করেন। শিবনারায়ণ বলিলেন তোমরা এদেশে এত কষ্ট পাইয়া কেন থাক, হিন্দুস্থানে চলিয়া যাইতে পার না? সেই মুদি দুঃখ করিয়া বলিল যে হে মহারাজ! আমরা কয় জন আছি কোন্ দেশে কোন্ গ্রামে যাইব। আগে আমরা এই দেশে সকলেই হিন্দু ছিলাম।

ক্রমশঃ।

নূতন পুস্তক।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমরা ঐ পঞ্জিকার দুই খণ্ড উপহার পাইয়াছি। এই পঞ্জিকা পূর্ব্ববৎ উৎকৃষ্টরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

৬৬২ সংখ্যা। ১৮১৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শান্তি নিকেতন।

১লা বৈশাখ রবিবার ৬১ ব্রাহ্ম সংবৎ।

আজ নব বর্ষের প্রথম প্রাতঃকালে নব সূর্য্যের অভ্যুদয়ে পরম পিতা পরমেশ্বরের পূজার জন্য আমরা এই আশ্রমে সমাগত হইযাছি। প্রাতঃসমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোল, বিহঙ্গগণের মধুর রব, আশ্রম কাননের নিঃস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে করুণাময় পিতার জীবন্ত আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আইস আমরা তাঁহার আরাধনাতে প্রবৃত্ত হই। যাঁহার করুণাতে আমরা আবার একবর্ষ সুখ সৌভাগ্যে অতিবাহিত করিলাম, যিনি পিতা মাতা সখা সুহৃদ হইয়া আমাদের শরীর মন আত্মাকে প্রতিক্ষণ রক্ষা করিয়াছেন, যাঁহার কৃপাতে পাপ প্রলোভন মোহ বিপদ হইতে আমরা উদ্ধার হইয়াছি, সেই পরম সুহৃদ অখিলমাতার চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া আইস আমরা আজ নববর্ষে প্রবেশ করি। সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদের সঙ্গে পুরাতন বর্ষ চলিয়া গেল, আমাদের পার্থিব জীবন এক বৎসর বৃদ্ধি হইল, পরলোকের দিকে আমরা এক বৎসর অগ্রসর হইলাম। ব্যবসায়ীরা যেমন বর্ষশেষে আপনাদের লাভালাভ গণনা করে, আসুন, আমরাও আজ আপনাকে পরীক্ষা করি। জীবন-বাণিজ্যের যথার্থ ক্ষতিলাভ হিসাব করি। সংসারের মান মর্য্যাদা কত উপার্জ্জিত হইল, তাহা গণনা করিবার আবশ্যক নাই। আমাদের মোহাচ্ছন্ন মলিন হৃদয় নির্ম্মল হইল কি না, প্রেমময় পবিত্র পুরুষের সহবাস লাভ করিয়া আমরা প্রকৃত শান্তি ও আরাম লাভ করিয়াছি কি না, ইহাই যেন আমরা গণনা করি। কতবার প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়াছি, কতবার প্রাণদাতা পিতার আদেশ অবহেলা করিয়াছি, তাঁহার অজেয় বাণী অপেক্ষা মনুষ্যের ক্ষীণ কণ্ঠকে অধিক করিয়া মানিয়াছি, বিশ্বনিয়ন্তার অমোঘ নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া কত সময়ে হৃদয়মনে যাতনা পাইয়াছি, কত সময়ে স্বর্গীয় সাধুজীবন যাপন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। হায়! আমরা তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াই হাহাকার করি। আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু এক

মুহূর্ত্তও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হই নাই, তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। এমন প্রেমময় পিতাকে যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না থাকি। তিনি আমাদের চিরকালের পিতা, পুরাতন পিতামহ, তিনি চির নূতন, তিনি চির পুরাতন "স এবাদ্য সউশ্বঃ"। তিনি অদ্যও যেমন কল্যও তেমন।

হে দীনবন্ধু পিতা! এই সুমধুর পবিত্র প্রাতঃসমীরণের মধ্যে আমরা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছি। হে পরম সখা! তুমিই আমাদের আশাভরসা, তুমিই আমাদের বলবুদ্ধি, সুখ দুঃখে তুমিই একমাত্র সঙ্গী। হে সত্যস্বরূপ! আমরা অসত্যে নিমগ্ন হইয়া তোমার সত্যালোক প্রতীক্ষা করিতেছি। আমরা অজ্ঞান-অন্ধকারে পথহারা, তোমার জ্যোতি বিকীর্ণ কর, যেন আগামী বর্ষে আর তোমার আশ্রয় পরিত্যাগ না করি। জল স্থল আকাশ গৃহ পরিবার সর্ব্বত্র যেন তোমার আবির্ভাব তোমার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া তোমাতে আত্ম সমর্পণ করি। হে দেব! তোমার প্রসাদে বায়ু সকল মধুময় রূপে প্রবাহিত হউক, স্রোতস্বিনীরা অমৃতস্যন্দিনী হউক, ওসধি বনস্পতি কি রাত্রি কি উষা মধুময় হউক, তুমি আনন্দ অমৃতরূপে আমাদের প্রাণে প্রকাশিত হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী টৌড়ি—তাল কাওয়ালি।

নব আনন্দে জাগো আজি; নবরবিকিরণে, শুভ্র সুন্দর প্রীতিউজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে।

উৎসারিত নবজীবননির্ঝর, উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি, অমৃত পুষ্প গন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে।

রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি।

ঐ পোহাইল তিমির রাতি; পূর্ব্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা,

জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি।

কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা মাঝে, মহা মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর, সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ বরষিলে করি প্রচার সুখ বারতা তুমি চির সাথের সাথী।

হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রহ্মপূজা।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লোকশিক্ষার উদ্দেশে পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়া পরিশেষে স্বীয় দোষ ক্ষালনের জন্য এই প্রার্থনা করিতেছেন।

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥"

হে জগদীশ! তুমি রূপবিবর্জ্জিত, অনির্ব্বচনীয় ও সর্ব্বব্যাপী। আমি বিকলচিত্ত হইয়া ধ্যানের দ্বারা তোমার রূপ বর্ণনা করিয়াছি, স্তুতিবাদ করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয়ত্ব খণ্ডন করিয়াছি এবং তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের ব্যাঘাত করিয়াছি। আমার অজ্ঞানতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর। অধিক শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্ভগবৎগীতা, বিষ্ণুপুরাণ, অষ্টাবক্রসংহিতা, মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও উপনিষদাদি সমুদায় শাস্ত্রই এক-

বাক্যে ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে।

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি।
তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি ॥
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি"

সকল বেদ যাঁহাকে কীর্ত্তন করিতেছে, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সকল তপস্যা, যাঁহার প্রাপ্তিকামনায় লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিতেছে, তাঁহার উপাসনা ব্যতীত মানবের আর মুক্তি নাই, ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের সার উপদেশ এবং হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য ভাব। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের আর এক সংস্কার এই যে, ব্রহ্মোপাসনা সংসারী গৃহস্থ লোকের ধর্ম্ম নয়, এবং ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তির শীত উত্তাপ সুগন্ধ দুর্গন্ধ ক্ষুধা পিপাসাদি শারীরিক ধর্ম্ম থাকিবে না। ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় কথা। জনক বশিষ্ঠ নারদ সনৎকুমার ভৃগু বরুণ ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মোপাসক ছিলেন। তাঁহারা শরীর ধারণ করিতেন এবং শরীরধারণোপযোগী লৌকিক ব্যাপারও সম্পন্ন করিতেন। ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী নাম্নী দুই পত্নী ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। মহাগৃহস্থ শৌনক আঙ্গিরসের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি জনক ব্রহ্মোপাসক হইয়াও রাজ্যপালন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ গৃহস্থ অর্জ্জুনকে গীতা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, অর্জ্জুন ব্রহ্মোপদেশ লাভ করিয়া কেবল গৃহস্থ ছিলেন না, শৃঙ্খলার সহিত রাজ্য পরিচালন করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে বেদোক্ত যজ্ঞাদিক্রিয়াত্যাগী একদল যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন, মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট "ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানাং" এই বাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এবং মনু এই সকল কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি যাগযজ্ঞের পরিবর্ত্তে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ও শমদমাদি সাধনের যে বিধি দিয়াছেন, তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্য শাস্ত্রে গৃহস্থ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী সমুদায় আশ্রমীর প্রতি ব্রহ্মোপাসনার প্রচুর উপদেশ রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্ঞানোন্নত আর্য্যসমাজে সজীব ব্রহ্মোপাসনাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে লোকসমাজের অজ্ঞানতাবশতঃ নানাবিধ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া, ভারতসমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল। সাধারণ জনসমাজ যাহাতে উন্নত জ্ঞানের অধিকারী না হইয়াও নিয়ম পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক শ্রৌত গৃহ্য অনুষ্ঠান সকল পালন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারে এই জন্য লোকহিতকামনায় বেদব্যাসশিষ্য মহর্ষি জৈমিনি ও স্মৃতিকারগণ কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সকল অবলম্বন করিয়া যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের বিধি ব্যবস্থা ও কর্ম্মমীমাংসা দর্শন প্রণয়ন করিলেন। জৈমিনি বলিলেন, বেদ কেবল ক্রিয়ার শাস্ত্র। "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" কেবল ক্রিয়ার জন্যই বেদের প্রতিষ্ঠা। এই সময়ে দীর্ঘকালব্যাপী দশ পৌর্ণমাস, অশ্বমেধ গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল, যাজ্ঞিক পুরোহিতগণ প্রবল হইয়া উঠিলেন। জনসমাজ হইতে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা অন্তর্হিত হওয়াতে ভারতাকাশ আবার যজ্ঞধূমে সমাবৃত হইল, ধর্ম্মের নামে বহুবিধ নৃশংস ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধ ও নাস্তিকদিগের বুদ্ধিবিপ্লব হইতে সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য বেদকে মূল করিয়া

নানাবিধ দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। নানাবিধ মতের সংঘর্ষণে তুমুল ধর্ম্মবিপ্লব বাধিয়া গেল। এই বিষম দুর্দ্দশা হইতে ভারত সমাজকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান বেদব্যাস জৈমিনীর কর্ম্মমীমাংসা, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, পতঞ্জলির যোগাভ্যাস, গৌতম ও কণাদের ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের পদার্থ বিচার এবং তর্কসিদ্ধান্ত উপনিষদের স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় মত ও সমুদায় শাস্ত্র সমন্বয় পূর্ব্বক উত্তর মীমাংসা রূপ ব্রহ্মমীমাংসা বেদান্তদর্শন প্রকাশ করিয়া বলিলেন, দাসের ন্যায় প্রাণহীন শুষ্ক বিধিপালনেতে সিদ্ধি লাভ হয় না, সহজ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রেমানুরঞ্জিত হৃদয়ে পরব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন অথবা তর্কশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যবলে মুক্তি লাভ হয় না। তিনি বলিলেন, আত্মা হইতে অর্থাৎ জীব হইতে পরমেশ্বর প্রিয়তম, প্রেমের দ্বারাই তাঁহার উপাসনা করিতে হয়।

"পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ"

শাঃ ৩।৩।৫৩।

"অনুবন্ধ" কি না পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও জীবের প্রতি প্রীতি, আর "তাদ্বিধ্যং" কি, না প্রীত্যনুকূল ব্যাপার অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য, এই দ্বিবিধ সাধনই ঈশ্বরের মুখ্যোপাসনা, "শব্দ" কি না শ্রুতি, "ভূয়ঃ" কিনা বারবার ইহাই বলেন। প্রেম ব্যতীত, হৃদয়ের সাক্ষাৎ যোগব্যতীত, ঈশ্বরপ্রীতি ও মানবপ্রীতি অসম্ভব। দাসের ন্যায় অন্ধভাবে অর্থ না বুঝিয়া কেবল বিধি পালনে প্রেম প্রকাশ পায় না। জানিয়া শুনিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করাই প্রেমের স্বভাব। ভগবান বেদব্যাস এই আত্মপ্রত্যয় আত্মানুভবসিদ্ধ জ্ঞানসঙ্গত হৃদয়সঙ্গত প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যকে মুখ্যোপাসনা রূপে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের বাহ্যাড়ম্বরপরিপূর্ণ ভারতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। কালবশে ভারতের ভাগ্যচক্র আবার পরিবর্ত্তিত হইল। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাতে জ্ঞানচর্চ্চা ও হৃদয়চর্চ্চা আবশ্যক, সাধারণ লোকে তাহাতে অশক্ত। আশুপ্রীতিকর ফলশ্রুতিপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডে বিবিধ আমোদ প্রমোদ এবং পরলোকে স্বর্গভোগের প্রলোভন; বিধি ও যাজকের উপর নির্ভর করিলেই যজমান স্বর্গভোগে অধিকারী, সুতরাং ফলকামীরা সকাম কর্ম্মকাণ্ডের মোহে অভিভূত হইল। ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা কয়েক জন জ্ঞানী লোকের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ভারত আবার অজ্ঞানতার গভীর গহ্বরে ডুবিয়া গেল। বিধাতার কৃপায় এই তিমিরাচ্ছন্ন ভারতক্ষেত্রে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিবার জন্য ধর্ম্মবীর শঙ্করাচার্য্য অভ্যুদিত হইলেন। এই বীরপুরুষ ৩২ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে বেদশিরোভাগ উপনিষৎ, বেদান্তসূত্র, গীতা প্রভৃতির ভাষ্য ও জ্ঞানগর্ভ বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নিকে আবার প্রজ্বলিত করত বৈদিক ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নিকট সকলে মস্তক অবনত করিল। এই সময়ে ভারতে ধর্ম্মের অতিহীন দশা উপস্থিত হইয়াছিল। নানা সম্প্রদায়ের নানা মত, অশেষ প্রকার মূর্ত্তি পূজা, কর্ম্মকাণ্ডআশ্রয়ী ব্রাহ্মণদিগের যাগযজ্ঞের আড়ম্বর। শঙ্করাচার্য্য পা-

ণ্ডিত্য বলে সকল মত খণ্ডন করত জ্ঞান-কাণ্ডের প্রচলন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, নিতান্ত পরাধীন ভাবে, বিধি নিষেধের একান্ত দাস হইয়া বেদমন্ত্রে অর্থবোধ না করিয়া লোকে কর্ম্মকাণ্ডে রত রহিয়াছে, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানসঙ্গত ব্রহ্মোপাসনা সেরূপ ভাবে হইতে পারে না; প্রাণে জ্বলন্তরূপে অনুভব করা চাই। উপনিষৎ ও বেদান্তসূত্র প্রভৃতি অত্যন্ত অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ গ্রন্থ। শঙ্করাচার্য্য ঐ সকল গ্রন্থের ভাষ্য না লিখিলে, জ্ঞান-কাণ্ডের আলোচনা ভারত হইতে একেবারে অপনীত হইত। উত্তর কালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই বেদান্ত সূত্র ও শাঙ্কর ভাষ্যাদি অবলম্বনেই শাস্ত্রীয় বিচারে সকলকে পরাস্ত করিয়া বিলুপ্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য স্বীয় অদ্বিতীয় বুদ্ধি-বলে বেদান্ত শাস্ত্র সকল একেশ্বর পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মের জ্ঞান ও পূজা পুনঃপ্রচার করিলেন। কিন্তু দেশের দুরদৃষ্টবশতঃ শুষ্কহৃদয় নীরস প্রকৃতি ভ্রান্ত লোকদিগের হস্তে পড়িয়া, শঙ্করপ্রচারিত বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম-জ্ঞান কেবল দার্শনিক তর্কেরই কারণ হইয়া উঠিল। প্রেমভক্তিবিহীন শুষ্ক জ্ঞান মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক ঈশ্বরানুরাগ ও ভক্তিভাবকে প্রস্ফুটিত করিতে পারিল না। ভারত আবার পশ্চাৎপদ হইয়া পার্থিব উল্লাস উৎসবময় পৌরাণিক ধর্ম্ম ও ব্রত নিয়মাদি ক্রিয়া কলাপকে আলিঙ্গন করিল। কাল্পনিক দেবদেবীর পূজা ও ধর্ম্মের নামে বহুবিধ বীভৎস কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে তান্ত্রিকদিগের রহস্যময় জঘন্য আচরণ ও নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগের তর্কশাস্ত্রের বিতণ্ডা এবং নিত্য নৈমিত্তিক বাহ্যানুষ্ঠান ও আচার মাত্র ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিল। নানক চৈতন্য কবির প্রভৃতি এক একজন ধর্ম্মসংস্কারক উত্থিত হইয়া ভারতভূমিকে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। বহুকাল পরে ভারতমাতার প্রিয়-পুত্র মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া জননী জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিলেন। তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির বিবিধ অজ্ঞানতা কুসংস্কার দুঃখ দুর্গতি দর্শন করিয়া দারুণ যন্ত্রণাতে বিদ্ধ হইলেন এবং দ্বিতীয় ব্যাস ও দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় সকাম কর্ম্মবন্ধন অন্ধভক্তি ও কুসংস্কার-পূর্ণ মূর্ত্তিবাদ হইতে ভারত সন্তানকে মুক্ত করিবার অভিলাষে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাকে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে উপনিষৎ বেদান্তদর্শন প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্র-সকলের তাদৃশ আলোচনা ছিল না। বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র ভাগবতাদি শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া রামমোহন জনসাধা-রণকে দেখাইয়া দিলেন যে, প্রেমোদ্বেলিত হৃদয়ে একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাই যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম। এই বেদ-বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনারূপ শ্রেষ্ঠতম হিন্দুধর্ম্মকে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ১৭৫১ শকের মাঘের একাদশ দিবসে আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন। এজন্য রামমোহন রায়কে কত আক্রমণ ও কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল; তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। কি গৃহস্থভবন কি পণ্ডিতদিগের চতুষ্পাঠী সর্ব্বত্রই এই আন্দোলন উপস্থিত হইল। অশেষ শাস্ত্র-দর্শী ব্রহ্মবাদী রাজা রামমোহন রায়ের

অগাধ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র বিচারের নিকট সকলেই পরাস্ত হইলেন। জড়োপাসনা ও হৃদয়বিহীন কর্ম্মাড়ম্বর এতদিন মানব-হৃদয়কে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখিয়াছিল। আত্মাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মেতে আত্মার যোগ মানবের শ্রেষ্ঠ অধিকার। জড়োপাসনা এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে হিন্দুজাতিকে বঞ্চিত করিয়া হিন্দুজাতির মনুষ্যত্ব অপহরণ করিয়াছিল। রামমোহন রায় শাস্ত্রের গভীর গহ্বর হইতে ব্রহ্মজ্ঞানকে উদ্ধার করিয়া ভারত সন্তানকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মযোগের অধিকার পুনঃপ্রদান করিলেন। তিনি কোন নতন ধর্ম্ম বা নূতন মত প্রচার করেন নাই। ভারতের চিরন্তন সম্পত্তি, যাহাতে ভারতের প্রকৃত গৌরব ও প্রকৃত মহত্ত্ব, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপূজাকে বহুকাল-প্রচলিত আজ্ঞানান্ধকার ভেদপূর্ব্বক দীপ্ত দিবালোকের ন্যায় স্বদেশবাসীর নিকটে প্রকাশ করিলেন। এই বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপূজা বর্ত্তমান সময়ে সমুন্নত আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপে প্রচারিত হইতেছে। পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় আর্য্যঋষিগণপরিসেবিত এই কল্যাণপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ নিবদ্ধ করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যই যে উপাসনা, এই মহা সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে জীবন্তভাবে প্রচার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভারতভূমিতে রক্ষা করিয়াছেন। এই মহাত্মা যদি ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দ্বারা নীত হইয়া জীবনের প্রথম বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন না করিতেন, তবে ব্রাহ্মসমাজের কি দশা হইত বলিতে পারি না। উপনিষদের মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞান বীজের আকারে নিহিত ছিল, এই মহাত্মার অটল অধ্যবসায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রভাবে তাহা শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফলে পরিণত হইয়া শান্তিপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে শোভা পাইতেছে। যাহা প্রাচীন হিন্দু ঋষিদিগের হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, তাহাই এখন মানব সাধারণের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। যে ব্রহ্মনাম অরণ্য কাননে গিরিগুহায় ঋষিদিগের পবিত্র কণ্ঠে উদ্গীত হইত, নগর পল্লীর জনকোলাহলে আজ সেই ব্রহ্মনাম কীর্ত্তিত হইতেছে।

জ্ঞান ও ভাব লইয়া ধর্ম্ম। একের অভাবে অন্যটি বিফল ও বিকল। জ্ঞানের অভাবে যেমন অন্ধভক্তি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিভীষিকা; প্রেমের অভাবে জ্ঞান সেইরূপ শুষ্ক মরুভূমিতুল্য, এবং জ্ঞান প্রেম উভয়ের অভাবে কর্ম্ম নীরস কোলাহল মাত্র। জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম। জ্ঞান এবং প্রেমের মণিকাঞ্চন যোগ ব্যতীত পবিত্র কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। জ্ঞানবিহীন হৃদয় ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করিতে গিয়া প্রবৃত্তির প্রিয়কার্য্য করিয়া বসে। আবার হৃদয়বিহীন প্রেমবিহীন জ্ঞান সৌরভহীন শুষ্ক পুষ্পের ন্যায় বৃথা। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্ম যোগাত্মক ব্রাহ্মধর্ম্মই ভারতের মুখ্যধর্ম্ম—যথার্থ আর্য্যধর্ম্ম অথবা যাহা একই কথা, যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদেশ হইতে সমাগত কোন অহিন্দু ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ পরম সম্পত্তি আমরা পিতৃপুরুষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা যতই দীন দরিদ্র হই না কেন, পূর্ব্বপুরুষদিগের উপার্জ্জিত

এই ব্রহ্মধন লাভ করিয়া আমরা ধনী হইয়াছি। যেমন গঙ্গা নদী ভারতভূমির, হিমালয় পর্ব্বত ভারতভূমির, এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই রূপ ভারতভূমির প্রাণের সম্পত্তি। প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বতী যেমন সুদূর গিরিকন্দর হইতে নিঃসৃত হইয়া তটভূমিকে উর্ব্বরা ও ফল শস্যে সুশোভিত করিয়া প্রবল বেগে সমুদ্রের উদ্দেশে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে, আমাদের সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই প্রকার ঈশ্বরের আদেশে বৈদিক ঋষিদিগের হৃদয়কন্দর হইতে উৎসারিত হইয়া জনসমাজের জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতা বিধান করত সকলের আত্মাকে ব্রহ্মধামে উপনীত করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের অনন্ত কালের বন্ধু। এই বন্ধুর প্রসাদেই আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন রূপে আত্মাতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতেছি, স্ত্রী পুত্র পরিবারে বেষ্টিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পাপ সন্তাপ হৃদয়ভার নিবেদন করিয়া পুণ্যশান্তি লাভ করিতেছি। হৃদয়ের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে যিনি আলিঙ্গন করেন, তাঁহার প্রাণ পুণ্যপ্রেমে উদ্ভাসিত হয়, তাঁহার গৃহ পরিবার সুখ সৌভাগ্যে শ্রীসম্পন্ন হয় এবং তিনি শমদমাদি ব্রহ্মবর্চ্চস লাভ করিয়া কৃতপুণ্য হয়েন। জীবন্ত জাগ্রত সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাতেই পরিত্রাণ। স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারা যেমন কেহ রাজা হয় না, সেইরূপ কল্পনার উপাসনাতেও মানবের পরিত্রাণ হয় না। সত্য স্বরূপের উপাসনাতেই মুক্তি, সত্য স্বরূপের উপাসনাতেই পরিত্রাণ, সত্য স্বরূপের উপাসনাতেই জীবনের সার্থকতা। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে মিথ্যা কল্পনা হইতে মুক্ত করিয়া সত্য পুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত করেন, এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদেই জ্ঞান সত্যস্বরূপকে জ্ঞাত হইয়া কৃতার্থ হইবে, প্রেম, প্রেমময় পিতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সার্থক হইবে, এবং পবিত্রতা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করিয়া স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বলেই এই অধঃপতিত ভারতভূমির দুঃখরজনীর অবসান হইবে।

এত দিন নীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান চরিত্র ও ধর্ম্মযাজনাতে কোন সম্বন্ধ ছিল না। লোকে অন্ধভাবে কেবল বিধি পালন করিত। ধর্ম্মের জীবন্ত শক্তি প্রাণে উপলব্ধি করিত না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিলেন,

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্মফলকামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সেই ব্যক্তি কেবল জ্ঞানমাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। অগ্রে চরিত্রবান হও, নীতিপরায়ণ হও। ধর্ম্ম যদি চরিত্রে প্রতিফলিত না হইল, জীবনকে পরিবর্ত্তিত না করিল, তবে তাহা ধর্ম্মই নহে। জীবন্ত পরমেশ্বরের উপাসনা করিলাম, অথচ মৃতের ন্যায় উদ্যম উৎসাহ বিহীন, প্রেমময় পিতাকে পূজা করিলাম অথচ আমি প্রেমভক্তি স্নেহ ভালবাসা শূন্য প্রস্তরের ন্যায়, পবিত্র স্বরূপের আরাধনা করিলাম অথচ প্রাণ যে নরকের কীট ছিল, তাহাই রহিয়া গেল ইহা অসম্ভব। জলপানে যেমন তৃষ্ণা নিবারণ হয় সূর্য্য উদয়ে যেমন উষার কুজ্ঝটিকা দূরীভূত হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপূজাতে তেমনি মানবজীবন পুণ্য প্রেম শান্তি লাভ করিয়া নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ-

সরোবরে ভাসিতে থাকে। কি গভীর দুঃখের বিষয়, আর্য্যঋষিদিগের অবলম্বিত কল্যাণপ্রদ সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি হিন্দু সন্তানেরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না, বরং অনেকে দ্বেষ করিয়া কাল্পনিক মূর্ত্তিপূজাকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক ব্রাহ্ম বন্ধু ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিজাতীয় আকারে নূতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করায়, ভারতক্ষেত্রে ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের সমূহ বিঘ্ন হইতেছে। ভারতবর্ষে জনসাধারণ মধ্যে উন্নত ধর্ম্মভাব প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করা কত কঠিন কার্য্য ভারতের প্রাচীন রহস্য আলোচনা দ্বারা তাহা আমরা অবগত হইলাম। ভারতবর্ষ ধর্ম্মের নামে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে, অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতা দূর করিবার জন্য পরমেশ্বরের আদেশে এই দীন হীন বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কোন নূতন সম্প্রদায় বা দল সৃষ্টি করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। ব্যক্তিগত মতভেদ লইয়া বিবাদ করিবার জন্যও পরমেশ্বর আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদান করেন নাই। ঘৃণা বিদ্বেষ ও মতামতের ক্ষুদ্রতা পরিহার করিয়া আমরা যেন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের শান্তিময় সুশীতল ছায়াতে পবিত্র প্রেমের বন্ধনে সকলে একত্র সম্বন্ধ হই। ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কোন অভিনব সম্প্রদায় সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন নাই। তিনি নানা স্থলে বারম্বার স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, যে এ দেশে বহুকাল হইতে বেদ বেদান্তের আলোচনা না থাকায়, ব্রহ্মজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, আমি তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিমিত্তই চেষ্টা করিতেছি মাত্র। অধুনাতন যে সকল ব্রহ্মোপাসক আপনাদিগকে হিন্দু আখ্যায় আখ্যাত করিতে সঙ্কুচিত এবং এমন কি অনিচ্ছুক, হিন্দুভাব ও হিন্দু রীতি নীতির প্রতি যার পর নাই বীতশ্রদ্ধ এবং যাঁহারা স্বমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করত স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সঙ্গঠন করিতে সাতিশয় ইচ্ছুক, তাঁহারা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বোক্ত উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করেন, ইহাই আমাদিগের একান্ত অনুরোধ।

এক্ষণে আমরা অমৃতময় ব্রহ্মোৎসবে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দয়াময় পিতার নিকট প্রার্থনা করি, ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় জ্যোতি সর্ব্বত্র প্রকাশিত হউক, মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মোপাসনা সকল নরনারীর হৃদয়কে অধিকার করুক, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রীতি সকলের হৃদয়ে উদ্দীপিত হউক। হে পরমাত্মন্! আমরা তোমার নামে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, এই উৎসবক্ষেত্রে সকলের প্রাণে তুমি প্রচুররূপে প্রেমামৃত বর্ষণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা ও দুঃখের কথা।

(প্রাপ্ত)

জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তন কাল বড়ই অশান্তিময়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, যে সময় কোন জাতি অন্য কোন উন্নতিশীল বৈদেশিক জাতির সংমিশ্রনে স্বীয় পূর্ব্ব সংস্কার, রীতি নীতি, সুখ ও স্বাধীনতার আদর্শ ও সর্ব্বপ্রকার জাতীয় ভাব ত্যাগ করিয়া বৈদেশীক সংস্কার, আদর্শ ও রীতি নীতি গ্রহণ করে সে সময় সেই

জাতির সমস্ত লোক বড়ই অসুখে ও অশান্তিতে কালাতিপাত করে। মনুষ্য মন স্বভাবতঃ রক্ষণশীল। কোন বিসম পরিবর্ত্তন হইলে চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা মনুষ্য মনের ন্যায় জাতীয় মনকেও আকুল করিয়া তুলে। যতদিন সেই জাতি পূর্ব্বসংস্কার ও নূতন সংস্কারের মিশ্রণ দ্বারা কতকগুলি সংস্কার ও আদর্শ পুনরায় স্বীয় হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইতে না পারে তত দিন সে জাতির আকুলতা উদ্বিগ্নতা ও অশান্তি যায় না। পুরাতনে বিশ্বাস যায় কিন্তু বহু দিনের মমতায় তাহা ত্যাগ করা যায় না, নূতন ভাল লাগে বটে অথচ তাহা গ্রহণ করিতে যেন কেমন কেমন বোধ হয়। পুরাতন সংস্কার মন্দ জানিয়াও ছাড়িতে পারা যায় না, নূতন সংস্কার ভাল জানিয়াও তাহা গ্রহণ করিতে পারা যায় না; অথচ সংস্কার স্থির না হইলে ও সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করিতে না পারিলে প্রাণের উদ্বিগ্নতা দূর হয় না; হৃদয়ে শান্তি পাওয়া যায় না। জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তনকালে লোক এইরূপ সংশয় সঙ্কটে পতিত হয়, কাজেই অসুখ ও অশান্তির ছায়া তাহাদের হৃদয় জুড়িয়া লয়। আমাদের জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তনস্রোত অনেক দিবস হইতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এত দিনেও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। ক্ষারমিশ্রিত জলে অম্ল মিশাইলে সেই মিশ্রিত জল যেরূপ ফেনার সহিত কাঁপিয়া উঠে ও বিশেষরূপে আলোড়িত হয় সেইরূপ ইংরেজী শিক্ষার সহিত প্রথম মিশ্রণে আমাদের পূর্ব্ব সংস্কারাদি সমূলে বিলোড়িত হইয়াছে। কিন্তু ফাঁপা ও ফেনা মিশিয়া গেলে সেই জল যেমন স্থির ভাব ধারণ করে আমাদের সংস্কারাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনও সেরূপ স্থিরভাব ধারণ করিতে পারে নাই। এই পরিবর্ত্তনাবর্ত্ত শেষ হইয়া সমাজ-সমুদ্রের সংস্কার-বারি স্থায়ী স্থির ভাব ধারণ করিতে যে কত দিন লাগিবে তাহা ঠিক বলা যায় না। যে পর্য্যন্ত কোন জাতির সমস্ত লোকের সংস্কার রুচি রীতি নীতি সুখ ও স্বাধীনতার আদর্শ অনেকটা একরূপ না হয় সে পর্য্যন্ত সেই জাতির লোকে আশানুযায়ী সুখ ও শান্তি পাইতে পারে না। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই যে অসুখে ও অশান্তিতে জীবন কাটাইতেছেন তাহার ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। এখনকার কৃতবিদ্য সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে ইংরাজী ধরণে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহাদের রুচি আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের লক্ষ্যও ইংরেজদের রুচি আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের লক্ষ্যের অনুরূপ হইতেছে। সমাজে ইংরেজী ধরণের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাগ বেশী নয়। সমাজের অধিকাংশ লোকের রুচি আকাঙ্ক্ষা জীবনের লক্ষ্য ও শিক্ষা স্বতন্ত্র প্রকারের। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা যাহাকে বঙ্গসমাজ বলি সে সমাজ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর পক্ষে উপযুক্ত নহে। আজি কালি কতকগুলি সংস্কৃতানভিজ্ঞ মুণ্ডিতমুণ্ড ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কতকগুলি অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সংস্কারবিরোধী গ্রাম্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আর কতকগুলি মূর্খ অর্দ্ধহস্তপরিমিতাবগুণ্ঠনবতী স্ত্রী লইয়া আমাদের সমাজ। সমাজেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বভাবে সামঞ্জস্য নাই অথচ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিজেরও কোন সমাজ নাই। কাজেই সামাজিকতারূপ প্রধান সুখ হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়

একরূপ বঞ্চিত। ইংরেজি শিক্ষা ইহাদের হৃদয়ে যে আশার ও আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দেয় সমাজ তাহার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। অপরিতোষণীয় আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে বড়ই যন্ত্রণা হয়। ইহাই কৃতবিদ্যদের অসুখের দ্বিতীয় কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। সুখের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার নিত্য সম্বন্ধ। আকাঙ্ক্ষাভেদে ও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী তৃপ্তিভেদে সুখভেদ। আবার শিক্ষাভেদে আকাঙ্ক্ষাভেদ, কাজেই শিক্ষাভেদে সুখভেদ হয়। সুখের মধ্যেও তারতম্য আছে বটে কিন্তু সে তারতম্যও অনেকটা শিক্ষাভেদেই হইয়া থাকে। ইংরাজী শিক্ষা কৃতবিদ্যদের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষানল জ্বালিয়া দেয় তাহার উপযুক্ত ইন্ধন সমাজ যোগাইতে পারেনা, কাজেই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে নিস্তেজ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়কেও নিরাশার কুয়াশায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সংসারে কিছুতেই তাহারা সুখশান্তি পায় না। রক্ত দূষিত হইলে যেরূপ নানাব্যাধি নানা প্রকারে মানুষকে পীড়িত করে ও তাহার সুখ সচ্ছন্দতার কণ্টক স্বরূপ হয় সেইরূপ সমাজের সহিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বভাবের সামঞ্জস্যাভাব নানা প্রকারে এই সম্প্রদায়ের সুখ সচ্ছন্দতার কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। পুরুষ শিক্ষিত হইতেছে কিন্তু সমাজের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ স্ত্রীগণের মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি শিক্ষার অভাবে ও কুসংস্কারের ঘোরতর শাসনে বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মস্তিষ্ক ইংরেজী চালচলনে ইংরেজী রুচিতে ও ইংরেজী ভাবে ভরপূর হইয়া আছে কিন্তু যাহাদিগকে তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী ও জীবনসঙ্গিনীরূপে মনোনীত করিতে হইতেছে তাহারা পূর্ব্ব চালচলনে ও পূর্ব্বরুচি ও সংস্কারের পদে পদে অনুবর্ত্তন করিতেছে। নব্য সম্প্রদায় চায় যে স্ত্রীটি বাঙ্গালা বেশ জানে, ইংরেজিতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে, সেলি বায়রন পড়িতে পারিলে তো সোণায় সোহাগ। পিয়ানো বাজাইতে জানে, চিত্রবিদ্যায় নিপুণতা থাকে, এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে পারে। স্ত্রীতে এইসব গুণ থাকিলে তবে তাহাদের মন উঠে এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়। কিন্তু সে আশা কোথায়।

> "উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিম দিগ্বিভাগে।
> বিকসতি যদি পদ্মঃ পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
> প্রচলতি যদি মেরুঃশীততাং যাতি বহ্নিঃ।

তবুও তো তাহারা নাচ গান শিখিতে স্বীকার করিবে না। ইহার পর সমাজে বার বৎসরের বেশী বয়সের মেয়ের বিবাহ হয় না, কাজেই স্ত্রীটি একে অশিক্ষিত তাতে অবুঝ হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় স্ত্রীকে একটী প্রধান সুখের কারণ মনে করে। কিন্তু তাহারা মনে মনে স্ত্রীর যে কল্পনা করিয়া রাখে তাহা রক্তমাংসজড়িত বাঙ্গালী স্ত্রীতে এক্ষণে পাওয়া অসম্ভব। যতদিন মানুষ সুখের দেখা পায় না কিন্তু পাইবে বলিয়া প্রাণে এক বিন্দুও আশা থাকে ততদিন বড় দুঃখেও মানুষ দুঃখী নয় কিন্তু যখন সুখ পাইয়াও মানুষ সুখী হয় না সুখের জিনিস পাইয়াও সাধ মেটে না তখনই মানুষ প্রকৃত দুঃখী। বিবাহের পর অনেক কৃতবিদ্য যুবকের মুখেই শুনিতে পাই 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল, অমিয়া সাগরে সেনান করিতে সকলি গরল ভেল'। পরিবারস্থ স্ত্রীসম্প্রদায় কেহই ইহাদিগকে সুখ দিতে পারে না। স্ত্রী, মা, ভগিনী কেহই ইহাদের পছন্দ মত হইতেছে না।

সকলকেই নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে, কাজেই ইহারা বড়ই অসুখী হইতেছে। ইহা একটী বিষম অনর্থের মূল হইয়াছে, কারণ যাহাদের সহিত সর্ব্বদা একত্র হইয়া বাস করিতে হইবে তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা বিরক্ত হইলে চলিবে কেন? অথচ এই কৃতবিদ্য সম্প্রদায় শিক্ষাবলে বিরক্ত হইতেছে। ইহারা যে বিরক্ত হইতেছে ইহা ইহাদের শিক্ষার দোষ নহে শিক্ষার ফল মাত্র। আবার ইহারা যাহাদের উপর বিরক্ত হইতেছে তাহাদেরও দোষ নহে কারণ তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক ইহাদিগকে বিরক্ত করে না! তাহারা যদি বলে তুমি একাকী শিক্ষিত হইলে কেন, আমাদিগকে লইয়া শিক্ষিত হইলে না কেন, তবে অবশ্য সে কথার উত্তর নাই (১)। কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই অসুখের কথঞ্চিৎ উপশম হইতেছে বটে কিন্তু কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকেই ইহার ফল হাড়ে হাড়ে ভুগিতেছে। এই জন্যই বলিতেছিলাম যে পর্য্যন্ত কোন জাতির সমস্ত লোকের সংস্কার রুচি রীতি নীতি সুখ ও স্বাধীনতার আদর্শ অনেকটা একরূপ না হয় সে পর্য্যন্ত সে জাতীয় লোক আশানুযায়ী সুখ পাইতে পারে না। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই জন্য এরূপ অশান্তিতে জীবন কাটাইতেছে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অশান্তির অন্য কারণ ধর্ম্মহীনতা। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মে আস্থাশূন্য। কোন ধর্ম্মই ইহাদের হৃদয়ে বিশ্বাসোৎপাদনে সমর্থ নয়। ইহারা যুক্তি ও তর্করূপ দুই চক্ষুঃ দ্বারা সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব পরলোকতত্ত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব করস্থিত আমলক ফলের ন্যায় দেখিতে ইচ্ছা করে। ধর্ম্মে এই অবিশ্বাস বর্ত্তমান শিক্ষা ও জাতীয় ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। ইতিহাস জৈবনিক organic ও সাংশয়িক critical দুই ভাগে বিভক্ত। যে সময় কোন জাতির বিশ্বাসপ্রিয়তা অতি প্রবল হয়, ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত মত সকলের সত্যাসত্য উপযুক্তরূপে বিবেচিত না হইয়া গৃহীত হয় এবং অন্ধ বিশ্বাসই সমস্ত কার্য্যের পরিচালক হয় তখনই সেই জাতির ইতিহাসের জৈবনিক ভাগ বলা যায়। কিন্তু অতিঘাত হইলেই তাহার প্রতিঘাত হইবে ইহা একটী ধ্রুব ঐতিহাসিক সত্য। কাজেই জৈবনিক ভাগের বিশ্বাসান্ধতা কালে সাংশয়িক ভাগের বিশ্বাসাভাবে পরিণত হয়। ইতিহাসের এই সাংশয়িক ভাগে লোকে যুক্তি ও তর্ক দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন না হইলে কিছুই গ্রহণ করে না। এবং সংশয়ই তাহাদের সমস্ত কার্য্যের পরিচালক হয় (২)। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের জৈবনিক ভাগ গিয়া এক্ষণে এই সাংশয়িক ভাব আসিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সংশয়ের ভাব আরও দৃঢ়রূপে প্রবেশ করিয়াছে। যদিও ইংরেজদের জাতীয় ইতিহাসে সাংশয়িক ভাগ বহুদিবস হইল লুথারের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু কোনটী ভাল কোনটী মন্দ এ বিষয়ে এখনও ইংরেজ জাতি কোন গভীর বিশ্বাস জাতীয় হৃদয়ে চির অঙ্কিত করিতে পারে নাই।

১ আমি 'প্রবাহ' লিখিত 'উনবিংশ শতাব্দির দুঃখ' শীর্ষক প্রস্তাব হইতে স্থানে স্থানে কিঞ্চিত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

২ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'মিলের জীবন চরিত হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ও কাজেই ইংরেজী সাহিত্যাদি হইতে এই সংশয় ভাবই গ্রহণ করিতেছে। ঈশ্বরে ও পরকালে অবিচলিত বিশ্বাস যে প্রগাঢ় শান্তির কারণ ইহা বোধ হয় খুব কম লোকেই অস্বীকার করিবেন। এই পাপ তাপ শোক দুঃখময় সংসারে ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছায় যাহার বিশ্বাস নাই তাহার মত দুর্ভাগা জীব সংসারে নাই। ঈশ্বরপ্রীতি বাস্তবিকই মূর্ত্তিমতী হইয়া সংসারে অমৃতধারা সিঞ্চন করে। ইহার অভাবে মন কেবল আত্মসুখান্বেষী ও সেই সুখের অপ্রাপ্তিতে ঘোরতর অশান্তিতে জীবন যাপন করে। শিক্ষিত সম্প্রদায় এই অশান্তি হাড়ে হাড়ে ভুগিতেছে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হওয়ায় তাহারা ধর্ম্মসংসৃষ্ট অন্যপ্রকার আমোদ সকলও হারাইয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বা এখনকার অশিক্ষিত সম্প্রদায় কোনরূপ ধর্ম্মোৎসবে যেরূপ প্রাণভরা হৃদয়তৃপ্তিকর আমোদ পাইত বা পায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মে বিশ্বাসাভাব ও পরিবর্ত্তিত রুচি তাহাদিগকে সেরূপ প্রাণভরা আমোদ গ্রহণ করিতে দেয় না।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুঃখের আর এক কারণ স্বাস্থ্যহানি, জানি না কেন কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে আজ কাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশেরই শারীরিক অবস্থা বড় শোচনীয়। সুখের যাহা প্রধান উপায় তাহাই এই শিক্ষিত সম্প্রদায় হারাইতেছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের সহিত তুলনা করিলে এখনকার সকলেই হীনবল হইতেছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আবার এখনকার অশিক্ষিতদের স্বাস্থ্য শিক্ষিতদের স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক ভাল ইহাই সাধারণতঃ দেখা যায়।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর এক দুঃখের কারণ দারিদ্র। ইহাদের বিলাসিতা ও অন্যান্য অভাব খুব বাড়িতেছে কিন্তু বিলাস সামগ্রীর দুর্ম্মূল্যতা ও ইহাদের দরিদ্রতা জন্য ইহাদের বিলাসপ্রিয়তা চরিতার্থ হইতেছে না। আমরা বড় লোকদের কথা কহিতেছি না। সাধারণতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই অর্থচিন্তায় আকুল। ইহাদের তেজ উৎসাহ ও সর্ব্বপ্রকার উদ্যম অর্থচিন্তাস্রোতে ভাসিয়া যায়। ইহাদের সর্ব্বপ্রকার আশা ও মনোরথ উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে। পূর্ব্বের লোক অপেক্ষা বা সমাজের অশিক্ষিত লোক অপেক্ষা শিক্ষিতদের অভাব ঢের বেশী কিন্তু সে অভাব পূরাইতে পারে তাহারা এরূপ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে না। অপূর্ণ অভাব জনিত দুঃখ শিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতেছে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুঃখের আর এক কারণ ইহাদের স্বার্থপরতা। ইংরেজী শিক্ষা ইহাদিগকে বড়ই স্বার্থপর করিয়া তুলিতেছে। ইহারা মিল প্রভৃতি দার্শনিকদের পুস্তকে পড়ে বটে যে পরের জন্য আত্মোৎসর্গই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কিন্তু কাজে ইহারা ঘোর স্বার্থপর। ইহারা 'নিজ' বই বুঝে না, নিজের সুখের জন্যই অবিরত লালায়িত। পূর্ব্বের লোকে বা এখনকার অশিক্ষিত লোকে পরিবারস্থ সকলকে প্রতিপালন ও গার্হস্থ ধর্ম্মের অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধন করিয়াই সুখ পাইত বা পায়, এখনকার কৃতবিদ্য সম্প্রদায় এ সুখ পায় না। দূর সম্পর্কীয় আশ্রিতদের কথা দূরে থাকুক ইহারা মাকে লইয়াও এক সংসারে থাকিতে নারাজ। অথচ আমাদের সামা-

জিক গঠন এমন যে এরূপ না থাকিলেও চলে না। একান্নভুক্ত পরিবারের উপর ইহারা হাড়ে হাড়ে চটা, ইচ্ছা ইংরেজদের মত মেমটী লইয়া সুখে ও শান্তিতে থাকা কিন্তু দরিদ্রতা ও সমাজের গঠন এই দুই কারণে ইহাদের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিলে কম খরচে সংসার চলে; বাল্য-বিবাহ-প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকায় ও স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত না হওয়ায়, অন্য কাহারও সহিত স্ত্রীলোকদের আলাপ করিবার প্রথা না থাকায় ও অন্যান্য কারণে অনেক সময়েই সংসারে মা ভগিনী না থাকিলে চলে না। এ বিষয় বিশেষরূপে বুঝাইতে হইলে স্বতন্ত্র আর একটী প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। *

আমরা উপরোক্ত কয়েক কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুঃখের কারণ-পরম্পরার মধ্যে প্রধান মনে করি। যাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দুঃখী মনে করেন না তাঁহাদিগকে আমাদের বলিবার কিছু নাই, কেন না তাঁহাদের সহিত আমাদের মতের ঘটনাগত পার্থক্য। সুখ ও দুঃখ আপেক্ষিক শব্দ। কাজেই এক প্রশ্ন হইতে পারে শিক্ষিত সম্প্রদায় কাহাদের অপেক্ষা দুঃখী। এ প্রশ্নের আমি এই উত্তর দি আমাদের পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন তাহাদের অপেক্ষা ও আমাদের পরে যাহারা আসিবে তাহাদের অপেক্ষা। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি প্রবন্ধশেষেও বলিতেছি শিক্ষিতদের অশান্তির সমস্ত কারণ তাঁহাদের শিক্ষার দোষ নহে ফল মাত্র।

* আমরা জানি একান্নভুক্ত পরিবারে সুখ ও শান্তি বড় কম কিন্তু প্রায় অধিকাংশ বাঙ্গালীর এ অশান্তির হাত ছাড়াইবার যো নাই। কাজেই ইহাকে ভাল মনে করা বই আর উপায় কি।

বেদান্ত মত।

সমাপয্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা দারাগ্ন্যাধানপূর্ব্বিকাঃ।
ব্রহ্মবিদ্যামথেদানীং বক্তুং বেদঃ প্রচক্রমে॥

এক্ষণে গ্রন্থকার বেদান্তের ব্রহ্মপরতা প্রতিপাদনের জন্য জ্ঞানকাণ্ড যে কর্ম্মকাণ্ড নিরপেক্ষ তাহা কহিতেছেন।

অনন্তর ইদানীং বেদ ব্রহ্মবিদ্যা বলিবার উপক্রম করিতেছেন। অর্থাৎ জ্ঞান কাণ্ডাত্মক বেদ বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পন্ন মুমুক্ষুর মোক্ষসাধন ব্রহ্মবিদ্যাকে বলিবার উপক্রম করিতেছেন। মুমুক্ষুর সাধনসম্পত্তি লাভ যে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠিতজনিত চিত্তশুদ্ধি হইতে হয় এই অভিপ্রায়ে বলা হইল যে দারাগ্ন্যাধানপূর্ব্বিকা সমস্ত ক্রিয়া সমাপন করাইয়া বেদ ব্রহ্মবিদ্যা বলিবার উপক্রম করিতেছেন। এস্থলে বিবাহ ও অগ্ন্যাধান অর্থে নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা রূপ বিধিবিহিত সমস্ত গার্হস্থ্য কার্য্য—অনুষ্ঠেয় যাবদীয় কার্য্য বুঝিতে হইবে। বেদ স্বতঃপ্রমাণ ও সর্ব্বার্থপ্রকাশক। যে ব্যক্তি নিত্য নিরতিশয় পুরুষার্থ যে মুক্তি তাহা প্রার্থনা করে এবং তদ্বিষয়ে উৎসাহ পূর্ব্বক যত্নশীল হইলেও তল্লাভে অকৃতকার্য্য বেদ সেই ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষের অবিষয় তাদৃক মুক্তির সাধন অবগত করাইয়া দেন। ফলত মুক্তির উপায় প্রতিপাদনেই বেদের তাৎপর্য্য, উক্তরূপ ব্যক্তির জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক যে পাপ তন্নাশের নিমিত্তই নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের বিধান। পাপক্ষয় করাই ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপ কর্ম্মের পরম প্রয়োজন। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে উহার মুক্তি সাধনে উপযোগিতা আছে। যদি বল কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোকাদি লাভ হয় তবে কেন আমি মুক্তিসাধনে পরম্পরায় কর্ম্মের

উপযোগিতা স্বীকার করি। অবশ্য তুমি এ কথা বলিতে পার। কিন্তু ইহাও বুঝিও কর্ম্মপ্রাপ্য লোক ক্ষয়াদিদোষ-দুষ্ট সুতরাং একান্তই হেয় ও অনুপাদেয়। আর ইহাও স্বীকার করি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে আনুষঙ্গিক ফলও হয় কিন্তু হইলেও উহা চিত্তশুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে সুরেশ্বরাচার্য্য কহিয়াছেন নিত্য পদার্থে শুদ্ধিরই প্রাধান্য ভোগ তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। ভোগ ভঙ্গুর বুদ্ধিশুদ্ধিই সকলের অভীষ্ট। অতএব চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বপ্রথম অপেক্ষিত বলিয়া তন্নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথম বেদের কর্ম্মবিধান পশ্চাৎ জ্ঞানোপদেশ। এখন বুঝ মুক্তির হেতু যে চিত্তশুদ্ধি তাহার হেতু কর্ম্ম। এইরূপ হেতুর হেতুভাবে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ। ফলত সাক্ষাৎ ফল যে মুক্তি তদর্থ যে জ্ঞান তৎপ্রতিপাদক বলিয়া এবং সেই জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা অপেক্ষিত নয় বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডের অনন্যশেষতা অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডনিরপেক্ষতা জানিবে।

কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই তাহা কর্ত্তার ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মনে কর পিতা তোমায় যে কর্ম্মে আদেশ দিয়াছেন তাহার ফল ইষ্ট, যে কর্ম্মে নিষেধ করিয়াছেন তাহার ফল অনিষ্ট। আর যাহাতে আদেশ নাই নিষেধ ও নাই এইরূপ কর্ম্মের ফল দৈবাধীন ইষ্টও হয় অনিষ্ট ও হয়। সেইরূপ দেখ বেদবিহিত কর্ম্মের ফল ইষ্ট, বেদনিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল অনিষ্ট, আর যাহা বিহিতও নয় নিষিদ্ধও নয় এরূপ কর্ম্মের ফল ইষ্টও হইতে পারে অনিষ্টও হইতে পারে। আমার একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মের যখন ফলব্যভিচার দেখা যায় না আর তোমার মতে মোক্ষও যখন একটী ফলবিশেষ তখন তাহা কর্ম্ম-বিশেষ-সাধ্য হউক; তজ্জন্য বিদ্যার বা জ্ঞানের কি প্রয়োজন? আর মুমুক্ষুরা তজ্জন্য কেনই বা জ্ঞানকাণ্ড আলোচনা করিবে। চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি কএকটী কর্ম্ম আছে অক্ষয় ফলার্থে তাহারই অনুষ্ঠান করুক। ইহা কর্ম্মজড় দিগের সিদ্ধান্ত। ইহার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

জাতি আয়ুঃ ভোগরূপ যে কর্ম্মফল তাহা দেহসম্বন্ধ ব্যতীত কখন ঘটে না সুতরাং কর্ম্ম দেহযোগেরই কারণ। যদি দেহযোগ হইল তবে তো সংসার দুর্নিবার। দেহসম্বন্ধ হইতেই প্রিয় অপ্রিয় সুখ দুঃখ নিশ্চয়ই হইবে। শ্রুতিও কহিয়াছেন শরীরীর কখনই প্রিয়াপ্রিয়ের অপহতি নাই। পরে এই সুখ দুঃখ ও তৎসাধন হইতে বাসনারূপী রাগ দ্বেষের উৎপত্তি হয়। আর এই রাগ দ্বেষ হইতেই কায়মন বাক্যের চেষ্টা হইয়া থাকে।

অজ্ঞ অর্থাৎ অহঙ্কার-পরবশ প্রত্যক্-আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-শূন্য ব্যক্তির বিহিত ও প্রতিসিদ্ধরূপ কর্ম্ম হইতেই পুনর্ব্বার ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। পরে দেহযোগ, আবার সেই সুখ দুঃখ। এইরূপ জন্ম মরণ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তৎফলভোগরূপ সংসার কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় অবিশ্রামে অনাদিকাল চলিতে থাকে ইহা তো প্রত্যক্ষ। অতএব ঐহিক যাহার উদ্দেশ্য এমন কর্ম্মের ফল অনিত্য ইহা যখন স্পষ্ট দেখা যায় আর পারত্রিক ফল যাহার উদ্দেশ্য তাহা কর্ম্ম বলিয়াই যখন তাহার অনিত্যফলতার অনুমান হয় তখন ধীমান ব্যক্তি কদাচ কর্ম্মফলের নিত্যত্ব আশা করিবে না। বেদও বলিয়াছেন ইহকালে কর্ম্মজিত লোক

যেমন ক্ষয় হয় সেইরূপ পরকালে পুণ্যজিত লোকও ক্ষয় হইয়া থাকে।

ভালই, এরূপ হইলেও মোক্ষার্থীর জ্ঞানে তো কোনও প্রয়োজন দেখি না, কারণ সংসারনিদান কৃত কর্ম্মের ভোগাবসানে ক্ষয় হইয়া গেলে নিমিত্তের অভাবে নৈমিত্তিকের অভাব হয় এই ন্যায়ে কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষ তো অযত্নলভ্য হইল।

না এরূপ বলিও না, কর্ম্ম অজ্ঞানমূলক, সেই অজ্ঞান থাকিতে কর্ম্মেরও অভাব ঘটে না। অথবা অজ্ঞের কর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরাম না হইলে সংসারের বিরতি হয় না। আর কৃত কর্ম্মের ফলভোগকালেও অবশ্যই কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় সুতরাং এইরূপে ভোগের আর বিরাম হইতেছে না। যদি এইরূপই হইল তবে তুমি কর্ম্মনিবৃত্তিতে মোক্ষসিদ্ধি এ কথা কিরূপে বল।

বেদে কথিত আছে লোক সকল অজ্ঞান রূপ নীহারে প্রাবৃত জল্পনাপর প্রাণের তৃপ্তিতে ব্যতিব্যস্ত এবং কর্ম্মবিধি দ্বারা শাসিত হইয়া বিচরণ করিতেছে। স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে, রাজন! পুরুষের একই শত্রু, দ্বিতীয় নাই, সেইটীর নাম অজ্ঞান। সে তদ্দারা আবিষ্ট হইয়া ঘোর সুদারুণ কার্য্য সকল করে ও কারিত হয়। এই শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা অজ্ঞানই এই কর্ম্ম ও তৎফল স্বরূপ এই সংসারের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব সেই অজ্ঞানের আত্যন্তিক উপরতি অর্থাৎ নাশই অভিপ্রেত, যত্ন পূর্ব্বক তাহাই সম্পাদন করিতে হইবে। মূল উন্মূলিত না হইলে প্ররোহের অভাব হয় না। শ্রুতি কহিয়াছেন আত্মবিৎ শোককে অতিক্রম করেন। এই শ্রুতি দ্বারা যখন এইরূপ নির্ণীত হইতেছে যে বিদ্যাই অজ্ঞান নাশের হেতু, সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্যা আরব্ধ হইতেছে। এই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা মুক্তি হয়। বিদ্যার উদয়ে প্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে কেবল আত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষকে লাভ করিবার আর বড় বিলম্ব হয় না।

কর্ম্মের শক্তি অনন্ত। শ্রুতিতে আছে যিনি সুবর্ণ দান করেন তাঁহার অমৃতত্ব লাভ হয়। স্মৃতিতে আছে জনকাদি কর্ম্মবলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে নির্ণীত হইতেছে যে কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষসিদ্ধি হয়, তবে ব্রহ্মবিদ্যায় প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা দূর করিতেছেন। সংসার-মূল অজ্ঞান নাশের জন্য বিদ্যাই সমর্থ কদাচ কর্ম্ম নহে। কর্ম্ম নহে যে তাহার কারণ অবিরোধ। কিন্তু বিদ্যা প্রকাশ স্বরূপ, সেই হেতু অপ্রকাশ রূপ অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে নিবৃত্ত করে। মনে কর রজ্জুতে আবরণস্বভাব অবিদ্যারূপ অন্ধকার একটী সর্পাদি আকার সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু রজ্জু ও তৎ-তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রদীপ সেই অবিদ্যাকল্পিত সর্পাদির ভ্রান্তিকে নিবৃত্ত করে। এস্থলে এই যে রজ্জুতে সর্পাদি ভ্রান্তি ও তৎ নিবৃত্তির প্রতি হেতু স্বভাব-বিরোধ, অর্থাৎ অবিদ্যার স্বভাব আবরণ আর বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানের স্বভাব প্রকাশ। সুতরাং যে প্রকাশ-স্বভাব সে আবরণ-স্বভাবকে বিরোধ হেতু অবশ্যই নষ্ট করিতে সুপটু। সেইরূপ কর্ম্ম অজ্ঞান-মূলক, যে স্বয়ং অজ্ঞান-মূলক সে আপনার অপ্রতিকূল স্বীয় স্বভাবের অবিরোধী অজ্ঞান-অন্ধকারকে কিরূপে নষ্ট করিবে। ফলত নীহারস্তোমবৎ অপ্রকাশ-স্বভাব হেতু কর্ম্ম অজ্ঞাননাশে এককালেই অসমর্থ। এস্থলে জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভের অন্য পথ নাই এই শ্রুতির সহিত সুবর্ণদাতার অমৃতত্বলাভ প্রতিপাদক শ্রুতির অবশ্য

বিরোধ ঘটিতেছে। কিন্তু এই সুবর্ণদানে অমৃতত্ত্ব লাভকে আপেক্ষিক বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সুবর্ণদান রূপ কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি তন্নিবন্ধন জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ এইরূপই বুঝিতে হইবে। আর স্মৃতিতে জনকাদির কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভের যে উল্লেখ আছে তাহারও এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। এস্থলেও এই কর্ম্মপরা স্মৃতিকে পূর্ব্ববৎ অন্যপরা বুঝিতে হইবে। অতএব এই বিরুদ্ধ শ্রুতি ও স্মৃতিবলে কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান নাশ হওয়া একান্ত অসম্ভব।

ভাল, বিদ্যাব্যতীত যদি অজ্ঞান নাশ না হয় তবে কেবল তৎনিমিত্তই—অজ্ঞান নাশের নিমিত্তই বিদ্যা অভিপ্রেত হউক। আর অজ্ঞানের কার্য্য যখন বাস্তব হইতেছে তখন সেই বাস্তব কার্য্যের নাশ বিদ্যা দ্বারা কদাচ হইতে পারে না। অতএব তন্নাশের জন্য হেত্বন্তর অন্বেষণ কর। এই আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত কহিলেন অজ্ঞানের নাশ না হইলে তৎকার্য্য যে রাগদ্বেষাদি তাহার নাশ হয় না। বিবেকের পূর্ব্বদশার অর্থাৎ অবিবেক-পূর্ব্বকত্বে এই রাগ-দ্বেষাদিতে অন্বয় ও ব্যতিরেক সিদ্ধ হয়। এই হেতু রাগাদি অজ্ঞানময় ইহা বাস্তব কিছুই নয়, অজ্ঞাননিবৃত্তিতেই তাহার নাশ হইয়া থাকে।

রাগ দ্বেষ ক্ষয়াভাবে কর্ম্মদোষোদ্ভবং ধ্রুবং।
তস্মান্নিঃশ্রেয়সার্থায় বিদ্যৈবাত্র বিধীয়তে।

রাগ দ্বেষ নাশ না হইলে তন্মূলক কর্ম্ম দোষের উৎপত্তি নিশ্চয়ই হয় অতএব নিঃশ্রেয়স লাভের নিমিত্ত বেদান্তবিদ্যাই বিহিত [illegible]য়াছে।

ক্রমশঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

আমাদের মধ্যে মুসলমান একজনও ছিল না, আমরা বংশাবলি আনন্দপূর্ব্বক ছিলাম। একজন মুসলমান বাদসাহ বলপূর্ব্বক গ্রাম গ্রাম হিন্দুদিগকে গোমাংস খাওয়াইয়া মুসলমান করিয়া দিয়াছে। আগে আমাদের হিন্দুনাম ছিল না, আর্য্য নাম ছিল। উহারা দেখিল যে আর্য্য নামের অর্থ শ্রেষ্ঠ, তাহারই জন্য গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে ঢেড্‌ড়া ফিরাইয়া দিল যে অদ্য হইতে যাহার আর্য্য নাম শুনিব তাহাকে কাটিয়া ফেলিব। তোমরা হিন্দু নাম লও, হিন্দু নাম সকলের নীচ নাম এবং খোদার নাম জপ। গ্রামের মধ্যে হিন্দুদের ঘরের মধ্যে যদি কেহ মরিত এবং কান্না কাটি করিত তাহাদের হুকুম দিত যে তোমরা এরূপে কাঁদিতে পারিবে না। বুক্‌ চাপড়াইয়া কাঁদিতে হইবে। যেরূপ আমরা মহরমের দিনে বুক চাপড়াইয়া কাঁদি সেই রূপ। মহারাজ! হিন্দুস্থানে কেহ হিন্দু রাজা নাই। হিন্দুরা সকলেই বলহীন মুখসর্ব্বস্ব কিন্তু কাজে কিছুই পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের হিন্দুদিগকে ধিক্। আমাদের মধ্যে একতা নাই। শিবনারায়ণ এই কথা শুনিয়া সেখান হইতে পঞ্জাবের এক গ্রামে আসিলেন। সেই গ্রামে দুই জন ব্রাহ্মণ সন্তান পেশোয়ারাভিমুখে গমন করিতেছিল। মুসলমানেরা তাহাদের যজ্ঞপবীত কাড়িয়া লইয়া গোমাংস খাওয়াইয়া দিল। তাহারা দুই জনে আপন গ্রামে আসিয়া তাহাদের পিতা মাতাকে সকল অবস্থা বলিল। মাতা পিতা পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে ইহার

কি উপায় করিতে হইবে। পণ্ডিতেরা বলিলেন যে দুই শত করিয়া টাকা প্রত্যেককে আনিতে হইবে তাহা হইলে ইহারা শুদ্ধ হইয়া যাইবে নতুবা ইহাদের শুদ্ধ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। সেই ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত গরিব ছিল। ভিক্ষা দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। দুই শত টাকা তাহারা কি প্রকারে দিবে। তাহারা টাকা দিতে না পারাতে সেই সন্তান দুইটিকে ঘরে লইতে পারিল না, তাড়াইয়া দিল। তাহারা মুসলমানদের ঘরে যাইল। এইরূপে মুসলমানদেরও দলপুষ্টি হইতে লাগিল। শিবনারায়ণ এই সকল অবস্থা দেখিয়া বিচারকর্ত্তাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, টাকা কি কখন জীবকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ করিতে পারে? কেবল মনের ভ্রম ও সমাজের শাসন মাত্র। হিন্দুদের এই দুর্দ্দশার দৃষ্টান্ত পার্শী অর্থাৎ শিউলিদের মধ্যে আছে। শিউলিদের মধ্যে যদি কেহ অখাদ্য বস্তু খায় অথবা কোন অপরাধ করে তাহা হইলে তাহাদের পণ্ডিতেরা এবং ভাই জ্ঞাতিরা বলে, যে যদি তুই আমাদের অর্দ্ধসের করিয়া তাড়ি প্রত্যেককে দিস্ তাহা হইলে তোকে শুদ্ধ করিয়া লইব। সেই ব্যক্তি যদি অর্দ্ধসের করিয়া তাড়ি প্রত্যেককে দেয় তাহা হইলেই সে শুদ্ধ হইয়া যায়, এবং যদ্যপি সে দিতে না পারে, তাহা হইলে সে অশুদ্ধই থাকে।

অনন্তর শিবনারায়ণ পঞ্জাব হইতে অম্বরসহর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় পুকুরের মধ্যে যে নানক্জির মন্দির আছে তিনি তন্মধ্যে যাইলেন। যাইয়া সেই মন্দিরের অর্থোপায়ের অবস্থা সকল দেখিলেন। দেখিলেন গ্রন্থ সাহেবকে অর্থাৎ পুস্তক কাগজ কালীকে প্রণাম করিতেছে। এবং কড়ি টাকা পয়সা দিতেছে। শিবনারায়ণ শুনিলেন, যাহারা যথার্থ সাধু এই স্থানে তাহার পরিচয় হয়। অর্থাৎ লোকে যথার্থ সাধুদিগকে চিনিতে পারে, এবং তাহাদের সেবা করে। সেই পুষ্করিণীর চারিদিকে মহান্তদিগের স্থান আছে, এবং তথায় সাধুদিগের নিয়মিত সেবা হইয়া থাকে। শিবনারায়ণ সকল মহান্তদের বাসায় আহারের সময় অপরাপর সাধুদিগের সঙ্গে যাইতেন। যে সকল সাধুর রঙ্গিন কাপড় থাকিত, এবং মস্তকে জটা ইত্যাদি নানা প্রকার ভেকের চিহ্ন থাকিত তাহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক বসাইতেন, এবং আহার করাইতেন। কিন্তু শিবনারায়ণের কোন রূপ ভেকের চিহ্ন ছিল না, তাঁহার জীর্ণ চাদর ও গায়ে ধুলা দেখিয়া তাড়াইয়া দিত।

পরে শিবনারায়ণ অম্বর সহর হইতে বাহির হইয়া এক ক্রোশ দূরে শুখাতলাও স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে আসিয়া তিনি দশ পনর দিন অবস্থান করিলেন। সেই গ্রামের দুই এক জন সাধু আসিয়া শিবনারায়ণের সহিত ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত। তাহারা শিবনারায়ণের কথা বার্ত্তা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া সেই গ্রামের সকলকে বলিত, যে এক জন যথার্থ মহাত্মা আসিয়াছেন। পরে সেই গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল, এবং উত্তম রূপে সেবা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অম্বর সহরের সেই মহান্তরাও শিবনারায়ণের কাছে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং তাহারা লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল যে এই মহাত্মা আমাদের বাটীতে গিয়াছিলেন। ইহাঁর কোন

ভেক ছিল না বলিয়া আমরা ইহাঁকে তাড়াইয়া দিয়াছি। সেই সহরের মধ্যে রাজারাম নামে একজন ক্ষত্রিয় শিবনারায়ণের প্রীতি পূর্ব্বক সেবা করিত। সেই ব্যক্তি যে দিবস শিবনারায়ণকে তলাওয়ের উপর দেখিল সেই দিবস বিছাইবার জন্য একটা কম্বল এবং গায়ে দিবার জন্য একটা লুই এবং একটা জলপাত্র রাখিয়া গেল। অনন্তর দুই এক দিবস পরে শিবনারায়ণ জঙ্গলের মধ্যে খালের ধারে বেড়াইতে গেলেন। ঐ সময় একজন সাধু শিবনারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য আসিল। রাজারাম শিবনারায়ণকে যে সকল বস্তু দিয়াছিলেন ঐ ব্যক্তি সুযোগ পাইয়া সেই সকল বস্তু অপহরণ করিয়া লইয়া গেল এবং এক দোকানদারের কাছে পাঁচ টাকায় বন্ধক রাখিয়া বলিল আমি এই টাকা দিয়া এক সপ্তাহ মধ্যে ঐ বস্তু ছাড়াইয়া লইব। মুদি সেই দ্রব্যাদি রাখিয়া পাঁচটি টাকা দিল। সাধু টাকা পাইয়া আফিন, গাঁজা, এবং নানাবিধ মিষ্টান্নে ব্যয় করিতে লাগিল। পরে শিবনারায়ণ বেড়াইয়া আপন স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, সে সকল বস্তু সেখানে নাই। কিছুক্ষণ পরে রাজারামও শিবনারায়ণকে সেবা করিবার জন্য তথায় আসিয়া দেখিল তাঁহার কম্বলাদি কিছুই নাই। সে শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ এই সকল বস্তু কি হইল। শিবনারায়ণ বলিলেন যে যিনি দিয়াছিলেন তিনিই লইয়া গিয়াছেন। রাজারাম বলিলেন, মহারাজ বোধ হয় কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, পুনরায় আমি আনিয়া দিতেছি, আপনার কষ্ট হইবে। শিবনারায়ণ বলিলেন আমার কিছু মাত্র কষ্ট হইবে না, আমার এক চাদরেতেই নির্ব্বাহ হইবে। অপর বস্তুর প্রয়োজন নাই। সাধু মহাত্মা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের কেবল দিন নির্ব্বাহ মাত্র প্রয়োজন। রাজারাম সেই কথা না শুনিয়া বাটিতে গিয়া পুনরায় সেইরূপ দ্রব্যাদি আনিয়া দিল। এদিকে যে সাধু কম্বলাদি অপহরণ করিয়া যে দোকানে বন্ধক রাখিয়াছিল, তথায় যাইয়া বলিল যে আরো এক টাকা আমাকে দাও। আমি এখন দ্রব্যাদি ছাড়াইতে পারিতেছি না। মুদি ক্রোধ প্রযুক্ত সেই সমস্ত বস্তু তাহাকে দিয়া বলিল, যে এই তোমার বস্তু লও আমার টাকা দাও। আমি আর রাখিতে পারিব না। ঐ সময় সেই দোকানে রাজারামের চাকর বসিয়াছিল। সেই চাকর চিনিল যে এই সকল বস্তু আমার মনিব স্বামী জীকে দিয়াছিল। এই সাধু চুরি করিয়া আনিয়াছে। তখন সে চুপে চুপে যাইয়া তাহার মনিবকে খবর দিল। রাজারাম তৎকালে আসিয়া সেই দ্রব্যাদির সহিত সাধুকে ধরিল। অপর অপর ব্যক্তি সেই সাধুকে মারিতে লাগিল। এবং বলিল যে ইহাকে পুলিষে দেও। রাজারাম বলিল তোমরা ইহাকে মারিও না এবং পুলিষে দিও না। শিবনারায়ণ স্বামি আমার পুলিস। তাঁহার কাছে লইয়া চল। পরে সকলে শিবনারায়ণের কাছে তাহাকে লইয়া আসিল এবং সকল অবস্থা বলিল। শিবনারায়ণ বলিলেন যে রাজারাম তুমি এই সকল দ্রব্য আমাকে সুখভোগের জন্য দিয়াছিলে। কিন্তু এই ব্যক্তি আপনার সুখের জন্য চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। কি করিবে, উহার অপরাধ মাপ করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দাও। কিন্তু দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যকে যদি দণ্ড না দেওয়া যায় তাহা হইলে এই প্রকৃতির অপর অপর

ব্যক্তির ভয় হয় না এবং উক্তরূপ ব্যবহার কার্য্য চলে না। আর উত্তম ব্যক্তিকে দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা কষ্ট দেয়। এই জন্য দুষ্ট স্বভাব দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে শাসন করা কর্ত্তব্য। একজনকে শাসন করিলে দশজনে দেখিয়া উত্তম পথে চলিবে। ইহাতে সকলের উপকার হয়। কিন্তু আমার কাছে যখন ইহাকে আনিয়াছ তখন ইহাকে ছাড়িয়া দাও। রাজারাম এমন জ্ঞানবান এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে তিনি সেই চোরকে ছাড়িয়া দিলেন। এবং মুদিকে পাঁচ টাকা দিয়া সেই সকল দ্রব্য ছাড়াইয়া লইলেন। পরে শিবনারায়ণ বলিলেন আমি এখান হইতে গমন করিব। এই সকল দ্রব্যাদি তুমি আপন বাটিতে লইয়া রাখিয়া দেও। যদ্যপি কোন মহাত্মার অভাব হয় তাহা হইলে তাহাকে দান করিও। রাজারাম শিবনারায়ণকে বলিলেন আপনি কোন্ দেশে যাইবেন, আমি আপনাকে যাতায়াতের রেলভাড়া দিব। আপনি পুনরায় অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দর্শন দিবেন। শিবনারায়ণ বলিলেন আমি সিন্ধুদেশে যাইব। তোমার রেল ভাড়া দিতে হইবে না। আমি দেশের অবস্থা দেখিতে দেখিতে পদব্রজে চলিয়া যাইব। রাজারাম শুনিলেন না। সিন্ধুদেশে ডুড়িশঙ্কর পর্য্যন্ত টিকিট করিয়া দিলেন। এবং দুইটা মোহর কাগজেতে মুড়িয়া শিবনারায়ণের হস্তে এই বলিয়া দিলেন যে আপনার অন্য সাধুর ন্যায় কোন ভেক নাই, আপনাকে কেহ চিনিতে পারে না। আপনার কাছে ইহা থাকিলে আপনার যে সময় যে বস্তুর প্রয়োজন হইবে সেই সময় ইহা ভাঙ্গাইয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। শিবনারায়ণ বলিলেন যে হে রাজারাম! বুঝিয়া দেখ সাধু মহাত্মাদের টাকা পয়সার প্রয়োজন কি? আমাদের কন্যা পুত্রের কি বিবাহ দিতে হইবে যে টাকা পয়সা লইতে হইবে এবং রাখিতে হইবে। টাকা পয়সা গৃহস্থদিগের সঞ্চয় করিয়া রাখা চাই, কারণ টাকা পয়সা বিনা গৃহস্থ ধর্ম্মের কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। সাধু মহাত্মাগণের টাকা পয়সা লওয়া উচিত নয়। এবং গৃহস্থদেরও সাধুকে তাহা দেওয়া উচিত নয়। যিনি যথার্থ সাধু মহাত্মা, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তর্যামি যাহার ধন, তাহার এ মিথ্যা ধনে প্রয়োজন কি? তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য কেবল মাত্র এক মুষ্টি অন্নের প্রয়োজন। আর উলঙ্গ অবস্থা নিবারণার্থ সামান্য বস্ত্রের প্রয়োজন। তিনি যেখানে যান গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে অন্ন বস্ত্র প্রস্তুত আছে। যে সময় যাহা প্রয়োজন হইবে সেই সময়ে অন্তর্য্যামি স্বয়ংই মনুষ্যের দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দিবেন। যদ্যপি পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস থাকে, অন্তরে যদ্যপি তৃষ্ণা না থাকে, যদ্যপি কোন কারণবশত টাকার ও প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সেই দেশে টাকাও মিলিবে। অতএব তুমি এই মোহর লইয়া যাও, এবং উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি কিনিয়া বাড়িতে আপনারা সপরিবারে খাও এবং ক্ষুধার্ত্তদিগকে দান কর। এইরূপে শিবনারায়ণ মোহর ফিরাইয়া দিয়া রেলে চাপিয়া সিন্ধুদেশে চলিয়া যাইলেন। সিন্ধুদেশে দুই চারি দিন ভ্রমণ করিয়া তথাকার অবস্থা দেখিয়া পুনরায় পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিলেন। পঞ্জাবে আসিয়া পাতিওয়ালা ও নাভা হইয়া দিল্লি চলিয়া গেলেন। দিল্লি হইতে গোয়ালিয়ার রাজবাটিতে উপস্থিত হইলেন। পরে রাজাদিগের অবস্থা দেখিয়া ভরতপুরে এবং কারালিতে, অনন্তর কারালি হইতে জয়পুর রাজবাটিতে

যাইলেন। সেখানে ও অপর অপর রাজাদের ন্যায় তাহাদের অবস্থা দেখিয়া, সেখান হইতে বিকানির মাড়োয়ার রাজ্যে যাইলেন। বিকানির হইয়া, যোধপুর রাজবাটিতে উপস্থিত হইলেন। যোধপুরে রাজার অধীনস্থ একজন জমীদার ছিলেন। সেই জমীদার জোধপুরের রাজাকে কর দিতেন, কিন্তু সেই জমীদার রাজাকে কয়েক বৎসর হইতে কর দিতে পারেন নাই, কোন কারণ বশতঃ জমীদার বলিতেন, যে আমার কাছে টাকা উপস্থিত হইলেই আপনাকে দিব। রাজা বলিলেন, আমাকে টাকা দাও আমি শুনিব না।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

হিমানী। লেখকের নাম অপ্রকাশিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে স্ত্রীবিয়োগে স্বামীর শোকোতপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রাণের সজীব জ্বলন্ত ভাষায় সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। "শোকের কশাঘাতে" বিরহীর "হৃদয় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, প্রাণের উৎসাহের আগুন নিবিয়া গিয়াছে" কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস-নয়ন বিস্ফারিত হইয়াছে। তিনি দেখিতেছেন "মৃত্যু স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এক বিবাহের বাঁধন। ইহ পরলোক দুইই ভগবানের রাজ্য—এত বড় দুই রাজ্যে মৃত্যু এক সম্বন্ধ বাঁধিয়া দেয়, স্বর্গ মর্ত্ত্যকে প্রেমের ডোরে বাঁধে।" তাহার নিকট স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, তার প্রিয় সামগ্রী কেমন যতনে সেখানে রক্ষিত, সে আনন্দলোকে জননীর প্রেম কোলে বসে তাঁরি হাতে প্রেমের অন্ন মুখে দিতেছে। তিনি প্রেমময়ের প্রেমমুখের বাণী শুনিতেছেন "তোমার ফুল স্বর্গের বাগানে ফুটিয়া থাকিবে, সে তোমারই থাকিবে, তুমি হেথায় থাকিয়া তার সুবাস পাইবে। সে তোমাদের কাছে স্বর্গের বারতা পাঠাইবে। "বাস্তবিক" তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ "এই মহা মন্ত্র সাধনে বিরহীর শোক তাপ শান্তি ও নির্ভরে পরিণত হইয়াছে। তিনি নির্ব্বেদ সহকারে বলিতেছেন "মা যখন প্রেম ভরে তাঁর ধন নিজ কোলে তুলে লন— তুমি আমি কে যে তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিতে চাব?"

শ্মশান-ভস্ম। লেখকের নাম অপ্রকাশিত। পৌরাণিক আখ্যায়িকা সামান্য ঘটনা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া লেখক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানিতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কতিপয় মূল তত্ত্বের ভাব প্রকটিত করিয়াছেন। প্রস্তাব গুলিতে আধ্যাত্মিক দর্শন ও লেখার পারিপাট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত ১৮১১ শকের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্ব স্ব দেয় মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে ১৮১২ শকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এবং যাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল গত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া ১৮১২ শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

৫৬৩ সংখ্যা। — ১৮১২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীৎনান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রেম।

"ঘুমায় সরসী বক্ষে নলিনী যেমন,
প্রেম জলধিতে আত্মা জুড়ায় তেমন।"

প্রেম কি? প্রেম কি বুঝান যায় না, অনুভব করা যায়। মধু যিনি পান করিয়াছেন, তিনিই জানেন মধু কি রূপ। প্রেম স্বর্গের ভাষা। আমরা উহার অনুবাদ করিতে অসমর্থ। দেবগণই উহা জানেন এবং বুঝেন। বিজ্ঞানের ছুরিকা প্রেমের রহস্য ভেদ করিতে অক্ষম।

জ্ঞান স্বর্গের আলোক। বিশুদ্ধ প্রেম স্বর্গের সিঁড়ি। জ্ঞান পথ দেখাইয়া দেয়। প্রেমই সেই পথ। জ্ঞান অম্ল। প্রেম রস। জ্ঞান স্বামী। প্রীতি পাত্রী। জ্ঞান বৃক্ষ। প্রেম পুষ্প। কল্পনা প্রীতির সখি। ভক্তি তাহার দুহিতা। প্রেম দেবতাদের অমৃত। জ্ঞান আত্মার শোভা। প্রেম উহার সৌরভ।

প্রেম-বিজ্ঞান অতীব বিচিত্র। রাসায়নিক বস্তু সমষ্টির মিলনে যেমন নয়নরঞ্জন নৈসর্গিক ব্যাপার দেখা যায়, দুইটী প্রাণের একীকরণেও, সেইরূপ, অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শোভা পরিদৃষ্ট হয়। একটী হৃদয় অন্য আর এক হৃদয়ে ঢালিয়া দিলে, সৌরভ, সৌন্দর্য্য ও আলোকময় এক মিশ্র-জীবন প্রস্তুত হয়। প্রেম-রসায়নে মিশ্রণেই সুখ, সৌরভ উৎপন্ন হয়; বিচ্ছেদ, অমিশ্রণের সময়েই অসুখ দুর্গন্ধ জন্মায়।

তারা যেমন তারার পানে ছুটে, তেমনি একটী হৃদয় অন্যের পানে ছুটে, একটী প্রাণ আর একটী প্রাণের দিকে ধাবিত হয়, ইহাই প্রেম। প্রেম অন্য কিছুই চাহে না, অন্য কিছুই ভালবাসে না, কেবল যাহাকে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়াছে তাহাকেই চাহে, তাহারই সঙ্গকে সর্ব্বাপেক্ষা অমৃতোৎসারী মনে করে।

প্রেমের অভিধানে "আমি, আমার," এ সকল কথা নাই, কেবল "তুমি ও তোমার" বই আর কিছুই খুজিয়া পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ কোথায়? প্রেমে। প্রেম আত্মার "অহং" নষ্ট করে। প্রেমের রাজ্যে আত্মা নিজেকে হারাইয়া ফেলে। প্রেম অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া বিনয় আনিয়া দেয়, এবং কপটতা নষ্ট করিয়া সরলতা আনিয়া দেয়। কোনরূপ ব্যবধান রহিলে

যেমন দুইটী রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণ হয় না, তেমনি কপটতা, দূর দূর ভাব রহিলে দুইটী হৃদয়ের পূর্ণ মিলন এবং সংমিশ্রণ, Dovetail union and fusion of heart, হয় না।

টাকা কড়ি সংসারের ধন। প্রেম স্বর্গের ধন। উহা অমূল্য। পৃথিবীর প্রজা রাজাকে ধনরত্ন কর দেয়। স্বর্গের প্রজা বিশ্বরাজকে প্রেম কর দেন। স্বর্গরাজ্যে যে যত বড় প্রজা, তাঁহাকে ততই অধিক প্রেম-ধন কর দিতে হয়। যে যত দেয়, সে ততোধিক পায়। প্রথমে যাহার এই ধন অল্পই ছিল, সে কর দিতে দিতে ধনবান হইয়া উঠে।

বারিবিন্দুর মধ্যে যেমন রামধনু থাকে, কিন্তু উহা সূর্য্যকিরণ-সম্ভূত, সূর্য্যকিরণেরই এক অবস্থান্তর মাত্র; সেইরূপ, ভগবানেরই প্রেম মানব হৃদয়ে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, আত্মীয় স্বজনের প্রেমরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া উহা তাহাদেরই প্রেম বলিয়া অনুমিত হয়। সূর্য্যকিরণ যেমন সপ্তধা হইয়া ইন্দ্রধনুতে শোভা পায়, তেমনি ঈশ্বরেরই প্রেম বাৎসল্যাদি বিবিধ বর্ণে মানব হৃদয়-ফলকে প্রতিফলিত হইয়া শোভা পায়। বহুরূপী যেমন প্রাতে হরিৎ, সায়ংকালে রক্তাদি বর্ণ ধারণ করে, লীলারসময় হরিই, তদ্রূপ, কখনও প্রেমরূপিণী জননী হইয়া আমাদিগকে স্নেহ-চুম্বনে ভাসাইতেছেন, আবার কখনও বা ভগিনী হইয়া বাল্যকালে আমাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। এবং তাঁহারই প্রেম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর আকারে আত্মারঙ্গভূমে অভিনয় করিতেছে। সূর্য্যকিরণ যেমন প্রতিফলিত হইয়া নিষ্প্রভ চন্দ্রকেও আভাময় করে, তেমনি জগদীশ্বরেরই প্রতিফলিত প্রেম শুষ্ক ও মলিন মানব হৃদয়কে সৌন্দর্য্যে ভাসাইয়া দেয়।

প্রেমিক "দেউলে।" তাঁহার আর নিজের কিছুই নাই। তাঁহার যাহা কিছু ছিল সকলই তিনি দিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে আর তোমার আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। তাঁহার শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা, ধন, জন, সকলই যে তাঁহার প্রিয়তমের! তিনি সকল বস্তুতেই প্রিয়জনকে দেখেন ও স্মরণ করেন। তিনিই কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিতে পারেন। তোমার আমার সে অধিকার কোথায়?

প্রেমিক কবি। তাঁহার মন আদর্শ পবিত্রতা, পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ভাবে পূর্ণ। তিনি সদাই সৌন্দর্য্যের আকাশে উঠিয়া কল্পনা-বায়ুর সাহায্যে অনন্তের পানে ছুটিয়া যান। প্রেমিকের হৃদয় আদি-কবিবিরচিত একটী সুন্দর কবিতা। তাঁহার চিন্তা, তাঁহার জীবন কবিত্ব-মাখা।

বৃক্ষলতা পুষ্পিত হইলে যেমন সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে জগৎকে মুগ্ধ করে, সেইরূপ, মানব হৃদয় পুষ্পিত হইলে প্রেমের সৌন্দর্য্যেও সৌরভে জগৎ বিমোহিত হয়।

পুষ্পকে পদদলিত করিলেও সে যেমন সৌরভ ঢালিতে বিরত হয় না, তেমনি প্রেমিক যতই কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করুন না, তিনি কিছুতেই বিরক্ত হয়েন না, বরং পদদলিত পুষ্পের ন্যায় অধিকতর প্রেম-সৌরভ ঢালিতে থাকেন। প্রেমের ধৈর্য্য, ক্ষমা এবং সহিষ্ণুতা হ্রাস পাইবার নহে।

বৃক্ষলতার ফুল ফল নিষ্ঠুর রূপে ছিড়িয়া লও, কিন্তু আবার উপযুক্ত সময় আসিলেই সে তোমাকে পত্র পুষ্প ফলে সজ্জিত "ডালি" দিয়া তোমার প্রতি তাহার গভীর প্রেম জানাইবে; সেইরূপ,

প্রেমিকের প্রাণে তুমি যতই কঠিন আঘাত কর, সুযোগ পাইলেই আবার তিনি সব কথা ভুলিয়া তোমার প্রতি তাঁহার অচল ও গভীর প্রেমের পরিচয় দিবেন।

নদী সমূহ যেমন গুপ্ত উৎস হইতে জন্মায় এবং পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু উৎসকে কেহই দেখিতে পায় না, জন-সমাজে তেমনি সুখ ও মঙ্গলের স্রোত বহে, তাহার উৎস, জন্মভূমি কেহ দেখিতে পায় না। প্রেমিক স্বাভাবিক লজ্জা ও বিনয়বশতঃ নিজের প্রেম কাহাকেও দেখান না, বরং মৃত্তিকার নিম্নস্থ উৎসের ন্যায় উহা লুকাইয়া রাখেন। অবগুণ্ঠনবর্তীর ন্যায় লজ্জার আবরণে প্রেমিক নিজ হৃদয়কে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন।

জড়ীয় আকর্ষণী শক্তি এক তারাকে অন্যের সহিত বিনা সূতায় গাঁথিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। প্রেম এক হৃদয়কে অন্যের সহিত অদৃশ্য রজ্জুতে বাঁধিয়া আমাদিগকে সংসারে দাঁড়াইবার স্থান দিয়াছে। সংসার টিকিত না, যদি এই প্রেম না রহিত। মনুষ্য পশু অপেক্ষাও হিংস্র জীব হইত, যদি প্রেমবারি মানব হৃদয়রূপ মরুভূমির কতকটুকু স্থানকে বৃক্ষলতার শ্যামল স্নেহ দ্বারা সজ্জিত করিয়া নয়ন মনের তৃপ্তি সাধন না করিত। শিশুর জন্য মায়ের প্রাণের টান্ আছে, তাই সমাজ আছে, মানুষ মানুষ আছে। রোগ শোকের জ্বালাতে জীব ছট্‌ফট্ করিয়া মরিত, যদি প্রেমের সুধাময় শান্তি-সলিল সব দাহ জ্বালা ধুইয়া না দিত। প্রেম দুঃখ ক্লেশকে ভাগ করে, সুখ সম্পদকে গুণ করে।

প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তি আছে। যে মৃত, প্রেম তাহাকে জীবন দেয়; যে নির্জীব, দুর্ব্বল, প্রেম তাহাকে সজীব, সবল করিয়া তুলে। প্রেম আলস্য জড়তা নষ্ট করিয়া জীবকে পরিশ্রমী এবং কর্ম্মশীল করে। কর্ম্ম ও সেবা বিহীন প্রেম ভাবুকতা মাত্র। উহা হৃদয়ের এক প্রকার বিলাসিতা। যেখানে প্রেম সেইখানেই কর্ম্ম, জীবন। যেখানে কর্ম্ম, জীবন, সেইখানেই প্রেম। যেখানে প্রেম সেইখানেই মধুরতা। যে কার্য্যে, যে ব্যাঞ্জনে প্রেমের মশ্‌লা পড়িয়াছে উহা কতই স্বাদু! যেখানে প্রেম-মশ্‌লার অভাব সেইখানেই কটুতা।

প্রেম মানুষকে ঐশ্বরিক বলে বলীয়ান করে। মহর্ষি ঈশার ভাষাতে বলিতে গেলে, "এক সার্ষপ-বীজ পরিমাণ প্রেম থাকিলে, পর্ব্বতকে যদি বল "সরিয়া যাও," সে সরিয়া যাইবে।" প্রেমের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে, বাধাপ্রাপ্ত নদী স্রোতের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে উহা নিজ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইবেই হইবে।

প্রেমের অঙ্কশাস্ত্রও স্বতন্ত্র। একে একে মিলিয়া, দুই না হইয়া, একই হয়: বহু যুক্ত হইয়া একেই পরিণত হয়।

প্রেমিক পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন না, তাঁহার চক্ষু ভবিষ্যতের দিকে। অতীত যেরূপই হউক না কেন, উজ্জ্বল ভবিষ্য আকাশ তাঁহার চক্ষের অগ্রে বিস্তৃত। নিরাশা যে কি, প্রেমিক তাহা কখন জানেন কি না সন্দেহ, অবিশ্বাসের মেঘ কখনও তাঁহার হৃদয়াকাশে জড় হয় না। তাঁহার হৃদয় মন আশাতে পরিপূর্ণ।

প্রেমের কাছে দুঃখ সুখ, ক্লেশ আরাম। প্রেমিক মরিয়া বাঁচেন। তিনি মৃত্যুর মধ্যে জীবন দেখিতে পান। তুমি আমি মৃত্যুকে কালসর্প জ্ঞানে ভয় করি; প্রেমিক তাহাকে কণ্ঠের প্রিয় হার করেন।

প্রেমের নয়নে ধন রত্ন লোষ্ট্রবৎ; আবার পুষ্পের একটী শুষ্ক পাবড়ী, একবিন্দু অশ্রু-কণাই অমূল্য। প্রেম আঁধারের আলোক, গ্রীষ্মের ছাতি, শীতের আতপ।

প্রেম অনন্তের দ্বার। প্রেমবিন্দুর মধ্যে প্রবেশ কর, অনন্তের ছায়া দেখিতে পাইবে।

প্রেম অন্ধ। প্রেমিক তাঁহার প্রিয়-জনের দোষ বা ক্রুটি দেখিতে পান না। প্রেমের অনুবীক্ষণ দিয়া যাহাই কিছু দেখ না, উহা বড়ই মনোহর দেখাইবে। প্রেম ছোটকে বড় করে, লাল কালো সকল বর্ণকেই একবর্ণ করে। প্রেম ভেদাভেদ ঘুচাইয়া শ্বেতকায় কৃষ্ণবর্ণকে এক করে। ছোট বড়, শ্বেত কৃষ্ণ, ধনী নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞান, এই সকল কথা অপ্রেমের অভি-ধানেই মিলে।

প্রেম নিঃস্বার্থ। প্রেমের রাজ্যে স্বার্থ-পরতার দুর্গন্ধ নাই। এক অন্যকে দিতে চায়, অন্যের নিকট হইতে কিছুই লইতে চাহে না। প্রেম নিজের যাহা কিছু আছে অন্যকে দিয়াই সুখী, দিতে পারিলেই সুখী। প্রেম কিছুরই প্রত্যাশা করে না। প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম পাইলেও সে সুখী।

প্রেমরাজ্য চিরপূর্ণিমা, চিরবসন্ত, চিরযৌবন, চিরনূতনের দেশ। প্রেমের হাটে পুরাতন জিনিস মিলে না। পুরা-তন সামগ্রী সংসারের হাটেই মিলে। প্রেমিকের চক্ষে প্রিয়জন চিরনূতন আন-ন্দের উৎস, "Ever-new delight."

প্রেম অজর, অমর। উহার জরা মৃত্যু নাই। প্রেমে তরঙ্গ নাই, চঞ্চলতা নাই। উহা প্রশান্ত, গম্ভীর, নিস্তরঙ্গ অমৃত-সিন্ধু। যে প্রেম কখন আছে, কখনও নাই, এই রূপ জুয়ার ভাটার মত আসে যায়, যাহা চঞ্চল, তাহা প্রেম নামেরই যোগ্য নহে। যথার্থ প্রেম অতল গভীর, স্থির সৌদামিনী, অবাত কম্পিত দীপশিখা।

দেবতারা এত পুষ্প-প্রিয় কেন? না, পুষ্প প্রেমেরই জড়ীয় বিকাশ বলিয়া। "Flowers are lovely; Love is flowerlike." প্রেম আত্মা-তরুর পারিজাত কুসুম।

প্রেম স্বর্গ মর্ত্ত্যের মধ্যেসেতু,যোজক। প্রেম "অন্ত" হইতে নিঃসৃত হইয়া অনন্তকে ছুটিয়া ধরে, অনন্তকেও দ্রব করিয়া দেয়। "অন্তের" প্রেমের ফাঁদে অনন্তও ধরা পড়েন। এতদ্দেশীয় লোক-দের বিশ্বাস যে, প্রেমোন্মত্ত মহাদেবের প্রেম-সঙ্গীতে ভবেশও গলিয়া গিয়া-ছিলেন, এবং তাহাতেই দ্রবময়ী গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছিল। প্রেম "অন্তকে" অনন্তের সঙ্গে মিলাইয়া দেয়। "অন্ত" অনন্তকে বলেন "তুমি আমার, আমি তোমার।"

বৃত্তের কিয়দংশ দাও, অঙ্ক-বিশারদ উহা হইতেই সমগ্র বৃত্ত বাহির করিবেন; তেমনি প্রেমিককে অপূর্ণ বস্তু দাও, তিনি তাহাকে পূর্ণ করিবেন, তাহাতে যাহা কিছু অভাব আছে, তাহা তিনি নিজ কল্পনা দ্বারা যোগাইবেন।

তুমি আমি জগৎকে যে চক্ষে দেখি, প্রেমিক সে চক্ষে, সে ভাবে দেখেন না। তাঁহার নিকট সমস্ত জগৎ সুন্দর। তাঁহার হৃদয়ের শোভা পৌর্ণমাসীর চন্দ্র-কিরণের ন্যায় জগতের মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রেমিক কুষ্ঠ-রোগীর মধ্যে কি দেখেন তিনিই জানেন। তিনি তাহাকে "প্রিয়দর্শন" বলিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন। আমরা যাহাকে কদর্য্য মনে করি, প্রেম তাহার রূপ রাশিতে বিমোহিত হয়।

প্রেমের জলে পাষাণ জলে। প্রেম পাষাণকেও পুষ্প-কোমল করে। ঘোর-তুর দস্যু, ভয়ানক নৃশংস জন্তুগণও প্রেমের পুষ্প-শৃঙ্খলে বাঁধা। যদি বারিতে কমল ডুবিতেছে, এবং শিলা ভাসিতেছে দেখিতে চাও, যদি মেষ সিংহ এক ঘাটে পিপাসার শান্তি করিতেছে দেখিতে চাও, তবে, সংসারক্ষেত্র হইতে নয়ন ফিরাইয়া যেখানে প্রেমের উৎস খুলিয়া প্রেমের তরঙ্গ উঠিতেছে সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর।

প্রেম দূরত্বাপহারী। উহার গতি বিদ্যুতাপেক্ষাও দ্রুত। প্রেমের মাপে বহু যোজন অতি নিকট। প্রেমের কাছে, আবার, এক হস্তই শত যোজন। প্রেমের চক্ষে এক মুহূর্ত্তই এক যুগ; আবার বিংশতি বৎসরও এক মুহূর্ত্ত।

জল দিয়া যেমন জল বাহির করা যায়, তেমনি প্রাণ দিয়া প্রাণ টানিয়া আনা যায়।

নীরবই প্রেমের বাগ্মিতা। একটী হৃদয়ের বাগ্মিতায় শত শত লোক মুগ্ধ ও বশীভূত হয়। একটী হৃদয়ের প্রেম সহস্র সহস্র হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। একজন চৈতন্য, একজন হাফেজ অসংখ্য নরনারীকে প্রেমোন্মত্ত করিয়াছিলেন।

বিদ্যুৎ যেমন এক শরীর হইতে শরীরান্তরে যায়, প্রেমও তেমনি হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে স্পর্শমাত্রেই তাড়িত বেগে ছুটিয়া যায়। দুইটী আত্মা মিলিবামাত্র প্রেম-বিদ্যুৎ হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটাছুটি করিয়া কি সব স্বর্গের সংবাদ দেয় কে বলিতে পারে?

প্রেম কণ্ঠস্বরকে সঙ্গীতাপেক্ষা সুমধুর করে, দেহকেও প্রফুল্ল এবং দিব্য-সৌন্দর্য্য-মাখা করে। প্রেমই সঙ্গীতের জন্মদাতা। প্রেম হইতেই কবিতা প্রসূত হইয়াছে এবং ভাষা প্রেম হইতেই পুষ্টি, লালিত্য, সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে।

বারি যেমন সর্ব্বস্থানেই সেই আকাশেরই জল, প্রেমও, তদ্রূপ, সকল স্থানেই সেই স্বর্গেরই মন্দাকিনী। স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেও, তিনি সেই পতিত-পাবনী জাহ্নবীই থাকেন। মেঘের জল যেমন হিমালয়ের উপর পড়িলে স্বচ্ছ ও পবিত্র আকার ধারণ করে, কিন্তু নগরের নর্দ্দামায় পড়িলে পঙ্কিল হয়, তেমনি, এই স্বর্গীয় প্রেম আধারভেদে নির্ম্মল সমল, স্বাস্থ্যকর অস্বাস্থ্যকর হয়। পবিত্রতার প্রস্রবণের উপর পড়িলে এই প্রেমের স্রোত শত শত নরনারীর পক্ষে তৃপ্তির উৎস হয়; কিন্তু সংসারের ধূলার উপর পড়িলে উহা মলিন হইয়া পড়ে, এবং জনসমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তি নষ্ট করে। সমল জলে সূর্য্যালোক পড়িলে যেমন উহা তত হানিকর হয় না, সেইরূপ নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি প্রেমের উপর ধর্ম্মের জ্যোতি পড়িলে উহা বিকৃত হইয়া যাইতে পায় না। স্বার্থরঞ্জিত প্রেম প্রেমের কলুষিত অবস্থা মাত্র। রূপজ মোহ আরও নিকৃষ্ট জাতীয়। উহা মনুষ্যকে পশু অপেক্ষাও জঘন্য করে। এইরূপ মোহকে প্রেম বলিলে প্রেমের মহত্ত্বের লাঘব করা হয়।

প্রেমের বীজ পরিবারের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখা দ্বারা জগৎকে ছাইয়া ফেলে! সমুদ্রে এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তরঙ্গমালা যেমন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, মানব হৃদয়ের প্রেমও সেইরূপ, ক্রমে ক্রমে অল্প হইতে অধিক স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। অনেকে মনে করেন যে নিজ পুত্র কন্যা, বা স্বামী স্ত্রীর প্রতি অধিক প্রেম হইলে মানুষ

সঙ্কীর্ণমনা হইয়া পড়ে, জগৎ আর তাহার প্রেম পায় না; কিন্তু কূপ যেমন বারিপূর্ণ হইলে উথলিয়া উঠে এবং উহার জল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ মানুষ প্রথমে একজনকে যথার্থ রূপে ভালবাসিতে শিখিলে পর,তাহার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ প্রেম উথলিয়া জগৎময় ছড়াইয়া পড়ে, এবং উদার বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়। এই রূপে প্রেমের গতি ক্রমেই অনন্তের দিকে, মহাসিন্ধুর দিকে ছুটে, এবং অবশেষে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস না করিয়া ছাড়ে না।

পৃথিবীর বস্তুতে আমরা কোন দিব্য সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না। কিন্তু কিয়ৎকাল চন্দ্রের দিকে চাহিয়া তাহার পর কোন বস্তু দেখিলে উহা, যেমন, পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মনোহর দেখায় এবং অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে স্নাত বলিয়া বোধ হয়; সেইরূপ, পার্থিব বস্তুর প্রতি প্রেম অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ না হইলেও, এবং "মায়া, মোহ" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইলেও, উহার গতি যদি পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হয়, তবে ভগবৎ-প্রেম-প্রসূত পার্থিব প্রেম এক অভিনব অলৌকিক আভাতে পূর্ণ হয়। ঈশ্বর-প্রেমিক যে সংসারের উপর বিরক্ত তাহা নহে; তিনি সংসারকে পবিত্র নয়নে দেখেন, এবং উহা তাঁহার প্রিয়তমেরই বলিয়া সংসারকে বড়ই ভালবাসেন।

জ্যোতি যেমন অন্ধকারের মহাশত্রু, ঈশ্বর-প্রেম তেমনি অসত্য ও পাপের মহা বিরোধী। হৃদয়-কুটীর মধ্যে যতই প্রেমের আলোক প্রবেশ করে, ততই পাপের অন্ধকার দূরীভূত হয়। হৃদয় কুটীরের একটী মাত্র গবাক্ষ খুলিয়া রাখিলে, রিপুদল পলাইবার পথ পায় না।

এক দিবস আমার একটী বন্ধু শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন যে "হে আর্য্য! পাপের সহিত সংগ্রামে ত ছট্‌ফট্ করিতেছি। এখন নিরাপদ স্থল কোথায় বলুন।" পূজ্যপাদ মহর্ষি উত্তর করিলেন "প্রেমে। প্রেমই একমাত্র নিরাপদ স্থল। আমাদের সঙ্গীতে আছে,—

> "প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।
> শুভ্র সত্য স্বরূপ সুন্দর নাহি উপমা তাঁর।
> যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়-ভার;
> সর্ব্ব সম্পদ তাহে মিলে থাকিলে তাঁর সাথ।"

তাপ, অর্থাৎ পাপ।"

একটি মাত্র প্রেম-স্ফুলিঙ্গ আত্মাতে লাগিলেই রাশি রাশি পাপ নিমেষ মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

প্রেম আত্মার চক্ষু কর্ণ ফুটাইয়া দেয়, বিশ্বাস-চক্ষুকে খুলিয়া দেয়, জ্ঞান-দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়া দেয়। অন্যে যাহা শুনিতে পায় না, সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতের অমৃত-লহরী প্রেমিকের শ্রবণবিবরকে পরিপূরিত করে। অন্যে যেখানে কিছু দেখিতে পায় না,প্রেম সেখানে,কি কথা কে জানে, পড়িতে পায়।

ঈশ্বর-প্রেমিকের কাছে জগতের প্রত্যেক পদার্থই সেই প্রেম-জলধির এক একটী ক্ষুদ্র ঢেউ। মানব চক্ষু যেমন প্রেমের কাহিনী শুনায়, প্রেমিকের নিকট তেমনি ত্রিভুবন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রেম কীর্ত্তন করে। স্বচ্ছ কাঁচ নির্ম্মিত দীপ মধ্য হইতে যেমন জ্যোতি বাহির হয়, প্রেমের চক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ড, সেইরূপ স্বচ্ছ; প্রেমিক উহার মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রেমের জ্যোতি দেখিতে পান। তিনিই "ফুটন্ত ফুলের মাঝে লুকান মায়ের হাসি" দেখিতে পান।

ঈশ্বর-প্রেমিক ঐশ্বরিক ভাবে পূর্ণ।

তিনি শান্ত, নিশ্চিন্ত, ভাবনাশূন্য। তাঁহার ধন এমন "ব্যাঙ্কে" সঞ্চিত, যাহা কখনই "দেউলে" পড়ে না। এক বিন্দু চক্ষের জল, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস-রূপ "চেক্" পাঠাইলেই তাঁহার সকল অভাব মোচন হয়, সকল দুঃখ দূরে যায়।

ঈশ্বর-প্রেমিক কিছুরই ভয়ে ভীত হয়েন না, কারণ সকলই তাঁহার প্রিয়তমের হস্তে। তিনি মৃত্যুর মধ্যে কেবল মায়ের বীণানিন্দিত মধুমাখা ডাক শুনিতে পান, মায়ের দিব্য-জ্যোৎস্নাময় সহাস্য আনন দেখিতে পান। কেবল তিনিই বুঝিয়াছেন যে পরমাত্মা রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু, আনন্দরূপমমৃতং।

চাতক ঘোর পিপাসাতুর হইলেও যেমন সে পৃথিবীর সমুদ্র-পূর্ণ বারি স্পর্শ করে না, একবার চাহিয়াও দেখে না, তাহাতে তাহার তৃপ্তি হইবার নহে, সে কেবল "ফটিক্ জল! ফটিক্ জল!!" করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া মেঘেরই নিকট হইতে এক বিন্দু বারি চাহে এবং তাহাতেই তৃপ্তি ও শান্তি পায়; সেইরূপ, প্রেমিক সংসার-সমুদ্রের তীরে থাকিলেও, সংসারের বারিতে তাঁহার তৃপ্তি হয় না বলিয়া তিনি তাহার পানে চাহিয়াও দেখেন না, তাহা স্পর্শও করেন না, কেবল "এক বিন্দু প্রেম! এক বিন্দু প্রেম!!" বলিয়া চিদাকাশে উঠিয়া সদাই সতৃষ্ণ নয়নে প্রেমময়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন। এক বিন্দু প্রেম পাইলেই তিনি সুখী, তৃপ্ত। প্রেমিক মুক্তিও চাহেন না, তিনি কেবল মুক্তিদাতাকেই চাহেন।

প্রেমিক হাফেজই বলিতে পারেন "শেষ বিচারের দিন সকলেই পুণ্যের ছালা লইয়া ভারাবনত মস্তকে বিচারকের নিকট যাইবে, কিন্তু আমি কেবল আমার প্রিয়তমের "তশবীরই" বগলে করিয়া বিচারকের নিকট উপস্থিত হইব।"

আতপতাপে তাপিত বসোরাতেই যেমন গোলাপরাজ সম্যকে শোভা পান, সেইরূপ, বিপন্ন ও দুঃখ-পীড়িত হৃদয়েই প্রেম অধিক শোভা পায় এবং সৌরভ ঢালে। বহ্নিতে দগ্ধ না হইলে যেমন গন্ধদ্রব্যের প্রকৃত সৌরভ বাহির হয় না, পুষ্পাকুলকে পেষণ না করিলে যেমন তাহা হইতে আতর গোলাব পাওয়া যায় না, তেমনি, পরীক্ষারূপ অনলে না পুড়িলে, বিপৎ-ভারে নিষ্পেষিত না হইলে প্রেম হইতে প্রকৃত সুসৌরভ বিনির্গত হয় না। অন্ধকারের মধ্যে হীরক যেমন অধিকতর উজ্জ্বলতা লাভ করে, দুঃখ বিপদের সময়ে প্রেমও তেমনি অধিক দীপ্তি ও শোভা লাভ করে।

জনশূন্য চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের শিরোভাগে যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যাননিরত শুভ্রকেশ ঋষি ব্রহ্ম-দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন বটে, কিন্তু পৃথিবীর শিখরদেশ হইতে, জ্ঞানের রাজ্য হইতে অবতরণ করিয়া, প্রেমের দেশে আসিয়া, উত্তপ্ত পুষ্পোদ্যানের বুল্‌বুল্ হইয়া, প্রেমকূজন দ্বারা সদ্ভাবকুসুমকলিকাগুলিকে প্রস্ফুটিত করিতে না পারিলে ব্রহ্মরসপান করা যায় না, সেই প্রেমঘন সচ্চিদানন্দ পুরুষকে উপভোগ করিতে পারা যায় না।

পূজনীয় শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্য মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে একদিবস বলিয়াছিলেন "বহিরাকাশ ভগবানের সদর। অন্তরাকাশ তাঁহার অন্দর। অন্দরে "বেরানা" বা বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে কেবল প্রেমের লোক প্রবেশ করিতে পায়। সেই হৃদয়-গুহাই তাঁহার "খাশ্ দর্‌বার।" প্রেমিকের হৃদয়ই তাঁ-

হার "কায়েম্ মোকাম্।" আর্শ বা সপ্তম স্বর্গের জ্ঞানেতে উজ্জ্বল এবং ধর্ম্মেতে উন্নত দেবতাগণও ব্রহ্মের সন্দর্শন লাভে বঞ্চিত, কিন্তু যে প্রেমিক নিজ হৃদয় নিকুঞ্জ-বনকে প্রিয়তমের আগমনের জন্য পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাকে তথায় দর্শন করিয়া ধন্য এবং কৃতার্থ হয়েন। যিনি প্রেমধনে ধনী, "তস্য তুচ্ছং সকলং।" প্রেমিকের হৃদয় পরমেশ্বরের প্রিয় বাসস্থান।

"প্রেমস্থ যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে,
সকলং হস্ততলং।"

মনুষ্যের কি অপূর্ব্ব অধিকার! প্রেমের কি মহীয়সী শক্তি! প্রেমের ডোরে প্রকাণ্ড, অনন্ত, অপরিসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে ক্ষুদ্র মানবের হৃদয়রূপ পর্ণকুটীরে ভরিয়া বাঁধিয়া রাখা যায়! নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথে এক একবার অগণ্য-তারকামণ্ডিত অপূর্ব্বশোভাময় অনন্ত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি, ও এক একবার নিজের ক্ষুদ্র, মলিন হৃদয়ের পানে চাহিয়া দেখি, এবং এই মহৎ অধিকারের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কোথায় কোন্ রাজ্যে চলিয়া যাই। অবশেষে চিত্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া ফিরিয়া আইসে। দিবাভাগে সংসারের ধূলা লইয়া ভুলিয়া থাকি, কিন্তু যখনই মুক্ত নৈশ গগনের দিকে নয়ন ফিরাই, তখনই কোটিকণ্ঠে তারকা-সমাজ বিস্মৃতি ও অমনোযোগের জন্য আমাদিগকে তিরস্কার করে, এবং মানব জীবনের এই উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ অধিকারের বিষয় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আজিও তাহারা একবাক্যে বলিতেছে "যদি জীবন চাও, তবে আত্মার মেলায় প্রেমের ব্যাপার করিতে আইস। এখানে স্বয়ং পরব্রহ্মের সহিত কারবার্ হয়। একটা ক্ষুদ্র, ভাঙ্গা, মলিন হৃদয়ের বিনিময়ে অনন্ত প্রেম, সুখ এবং অমৃত পাইবে।" আজিও আমাদের অবশ প্রাণ জাগিতেছে না, মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না। ঐ! উহারা আমাদের তাচ্ছিল্য এবং অবহেলাতে লজ্জিত হইয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া একখানা প্রকাণ্ড মেঘের অন্তরালে মুখ লুকাইল। উহাদের সঙ্গে আমাদের প্রাণের টান্ আছে, তাই উহারা দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়াও প্রত্যহই আমাদের হিত-কামনা এবং মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে। তাহারা সমস্ত রাত্রি শিশির বিন্দুর ছলে আমাদের দুর্ম্মতির জন্য শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করে। কিন্তু আমাদের আত্মা চিরদিন বধির, মোহ-নিদ্রায় অভিভূত।

সহস্র সহস্র জ্ঞানবান পণ্ডিত এবং ধনবান রাজাধিরাজ জলবুদ্বুদের ন্যায় কাল-সমুদ্রের বক্ষে উদয় হইতেছে এবং নিমেষ মধ্যে কোথায় পুনরায় মিলাইয়া যাইতেছে; সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ তাহাদিগকে অতীতের গুহায় লইয়া যাইয়া বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকাতে আবৃত করিতেছে। জগৎ তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইতেছে। কিন্তু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে একজন প্রেমিক নবদ্বীপ বা বেথেলহামে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন বলিয়া আজিও অগণ্য নরনারীর হৃদয়ে কতই প্রেমের তরঙ্গ উঠিতেছে! এক মহাত্মা প্রেম-সমুদ্রে ঝম্ফ প্রদান করিলেন, অমনি জনসমাজে তাহার ঢেউ উঠিল। উহা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতে লাগিল—আজিও পর্য্যন্ত তাহার বেগে মানব সমাজ তোল্পাড়্ হইতেছে। যত দিন মানুষ দেবত্বের আদর করিবে, তত দিন ইহাঁদের স্মৃতি জ্বলন্ত অক্ষরে মানব সমাজের বক্ষে অঙ্কিত রহিবে।

জ্ঞান মানুষকে মহত্ত্ব দিয়াছে। প্রেম,

স্বার্থত্যাগ, আত্মোৎসর্গ তাহাকে দেবত্ব দিয়াছে, এবং দৈববলে বলীয়ান করিয়াছে। যেখানে প্রেম, সেইখানেই স্বর্গ। যেখানে অপ্রেম, সেইখানেই নরক। যেখানে প্রেম, সেইখানেই এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান। যেখানেই তাহার অভাব, সেইখানেই সয়তানের রাজত্ব এবং এই সকল লক্ষণের অভাব।

কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ দেখিলে কে বলিতে পারে যে উহা হইতে সুগন্ধী সুকোমল গোলাপ জন্মিবে? সৃষ্টির সময় যখন এই পৃথিবী গলিত ধাতুপুঞ্জ ছিল, এবং যখন হিমালয় হইতেও বৃহৎ বৃহৎ এক একটা গলিত ধাতুস্ফুলিঙ্গ তাড়িত বেগে শত যোজন উর্দ্ধে উঠিতেছিল এবং নামিতেছিল, সেই সময়কার সদ্যজাত পৃথিবীর ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া কে আশা করিতে পারিত যে ধরণী আবার বৃক্ষ-লতায় ভূষিত হইয়া এই শান্ত এবং মনোহর বেশ ধারণ করিবে? অমাবশ্যার ঘন অন্ধকার দেখিয়া কে ভাবিবে যে সেই ভয়ঙ্কর তমসাচ্ছন্ন আকাশ আবার চন্দ্রের হাসিতে ভাসিয়া যাইবে? অথচ দেখ, প্রেমময়ের গুণে এ সকলিই সম্ভব হইয়াছে। অতএব, আমাদের হৃদয় কণ্টকময় হইলেও, ভয়ানক রিপুর আবর্ত্ত এবং অশান্তির স্থল হইলেও, আমাদের অন্তরাকাশ ঘনতমসাচ্ছন্ন হইলেও, আমরা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি, যে একদিন না একদিন প্রেমময়ের করুণাতে আমাদের এই হৃদয়েই প্রেমের গোলাপ প্রস্ফুটিত হইবে, শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হইবে, এবং চিরপূর্ণিমা রাজত্ব করিবে।

বনফুল।

দ্বিতীয় গুচ্ছ।

(১)

১। আত্মার নির্জ্জন কুটীরে প্রবেশ না করিলে, যথার্থ বেদ পাঠ করা যায় না। আত্মার মধ্যে স্বয়ং জীবন-বেদ উন্মুক্ত রহিয়াছেন। সেখানে তাঁহাকে না পাঠ করিলে আর কোথাও পাঠ করা যায় না। আত্মার মধ্যেই দর্শন শাস্ত্র পাঠ কর, কেবল দর্শন শাস্ত্র পড়িয়া তাঁহাকে দর্শন করা যায় না।

২। আমাদের প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাসের এখন বড়ই "টানাটানি"। তুমি যদি এই হৃদয় কুটীরে বাস করিতে চাও, তবে নিজ ব্যয়ে উহা "মেরামৎ" করাইয়া সাজাইয়া লও।

৩। আমাদের মনকে রবারের গদির মত করিতে হইবে। উহাতে যতই কেন নৈরাশ্য এবং দুশ্চিন্তার ভার পড়ুক্ না, যেন অচিরেই উহা পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবিচলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৪। সপ্তমবর্ষীয়া বালিকার পক্ষে যৌবন, বিবাহ ও মাতৃ অবস্থার কথা সর্ব্বদা বলা যেমন অনধিকারচর্চ্চা মাত্র, আমাদের পক্ষেও তেমনি সর্ব্বদা বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তির উচ্চ উচ্চ কথা বলা "জ্যাঠামী" বা অনধিকারচর্চ্চা মাত্র।

৫। পারস্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে গুলেস্তাঁ বা পুষ্পোদ্যানে বুল্‌বুল্ পক্ষী উষাকালে প্রেমসঙ্গীত না শুনাইলে অভিমানিনী গোলাপ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে না। সেইরূপ স্বয়ং পরমাত্মা বুল্‌বুল্ হইয়া হৃদয়কাননে প্রেমকূজন না করিলে, মোহ আবরণ উন্মোচিত হয় না, প্রাণ খুলে না, আত্মা ফুটিয়া তাহার শোভা ও সৌরভ বাহির হয় না। উষার কিরণ পদ্মিনীকে চুম্বন না করিলে কখনও কি সে

বিকসিত হয়? হাজার জ্ঞানের বাতি জ্বাল, বা বৈজ্ঞানিক আলোক লাগাও কিছুতেই কিছু হইবে না, কিছুতেই আত্মা-কুসুম ফুটিবে না।

৬। জ্ঞান আত্মার শোভা, প্রেম উহার সৌরভ। প্রেমবারি-স্পর্শে বিকসিত আত্মা-পুষ্পকে যতই নিষ্পেষিত করিবে ততই উহার সৌরভ ও আতর গোলাব্ বাহির হইবে।

৭। শৌণ্ডিক যেমন মদিরা বিক্রয় করে, এবং অন্যকেই মাতোয়ারা করে, কিন্তু স্বয়ং কখন এক বিন্দুও সুরাপান করে না, আমরাও তেমনি ধর্ম্মের দোকানে সর্ব্বদাই রহিয়াছি, এবং হরিরসমদিরার কথা বলিতেছি, কিন্তু ভ্রমেও কখন এক বিন্দু প্রেমসুরা পান করিয়া "বেহুঁশ" হই না। কার্য্যতঃ, আমরা সুরাপান-নিবারিণী সভা গড়িতে বসিয়াছি।

৮। বালিকা যেমন বাল্যকালে চপলতা পূর্ণ থাকে, ও দৌড়াদৌড়ি করিয়া এবং পুতুল লইয়া খেলাইয়া বেড়ায়; কিন্তু যৌবনোদ্গমে স্বামীর সহিত পরিচয় হইলেই তাহার চপলতা ঘুচিয়া গাম্ভীর্য্য দেখা দেয়, তাহার খেলা ধূলা চিরদিনের মত ফুরায়, সে সংযতবসনা হইয়া স্বামীকে লইয়া স্বামীর সেবায় ও সহবাসেই ব্যস্ত থাকে; সেইরূপ,যতদিন হৃদয়নাথের সহিত মানুষের পরিচয় না হয়,ততদিনই চঞ্চলতা, লাফালাফি থাকে ও সে সংসারের ধূলা লইয়া ক্রীড়া করে; কিন্তু এক মুহূর্ত্ত তাঁহার সহিত দেখা হইলে সব খেলাধূলা দূরে যায়, জীবনের চঞ্চলতা ঘুচিয়া যায়, মানুষ হস্তপদ গুঁটাইয়া লজ্জার আবরণে নিজেকে নির্ল্লজ্জ সংসারের অপবিত্র কটাক্ষ হইতে আচ্ছাদন করিয়া, মধুপানোন্মত্ত ভ্রমরের ন্যায় নীরবে, নিজ স্বামীর সেবা ও সহবাসে চিরজীবনের জন্য অনুরক্ত হয়।

৯। ভাঙ্গা ঘরেই ভূতের কার্‌খানা। যদি হৃদয়ে সাধু চিন্তা ও সাধু ভাব না থাকে, তবে অসাধু চিন্তা ও ভাব তোমার হৃদয় মনকে অধিকার করিবেই করিবে। হৃদয় মন কখনই শূন্য থাকিতে পারে না, কারণ "Nature abhors a vacuum" অর্থাৎ প্রকৃতি শূন্যতার বিরোধী।

১০। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে যেমন দেখা যায় যে একটী নদী বহুদূর বহিয়া অবশেষে এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল, আর উহার কিছুই দেখা গেল না, আধ্যাত্মিক দৃশ্যও ঠিক্ ঐরূপ। বহুদিন ধরিয়া জীবন-স্রোত পাপের বাঁকা পথ দিয়া বহিয়া অবশেষে ভবিষ্যতের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিলে আর উহার কিছুই দেখা যায় না। আমরা অদূরদর্শিতা বশতঃ হতাশ হইয়া পড়ি। কিন্তু নদী যেমন পর্ব্বতাদি অশেষ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে সাগরের পানে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইয়া, অবশেষে অতল সিন্ধুজলে মিশাইয়া শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করেই করে, আমরাও যদি অতীতের দুঃখময় স্মৃতিকে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইয়া, আশাতে বুক বাঁধিয়া এক লক্ষ্যে তাঁহারি পানে ধাবিত হই, তবে অবশেষে নিশ্চয়ই সেই শান্তির সাগরে যাইয়া প্রাণ জুড়াইবই জুড়াইব। সর্ব্বদেশীয় আধ্যাত্মিক ভূগোল ইহাই শিক্ষা দিতেছে।

চিন্ময় সৌন্দর্য্যের স্তোত্র।

(ইংরাজী কবি শেলী হইতে অনুবাদিত।)

একটি অদৃশ্য শক্তির স্তম্ভিতকারী ছায়া অদৃশ্যভাবে আমাদিগের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। বসন্ত সমীরণ যেমন পুষ্প হইতে

পুষ্পে গুড়ি মারিয়া যায় সেইরূপ চঞ্চল পক্ষের সহিত এই বিচিত্র জগৎকে সেই শক্তি দর্শন দেন। দেবদারুময় পর্ব্বতের পিছনে যেমন চন্দ্ররশ্মি দেখা দেয়, তাহার ন্যায় কিম্বা প্রদোষ সময়ের বর্ণও সুশব্দের ন্যায়, অথবা চন্দ্রশূন্য কেবল তারকরশ্মি দ্বারা ম্লানভাবে উজ্জ্বলিত আকাশে যেমন মেঘ ইতঃস্তত বিস্তৃত থাকে তাহার ন্যায় কিম্বা শ্রুত সঙ্গীতের স্মৃতির ন্যায় কিম্বা যে কোন বস্তু সৌন্দর্য্য জন্য, সৌন্দর্য্য অপেক্ষা নিগূঢ়ত্ব জন্য, প্রিয় তাহার ন্যায় ঐ শক্তি চঞ্চল। অপাঙ্গ ইঙ্গিতের ন্যায় প্রত্যেক মানব হৃদয়ে ও প্রত্যেক মানব মুখ-শ্রীতে তিনি দেখা দেন। সুন্দরাত্মা! তুমি যে মানব মনের ভাবকে ও মানব মূর্ত্তিকে আলোক প্রদান কর, তাহাকে তোমার শোভন বর্ণ দ্বারা তুমি একবারে পবিত্র কর, এমন যে তুমি, তুমি আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলাইলে? তুমি এইরূপে পলায়ন করিয়া এই অশ্রুময় ম্লান বিস্তৃত উপত্যকারূপ জীবনকে কেন নির্জ্জন ও আনন্দশূন্য কর? এই প্রশ্ন করাও যেমন এই সকল প্রশ্ন করাও তেমন যে সূর্য্যরশ্মি ঐ পার্ব্বত্য স্রোতের উপর কেন চিরকাল শোভন ইন্দ্রধনু রচনা না করে? কেন যে বস্তু একবার দেখা দেয় তাহা মলিন ও ক্ষয়িত হয়? কেন এই ভূমণ্ডলের দিবালোকের উপর ভয় ও দুঃস্বপ্ন ও জন্ম মৃত্যু বিষাদান্ধকার নিক্ষেপ করে? কেন মনুষ্য রাগ দ্বেষ আশা ভরসার এত অধীন? মর্ত্ত্যলোক অপেক্ষা উচ্চতর লোক হইতে জ্ঞানী অথবা কবিকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর কখন প্রদত্ত হয় নাই। এই সকল বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহাদিগের যত্ন যে নিষ্ফল তাহা "দেব" "উপদেব" এই সকল শব্দ প্রতিপন্ন করিতেছে। এই সকল শব্দ ক্ষীণ মন্ত্র, তাহাদের প্রভাব দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য পদার্থ হইতে সংশয়, হঠত্ব ও নশ্বরত্ব পৃথক্ করিতে পারে না। পর্ব্বতের উপরিস্থ কুজ্ঝটিকা-তাড়নাকারী আলোকের ন্যায় কিম্বা কোন বাদ্য যন্ত্রের তার-মধ্যে নৈশ সমীরণের সঞ্চরণ দ্বারা উদ্ভাবিত সঙ্গীতের ন্যায় কিম্বা গভীর নিশীথ সময়ে কোন স্রোতস্বতীর উপর ভাসমান চন্দ্রালোকের ন্যায় কেবল তোমারি জ্যোতি জীবনরূপ উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্নকে শ্রী সৌন্দর্য্য ও সত্যতা প্রদান করে। প্রেম,আশা ও আত্মমর্য্যাদাবোধ এই সকল সুখজনক পদার্থ মেঘের ন্যায় যায় ও আইসে; তাহারা কতিপয় অনিশ্চিত মুহূর্ত্ত জন্য মনুষ্যকে ঋণ-স্বরূপ প্রদত্ত হয়। তুমি যেরূপ অনির্ব্বচনীয় ও স্তম্ভিতকারী পদার্থ তোমার শোভন অনুচরবৃন্দের সহিত যদি মানব মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা রাখিতে তাহা হইলে মনুষ্য অমৃত ও সর্ব্বশক্তিমান হইত। যে সকল কোমল ভাব প্রেমিকের চক্ষে বৃদ্ধি ও ক্ষয় পায় তাহার দূত স্বরূপ তুমি। অন্ধকার যেমন হ্রসমান দীপশিখার পুষ্টিস্বরূপ তেমনি তুমি মানব চিন্তার পুষ্টিস্বরূপ। তোমার ছায়া যেমন আইল তেমনি চলিয়া গেল এমন যেন না হয়। যাহাতে মৃত্যু জীবন ও ভয়ের ন্যায় একটি অন্ধকারময় সত্য না হয় এই জন্য প্রার্থনা করিতেছি যে আমাদিগকে ফেলিয়া তুমি কখন পলাইও না। যখন আমি বালক ছিলাম তখন অপচ্ছায়ার অন্বেষণে বাহির হইতাম এবং মৃতদিগের সহিত উচ্চ কথোপকথন করিবার জন্য সভয় পদনিক্ষেপে প্রকোষ্ঠ, গুহা ও ভগ্নাবশেষ মধ্য দিয়া দ্রুতরূপে গমন করিতাম। উপধর্ম্মোক্ত নাম সকল যাহা আমাদিগের যৌবনের আহার সেই সকল নাম উচ্চৈঃ-

স্বরে ডাকিতাম কিন্তু কোন উত্তর পাইতাম না। আমি তাহাদিগকে শুনিতে পাইতাম না ও দেখিতে পাইতাম না এমন সময়ে সেই মধুর কালে যখন বসন্ত সমীরণ সকল জীবিত বস্তুকে প্রণয়ভাষণ করে এবং সেই সকল বস্তু জাগ্রত হইয়া পক্ষী ও মুকুলের সুবার্ত্তা আনয়ন করে সেই সময়ে যখন মানব জীবন বিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলাম তখন হঠাৎ যখন তোমার ছায়া আমার আত্মার উপর পতিত হয় তখন আমি চিৎকার করিয়া উঠি এবং আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া করযোড় হই। আমি সেই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আমি তোমাকে এবং তোমার যাহা তাহাকে আমার সমস্ত ক্ষমতা উৎসর্গ করিব। সে প্রতিজ্ঞা কি আমি রক্ষা করি নাই? স্পন্দনশীল হৃদয়ে এবং অশ্রুময় চক্ষে আমি এক্ষণে বিগত সহস্র হোরা সকলকে তাহাদিগের বিশুদ্ধ সমাধি মন্দির হইতে আহ্বান করিতেছি। তাহারা আমার সহিত প্রেমানন্দ ও অধ্যয়নোৎসাহের সুকল্পনাপূর্ণ নিকুঞ্জে বসিয়া ঈর্ষান্বিত রজনী জাগরণে অতীত করিয়াছিল। সেই সকল হোরা অবগত আছে যে এমন আনন্দ আমার ভ্রূদ্বয়কে কখন উজ্জ্বল করে নাই যাহার সহিত এই আশা সংযুক্ত না ছিল যে তুমি এই পৃথিবীকে কখন না কখন অন্ধকারময় ক্রীতদাসত্ব হইতে বিমুক্ত করিবে এবং হে স্তম্ভিতকারী লালিত্য! তাহাকে এমন জিনিস দিবে যাহা বাক্যেতে প্রকাশিত হয় না। যখন মধ্যাহ্নকাল বিগত হয় তখন দিবস আরো গম্ভীর ও প্রশান্ত হইয়া আইসে। শরৎকালে এমন সঙ্গীত আছে এবং তাহার আকাশে এমন জ্যোতি আছে যাহা নিদাঘে শুনা যায় না অথবা দেখা যায় না, উহা এমন জিনিষ যেন তাহা কখন হইতে পারে না অথবা হয় নাই। তোমার শক্তি যাহা প্রকৃতির সত্যের ন্যায় আমার প্রবণ নবযৌবনের উপর অবতরণ করিয়াছিল তাহা এক্ষণে জীবন অবসান সময়ে তোমার ও তোমার সকল সুন্দর বস্তুর এই উপাসকের বাহ্য জীবনকে শান্তি প্রদান করুক। সুন্দরাত্মা! সেই উপাসক তোমাকে ও সকল মনুষ্যকে তোমার মোহন মন্ত্র দ্বারা প্রীতি করিতে বাধ্য।

অরূপীর রূপ।

ঈশ্বর অরূপী অশরীরী। তিনি নাম রূপের অতীত। "স্ব মহিম্নি" তিনি তাঁহার মহিমার মধ্যে বিরাজিত। উপরে অনন্ত কোটি নক্ষত্রলোক, নিম্নে ভূলোক, ইহার মধ্যে তিনি ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন। এই অসীম ভূমণ্ডলের মধ্যে এমন স্থান নাই যেখানে তিনি নাই। কিন্তু অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কারণরূপে যখন আমরা পরমেশ্বরকে দেখি, তখন আমরা তাঁহাতে এক উচ্চতর মহত্তর সত্তা দেখিতে পাই। এই সমস্ত জগত তাঁহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। তিনি তাঁহার মহিমার মধ্যে বিরাজিত থাকিলেও তিনি ও তাঁহার মহিমা একপদার্থ নহে। তিনি তাহাদিগেরও অতীত। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সর্ব্বব্যাপী ভুবঃ স্পর্শাদত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম।

বিষ্ণুপুরণ। ১২অ, ৫৮।

তাঁহার অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত পদ, তিনি সর্ব্বব্যাপী, আকাশ স্পর্শ করিয়াও দশ অঙ্গুলি স্থান অধিক হইয়া স্থিতি করিতেছেন। এই শ্লোক শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার একত্রিংশ

অধ্যায়ের ১ম কণ্ডিকার অবিকল অনুরূপ বলিলেও ক্ষতি হয় না। "সর্ব্বব্যাপী ভুবঃ স্পর্শাৎ" ইহার স্থানে "স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা" আছে, ইহাতে অর্থগত নিতান্ত অধিক তারতম্য নাই। তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া পাছে আমরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রভেদ ভুলিয়া যাই, এই জন্য ঈদৃশ শ্লোকের অবতারণা। তিনি সৃষ্টির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াও উহা অপেক্ষা অতিরিক্ত হইয়া রহিয়াছেন। "সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি" তিনি সকলকে আবৃত করিয়া স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অনন্ত উদার ক্রোড়ে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্থান পাইয়াছে, তিনি সকলকে রক্ষা করিতেছেন।

জগৎ একভাবে যেমন তাঁহা হইতে ভিন্ন, তিনি যেমন সকলের রক্ষাকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতা, তেমনি আর একভাবে জগৎ তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাঁহার অধিষ্ঠানেই ইহার প্রতিষ্ঠা। জগতের সৃষ্টিকৌশল যতই আমরা আলোচনা করি ততই তাঁহার মঙ্গলভাব, তাঁহার প্রীতির ভাব চতুর্দ্দিকে বিকশিত দেখি। তিনি মনুষ্যের জন্য ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল দিলেন, পশু পক্ষীর জন্য তরু লতাগুল্মকে ফলভরে অবনত করিয়া দিলেন, ওষধি বনস্পতির জন্ম-বৃদ্ধির জন্য জল বায়ু রৌদ্র ও মৃত্তিকাকে তাহার উপযোগী করিলেন, উত্তাপের জন্য সূর্য্যকে আকাশে স্থাপিত করিলেন, বায়ু ও বৃষ্টিকে নিয়মিত করিবার জন্য ধরাপৃষ্ঠকে তাহার উপযুক্ত করিলেন ও সূর্য্যের সহিত তাহাদের চিরসম্বন্ধ আবদ্ধ করিয়া দিলেন, সৃষ্ট তাবৎ পদার্থকে জীব জন্তুর সুখ শান্তি সাধনের ও অরাম লাভের অনুরূপ করিলেন। এবং মাতার ন্যায় সৃষ্টির মূলে রহিলেন, এবং সকলের অভাব মোচনে তৎপর থাকিলেন।

পরমার্থজ্ঞানী সাধু পুরুষেরা অন্তরে বাহিরে সেই অনাদিমৎ পরমেশ্বরের সত্তা অবলোকন করেন। তাঁহাদের আত্মা দিব্য আলোকে জ্যোতিষ্মান, তাঁহাদের চর্ম্মচক্ষু দিব্যবলে তেজীয়ান। জড় কি জীব তাবতের মধ্যে কেবল তাঁহাকেই তাঁহারা অনুসন্ধান করেন। অক্ষুণ্ণ ভৌতিক নিয়মে আবদ্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারদের সমক্ষে দিব্যভাবে বিরাজ করিতে থাকে। তাঁহারা ঈশ্বরকে এই সৃষ্টির মধ্যে এমনই ওতপ্রোতভাবে দেখেন, তাঁহাদের প্রীতিবিস্ফারিত নয়ন এই জড়ের মধ্যে এমনই সজীবতা দেখিতে পায় যে তাঁহারা ইহাকে ঈশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি না বলিয়া থাকিতে পারেন না। যাঁহারা তাঁহাকে আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ, মনের মন বলিয়া জানেন আবার তাঁহারাই বলিয়া উঠেন যে "চন্দ্রমা ইহাঁর মন, সূর্য্য ইহাঁর চক্ষু, অগ্নি ইহাঁর মুখ, অন্তরীক্ষ ইহাঁর নাভি, দ্যুলোক ইহাঁর মস্তক, ভূমি ইহাঁর পদ, দিক্ সকল ইহাঁর শ্রোত্র। এইরূপে সমস্ত সৃষ্টিকেই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি রূপে কল্পনা করেন। ইহাই শুক্লযজুর্ব্বেদোক্ত মাধ্যন্দিনী শাখার বিরাট মূর্ত্তি।

উপনিষদেও এই বিরাট মূর্ত্তির প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। ইহা এমনই প্রাণস্পর্শী যে বাস্তবিক ইহা পাঠে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। "অগ্নির্মূর্দ্ধা, অগ্নি ইহাঁর মস্তক, চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু, দিশঃ শ্রোত্রে, দিক সকল ইহাঁর কর্ণ, বাক্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ, বেদ ইহাঁর বাক্য, পদ্‌ভ্যাং পৃথিবী, পৃথিবী ইহাঁর পদ হৃদয়ং বিশ্বমস্য,বিশ্ব ইহাঁর হৃদয়। অরূপীর

এইরূপ বিরাট মূর্ত্তি আলোচনায় এক ভক্ত কহিয়াছিলেন এই সুপ্রকাণ্ড পৃথিবী যাহার উপর আমি সপ্তবিতস্তিপরিমিত দেহে দাঁড়াইয়া আছি ইহা তোমার নিকট একটি ক্ষুদ্র রেণু; এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য রেণু তোমার রোমবিবর রূপ গবাক্ষ দিয়া অনবরত যাতায়াত করিতেছে, আমি ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর হইয়া সেই তোমার মহিমা কি বুঝিব! (ভাগবত ১০ স্কন্ধ।)

কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণের বিরাট মূর্ত্তি যারপর নাই সুদীর্ঘ, ইহাতেও বেদমন্ত্রের ছায়া দেখি। ধর্ম্মপরায়ণ রাম কর্ত্তৃক নিহত কবন্ধ অগ্নিদগ্ধ হইলে যখন তাহা হইতে কন্দর্পসদৃশ পরমসুন্দর এক পুরুষ নির্গত হন তখন তিনি রামের স্তুতিস্থলে তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্মরূপে যে বর্ণনা করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল। তিনি বলেন "তুমি সকলেরই মুক্তিদাতা, এই সমস্ত লোক তোমার বিরাট মূর্ত্তিতে বাস করিতেছে; পাতাল ঐ দেহের পাদদেশে, মহীতল তোমার পার্ষ্ণিদেশে, রসাতল গুল্‌ফদ্বয়ে, তলাতল উহার অধোভাগে, সুতল জানুদ্বয়ে, বিতল উরুদেশে, পৃথিবী জঘন দেশে ও আকাশ নাভিদেশে, তোমার উরু স্থলে স্বর্গলোক, গ্রীবায় মহর্লোক। তোমার মুখমণ্ডলে জনলোক, ললাটে তপলোক, মস্তকে সত্যলোক। ইন্দ্রাদি লোকবাসিগণ তোমার হস্তে বাস করিতেছেন; দিক্ তোমার কর্ণ, মুখ অগ্নি, তোমার চক্ষুদ্বয় সূর্য্য, মন চন্দ্র। তোমার ভ্রূভঙ্গীতে কাল, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, অহঙ্কারে রুদ্র, বাক্যে অক্ষয় ছন্দ অর্থাৎ বেদ, দশনমূলে যম, দন্তে নক্ষত্রগণ বাস করিতেছে। তোমার যে হাস্য তাহা মোহকারী মায়া, সৃষ্টি তোমার অপাঙ্গমোক্ষণ। তোমার সম্মুখে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠভাগে অধর্ম্ম, চক্ষুর পলকে দিবারাত্রি। সপ্ত-সমুদ্র তোমার কুক্ষিদেশে, তোমার নাড়ী সকল নদী, তোমার গাত্রের রোম সকল বৃক্ষৌষধী, রেত সকল বৃষ্টি, তোমার মহিমা জ্ঞানশক্তি; তোমার ঐরূপ স্থূলদেহে যাঁহারা মন সমাধান করেন, তাঁহারদের অনায়াসেই মুক্তি হয়। তোমার বিরাটমূর্ত্তি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই।" (আরণ্যকাণ্ড নবম অধ্যায়।)

সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে কল্পনা করাই বিরাটমূর্ত্তি কল্পনার অপর নাম। বিরাটমূর্ত্তি কল্পনায় ঈশ্বরকে ব্যাপক ভাবে দেখা হয়; অসীম চরাচর সুপ্রকাণ্ড হইলেও তাহারা প্রত্যেকে ঈশ্বরের কল্পিত এক এক ক্ষুদ্র অবয়ব মাত্র, এরূপ কল্পনায় হৃদয়ের প্রীতিভাব আরও জাগ্রত হইয়া উঠে। তিনি যে ক্ষুদ্র নহেন কিন্তু "মহতোমহীয়ান" আমরা তাহাই ইহাতে জাগ্রত দেখি। অনন্ত সৃষ্টিও তাঁহার নিকটে ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর এই ভাব হৃদয় মধ্যে পরিস্ফুট হয়। এবং ইহাতে হৃদয় বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে।

ঋষিরা বৈদিক কালে যেরূপ বিরাটমূর্ত্তি কল্পনা করিতেন, ভাগবতেও তাহারই পরিচয় পাই, অধ্যাত্ম রামায়ণে তাহাই দেখি, ও ইহার গাম্ভীর্য্যে আমরা স্তব্ধ হইয়া যাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আপনার যে বিরাট মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে অর্জ্জুন যার পর নাই বিস্মিত ও ভীত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন সখে তুমি এই দুর্নিরীক্ষ্য মূর্ত্তি উপসংহার করিয়া লও। আমি কোনও রূপে উহা দেখিতে সমর্থ হইতেছি না। ফলতঃ ঋষিরা ব্রহ্মকে অরূপী অশরীরী বলিয়া জানিলেও এই যে বিরাট মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন ইহা

দ্বারা তিনি যে মহতেঃ মহীয়ান তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। বেদাদি শাস্ত্রে ঈশ্বরের মহান ভাবের পরিচয় দিবার নিমিত্তই এই বিরাটরূপের কল্পনা। ইহাতে ব্রহ্ম যে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড ও অসীম আকাশ হইতেও উচ্চ তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, ফলতঃ ব্রহ্মের অনন্তত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া বিস্ময় সহকৃত ভক্তির উদ্রেক করা এবং স্রষ্টা যে সৃষ্ট হইতে অতিরিক্ত তাহা প্রতিপাদন করা এই কল্পনার উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্ত্তী কোন কোন গ্রন্থে শক্তি ও শক্তি-মানের অভেদ স্বীকার করিয়া ভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি কল্পনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতির দিব্য স্ত্রীমূর্ত্তি। আপাত দৃষ্টিতে বোধ হইবে ব্রহ্মের ব্যাপক ভাবকে নিতান্ত ব্যাপ্যে আনয়ন করা হইয়াছে কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। আমরা এস্থলে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ লইলাম। ইহার অধ্যায়িকা ভাগে এইরূপ আছে "পুরাকালে ইন্দ্র ও মহিষাসুরের বহুকালব্যাপী এক মহাযুদ্ধ হয়। তাহাতে ইন্দ্র দেব অন্যান্য দেবমণ্ডলীর সহিত সসৈন্যে বার বার পরাভূত হন। ইন্দ্রপ্রমুখ পরাজিত দেবগণ ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া পরাজয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন এবং যাহাতে দেবমণ্ডলী এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পান তাহার জন্য বিশিষ্টরূপে অনুরোধ করেন। এই সংবাদে বিষ্ণু ও রুদ্র যার পর নাই কুপিত হইলেন। তাঁহারদের দেহ হইতে সুমহৎ তেজ বিনির্গত হইতে লাগিল। সেই তেজ অন্যান্য দেবশরীর-বিনির্গত তেজের সহিত একতা লাভ করিয়া নারীরূপে পরিণত হইল। এই মহাশক্তিরূপা নারীকে মহাদেব স্বীয় ভীষণ শূল অর্পণ করিলেন, বিষ্ণু স্বীয় চক্র দিলেন, বরুণ শঙ্খ, হুতাশন শক্তি, মরুৎ বাণপূর্ণ তূণীর ও ধনুক, ইন্দ্র স্বীয় কুলিশ ও ঐরাবৎ হস্তী হইতে এক সুপ্রকাণ্ড ঘণ্টা, যমরাজ স্বীয় কালদণ্ড, অম্বুনাথ স্বীয় নাগপাশ, প্রজাপতি অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, দিবাকর সেই কামিনীশরীরের প্রত্যেক রোমকূপে স্বকীয় প্রখর তেজ, কাল অত্যুৎকৃষ্ট নির্ম্মল অসিচর্ম্ম প্রদান করিলেন। ক্ষীরোদ পরমোৎকৃষ্ট অঙ্গাভরণ পরিধেয় কণ্ঠে হার মস্তকে মণিখচিত মুকুট, কর্ণে দিব্য-কুণ্ডল, হস্তে বলয়, ললাটে দীপ্তিমান অর্দ্ধচন্দ্র ইত্যাদি অলঙ্কার প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মল পরশু দিলেন, সমুদ্র তাঁহার বক্ষ ও মস্তক অম্লান কমল দ্বারা সুশোভিত করিলেন, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় নানা রত্নাদি সহ এক বাহক সিংহ, কুবের অক্ষয় মধুপূরিত দিব্য পানপাত্র, ভূধারী অনন্তাদি নাগগণ মণি মানিক্য ও পৃথিবী নাগহার সমর্পণ করিলেন। বিবিধ অলঙ্কার ও আয়ুধভূসিতা মহাশক্তি অট্টহাস শব্দে আকাশ ভেদ করিয়া সপ্তলোক বিচলিত করিলেন। ইহাই শারদীয় উৎসবের দেবী মূর্ত্তি। কিন্তু দেবীমাহাত্ম্যের এই অসুর-সংহারকারিণী মূর্ত্তিকে পাছে লোক ব্যাপ্য ভাবে গ্রহণ করে এই আশঙ্কায় প্রকৃতির মধ্য হইতে যা কিছু ভীষণ যা কিছু রমণীয় এই মূর্ত্তিতে তৎ সমুদায়ের সমাবেশ করা হইয়াছে। এইরূপ ভীম ও কান্ত ভাবে অলঙ্কৃত মূর্ত্তির কল্পনায় ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে ইনিই আদ্যা প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি। ইহাতেও যদি স্থূলদর্শীদিগের ব্যাপ্যভাবের মোহ উপস্থিত হয় সেই জন্য মাহাত্ম্যের প্রারম্ভ ভাগে দেবীসূক্ত সংযোজিত হইয়াছে। ইহা কএকটী ঋক্ মন্ত্র প্রকৃতির

কার্য্যবাদে পূর্ণ। অর্থাৎ ইহা দ্বারা সহজেই বোধ হইবে শক্তি ও শক্তিমানকে অভেদে লইয়া অরূপীর কল্পিত রূপ প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু বেদাদির কল্পিত বিরাট মূর্ত্তিতে কেবল হৃদয়স্তব্ধকর বিস্ময়ের ভাব উপস্থিত হয় দেবীমাহাত্ম্যে তদ্রূপ নহে। ইহাতে ব্রহ্মের ব্যাপক ভাবে কেবলই দুর্নিরীক্ষ্যতা নাই। ইহা ভীম ও কান্ত উভয়ই। ফলতঃ ঈশ্বর যে মহতোমহীয়ান তাঁহা হইতে কেহই বৃহৎ নহে কেহই মহৎ নহে, শাস্ত্রোক্ত এই সমস্ত বিরাটমূর্ত্তিতে তাহাই দেখি। এইরূপ কবি কল্পনায় হৃদয় যারপর নাই উদার ভাব ধারণ করে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কবিত্বে কখন কখন সত্যের অপলাপ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বিরাটমূর্ত্তি কল্পনার ন্যায় সত্য ও স্বর্গীয় কবিত্বের এমন মিশ্রণ হিন্দুশাস্ত্র ব্যতীত আর বুঝি অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রের এইরূপ গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া শাস্ত্রবলেই অমূর্ত্তের মূর্ত্তি ও অপ্রাণের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব হইতে বহু দূরে। তাঁহাদের ভিত্তি-রচনা বালুকাস্তূপের উপর সুতরাং একান্তই অপ্রতিষ্ঠ।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়াতে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনভূমিতে আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহারা পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীসহ দ্বৈতকাননে বাস করিতেছেন। একদিন সন্ধ্যাকালে দ্রৌপদী ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, নাথ! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কি নিষ্ঠুর, আমাদিগকে রাজভ্রষ্ট ও বনচারী করিয়াও সে কিছুমাত্র অনুতাপিত হয় নাই, তুমি ধর্ম্মনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তোমাকে কঠোর বচন প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না। তুমি যখন মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া বহির্গত হইলে, তখন সমুদায় কুরুসন্তানই দুঃখাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু পাপাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন কিছু মাত্র দুঃখিত হয় নাই। তুমি রাজসভামধ্যে রাজন্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিতে, আর আজ তোমার চীরবসন ও তৃণশয্যা অবলোকন করিয়া আমি ব্যথিত হইতেছি। হা নাথ! পূর্ব্বে তুমি সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ যতি ব্রহ্মচারীগণকে সুবর্ণপাত্রে সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করাইয়াছ, আজ তুমি কি রূপে বন্য ফল মূল দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। হে রাজেন্দ্র! তুমি যে কখন দুঃখের মুখ দেখ নাই, কিরূপে এই বনবাস-ক্লেশ সহন করিবে, এই চিন্তা করিয়া আমি শোকে অভিভূত হইতেছি। তোমরা রাজপুত্র হইয়া বনবাসে দাসোচিত কার্য্য করিতেছ, দুর্য্যোধনই এই সমুদায় অনর্থের মূল, ইহাতেও কি তোমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় না? বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, মহাবল অর্জ্জুন, প্রিয়দর্শন শৌর্য্যশালী মাদ্রীকুমারদ্বয়, তোমার প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া নীরবে সমুদায় সহ্য করিতেছেন, আমি দ্রুপদরাজার কন্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ এবং তোমার ন্যায় ধর্ম্মাত্মার ধর্ম্মপত্নী হইয়াও বনবাসিনী হইলাম। তোমার ইন্দ্রতুল্য ভ্রাতৃগণকে শোকে মলিন দেখিয়াও যখন তোমার কিছু মাত্র ক্রোধোদয় হইতেছে না, তখন বুঝিলাম যে তোমার মনে ক্রোধের স্থান নাই। কার্য্যকালে বীরত্ব প্রকাশ করাই ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ, হা নাথ! ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় কোথায়? কার্য্যকালে অবশ্য ক্ষমা অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু এখন তেজ

প্রকাশেরই সময় উপস্থিত। ক্ষমা ও তেজ কোন্‌টি শ্রেয়স্কর, এই বিষয়ে পৌরাণিকেরা এক প্রাচীন কাহিনী বলিয়া থাকেন,আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

কোন সময়ে দানবরাজ বলি স্বীয় পিতামহ ধর্ম্মজ্ঞ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে তাত! ক্ষমা এবং তেজ এতদুভয় মধ্যে শ্রেয়স্কর কি এবিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অনুগ্রহ পুরঃসর তাহা অপনীত করুন। প্রহ্লাদ বলিলেন, হে বৎস! নিরবচ্ছিন্ন তেজ অবলম্বনে কদাচ শ্রেয়োলাভ হয় না এবং কেবল ক্ষমা আশ্রয় করিলেও শুভ লাভ হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত ক্ষমা অবলম্বন করেন, ভৃত্য উদাসীন ও শত্রুগণ তাঁহাকে অনায়াসেই পরাভব করে। ভৃত্যেরা ক্ষমাশীল প্রভুকে সমুচিত সম্মান করে না। ক্ষুদ্রাশয় হীনমতি লোকেরা নিরন্তর ক্ষমা লাভ করিয়া বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে। অপরাধীকে দণ্ড না দেওয়া অতীব অন্যায়। সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই কারণে নিরন্তর ক্ষমা অবলম্বন করেন না। ক্ষমাহীন ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিদিগেরও দোষ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রজোগুণসম্পন্ন ক্রোধী ব্যক্তি দোষী নির্দ্দোষ বিচার না করিয়া দণ্ড প্রদান করিয়া আত্মীয় বান্ধববর্গের কেবল বিরাগভাজন হইয়া থাকে। যিনি উপকারী ও শত্রুর প্রতি সমান তেজ প্রকাশ করেন, যিনি অন্যায় পূর্ব্বক ক্রোধভরে দণ্ডবিধান করেন, তিনি অচিরাৎ ধন মান প্রাণ ও আত্মীয় স্বজন হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন। সময় বিশেষে তেজস্বিতা ও সময় বিশেষে মৃদুভাব অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। যিনি যথাযোগ্য কালে তেজস্বী এবং যথা যোগ্য কালে ক্ষমাশীল মৃদুস্বভাব তিনিই ইহ প[illegible] অশেষ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। কোন্ অবস্থায় ক্ষমা অপরিত্যজ্য বলিতেছি শ্রবণ কর। যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে তোমার বহুতর উপকার করিয়া পরে অপরাধে পতিত হয়, তবে তাহাকে মার্জ্জনা করিয়া তাহার উপকার করাই কর্ত্তব্য। অজ্ঞানতা বশতঃ যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা বিধেয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক দোষ করিয়া যাহারা তাহার অপলাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়, অপরাধ লঘু হইলেও তাহাদিগকে ক্ষমা করা উচিত নহে। অপরাধ প্রথম হইলে সকলকেই ক্ষমা করিবে। হে বৎস! ক্ষমার এই সকল অবসর, ইহার বিপরীত হইলেই তেজ প্রকাশ করা বিধেয়।

দ্রৌপদী উক্ত উপাখ্যান সমাপন করিয়া বলিলেন, হে মহারাজ! আপনার শৌর্য্য প্রকাশের কাল উপস্থিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা লোভপরবশ হইয়া নিয়তই আমাদিগের অনিষ্ট করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে আর ক্ষমা করা কোন রূপেই বিধেয় নহে। উপযুক্ত অবসরে শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া ক্ষাত্র ধর্ম্ম রক্ষা করুন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কল্যাণি! যাঁহারা ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন, তাঁহাদেরই মঙ্গল হয়, কিন্তু যাহারা ক্রোধাবেগ ধারণ করিতে পারে না, ক্রোধ তাহাদের সমূহ অমঙ্গলের কারণ। ক্রোধের বশীভূত হইলে মানুষ অন্ধ হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই জ্ঞান থাকে না। ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিরা কার্য্যাকার্য্য ও বাচ্যাবাচ্যের বিচার করিতে পারে না। তাহারা গুরুজনদিগকেও কঠোর বচনে বিদ্ধ করে।

ক্রোধীরা আপনারও অনিষ্ট করিয়া থাকে। হে শোভনে! ক্রোধ হইতেই সমুদায় সন্তাপ উপস্থিত হয়। ক্রোধী ব্যক্তি দক্ষতা অমর্ষ, শৌর্য্য এবং ক্ষিপ্রকারিতা লাভ করিতে পারে না। মূর্খেরাই ক্রোধকে তেজ মনে করিয়া থাকে। হে দেবি! ক্রোধের ন্যায় আর অপকৃষ্ট বস্তু কিছুই নাই। আমি কিপ্রকারে অনর্থকর ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপ সঞ্চয় করিব। ক্ষমার ন্যায় ধর্ম্ম নাই। যদি সকলেই উৎপীড়িত হইয়া উৎপীড়ন হিংসিত হইয়া হিংসা করে, কেহ কাহাকেও ক্ষমা না করে তাহা হইলে সংসারের কি ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, একবার চিন্তা করিয়া দেখ। দুর্য্যোধন ক্ষমা না করুক আমি কখনও ক্ষমা পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমি যদি ক্ষমা অবলম্বন না করিয়া ক্রোধ করি, তাহা হইলে কুরুকুল এখনই ধ্বংস হয়। হে কৃষ্ণে! পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল সাধুরাই মানবকুলের ভূষণ। যে ব্যক্তি প্রভাবশালী হইয়াও ক্রোধ জয় করতঃ ক্ষমাশীল তিনিই বিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ। মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমাবান সাধুদিগের এক গাথা উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রবণ কর। ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র, যিনি ইহা জানেন, তিনিই সকলকে ক্ষমা করিতে পারেন। ক্ষমা ব্রহ্ম তপঃ, ক্ষমা শৌচ। ক্ষমাতেই সত্য, ব্রহ্ম, যজ্ঞ, ও সমুদায় লোক প্রতিষ্ঠিত আছে। হে দেবি! বল, আমি কি প্রকারে ঈদৃশী ক্ষমাকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারি। ক্ষমা বিষয়ক এই গাথা শ্রবণ করিয়া এখন তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত হও। ক্ষমা এবং অনৃশংসতা মহাত্মাদিগের একমাত্র অবলম্বনীয়। আমি প্রকৃতরূপে ক্ষমাকেই অবলম্বন করিব।

পাঞ্চালী কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি আজীবন ধর্ম্মেরই সেবা করিয়াছ। কখনও তুমি ধর্ম্মকে অবহেলা কর নাই। তোমার জীবনও রাজ্য কেবল ধর্ম্মেরই নিমিত্ত।’ আমি নিশ্চয় জানি তুমি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে ও আমাকে পরিত্যাগ করিবে, তথাপি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না। হে নাথ! ছায়ার ন্যায় তোমার অসাধারণ বুদ্ধি ধর্ম্মেরই অনুসারিণী। সসাগরা পৃথিবীর রাজা হইয়াও কনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কি সমকক্ষ কাহাকেও তুমি অবজ্ঞা কর নাই, তুমি সর্ব্বপ্রকারেই দেবদ্বিজের সেবা করিয়াছ। শুনিয়াছি, ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি দেখিতেছি, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করিতেছেন না। তুমি গোমেধাদি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞসকল অনুষ্ঠান করিয়াছ, তথাপি অক্ষক্রীড়াতে তোমার বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইল। লোভপরবশ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সম্পদ এবং তোমার বনবাস অবলোকন করিয়া আমি ধর্ম্মের প্রতি সন্দিহান হইতেছি। বিধাতার এবম্প্রকার আচরণ দেখিয়া বিধাতাকেই তিরস্কার করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

মহামতি যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যুক্তিযুক্ত ও সুবিন্যস্ত তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু আমি ফলের আকাঙ্ক্ষী হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করি না। আমি দাতব্য বলিয়াই দান করি এবং যষ্টব্য বলিয়াই যজ্ঞ করিয়া থাকি। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া আমার যাহা করা কর্ত্তব্য, ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমি যথা শক্তি তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমার মন স্বভাবতই ধর্ম্মানুসারী। হে যাজ্ঞসেনি! আমি শাস্ত্র এবং সাধুদিগের আচরণ

দেখিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করি, আমি কোন ফলের প্রত্যাশা করি না। স্বর্গাদি ফল কামনা করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে, সেই ধর্ম্মবণিক এবং ধার্ম্মিক সমাজে অতিশয় ঘৃণিত হইয়া থাকে। সে কখনও ধর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। হে শোভনে! তুমি কদাচ ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ করিও না, ধর্ম্ম কখন বিফল হয় না, এবং অধর্ম্মও কখন ফলবান হয় না। ধর্ম্ম প্রভাবে ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ দেবগণ অপেক্ষাও সম্মান লাভ করিয়াছেন। যিনি অসন্দিগ্ধচিত্তে ধর্ম্মের সেবা করেন, তিনি ব্রহ্মালোক লাভ করিয়া অপার শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। ধর্ম্ম বিফল হইলে জগৎ গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যায়। হে কল্যাণি! তুমি নাস্তিক্য বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। সর্ব্বভূতের অধিপতি পরম দেবতাকে জানিতে ইচ্ছা কর এবং তাঁহার চরণে নমস্কার কর।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

যদ্যপি টাকা না দাও তাহা হইলে তোমাকে আমার রাজ্য মধ্যে বাস করিতে দিব না, তোপে উড়াইয়া দিব। সেই জমীদার বলিলেন আপনি রাজা, সমস্তই করিতে পারেন। মন্ত্রীরা রাজাকে পরামর্শ দিল, যে পেড়াপিড়ি না করিলে, সহজে টাকা দিবে না। রাজা তাহাই শুনিয়া সৈন্য সামন্ত তোপ গোলা গুলি লইয়া যাইয়া সেই জমীদারের ঘর বাড়ি তোপে উড়াইয়া দিল। যেমন তোপ ছাড়িতে লাগিল, অমনি তাহারা ভয়েতে বাটি হইতে বাহির হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য জঙ্গলে পলায়ন করিল। রাজা দুর্ব্বল ব্যক্তির উপর বল প্রকাশ করিয়া, সসৈন্যে যাইয়া বাহাদুরি করিয়া তাহার উত্তম উত্তম বহুমূল্যের অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাটিতে প্রত্যাগমন করিলেন। অনেক লোক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, এবং ইংরাজেরাও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

সেই সময় শিবনারায়ণ একখানি জীর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া, দরিদ্রের ন্যায় সেখানে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা শিবনারায়ণকে দেখিয়া, চাকরদিগের উপর রাগ করিয়া বলিলেন যে এই দরিদ্রকে এখানে কেন আসিতে দিলে। ইহাকে বাহির করিয়া দাও। শিবনারায়ণ দেখিলেন যে ক্রোধ প্রযুক্ত রাজা ভ্রমে অন্ধ হইয়া আছেন, এখন কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। রাজার চাকর শিবনারায়ণকে হাত ধরিয়া গলা ধাক্কা দিতে দিতে রাস্তায় তুলিয়া দিলেন। শিবনারায়ণ সেখান হইতে আবুপাহাড়ের দিকে চলিলেন। তিনি পালিগ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যার সময় বসিয়া আছেন তৎকালে যোধপুরের রাজার চাকর, তাহার পদবী গোঁসাই ভারতী, যোধপুর হইতে উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া পালিগ্রামে যাইতেছিল। সন্ধ্যাকালে দেখিল যে শিবনারায়ণ সেখানে বসিয়া আছে। এখানে কোন গ্রাম নাই মনুষ্য নাই জল নাই কেমন করিয়া রাত্রে এখানে থাকিবে এবং বাঁচিবে। এই ভাবনায় আকুল হইয়া শিবনারায়ণকে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে যে এখানে বসিয়া আছ। তুমি কোথায় যাইবে। শিবনারায়ণ বলিলেন আমি মনুষ্য আমি পালি যাইব। ভারতী গোঁসাই বলিলেন তুমি আমার এই উষ্ট্রে

আরোহণ কর, তোমাকে পালিতে ষ্টেসনের কাছে নামাইয়া দিব। শিবনারায়ণ বলিলেন আমি এখানে রাত্রে থাকিব, কল্য সকালে চলিয়া যাইব। ভারতী তাহা শুনিল না, সে আপন উষ্ট্রে উঠাইয়া লইয়া পালিতে গমন করিল এবং আপনার বাসাতে লইয়া যাইয়া শিবনারায়ণকে সেবা শুশ্রূসা করিয়া সেই রাত্রে সেখানে বিশ্রাম করিতে দিলেন। ওখান হইতে শিবনারায়ণ আবু পাহাড়ে যাইলেন। অনেকের মুখে শুনিলেন যে বড় বড় ঋষি মহাত্মা আবু পাহাড়ে থাকেন। শিবনারায়ণ আবু পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে গুহাতে এবং মন্দিরে মন্দিরে এবং পাহাড়ের নীচে এবং উপরে সর্ব্বত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাধু মহাত্মাদিগকে দেখিলেন। যেরূপ প্রবাদ ছিল তাহার মধ্যে সেরূপ সাধু একটিও পাওয়া গেল না। যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই তৃষ্ণাতুর দেখিলেন। চারিদিক হইতে গৃহস্থেরা সেবা শুশ্রূসা করিতেছে। এবং গৃহস্থেরা বলিতেছে আমাকে পুত্র দেন ধন দেন। আর সাধু মহাত্মাগণ বলিতেছেন যে যখন তোমরা আমার কাছে আসিয়াছ তখন তোমাদের সকলই আমি দিব, কোন চিন্তা করিও না। তুমি বাড়ি গিয়া দশ টাকা শীঘ্র পাঠাইয়া দিও। আমি এমন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিব যে তোমার পাঁচটী এমন পুত্র হইবে যে তাহাদের তেজে সম্মুখে কেহই দাঁড়াইতে পারিবে না এবং গাছের এমন একটা শিকড় দিব তাহাতে তোমার কৈলাশ লাভ হইবে এবং একটু বিভূতি ও সেই শিকড় একটু খাইলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। সেই কথা শুনিয়া গৃহস্থেরা পশু হইয়া কেহ দশ টাকা কেহ পাঁচশ টাকা লইয়া গুহার মধ্যে সেই প্রবঞ্চক সাধুদিগকে দিয়া আইসে। সেই পাহাড়ের উপর সাধুদিগের মধ্যে এই দেখিতে পাইলাম যে একটা পুকুর জলে পরিপূর্ণ আছে ও ইংরাজেরা সেখানে কৈলাস ভোগ করিতেছেন। শিবনারায়ণ সেখান হইতে বরোদার রাজ্যে যাইলেন। রাজবাটীতে যাইয়া অন্য অন্য রাজাদের ন্যায় অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতে গ্রীনাড়ী পাহাড়ে চলিয়া যাইলেন।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

পারের নৌকা। শ্রীযুক্ত চুণিলাল মিত্র প্রণীত।

সাধু মহাত্মাগণ যে যে উপায়ে ভবসিন্ধু পারে গিয়াছেন সেই সেই উপায় গুলি গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে গল্পচ্ছলে বলিতে গিয়া যোগ বৈরাগ্য বিশ্বাস সাধুতা প্রভৃতির এক একটী সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বদা পাঠক গল্পগুলির ভাব গ্রহণ করিলে কথিত বিষয় সমূহের যদিও অল্প কিন্তু মনোমুগ্ধকর আভাস পাইয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। গ্রন্থকার পুস্তকের একস্থলে ঈশ্বরকে "সাকার-নিরাকার কিন্তু কল্পনার অতীত" বলিয়াছেন। ইহার ভাবার্থ কি?

পুনর্জন্ম আছে কি না? শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন প্রণীত।

পূর্ব্বজন্ম থাকা সম্ভব নহে গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিবিধ প্রচলিত যুক্তি দ্বারা তাহা সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি গুলি যে সুন্দররূপে খণ্ডন হইয়াছে তাহা বোধ হইল না।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় রবিবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর অষ্টাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

১ আষাঢ়
১৮১২ শক

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮১।

৫৬৪ সংখ্যা   ১৮৩২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আখ্যানমালা।

(মহর্ষি সক্রেটীস্)

১। একদা ডেল্‌ফিস্থ দেবমন্দিরে দৈববাণী হইল যে সক্রেটীস্ জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহার বিপক্ষ দলের লোকেরা খেপিয়া উঠিল। সক্রেটীস্ বলিলেন "আমি যে অজ্ঞান ও কিছুই জানিনা, ইহা বেশ বুঝিয়াছি। কিন্তু অন্যে নিজের যে অজ্ঞানতা আছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তজ্জন্যই বোধ হয় দৈববাণী আমাকে জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকিবে।" এই দৈববাণী শুনিয়া অবধি মহাত্মা তাঁহার শিষ্যবর্গকে আত্মানুসন্ধান শিখাইতে লাগিলেন।

২। একদা মহর্ষি সক্রেটীস্ ধনকুবের এল্‌কিবায়েডিস্ প্রভৃতি শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া এথেন্স্ নগরে ভ্রমণ করিতেছেন, এমৎ সময়ে হঠাৎ জনৈক দুরাচার তাঁহাকে অযথা নিন্দা ও গালি দিতে লাগিল। শিষ্যগণ রোষপরবশ হইয়া দুষ্টাত্মাকে উত্তম মধ্যম দিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া মহাত্মা সক্রেটীস্ ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ, তোমরাই আমার অপমান করিতেছ, কারণ, তোমরা আমার উপদেশের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছ। আচ্ছা, তোমরা কি কাহাকেও খঞ্জ বা সৌন্দর্য্যহীন বলিয়া প্রহার কর?" সকলে উত্তর করিলেন "না"—মহাত্মা কহিলেন, "তবে যাহার মন বা হৃদয় অসুন্দর তাহাকে মারিতে যাও কেন?" এই প্রকার উপদেশে সকলেই লজ্জিত হইয়া দুষ্টকে প্রহার হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

৩। একবার অর্কিলাস নামক সক্রেটীসের ধনাঢ্য এক গুরু উক্ত মহাত্মার নিকট দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি সক্রেটীস্‌কে ধনবান করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন। সক্রেটীস্ ইহার সুন্দর উত্তর দিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "যে উপহারের প্রতিদান দিতে পারিব না, তাহা কিরূপে লইব? ইহা ব্যতীত, (প্রায়) দুই আনা হইলেই এথেন্সে এক প্রকার উদর পূর্ণ করা চলে, এবং নির্ঝরিণী সর্ব্বদাই স্বচ্ছ বারিপূর্ণ থাকে। তবে, আমার আর্থিক অবস্থা যদি আমার পক্ষে প্রচুর না

হয়, আমিই স্বয়ং আমার অবস্থানুরূপ হইব, (অর্থাৎ অভাব সমূহ তদনুযায়ী অল্প করিব), তাহা হইলেই আমার যাহা কিছু আছে আমার পক্ষে প্রচুর হইবে।"

৪। এক দিবস এল্‌কিবায়েডিস্ নিজ ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব করিতেছিলেন। তৎকালে আর কেহই তাঁহার ন্যায় ধনবান ছিলেন না। তাঁহার গুরু সক্রেটীস্ তাঁহাকে মানচিত্রের নিকটে লইয়া গিয়া "এটিকা" দেখাইতে আদেশ করিলেন। এথেন্স্ যে প্রদেশের রাজধানী ছিল, তাহারই নাম এটিকা। মানচিত্রের উপর উহা বড়ই ক্ষুদ্র দেখায়। শিষ্য বহু কষ্টে এটিকা বাহির করিলেন। মহর্ষি কহিলেন "ইহার মধ্যে তোমার প্রাসাদ ও সম্পত্তি দেখাও।" এল্‌কিবায়েডিস্ উত্তর করিলেন "প্রভো! উহা এত ক্ষুদ্র যে দেখিতেই পাওয়া যায় না।" মহাত্মা সহাস্যবদনে বলিলেন, "দেখ, তুমি কি সামান্য বিষয়ের জন্য গর্ব্বে অন্ধ হইতেছিলে!" শিষ্য লজ্জিত ও উপদিষ্ট হইয়া নীরবেই রহিলেন।

৫। জনৈক হৃত্তত্ত্ববিবেকী (Phrenologist) মহাত্মা সক্রেটীস্‌কে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার কিম্ভূত কিমাকার চেহারা দেখিয়া বোধ হয় যে তুমি নিতান্ত পাজী, বদমায়েশ লোক।" মহাত্মা বিনীতভাবে উত্তর করিলেন "আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন; আমার দেহ যেমন কদর্য্য, আত্মাও তেমনি। আমি কেবল মানসিক বল দ্বারা কুপ্রবৃত্তিগুলিকে শাসনে রাখিয়াছি।" কেমন উদারতা!

৬। স্থান—ডেলিয়াম্ রণক্ষেত্র। সময়—ঘোরতর সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া এথিনীয়গণ শত্রুদ্বারা তাড়িত হইয়া গৃহাভিমুখে পলায়ন করিতেছে। একজন দীর্ঘকায় ও বলশালী পুরুষ এই সময়ে রণক্ষেত্রের উপর দিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া শয়নকক্ষে পদচালনার ন্যায় ধীরে ধীরে এথেন্সাভিমুখে আসিতেছেন। এ বীর পুরুষ কে? উনি মহাত্মা সক্রেটীস্। এলকিবায়েডিস্ সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই একদিবস সক্রেটীসের প্রশংসা করিতে করিতে এই ঘটনাটী উল্লেখ করেন। ইহা প্লেটোর সিম্‌পোসিয়ামে বর্ণিত হইয়াছে।

৭। জেন্থিপী এথেন্সের এক জন প্রসিদ্ধ ব্যাপিকা। ইনি মহাত্মা সক্রেটীসের পত্নী ছিলেন। এক দিন ইনি সক্রেটীসের সহিত তুমুল বিবাদ আরম্ভ করিলেন। কলহান্তে সক্রেটীস্ (অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া?) গৃহ হইতে বাহির হইতেছেন এমত সময়ে ছাদ্ হইতে মস্তকের উপর সমল এক কলস জল পড়িল, মহাত্মা ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়াই দেখেন যে দন্তপাটি বিকসিত করিয়া তাঁহার মুখরা ভার্য্যা আনন্দে উল্লাস করিতেছেন। হাস্যের মর্ম্ম বুঝিয়া সুরসিক সক্রেটীস্ বলিলেন "এত তর্জ্জন গর্জ্জনের পর যে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে, এ ত আমি পূর্ব্বেই জানিতাম!" এই বলিয়া হাস্যমুখে তিনি চলিয়া গেলেন। মহাত্মা এত ধীর ও বিশ্বাসী ছিলেন যে গম্ভীর ভাবে বলিতেন "আমার পরম সৌভাগ্য, তাই জেন্থিপীর মত ভার্য্যা লাভ করিয়াছি। ইহা পরমেশ্বরের মঙ্গলবিধান। আমি গৃহেই চরিত্রগঠন ও চরিত্রপরীক্ষা করিতে পারি, এবং ক্ষমা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতাদি গুণ শিক্ষা করিতে পারি। জেন্থিপীর ব্যবহার ও অত্যাচারেও যদি মনের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারি, তবে সংসার ক্ষেত্রে কখনই আমার কোন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিবে না।"

৮। সক্রেটীস্ ঋণশোধ করা সত্যনিষ্ঠা

ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার অঙ্গ মনে করিতেন। মৃত্যুকালে তিনি হেমলক বিষ পান করিয়া অচেতন প্রায় হইয়াও একবার বস্ত্রাচ্ছাদিত মুখ খুলিলেন। সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিকটে গেল। মহাত্মা জনৈক শিষ্য ক্রিটোকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি এস্কে-পিয়াসের নিকট একটী কুক্কুটের জন্য ঋণী। আমার স্ত্রীকে বলিও। তাহার ঋণ যেন শোধ করা হয়।" এই গল্প হইতে মহা-ত্মার সাংসারিক অবস্থা,সত্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

৯। মহাত্মা কি শীত, কি গ্রীষ্ম সর্ব্ব-কালে একই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই অনাবৃত পদে থাকিতেন, অথচ পাদুকাধারী যুবকগণও তুষারের উপর দিয়া তাঁহার ন্যায় দ্রুত পদে চলিতে পারিত না। কেবল বন্ধুদের বাটিতে নিম-ন্ত্রিত হইলে মহাত্মা পাদুকা ব্যবহার করি-তেন। তাঁহার বিলাসিতার চরম সীমা এই পর্য্যন্ত ছিল। তিনি চিরদিনই মিতা-হারী ছিলেন। পাছে ব্যায়াম করিলে ক্ষুধা অধিক হয় এবং অধিক পরিমাণে আহার করিতে হয় এই ভয়ে তিনি কোন প্রকার ব্যায়াম করিতেন না; কিন্তু তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক বাহুবল এত অধিক ছিল যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না।

১০। এক দিবস তরুণবয়স্ক শিষ্যগণকে উপদেশ দিবার সময় মহাত্মা বলিয়াছিলেন, যে, দর্পণে মুখ দেখিবার সময় যদি দেখ যে তোমার মুখ সুন্দর, তবে গর্ব্ব না ক-রিয়া ইহাই ভাবিবে যে তোমার চরিত্রকেও তদনুরূপ সুন্দর করিতে হইবে। কিন্তু যদি দুর্ভাগ্য ক্রমে দেখিতে পাও যে তুমি সুন্দরের মেলায় যাইবার উপযুক্ত নহ, তবে ইহাই স্মরণ রাখিও যে, এই কদর্য্য মুখশ্রীকে সদ্গুণের আবরণে ঢাকিতে হইবে। এই উপদেশ মহাত্মা নিজ জীবনে পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

বনফুল।

(২)

১। পুতুলনাচে সকলের বোধ হয় যে যথার্থই পুতুলগুলি নাচিতেছে। কিন্তু ঐ যে অন্তরালে এক ব্যক্তি রহিয়াছে ও সেই পুতুল নাচাইতেছে, উহা কেহ দেখিতে পায় না। সেইরূপ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক অদৃশ্য শক্তি কার্য্য করিতেছেন, উহা কেহ চক্ষে দেখিতে পায় না। আমরা ছায়াবাজির পুতুলের মত হাত পা নাড়িতেছি; এই মহাশক্তিই আমাদিগকে পুতুলের ন্যায় নাচাইতেছেন; অথচ অজ্ঞানবশতঃ আমরা তাঁহাকে দেখি-তেছি না।

২। জগজ্জননীর সহিত যদি সাক্ষাৎ করিতে চাও,তবে অন্দরে আইস। অন্দরে অসাধু লোকের প্রবেশ নিষেধ। অতএব, অপবিত্রতার জীর্ণ মলিন বসন বাহিরে পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র বসন পরিধান পূর্ব্বক অন্দরে আইস।

৩। অভুক্ত রোগীকে এক দিনেই অপরিমিত আহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। বস্তুতঃ, পথ্যের উচিত ব্যবস্থা হইলে, ঔষধ না দিলেও চলে। বৈদ্যনাথ ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝেন। তিনি আধ্যাত্মিক রোগীকে একবারেই অধিক পথ্য দেন না। ক্রমে ক্রমে পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেন; কারণ, অজীর্ণতা এক মহা আধ্যাত্মিক ব্যাধি।

৪। চক্ষু-রোগ হইলে, সুচিকিৎসক চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিতে উপদেশ দেন, কারণ ক্ষীণ চক্ষুতে হঠাৎ প্রখর সূর্য্যকিরণ

অধিক পরিমাণে লাগিলে অনভ্যাসবশতঃ চক্ষু ঝল্‌সিয়া যাইতে পারে। সেই জন্যই পরমেশ্বর একবারে অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক সত্য আমাদিগের নিকট প্রকাশ করেন না।

কি সাধ্য দুর্ব্বল-চক্ষু মনুষ্যের, যে সে সত্যসূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ এক্‌বারে সহ্য করিতে পারে?

৫। মানুষ মাতৃঋণ শোধ করিতে অসমর্থ। অনন্ত প্রেমের ঋণ তবে কিরূপে শোধ করিবে? শোধ করা দূরে থাকুক্‌, যদি বিশ্বজননীর কৃপা ও প্রেমের জন্য মানুষ কৃতজ্ঞতা অনুভব করিত, তবে একটি মাত্র চন্দ্রকিরণের জন্য, এক দণ্ডের অশেষ প্রকার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সুখের জন্য মানুষ কৃতজ্ঞতার ভারে চিৎকার করিয়া মরিয়া যাইত। তবে মনুষ্যের ইহাই কর্ত্তব্য যে সে যেন এই অনন্ত ঋণের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখে ও "নিমক্‌হারামী" করিয়া সকলি ভুলিয়া না যায়।

৬। সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্বাকাশ, উষাবালার হাসিতে স্নাত হইয়া কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে! তেমনি, আত্মাতে সত্যসূর্য্যের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্ব হইতেই, মানব জীবনে এমনি তাহার পূর্ব্বরাগ লক্ষিত হয়, যে তাহার জ্যোতি মনুষ্যের বাক্য ও কার্য্যে পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হয় এবং জগৎ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হয়।

৭। কোন রাজা, ভক্ত বৈরাগীর প্রতি— "আপনি যথার্থ স্বার্থত্যাগী! ধর্ম্মের জন্য ধন মান সকলি পরিত্যাগ করিয়াছেন!" বৈরাগী,—"মহারাজ! আমি নিতান্ত স্বার্থপর; আপনিই যথার্থ স্বার্থত্যাগী। আমি ত অনন্ত ধনের আশায় সামান্য সুখ সম্পদ বিসর্জ্জন দিয়াছি; কিন্তু আপনি অনন্ত ধন ত্যাগ করিয়া সংসারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, হীরক পরিত্যাগ করিয়া ছাই বাছিয়া লইয়াছেন, অতএব আপনিই অধিক ত্যাগী।"

৮। গুণ বিশেষের প্রাধান্যানুসারে আমরা ব্যঞ্জনের ন্যায় মানব চরিত্রের দোষগুণ নির্দ্দেশ করি। ব্যঞ্জনে সর্ব্ব প্রকার মশলাই থাকে, কিন্তু কোনটীর পরিমাণ অন্যগুলি অপেক্ষা অধিক হইলে, আমরা ঐ আধিক্যানুসারেই ব্যঞ্জনের নামকরণ করি, যথা,—অধিক লবণ হইলে, "নোন্‌টা" ইত্যাদি। সেইরূপ, প্রত্যেক মনুষ্যের চরিত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোভাব আছে, কিন্তু যখনই কোন চরিত্রে অবশিষ্ট গুলি অপেক্ষা কোনটীর স্বাদ অধিক হয়, তখনই আমরা বলি "ইহার সাত্বিক প্রকৃতি" বা "ইহার প্রকৃতি বড়ই ঝাল, অর্থাৎ রজোভাবাপন্ন।"

৯। যথার্থ ধনীর ধন এমন "ব্যাঙ্কে" সঞ্চিত আছে যে উহা কখনও "দেউলে" পড়ে না। অনন্ত প্রেমের ভাণ্ডার কি কখনও নিঃশেষিত হয়। এক বিন্দু অশ্রুকণা, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ও অস্ফুট প্রার্থনা এই "ব্যাঙ্কের" "চেক্"। এস, সচ্ছিদ্র অঞ্চলে সংসারেব ধূলা না বাঁধিয়া আমরা যেন এই "ব্যাঙ্কে" ধন সঞ্চিত করিয়া রাখিতে যত্নবান হই।

ভবানীপুর সাম্বৎসরিক উৎসব।

রবিবার ৯ই আষাঢ় ১২৯৭ সাল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞান-প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বরকে জ্ঞানদ্বারা লাভ করিতে হইবে। আর্য্যঋষিরা তাঁ-

হাকে সাধনপ্রভাবে লাভ করিয়া আপ্ত-কাম হইয়া বলিয়া গিয়াছেন,

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।"

সত্য ব্যবহার দ্বারা তপস্যা দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়, জ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি সেই নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরকে ধ্যানযুক্ত হইয়া লাভ করেন। তাঁহারা তাঁহার স্বরূপ সম্মন্ধে নিঃ-সংশয় হইয়া বলিয়া গিয়াছেন "রসো বৈ সঃ" তিনি রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু—তিনি আনন্দের পারাবার। আমারদের সম্মুখে সেই আনন্দের পারাবার চিরপ্রবাহিত রহিয়াছে, আমরা সকলেই সেই আনন্দের ভিখারী। এখানে চারিদিকে অশান্তি ও অপূর্ণতার মধ্যে হৃদয়ের ক্ষুধা দূরীকরণের প্রচুর উপকরণ বিদ্যমান নাই। সেই জন্য আমরা হৃদয়ের পিপাসা শান্তি ক-রিতে অসমর্থ হইয়া আপনা হইতেই তাহার নিকট ধাবিত হইতেছি, তারস্বরে তাহাকেই ডাকিতেছি। বিষয়সুখে আ-মাদের আত্মা আর ম্লান হইতে চাহিতেছে না। সেই জন্যই অন্তরতম প্রদেশ হইতে কে যেন বলিতেছে "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"।

কিন্তু সেই প্রেমের আকর অনন্ত সুখের প্রস্রবণের দিকে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের জ্ঞানকে পরিণত ও পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে পাইবার উপায় নাই। এঁকে আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তাহাতে আবার চারি-দিকে অন্ধকার, আমাদের লক্ষ্যস্থল যার-পর নাই দূরদেশে, এই আপাতপ্রতীয়-মান দূরদেশে আমরা কাহার কর্ত্তৃত্বে নীয়-মান হইয়া—কাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইতে পারি। কে আমারদের এই অন্ধকারে কাণ্ডারী হইতে পারে। অন্তর্দেশ আলোড়িত করিয়া দেখিলাম আত্মার চক্ষু কেবল জ্ঞানই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক, সম্বল ও ভরসা। যে জ্ঞান আমাদিগকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়াছে, যে জ্ঞানের পরিণত অবস্থা আমাদিগকে স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রতি বৃথা মায়া মমতা ও পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ঐশ্বর্য্যের অসারতা বুঝাইয়া দিয়াছে, আমরা যে অনন্ত ধামের যাত্রী যে জ্ঞান আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তাহা ধারণ করিয়াছে, যে জ্ঞান আমাদিগকে ঈশ্বরের অনুপম পিতৃভাব অতুলন মাতৃ-বাৎসল্য শিক্ষা দিয়াছে সেই জ্ঞানই দিব্যালোক ধারণ করিয়া আমাদিগের অনন্তপথের পথপ্রদর্শক হইতে পারে, ও পাপতাপ মোহমলিনতার পরপারে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়।

আমাদের ঈশ্বরের পূজা শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি পবিত্রতা লইয়া; ইহা অজ্ঞানতা বা অন্ধ বিশ্বাসের অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস নহে, ইহা জ্ঞানালোক-সমুজ্জ্বল উন্নত ও উদার হৃদয়ের সরল ও স্বাভাবিক স্ফুরণ। আমরা হৃদয়ের স্বাভাবিক জ্বলন্ত বিশ্বাস-বলে তাঁহার সত্তায় উপস্থিত হইয়াছি, বাহ্য জগতে তাঁহার অনুপম রচনা-কৌশল দেখিয়া—সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার স্নেহ করু-ণার নিদর্শন পাইয়া সেই সকল সৌন্দ-র্য্যের আকর প্রেমের সাগরকে শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে শিক্ষা করিয়াছি, আমাদের দুর্ব্বলতা তাঁহাকে রোগের ঔষধ শো-কের সান্ত্বনা বিপদের কাণ্ডারী বলিয়া শিক্ষা দিয়াছে। পৃথিবীর সুখ সম্পদের অনিত্যতা সেই শাশ্বত সুখদাতার নিত্য প্রসারিত উদার ক্রোড়কে দৃঢ়রূপে আশ্রয়

করিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিয়াছে। আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক উত্তেজনা তাঁহাকে প্রীতি করিতে ও ভয় বিপদে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছে। তাই আমরা সেই জ্ঞানদাতা গুরু ও সম্পদদাতা বিধাতাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতার সহিত এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। তিনি আমাদের জ্ঞানকে ও প্রীতিভাবকে ক্রমাগতই পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন। আজ সংসারের আকর্ষণ আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না, তুচ্ছ বিষয়সুখ তাঁহার সুমধুর আহ্বানের নিকট পরাজিত হইল, সেই জন্যই আমাদের এত আনন্দ কোলাহল। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর কীট হইয়াও দিব্যধামনিবাসী দেবগণের সহিত একস্বরে তাঁহার স্তুতিগান করিতেছি এ আনন্দ আমাদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়িতেছে, বাক্য আর কি বলিবে!

যে জ্ঞান আমাদিগকে ঈশ্বরের পথের পথিক করে, যে জ্ঞান মনুষ্যকে দেবপদবীতে লইয়া যায়, যে জ্ঞানালোকে হৃদয়দেশ আলোকিত হইলে আত্মারূপ দর্পণে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, সেই জ্ঞানের সঙ্গে বৈরাগ্য ও উপরতির ঘনিষ্ঠতম যোগ। জ্ঞানের পূর্ণ উদ্রেকে বৈরাগ্য ও উপরতি তাহার চিরসহচর। বৈদান্তিকেরা কহেন "শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন জ্ঞানোদ্রেকের কারণ।" আচার্য্য সন্নিধানে বা শাস্ত্রপাঠে ঈশ্বরের স্বরূপ স্নেহ বাৎসল্য প্রভৃতি অবগত হওয়ার নাম শ্রবণ; পাঠান্তে বা শ্রবণান্তে তাহা মনে মনে আলোচনা করার নাম মনন; তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাতে আত্মার সমাধান করার নাম নিদিধ্যাসন। এই তিন হইতে আমাদের হৃদয়নিহিত ভগবৎবিষয়ক স্বাভাবিক জ্ঞানের স্ফুরণ হয়। জ্ঞানের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-চিন্তা মনে স্থান পায়। কোথা হইতে আমি আসিলাম, কোথায় যাইব, পরে আমার কি হইবে, আত্মা কি চিরজীবী, ইহার গম্যস্থলই বা কোথায়, ঈদৃশ চিন্তাই মনে স্থান পাইতে থাকে; এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "আত্মতত্ত্ব বিচার জ্ঞানের স্বভাব।" যখন আত্মচিন্তা মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকে, তখন কি আর অজ্ঞান ও মোহজাল হৃদয়কে আবিল করিয়া তুলিতে পারে। নদী যেমন সহজেই সিন্ধুর দিকে ধাবিত হয়, কুসুম যেমন সহজেই গন্ধদান করে, মন তেমনই সহজেই তাঁহাকেই চাহে, তাঁহাকে লইয়া বিভোর হইয়া থাকে, মোহের কি সাধ্য যে তাহা অাঁধারে ফেলে। সুতরাং "নিবৃত্ত হৃদয়গ্রন্থির অনুদয় জ্ঞানের কার্য্য হইয়া পড়ে।" এবং ইহাই শাস্ত্রের অনুমত। একভাবে এখানে ইহাও বলা যাইতে পারে যে চিকিৎসা রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতিষ, সাহিত্য মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যা সকল যে এককালে জ্ঞানের অবিষয় তাহা নহে। বহির্জগতে ঈশ্বরের যেরূপ সুনিপুণ হস্তচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহার জ্ঞান প্রেমের যেরূপ জ্বলন্ত নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে ঐ সকল বিদ্যা আত্মতত্ত্ববিচারকে প্রদীপ্ত করিয়া দেয়, ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে। ঈশ্বরের ছবি অন্তর্জগতেও যেরূপ প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে, বহির্জগতেও তেমনই প্রতিফলিত। অন্তরে বাহিরে উভয়েতেই তিনি দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। যে বিদ্যাই আলোচিত হউক না কেন, যদি তাহার সঙ্গে ঈশ্বরের অতু-

লন নৈপুণ্য না দেখি, তাঁহার কৌশল তাঁহার মঙ্গলভাব যদি অনুভব করিতে না শিখি, তবে সেরূপ নিরীশ্বর শিক্ষার প্রয়োজন কি? যদি সকল শিক্ষার মধ্যে ঈশ্বরকে ও জীবনের লক্ষ্যকে তাহাতে সংশ্লিষ্ট না দেখি, তবে সে শিক্ষার অপূর্ণতা চিরকালই রহিয়া যাইবে।

যখন জ্ঞান এরূপ পরিস্ফুটাবস্থা ধারণ করে, তখন ক্রমে বৈরাগ্যের ভাব মনে প্রদীপ্ত হয়। "বিষয়ের দোষ দৃষ্টি অর্থাৎ বিষয়সুখের অনিত্যতা ও অপ্রচুরতা বৈরাগ্যের কারণ।" যদি বিষয়ের মধ্যে মগ্ন থাকিয়া বিষয়সুখের পশ্চাদ্ধাবনে তৎপর হইয়াও অন্তরে স্থায়ী বিমলানন্দের সঞ্চার না হইল, ক্ষণেক্ষণে তাহা হইতে গরল উদ্গীরিত হইতে লাগিল, যদি পৃথিবীর সুখ হৃদয়ভেদী দুঃখে পরিণত হইল, যদি পার্থিব সুখ মৃগতৃষ্ণিকাবৎ ভ্রান্তিমাত্র হইয়া উঠিল, যখন হৃদয়ের মহাশূন্য তাহাতে পরিপূরিত হইল না, তখন সে ছার মলিন সুখ লইয়া কে থাকিতে চায়? ইহাতে যে মনে সহজে বৈরাগ্য উদীপ্ত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি। এই প্রবল বৈরাগ্য একবার অন্তরে উদিত হইলে কে আর অস্থায়ী মলিন বিষয়সুখ কামনা করে এবং কে আর ছার বিষয়ভোগেচ্ছাকে হৃদয়ে স্থান দেয়। সেই জন্যই শাস্ত্রে আছে "বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা বৈরাগ্যের স্বভাব এবং পরিত্যক্ত বিষয়েতে ভোগেচ্ছার অনুদয় বৈরাগ্যের কার্য্য।"

যেমন আমরা ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি যে ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন পরমার্থজ্ঞান উদ্রেক করিবার কারণ তেমনই আমরা পরীক্ষাতে দেখি যে, যুক্ত আহার-বিহার মনঃসমাধানের যার পর নাই অনুকূল। মনঃসমাধানের অভাবে মনের একাগ্রতার অভাবে যে তাঁহাকে অধিক ক্ষণ ধরিয়া আরাধনা করা যায় না, চিত্তচাঞ্চল্য হেতু যে তাঁহার উপাসনায় ব্যাঘাত ও তন্নিবন্ধন মনে বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা সাধক মাত্রেই অবগত আছেন। এই যে মনঃসমাধান ও চিত্তচাঞ্চল্য দূরীকরণ ইহা তাঁহাকে লাভ করিবার সোপান মাত্র। অতএব বেদান্তে বলে "যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ইহারা উপরতির কারণ, ঈশ্বরেতে বুদ্ধির একাগ্রতা উপরতির স্বভাব, এবং লৌকিক ব্যবহারের শৈথিল্য উপরতির কার্য্য।" যিনি ঈশ্বরেতে মনঃসমাধান শিক্ষা করিয়াছেন, ঈশ্বরই যাঁহার সর্ব্বস্ব, যিনি অন্তরতম ঈশ্বরকে "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা" পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ও আর আর সকল হইতে প্রিয় বুঝিয়াছেন তাঁহার নিকট লৌকিক ব্যবহারের বাধ্যতা কি? তিনি ত আপনা হইতেই বলিতে থাকেন "ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং হি নো মাতা সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৄণাম, স্বাদু সখ্যং সাধ্বী প্রণীতি। ত্বং অস্মাকং তবাস্মি" তুমি আমারদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি সখা, তুমি পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা, তোমার সঙ্গে যে বন্ধুতা তাহা যারপর নাই সুস্বাদু, তুমি যে আমাদের আমরা যে তোমারই।

এইরূপে যখন বৈরাগ্য ও উপরতির সঙ্গে জ্ঞান যোগলাভ করে, তখন তাহার কলেবর যার পর নাই পরিবর্দ্ধিত হয়। নদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া কলকলরবে মহাসমুদ্রাভিমুখে সতেজে গমন করিতে করিতে যখন আবার দুই চারিটি সুপ্রকাণ্ড নদীর সহিত মিলিত হয়, তখন সেই ভীষণ সঙ্গম হইতে বিনির্গত এক ভীমা নদী

যেমন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে মহাসমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়, তেমনই আমাদের পরমার্থ জ্ঞান যখন বৈরাগ্য ও উপরতির সহিত মিলিত হয়, তখন তাহার উচ্ছ্বাসের সীমা থাকে না, সে সতেজে জ্ঞানসমুদ্র প্রেমসমুদ্রের দিকে সতেজে বহমান হইতে থাকে ও শীঘ্রই তাঁহাতে মিলিত হয়।

মনুষ্য জ্ঞানের অপ্রচুরতানিবন্ধন প্রথমে সংসারকেই সর্ব্বস্ব জানিয়া জ্ঞানকে তাহাতেই নিবদ্ধ করে। জ্ঞানের শাখা প্রশাখা অনিত্য সুখ সম্পদের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া যায়, এবং মনুষ্য আপনাকে মায়া মমতার সামগ্রীর সহিত বিজড়িত করিয়া তোলে। ক্রমে যখন জ্ঞান প্রসারতা লাভ করে এবং বৈরাগ্য ও উপরতির সহিত মিলিত হয়, তখন জ্ঞানকাণ্ডের পৃথিবীর অভিমুখীন শাখা প্রশাখা ম্লান হইয়া যায়। কিন্তু স্বর্গের দিকে সরল ও সতেজ শাখা-পল্লব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এ অবস্থা অনাসক্ত ভাবে বিষয়ভোগের অবস্থা। জ্ঞানের এই নূতন শাখাপল্লব উদ্ভিন্ন হইয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, নিষ্ঠা, নির্ভর, আত্মপ্রসাদ রূপ বিবিধ ফল প্রসব করিতে থাকে। সাধক তাহারই আস্বাদনে অমৃতভোজী দেবতাগণের ন্যায় ঈশ্বরের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকে।

বেদান্তে এই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও উপরতি এই তিনেরই পরিসমাপ্তি কথিত আছে। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন যেমন জ্ঞানের কারণ, আত্মতত্ত্ব বিচার যেমন জ্ঞানের স্বভাব, নিবৃত্ত হৃদয়গ্রন্থির অনুদয় যেমন জ্ঞানের কার্য্য তেমনই "দেহাত্মবৎ পরাত্মত্ব দার্ঢ্যে বোধঃ" জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, অর্থাৎ আপনার ন্যায় সর্ব্বজীবে সমান প্রীতির দৃঢ়তার নাম জ্ঞানের অবধি বা পূর্ণমাত্রা। বিষয়েতে দোষদৃষ্টি যেমন বৈরাগ্যের কারণ, বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা যেমন বৈরাগ্যের স্বভাব, এবং পরিত্যক্ত বিষয়েতে ভোগেচ্ছার অনুদয় যেমন বৈরাগ্যের কার্য্য, তেমনি "ব্রহ্মলোকতৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্মতঃ" সম্পূর্ণরূপে ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ এমন কি ব্রহ্মলোক রূপ ফলপ্রাপ্তিতে তৃণজ্ঞান হওয়া বৈরাগ্যের পূর্ণবিকাশ বা পরিসমাপ্তি। যম নিয়ম ধ্যান ধারণা সমাধি প্রভৃতি যেমন উপরতির কারণ, ঈশ্বরেতে বুদ্ধির একাগ্রতা যেমন উপরতির স্বভাব, লৌকিক ব্যবহারে শৈথিল্য যেমন উপরতির কার্য্য, তেমনই "সুপ্তিবৎ বিস্মৃতিঃ সীমা ভবেদুপরমস্য হি" (পঞ্চদশী, চিত্রদীপ ২৮৬ শ্লোক) সুষুপ্তিকালে যেমন বাহ্য বিষয় বিস্মৃত হওয়া যায়, তদ্রূপ জাগ্রৎকালেও যখন বিষয় ভোগের বিস্মৃতি ঘটিবে তখনই জানিবে যে উপরতির শেষ মঞ্চে উঠিয়াছ।

ইহাই পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থের জ্ঞান, বৈরাগ্য ও উপরতির তাৎপর্য্য। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মেও রহিয়াছে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ," পরমাত্মার দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে; "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি," ইন্দ্রিয় সংযমী, যুক্তমনা, উপরত, তিতিক্ষু ও একাগ্রচিত্ত হইয়া আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দেখ।

পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণ ঈশ্বরলাভের যে রূপ প্রকৃষ্ট পথ সকল উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা এই সুদূরবর্ত্তী কালেও সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছি। কিন্তু শুদ্ধ আর স্তম্ভিত হইলে চলিবে না। সমুদ্রগর্ভে মণি মুক্তা

প্রবালাদি রহিয়াছে তাহাতে আমাদের কি? সকলে উত্থান কর, জাগ্রত হও, ঈশ্বরের পথে গমন কর, আর কত কাল মোহে অভিভূত থাকিবে, আর কত দিন ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত থাকিয়া আত্মার বিলয়দশা আনয়ন করিবে? ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের মুখ আর কত কাল ম্লান করিয়া রাখিবে? আর্য্য পিতৃপিতামহগণ আমারদের জন্য স্বর্গের সোপানপরম্পরা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, আইস ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া দৈববলে বলী হই, যত্ন ও সহিষ্ণুতা সহকারে সেই পথে অগ্রসর হই ও মনুষ্য জন্মের সাফল্য সম্পাদন করি। আর্য্য ঋষিকুলের দুর্ব্বল সন্তানসন্ততি বলিয়া আমারদের উপরে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা রহিয়াছে, আমারদের সামান্য যত্ন চেষ্টা দেখিলে তিনি অবশ্যই আমাদিগকে জয়যুক্ত করিবেন, এবং অল্প সাধনায় আমাদিগকে সিদ্ধি দিবেন।

আইন সম্মত বিবাহ।

গত ২২ জুনে প্রকাশিত The liberal and the new dispensation নামক সাপ্তাহিক পত্রে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র Sir William Muir নামক জনৈক ইংলণ্ডীয় বন্ধুকে এই সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখেন। পত্রখানির উপসংহারে কেশব বাবু বিবাহ সম্বন্ধীয় ১৮৭২ সালের ৩ আইনের উপরে সম্পূর্ণ অনাস্থা দেখাইয়াছেন। পত্রখানির আদ্যোপান্ত উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে আমরা নিম্নে কয়েক পংক্তি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "The act passed for the benifit of Brahmos in 1872 Act III discards the very name of God and tends to promote godless civil marriages for which India is not ripe. .... Marriages of a godless and atheistic character ought to find no encouragement. ইহার অনুবাদ এইরূপ, "ব্রাহ্মগণের উপকারের জন্য যে ১৮৭২ সালের ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে; ইহাতে নিরীশ্বর ও (civil) অধর্ম্ম্য বিবাহ প্রশ্রয় পাইবে, ভারতবর্ষ এরূপ বিবাহ (প্রবর্ত্তন) জন্য প্রস্তুত নহেন। * * * নিরীশ্বর ও নাস্তিক ভাবের বিবাহে উৎসাহ দেওয়া কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে।" বলা বাহুল্য ১৮৭২ সালের ৩ আইন অর্থাৎ বিবাহ আইন কেশব বাবুর উদ্যোগে বিধিবদ্ধ হয়। আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বিল পাশ হইবার পূর্ব্বে কতই না চীৎকার করিয়াছিলাম, কতই না তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, এবং সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের অধিকারের অন্যায্যতার বিষয় কতবার না সুস্পষ্ট দেখাইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষগণ দলাদলির অগ্নিতে এমনই প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ নিজ অন্ধবিশ্বাস এমনই দৃঢ়তার সহিত পোষণ করিয়াছিলেন যে আমাদের সকল সমালোচনা ও পরামর্শ দান ব্যর্থ হইয়া যায়। আমরা যতবারই ১৮৭২ সালের ৩ আইন সম্মত বিবাহকে নিরীশ্বর বিবাহ বলিয়াছি, ততবারই তাঁহারা এরূপ বিবাহকে সেশ্বর প্রতিপন্ন করিবার বিপুল চেষ্টা পাইয়াছেন এব নিরর্থক যুক্তি দেখাইয়াছেন। আজ আমরা ১০। ১২ বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন তত্ত্ববোধিনী উদ্ঘাটন করিয়া দেখিতেছি যে আইনঘটিত বিবাহের নিরীশ্বরতা সম্বন্ধে আমরা যাহা যাহা কহিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে

কেশব বাবুর সঙ্গে আমাদের এক মত। কেশব বাবু ইহা সরলভাবে তাঁহার বিলাতীয় পত্রে স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুজাতির চির প্রচলিত বিবাহপদ্ধতি যথাযথ রাখিয়া কেবল তাহা হইতে পৌত্তলিক অংশ বাদ দিয়া, তাহার স্থানে ব্রহ্মোপাসনা যোজিত করিয়া দিয়াছেন। এরূপ সুসংস্কৃত বিবাহপদ্ধতি যে দেশ কালের বিশেষ উপযোগী তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। বলিতে কি, আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি সংকলনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমাজতত্ত্বদর্শিতা ও দূরদর্শিতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার আত্মা ব্রহ্মতেজে যেমনই তেজীয়ান, তাঁহার চক্ষু দিব্যালোকে তেমনই জ্যোতিষ্মান্। ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজ সংস্কারক হইতে হইলে যে সকল অনন্যসাধারণ গুণের আবশ্যক, তাহা তাঁহাতেই রহিয়াছে। ইঁহার সংগ্রহীত ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন পরিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম এবং এই জ্ঞানোন্নত সময়ের বিশেষ উপযোগী, ইঁহার সংকলিত অনুষ্ঠান পদ্ধতিও তেমনই দেশাচারানুগত ও হিন্দুভাব পরিপূরিত। যাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে কহিয়া থাকেন যে ইহাতে প্রচলিত বিবাহের প্রাণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্মত ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতি সংকলিত হয় তখন নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, কাশীস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ একবাক্যে এরূপ বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন। এবং এরূপ বিবাহের অসিদ্ধতা সম্বন্ধে কখন ঘুনাক্ষরেও সন্দেহ প্রকাশ করিবার কারণ দেখিতে পান নাই। কেশব বাবু তাঁহার শেষ জীবনের "আর্য্যদিগের পবিত্র নব সংহিতা" (The new sanhita or sacred laws of the aryans of the new dispensation) নামক গ্রন্থে বিবাহ সম্বন্ধে যতদূর পারেন হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এমন কি যাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও নবসংহিতার বিবাহ পদ্ধতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসংশয় চিত্তে বলিবেন যে নবসংহিতার বিবাহ পদ্ধতি রচনা কালে আদি সমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়াছে, এমন কি স্থল বিশেষে তিনি প্রকারতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতিই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

গায়ত্রী চিন্তা।

(বিগত বর্ষের মাঘ মাসের পত্রিকার ১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

ঈশ্বর আমাদিগকে এই শুভ মুক্তিবিষয়িণী বুদ্ধি—তাঁহার সহবাস করিবার লালসা প্রভৃতি প্রদান করিয়া আমাদিগের প্রতি কি অপার দয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বৃত্তি জন্যই আমরা ইতর জন্তুগণ হইতে বিশেষ রূপে বিলক্ষিত। হে মানব! যখন এই কল্যাণকর বৃত্তির প্রসাদে হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়ের প্রেম ভক্তি উপহার দিয়া পূজা কর, যখন তাঁহার অনুমোদিত জানিয়া পরসেবা ও পরদুঃখহরণ ও সংসারের কার্য্যভার বহন কর, তখন তোমার দেবভাব দেবোচিত কার্য্য জন্য দয়াময়কে ধন্যবাদ প্রদান কর। অন্তরের সহিত বল "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং"। তুমি অধম পামর, তিনি ভিন্ন

কে তোমাকে প্রবৃত্তি-সুলভ মলিন পঙ্কিল সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অমৃত ধামে লইয়া যাইতে পারে? বিবেচনা কর তোমার ভক্তি প্রভৃতি সদ্ভাবের জন্য ঈশ্বরের কিছুই নহে, তোমারই সম্পূর্ণ লাভ। তিনি তোমাকে নিঃস্বার্থ প্রেম ও যত্ন করেন তাই তোমার অনন্ত মঙ্গলের উদ্দেশে এই স্বর্গীয় বৃত্তি দ্বারা তোমাকে বিভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার দান অবহেলা করিও না। যখন দয়াময় পবিত্র ভাব দিয়া তোমার জীবনকে ক্ষণকালের জন্য মধুময় করেন, তখন সেইভাব যাহাতে স্থায়ী ও বৰ্দ্ধমান হয় তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। তাহাকে প্রচুর রূপে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিবে। তাঁহার যে অপার করুণা তোমার প্রতি অজস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখিবে। সে করুণার তুমি কি প্রতিক্রিয়া করিতেছ? তিনি তোমাকে প্রতি নিমেষে জীবন দান করিতেছেন, তুমি সে জীবন কি তাহাকে সমর্পণ করিয়াছ? মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে একান্তে প্রার্থনা কর, তিনি মুমুক্ষুদিগের বিষয়-তৃষ্ণা হরণ করেন, তিনি তোমার চির দিনের মলিন জীবন বিদূরিত করিয়া তোমাকে নব জীবন প্রদান করিবেন, যে জীবনের মধ্যবিন্দু ও লক্ষ্য এক মাত্র তিনিই হইবেন। সে জীবনে তোমার স্বভাব তৃণ হইতেও বিনত বিনম্র ও সুকোমল হইবে, তোমার চিত্ত সুস্থির, ইন্দ্রিয় সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় সংযত থাকিবে। সে জীবনে ঈশ্বরের অপার দয়া মহিমাদির নিদর্শন তোমার চিত্তে অহরহ জাগরূক থাকিয়া তুমি সতত উৎফুল্ল থাকিবে, তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ শ্রবণ স্মরণ করিবামাত্র তোমার প্রেমাশ্রু বিগলিত হইবে। তখন কতই অনুতাপ করিবে যে কেন অকিঞ্চিৎকর কাচ লইয়া মহামূল্য নিধিকে এত দিন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। তখন পৃথিবীতে থাকিয়াও বোধ হইবে তোমার আত্মা স্বর্গে দেবতা সাধু ভক্ত বৃন্দের সহিত প্রভুর আরাধনা ধ্যান ধারণা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তখন এক একটী করিয়া তোমার প্রত্যেক মলিনতা সংসার-স্পৃহা অপসারিত হইবে—প্রত্যেক হৃদয়গ্রন্থি এক এক করিয়া স্খলিত ও উন্মূলিত হইবে। যেমন পুরাকালে অশ্বমেধের বধ্য অশ্বের একটীও কৃষ্ণবর্ণ লোম থাকিলে তাহা যজ্ঞার্থে গৃহীত হইত না, তেমনি তুমি দেখিবে যে দয়াময় তোমাকে তাঁহার অমৃতধামের যোগ্য করিয়া গ্রহণ করিবেন বলিয়া একে একে তোমার কুটিল কামনা কদভ্যাস সমুদয় নিরসন করিতেছেন। দিন দিন তাঁহার অভয় পদে মতি বিশ্বাস আনন্দ ও নির্ভর বর্দ্ধিত করিতেছেন। তখন তোমার নয়ন স্বভাব কথাবার্ত্তা ও আচরণ হইতে একটী স্বর্গীয় সুন্দর জ্যোতিঃ বাহির হইবে। তখন তোমাকে দেখিলে বোধ হইবে যে এইখানে থাকিয়াই তুমি ব্রহ্মলোকবাসী হইয়াছ, সে লোক হইতে তোমার আর প্রচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

এ স্থলে বিচার্য্য এই যে জগদীশ্বর কি সকল মনুষ্যকে তাঁহাকে পাইবার অধিকারী করিয়াছেন ও তদুপযোগী উপায় করিয়া দিয়াছেন? তাঁহার কি পক্ষপাত আছে? আমরা যদি জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা স্বীয় বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করি ও তিনি আমাদিগের হৃদয়ে যে বিবেকরূপ বাণী প্রেরণ করেন তাহা শুনিতে অভ্যাস করি,

তাহা হইলে তাঁহাকে জানিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করিতে ও তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে আমাদিগের কায় মনে স্বতই প্রবৃত্তি হয়। এ নিমিত্ত কথিত হইয়াছে যে ভক্তি জন্য নহে। ভক্তি বীজ প্রত্যেকের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত আছে। মোহাভিনিবেশ সংসারা-সক্তি অজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবধান দ্বারা তাহা অঙ্কুরিত হইতে পায় না এই মাত্র। প্রেমের পরিণাম বা গাঢ় সান্দ্র প্রেমই ভক্তি। এক না এক বিষয়ে প্রেম সকলেরই আছে। তুমি ধন জন বিত্তে পুত্রে বা অন্য কোন বস্তুতে যে প্রেম স্থাপন করিয়াছ তাহা প্রত্যাহৃত করিয়া পরম প্রেমাস্পদের প্রতি অর্পণ কর, তোমার প্রেম সার্থক হইবে ও ক্রমে তাহা ভক্তি রূপ আকারে পরিণত হইবে। তুমি যে গ্রন্থ দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে পাওয়া যায় তাহা পাঠ ও আলোচনা কর, বিজ্ঞানবান আচার্য্য যে পরম তত্ত্বের উপদেশ দেন তাহা গ্রহণ কর, ঈশ্বরের নামগানাদি শ্রবণ কর, সূর্য্য চন্দ্র ওষধি বনস্পতি নদী বিহঙ্গ ঈশ্বরের যে মহিমা প্রতিনিয়ত ঘোষণা করিতেছে, এই বিশ্ব অনাহত শব্দে বিশ্বেশ্বরের অনন্তগুণের যে কীর্ত্তন করিতেছে তাহা আত্মার অভ্যন্তরে অনুভব করিতে অভ্যাস কর, অচিরাৎ তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইবেন। তাঁহাকে প্রেম করিতে তোমার সর্ব্বান্তঃকরণ ধাবিত হইবে। তুমি প্রত্যেক নিঃশ্বাসে আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ ও প্রত্যেক প্রশ্বাসে সাংসারিকতা বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। সে প্রেম দ্বারা চিত্ত রসিত ও আপ্লাবিত হইলে তাহাতে কি অন্য প্রেম স্থান পায়? অন্য প্রেম সমস্তই ভগবৎ প্রেমের অধীন হইয়া থাকিবে। আর ভক্তের প্রতি ভগবানের এই আদেশও যে তাঁহাকে হৃদয় সর্ব্বস্ব দিতে হইবে তবে তাঁহাকে পাইবে। যাহা কিছু করিবে তাঁহার উদ্দেশে তাঁহার অনুমোদিত বলিয়া করিবে, তবে এই খানেই তাঁহার সহিত বাস করিবে ও ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

বৈদান্তিক মত।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

নমু কর্ম্ম তথা নিত্যং কর্ত্তব্যং জীবনে সতি।
বিদ্যায়াঃ সহকারিত্বং মোক্ষংপ্রতিহি তৎব্রজেৎ।

জীবন থাকিতে নিশ্চয় নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অতএব সেই কর্ম্ম মোক্ষের প্রতি বিদ্যার সহকারি হউক।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে সংসার অজ্ঞানমূলক, জ্ঞানই সেই সংসার নিবর্ত্তক ও মুক্তির হেতু, কর্ম্ম নহে। এক্ষণে কথা এই যদি কর্ম্ম স্বয়ং মোক্ষহেতু না হয় তবে জ্ঞানের সহিত মিলিয়া তাহার হেতু হইবে। এক্ষণে এই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদিগের মত উত্থাপিত হইতেছে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে কেহই কর্ম্ম না করিয়া কদাচ এক দিনও থাকিতে পারে না। সকলেই অবশ হইয়া প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই স্মৃতিপ্রমাণে বুঝা যায় জীবৎ পুরুষের অবশ হইয়াও কর্ম্ম কর্ত্তব্যই হইতেছে। ইহার প্রতিপোষকে শ্রুতিও আছে, জ্ঞানের ন্যায় কর্ম্মও যাবজ্জীবন নিত্য অবশ্য কর্ত্তব্য। আর তুমি বলিতেছ উপযোগি নয় বলিয়া মুমুক্ষুর কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, এই আপত্তি নিরাসের জন্য বলা হইতেছে কর্ম্ম মোক্ষের হেতুভূত বিদ্যার সহকারিত্ব (ইতিকর্ত্তব্য ভাব) প্রাপ্ত হইবে, এই কারণে মুমুক্ষুর তাহা অনুষ্ঠেয়

হউক। বিদ্যা দ্বারা মুক্তি হয় শ্রুতিতে বিদ্যা পদে এই তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় বিদ্যা বা জ্ঞান যে মোক্ষসাধন তাহাই বুঝা যায়। আর যাহা সাধন বা করণ তাহা ইতিকর্ত্তব্য-সাপেক্ষ এই হেতু আর জ্ঞানের অন্য কোনও ইতিকর্ত্তব্য নাই এই হেতু কর্ম্মই তাহার সহকারি হইতে পারে।

যথা বিদ্যা তথা কর্ম্ম চোদিতত্বাবিশেষতঃ।
প্রত্যবায়স্মৃতেশ্চৈব কার্য্যং কর্ম্ম মুমুক্ষুভিঃ।

নির্ব্বিশেষে বিধি আছে বলিয়া বিদ্যা আর কর্ম্ম উভয়ই কর্ত্তব্য হইতেছে। প্রত্যবায়-স্মৃতিবলেও মুমুক্ষুর কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়।

জীবের কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন ও বিদ্যা দ্বারা মুক্তি হয় এই হেতু পারদর্শী যতিরা কদাচ কর্ম্ম করেন না ইহাই স্মৃতিবাক্য। এই স্মৃতিবাক্য-বলে মুমুক্ষুর কর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ, যদি এই আপত্তি উত্থাপন কর তবে শুন। মুমুক্ষুর যেমন জ্ঞান আবশ্যক সেইরূপ কর্ম্মও কর্ত্তব্য। ইহার হেতু এই, যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই এক-যোগে জানে তাহার মুক্তি হয়, এই শ্রুতিতে বিদ্যা ও অবিদ্যার সম্বন্ধে সমুচ্চয়-বিধি বিহিত হইয়াছে। আর বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করিয়া এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-বিষয়ে আসক্ত হইয়া মনুষ্য অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কর্ম্মের অননুষ্ঠানে এই প্রত্যবায়-স্মৃতি আছে। ইহার বলে কর্ম্ম কর্ত্তব্যই হইতেছে। উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধে কর্ম্মনিষেধক যা কিছু অপস্মৃতি আছে তাহা জ্ঞানের প্রশংসাপর বলিয়া জানিও।

নন্বু ধ্রুবফলা বিদ্যা নান্যং কিঞ্চিদপেক্ষতে।
নাগ্নিষ্টোমো যথৈবান্যং ধ্রুবকার্য্যোঽপ্যপেক্ষতে।

বিদ্যা ধ্রুবফল, সে অন্য কিছুই অপেক্ষা করে না, এইরূপ বলিও না। দেখ অগ্নিষ্টোম ধ্রুব কার্য্য হইলেও অন্যকে অপেক্ষা করে।

কর্ম্ম বিদ্যার সহকারি হউক পূর্ব্ব শ্লোকের ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্তী তাহা খণ্ডন করিতেছেন। বিদ্যা সহকারি-নিরপেক্ষ, কারণ সে ধ্রুবফল। পূর্ব্ববাদী ইহার ব্যভিচার দেখাইয়া পরিহার করিতেছেন। না, এরূপ বলিও না। অগ্নিষ্টোম একটী ধ্রুবফল কার্য্য তথাপি সামবেদের অবয়ব-বিশেষ যে উদ্গীথশাস্ত্র তৎপ্রকাশিত দেবতাজ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত অগ্নিষ্টোম ফলপ্রদানে অসমর্থ। সেইরূপ বিদ্যা যদিও ধ্রুবফলা তথাচ নিত্য কর্ম্মের সহিত তাহার সমুচ্চয় হউক।

তথা ধ্রুবফলা বিদ্যা কর্ম্ম নিত্যমপেক্ষতে।
ইত্যেবং কেচিদিচ্ছন্তি ন কর্ম্ম প্রতিকূলতঃ।

ধ্রুবফলা বিদ্যা নিত্য কর্ম্মকে অপেক্ষা করে এইরূপ কেহ কেহ ইচ্ছা করেন কিন্তু বিদ্যা কর্ম্মকে প্রতিকূল বলিয়া অপেক্ষা করে না।

এইরূপ কেহ কেহ ইচ্ছা করেন এই পর্য্যন্ত ধরিয়া পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার করা হইল। এখন ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন। বিদ্যা স্বকার্য্যে কর্ম্মকে অপেক্ষা করে না, কারণ কর্ম্ম বিদ্যার প্রতিকূল—বিরুদ্ধ। যাহা স্বপ্রতিকূল তাহা আপনার সহায় হইতে পারে না। অন্ধকার কি আলোকের সহায় হয়?

বিদ্যায়াঃ প্রতিকূলং হি কর্ম্ম স্যাৎ সাভিমানতঃ।
নির্ব্বিকারাত্মবুদ্ধিশ্চ বিদ্যেতীহ প্রকীর্ত্তিতা।

জাত্যাদি অভিমান বশতই কর্ম্ম বিদ্যার নিশ্চয় প্রতিকূল, আর নির্ব্বিকার আত্মবুদ্ধি বেদান্ত শাস্ত্রে বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে কর্ম্ম বিদ্যার প্রতিকূল। এক্ষণে সেই প্রতিকূলতা

প্রমাণিত হইতেছে। কর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি জাত্যভিমানী পুরুষ কর্ত্তৃক সম্পাদ্য। আর বিদ্যা জাত্যাদি-অভিমান-শূন্য যে পুরুষ তন্নিষ্ঠ। এই হেতু কর্ম্ম ও বিদ্যার বিরোধ প্রসিদ্ধই আছে। এই প্রসিদ্ধি পরে উপপাদিত হইতেছে। আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা নহি কিন্তু আমি কূটস্থ ব্রহ্মই, এইরূপ ব্রহ্মাত্মাকার যে অন্তঃকরণ-বৃত্তি বিদ্বানেরা প্রকর্ষের সহিত ইহাকেই বিদ্যা বলিয়াছেন। আর আমি ব্রাহ্মণ, এই কর্ম্মের কর্ত্তা, এই কর্ম্মসাধ্য ফল আমার হইবে এইরূপ অভিমান-পূর্ব্বকই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ইহা প্রত্যক্ষ। সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ স্পষ্টই দাঁড়াইতেছে।

অহং কর্ত্তা মমেদং স্যাদিতি কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে।
বস্ত্বধীনা ভবেৎ বিদ্যা কর্ত্ত্রধীনো ভবেদ্বিধিঃ।

আমি কর্ত্তা, আমার এইটী হইবে এই রূপে কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। বিদ্যা বস্তুর অধীন আর বিধি কর্ত্তার অধীন।

পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞানের অন্তর্মুখ প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের বহির্মুখ প্রবৃত্তি এই ভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রবৃত্তিতে বিরোধ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে উৎপত্তিতেও বিরোধ দেখাইতেছেন। বিদ্যা প্রমাণ বস্তুর অধীন; যেমন প্রমাণ, যেমন বস্তু, জ্ঞান ঠিক সেইরূপই হয়, তাহাতে পুরুষের স্বাতন্ত্র বা কর্ত্তৃত্ব কিছুমাত্র নাই। আর বিধি বা বিধেয় কর্ম্ম কর্ত্ত্রধীন —কর্ত্তৃতন্ত্র, পুরুষ তাহা করিলেও করিতে পারে, না করিলেও না করিতে পারে অথবা অন্যথাও করিতে পারে। এইরূপ পুরুষের স্বাতন্ত্র্য ও অস্বাতন্ত্র্যরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ কারণ হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎপত্তি হইতেছে বলিয়া এই উভয়ের সমুচ্চয় কদাচ হইতে পারে না।

কারকাণ্যুপমৃদ্নাতি বিদ্যা বুদ্ধিমিবোষরে।
ইতি তৎসত্যমাদায় কর্ম্ম কর্ত্তুং ব্যবস্যতি।

আরও বিদ্যা হইলে নিরাশ্রয়তা হেতু কর্ম্মের স্বরূপই লাভ হইতেছে না সুতরাং সে জ্ঞানের সহকারী কিরূপে হইবে এই বলিয়া এই উভয়ের অন্যরূপ বিরোধ প্রদর্শিত হইতেছে। উষর-প্রদেশ-জাত জল-বুদ্ধিকে যেমন উষর-স্বভাব-লম্বিনী বিদ্যা নষ্ট করিয়া দেয় সেইরূপ আত্মাতে অধ্যস্ত কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধিকে আত্ম-স্বভাব-লম্বিনী বিদ্যা বিনষ্ট করিয়া দিতেছে ইহা সত্যই। যখন বিনষ্ট করিয়া দিতেছে তখন তাহার সেই কর্ত্তৃত্বাদিকে সত্য জানিয়া জ্ঞানী কি রূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। অর্থাৎ কর্ম্ম কর্ত্তৃনিষ্ঠ। জ্ঞানোদয়ে কর্ত্তৃত্বাদি নষ্ট হইলে কর্ম্ম নিরাশ্রয় হইয়া যায়।

বিরুদ্ধত্বাদতঃ শক্যং কর্ম্ম কর্ত্তুং ন বিদ্যয়া।
সহৈব বিদুষা তস্মাৎ কর্ম্ম হেয়ং মুমুক্ষুণা।

জ্ঞানী এইরূপ বিরোধ হেতু জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করিতে অসমর্থ। অতএব মুমুক্ষু কর্ম্মত্যাগী হইবেন।

দেহাদ্যৈরবিশেষেণ দেহিনো গ্রহণং নিজং।
প্রাণিনাং তদবিদ্যোত্থং তাবৎ কর্ম্মবিধির্ভবেৎ। ১৬।

সকলের দেহাদির সহিত নির্ব্বিশেষে দেহীর গ্রহণ স্বাভাবিক, তাহা অবিদ্যাকৃত, ঐ অবস্থায় কর্ম্মবিধি হইবে।

যদি বেদান্তজ্ঞান কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-ভেদের নাশক হয় তাহা হইলে জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড নির্বিষয় হইয়া যায় সুতরাং নির্বিষয় কর্ম্মকাণ্ড অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। কর্ম্মকাণ্ডের অপ্রামাণ্যে স্বাধ্যায় অধ্যয়ন বিধিতেও বিরোধ ঘটে। কিন্তু ইহা নিতান্তই অনিষ্টজনক। এই আশঙ্কায় প্রশ্ন হইতেছে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে না পরে কর্ম্মকাণ্ড অপ্রমাণ হইবে। উত্তরস্থলে কহিতেছেন প্রথমে নহে। দেহীর— আত্মার দেহাদির সহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রাণ ও তৎধর্ম্মের সহিত অবিবেক

দ্বারা আপনার যে গ্রহণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সহিত যে আপনার অভেদ-বুদ্ধি তাহা স্বাভাবিক। মনুষ্যের এইরূপ যে আত্মবুদ্ধি তাহা অবিদ্যা-জনিত—অনাদি অজ্ঞান হইতে উত্থিত ভ্রান্তি-সংস্কার-জনিত, কারণ সর্ব্বসাধারণেই এইরূপ আত্মজ্ঞান দেখা যায়। অতএব যাবৎ আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ,আমি ইন্দ্রিয়যুক্ত,আমি সকাম, আমি বলবান ইত্যাকার ভ্রান্তি-জ্ঞানের অনুবৃত্তি হয় তাবৎ কর্ম্মবিধি অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড প্রমাণ হইবে। যে প্রমিতির জনক সেই প্রমাণ। যে অধিকারী বেদ তাহারই প্রমিতি-জনক, কদাচ অনধিকারীর পক্ষে নহে। এখন বুঝ, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত প্রমিতির জনক কর্ম্মকাণ্ড যখন অধিকারী লাভ করিতে পারিল তখন তাহার ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। সুতরাং তোমার স্বাধ্যায় অধ্যয়নে বিরোধ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক।

নেতি নেতীতি দেহাদীনপোহ্যাত্মাবশেষিতঃ।
অবিশেষাত্মবোধার্থং তেনাবিদ্যা নিবর্ত্তিকা।

ইহা নহে, ইহা নহে, এই শ্রুতি দ্বারা দেহাদি সমস্তকে ব্যাবৃত্ত করিয়া অবিশেষ আত্মবোধের নিমিত্ত আত্মা অবশিষ্ট থাকেন তদ্দ্বারা অবিদ্যা নিবর্ত্তিত হয়।

নেতি নেতি, এ আত্মা নয়, এ আত্মা নয়, এই শ্রুতি দ্বারা ভ্রান্তি দৃষ্টিতে আত্মার আত্মীয় ভাবে স্বরূপ ভাবে গৃহীত দেহাদিকে নিষেধ করিয়া প্রতিষেধের অবধি বা সীমাভূত আত্মা অবশেষ থাকেন। কি জন্য এইরূপ প্রতিষেধ? এই আকাঙ্ক্ষায় কহিলেন অবিশেষ আত্মবোধের নিমিত্ত। অবিশেষ যে আত্মা তাহার বোধ কি না নির্ব্বিশেষ চিৎ সৎ ও আনন্দ স্বভাবের যে আবির্ভাব তন্নিমিত্ত। পরাক্ অর্থের (বহির্বস্তুর) ব্যাবৃত্তি হইলে তাহার অবস্থিতির অবধি বা সীমাভূত প্রত্যক্ অর্থই (অন্তর্বস্তু) অবশিষ্ট থাকেন। সেই প্রত্যক তত্ত্ব বোধেরই নিমিত্ত। প্রত্যক্-তত্ত্ব-বোধে কি ফল? এই আকাঙ্ক্ষায় পরে কহিলেন, যন্নিবন্ধন দেহাদিতে আত্মাভিমান উৎপন্ন হইয়া কর্ম্মে অধিকারের হেতু হইয়া আছে সেই অবিদ্যাই ঐ প্রত্যক্-তত্ত্ব-বোধ দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। অতএব নিমিত্তের অভাবে নৈমিত্তিকেরও অভাব হয় এই ন্যায়ে যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁহার নিকট কর্ম্মকাণ্ডের আর উপযোগিতা থাকিল না। অর্থাৎ ফলোপধায়ক জ্ঞানের জনক নয় বলিয়া কর্ম্মকাণ্ড তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে অবশ্যই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। যাহার তীব্র ক্রোধের নিবৃত্তি হইয়াছে আভিচারিক বিধিশাস্ত্র আর কি তাহার কোনও প্রয়োজনে আইসে?

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

নীচে ঝুনাগড়ের নিকট যেখানে শবদাহ করে সেইখান হইতে গ্রীনাড়ি পাহাড়ে উঠিবার পথ আছে। সেই স্থানে অনেক ঠাকুর লইয়া একজন ব্রহ্মচারি ছিলেন। শিবনারায়ণ সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারি ও ব্রহ্মচারির ঠাকুরকে প্রণাম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ব্রহ্মচারি রাগ করিয়া বলিলেন, "বেটা, তুই কে যে আমার ঠাকুরকে প্রণাম করিলি না?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "ঠাকুর কোথা আছেন?" ব্রহ্মচারি বলিলেন, "দেখিতেছিস্ না এই সকল ঠাকুর এখানে ধরা আছে।" শিবনারায়ণ বলিলেন, দেখিতেছি ও সকল তো পাথর এবং পিত্তলের পুত্তলি রাখিয়াছ। উহাদিগকে প্রণাম করিতে গেলে তো কত থাল, গেলাস ইত্যাদি পিত্তল কাঁসার নির্ম্মিত দ্রব্য আছে এবং পাহাড় পর্ব্বত ইত্যাদি ও কত প্রস্তর আছে সে সকলকে আমি কত প্রণাম করিব?" ব্রহ্মচারি বলিলেন, তুমি কে, তুমি কোন শাস্ত্র পড়িয়াছ, তুমি গৃহস্থ না

সাধু?” শিবনারায়ণ বলিলেন আমি গৃহস্থ কি সাধু জানি না,এবং গৃহস্থ ও সাধু কাহাকে বলে তাহাও আমি দেখি নাই। ব্রহ্মচারি শুনিয়া হাত জোড় করিয়া শিবনারায়ণকে বসিবার জন্য একটী কম্বল পাতিয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছেন?” শিবনারায়ণ বলিলেন, “আমি কোন শাস্ত্র পড়ি নাই এবং সকল শাস্ত্র পড়িয়াছি। পরে ব্রহ্মচারিকে বলিলেন তোমাদের তো শাস্ত্র বেদেতে লেখাই আছে, সাকার বিরাট পরব্রহ্মের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ মন; এই প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপকে পূজা নমস্কার প্রণাম ও ধ্যান পূর্ব্বক পূজা কর, ওঁকার মন্ত্র জপ কর এবং অগ্নিতে আহুতি দাও। এই জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগকে সকল কষ্ট দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবেন, সদা আনন্দ রূপ মুক্ত স্বরূপ থাকিবেন। ব্রহ্মচারি উঠিয়া শিবনারায়ণকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, “ঠিক মহারাজ, আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বাস হয় না এবং বুঝিতেও পারি না।” সেখান হইতে শিবনারায়ণ গ্রীনাড়ির উপর উঠিতে লাগিলেন। দেখিলেন পথের ধারে গুহার মধ্যে ২।১ জায়গায় সাধুরা বসিয়া আছেন, যাত্রিরা ঠাকুর দর্শন করিবার জন্য উপরে উঠিবার সময় সেই সাধুদিগকে চাউল কড়ি এবং পয়সা দিয়া যায়। শিবনারায়ণ উপরে উঠিয়া রমানন্দ স্বামীর ছত্রে যাইলেন। সেখানে একজন অতি মহান্ মহান্ত ছিলেন। গ্রীনাড়ির মধ্যে তাঁহার নাম বিশেষ বিখ্যাত ছিল। শিবনারায়ণ ঐ মহান্তের সম্মুখে যাইয়া বসিলেন। মহান্ত নমস্কার না করাতে রাগ করিয়া বলিলেন, “তুমি কে? তুমি কোন সম্প্রদায়ের সাধু?” শিবনারায়ণ বলিলেন, “সম্প্রদায় কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না, আমি মনুষ্য (আদমি)। তুমি যেমন মনুষ্য আমিও সেইরূপ মনুষ্য।” মহান্ত বলিলেন, “দেখিতেছি ত যে তুই বেটা মনুষ্য। তোর হাত পা আছে। তবে তুই কে, কি জাত?” শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি বলিলে তবে তুমি জানিতে পারিবে, আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিব; তুমি ঠিক কিরূপে জানিতে পারিবে?” মহান্ত রাগ করিয়া বলিলেন, “তুই এখান হইতে যা, দূর হ”। শিবনারায়ণ সেখান হইতে উঠিয়া বিচার করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়াছি গ্রীনাড়ির উপর বড় বড় অঘোর ঋষি মহাত্মা আছেন; একবার চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিব তাঁহারা কোথায় আছেন। প্রথমেই তো এই এক শ্রেষ্ঠ মহাত্মাকে দেখিলাম।” শিবনারায়ণ সেখান হইতে ক্রমশঃ একজন আচারি * ও একজন ব্রহ্মচারির নিকট গেলেন। সেখানেও পূর্ব্বকার মহান্তের ন্যায় কথাবার্ত্তা হইল। পরে সেখান হইতে গ্রীনাড়ির উপর অম্বিকা ভবানী দেবীর মন্দিরেতে যাইয়া দেখিলেন একজন গৃহী সাধু বসিয়া আছেন; একটা প্রদীপ জলিতেছে ও কুণ্ডে বিভূতি রহিয়াছে। এবং একটী প্রস্তরে সিন্দুর মাখাইয়া রাখিয়াছে। যাত্রিরা যাইয়া সেখানে পয়সা কড়ি চাউল দাউল আটা ইত্যাদি দেয়। এবং ঐ প্রদীপের আলোকে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে দর্শন করিয়া উহাকে দেবী মাতা বলিয়া পূজা করে। মন্দির হইতে শিবনারায়ণ দত্তাত্রেয় ঋষির কমণ্ডলু নামক এক পুকুরের ধারে গেলেন। সেখানে উলাঙ্গ সাধু মহাত্মা নাগাদিগের বাস। কেহ আসিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করে, “তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ও কোন মঠের সাধু; গিরি পুরি না ভারতি? যে মহাত্মা ঠিক উত্তর করিতে পারেন তাঁহাকে সেখানে এক রাত্রি থাকিতে দেয়, না পারিলে হাত পা বান্ধিয়া কাপড় চোপড় সমস্ত কাড়িয়া লয়। এবং লঙ্গটী মাত্র পরাইয়া তাড়াইয়া দেয়। যে দিবস শিবনারায়ণ সেখানে যান সে নাগারা চারিজন সাধু মহাত্মাকে সেইরূপ করিয়াছিল। অনেক সাধু মহাত্মা গুরুদেব উপর এইরূপ অত্যাচার হয় দেখিয়া ঐ চারিজন সাধু জুনাগড়ের মুসলমান নবাবের নিকট নালিশ করিল। গ্রীনাড় পাহাড় নবাবের অধিকার ভুক্ত। নবাব নালিশ শুনিয়া অতিশয় রাগ করিয়া বলিলেন, অনেকে আসিয়া নালিশ করে কিন্তু আমি মিথ্যা ভাবিয়া কিছু করি নাই। বোধ হয় সত্যই ইহারা সাধুদিগকে কষ্ট দিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়।’ সিপাই পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কেন এরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া গরিবদিগের জিনিস পত্র কাড়িয়া কুড়িয়া লও। গ্রীনাড়ের মধ্যে সকলেই তোমাদিগকে মহাত্মা বলিয়া জানে। এবং তোমরা উলাঙ্গ অবস্থায় থাক। সেই মহাত্মা নামের কি এই পরিচয় যে লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া ডাকাতের ন্যায় কাড়িয়া কুড়িয়া লও।” নাগারা নবাবের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া দোষ অস্বীকার করিল। নবাব তখন তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—“যদি তোমরা স্বীকার না কর তাহা হইলে তোমাদিগকে দণ্ড দিব।” তাহাতে

* আচার্য্য শব্দের অপভ্রংশ।

নাগারা বলিল,"ধর্ম্মাবতার আমরা কি করিব,আমাদের অপরাধ কি, পরম্পরা ক্রমে আমাদের পরমগুরুর এইরূপ আজ্ঞা। নবাব শুনিয়া বলিলেন, ইহারা গরিব লোক; যেরূপেই ইহারা খোদাকে অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর গুরুকে ভজনা উপাসনা করুক না কেন মাড়াই মটের নাম লউক আর নাই লউক তাহাতে তোমাদের হানি কি? এখন আমি হুকুম দিতেছি যে এখনি যাইয়া যাহা ইহাদের লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দাও এবং ১৫ দিনের মধ্যে গ্রীনাড় হইতে বাহির হইয়া যাও; গ্রীনাড়ে তোমরা থাকিও না। আমি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম। যাহা বলিলাম তাহা যদি না কর তাহা হইলে তোমাদের কয়েদ করিব। আগে ভাল ভাল মহাত্মা দুই একটা থাকিতেন, এখন যাহাদিগকে দেখিতেছি তাহারা ঠক তৃষ্ণাতুর। নাগা সন্ন্যাসিরা নবাবকে ছেলাম করিয়া চলিয়া গেল ও তাঁহার আজ্ঞামত সেই চারিজন সাধুর যাহা কাড়িয়া লইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিল কিন্তু গ্রীনাড় হইতে বাহির হইল না। এবং নবাবও তাহার কোন খবর লইলেন না। শিবনারায়ণ তাহার পর গোরক্ষনাথের (ছাতা) অর্থাৎ সমাধিস্থানে গেলেন। এবং কবির দাসের স্থান দর্শন করিয়া গ্রীনাড়া পাহাড়ের উপর নীচে চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, স্বরূপে নিষ্ঠাবান মহাত্মারা সেখানে আছেন কি না। পাহাড়ের সকল গুহা এবং মন্দিরে ঘুরিলেন কিন্তু পাহাড়ের সকল স্থানে ঘুরিয়া শ্রীবৈষ্ণবের মধ্যে ২১ জন মহাত্মা ভক্তজন দেখিতে পাইলেন যাঁহাদের ঈশ্বরেতে ভক্তি শ্রদ্ধা নিশ্চল হইয়া মনেতে কোন কপটতা নাই। এবং একজন আঘোরিকে দেখিলেন। তিনিও শান্ত ও স্বরূপেতে অচল হইয়াছিলেন। শিবনারায়ণ দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষ সকল জাতি স্বরূপেতে পরব্রহ্মের স্বরূপ, সকলের মধ্যে পরব্রহ্ম একই পুরুষ বিরাজমান আছেন। সকলই স্বরূপেতে মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু যে ব্যক্তির স্বরূপেতে বোধ নাই সে ব্যক্তিকে অবোধ বলা হয়। এবং যে ব্যক্তির স্বরূপেতে নিষ্ঠা হইয়াছে অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মাতে অভেদ দেখিতেছেন অর্থাৎ একরূপ সকল চরাচরকে দেখিতেছেন তাহাকেই সিদ্ধ পুরুষ বলে। সেইখানের সাধু সিদ্ধপুরুষেরা গৃহস্থদিগকে নানা প্রকারের মিথ্যা ভয় দেখাইয়া দিত যে সেখানে বড় বড় আঘোরি আছে; তাহারা মনুষ্যদিগকে ধরিয়া ধরিয়া খাইয়া ফেলে। তাহাতে গৃহস্থ লোক জিজ্ঞাসা করিত যে—"আপনারা রাত্রে এখানে থাকেন কি প্রকারে? সাধুরা বলিয়া দিতেন "আমরা সিদ্ধ পুরুষ আমাদের খাইবে না। তোমাদের খাইয়া ফেলিবে।" কিন্তু সাধুদের একথা বলা মিথ্যা, সেস্থানে এক আধ জন যে আঘোরি থাকিতেন তাঁহারা জ্ঞানবান্ মনুষ্য। যদ্যপি একেবারে খাদ্য সামগ্রী না পাওয়া যায় তাহা হইলেই প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কোন স্থানে আঘোরিরা মরা মানুষ অথবা পশুদিগের মাংস খায় কিন্তু জীবিত মনুষ্যকে তাহারা খায় না। যেরূপে শৃগাল কুক্কুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কোন খানে মরা জীব জন্তু পড়িয়া থাকিলে খায়, সেরূপ তাহারা খায়। তাহাতে তাহাদের কোন ঘৃণা নাই। এবং কতলোকও সাধনের জন্যও খায়। শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিলেন—যে মনুষ্যরা কত গল্প করেন যে অমুক অমুক স্থানে অনেক সিদ্ধ পুরুষ আছেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছি যে এখানকার মধ্যে শ্রীবৈষ্ণবদের মধ্যে ২১ জন ভক্ত নিশ্চল এবং একজন অঘোরিমতে সিদ্ধ পুরুষ স্বরূপেতে নিষ্ঠাবান। এবং দেখা যাইতেছে যে সমুদয় কল্পিত তীর্থের মধ্যে হরিদ্বারের নিকটে হৃষীকেশে ২১৪ জন বিদ্বান পণ্ডিত মহাত্মা আছেন। আর যাহা আছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে। পৃথিবীর উপরে পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মাই সিদ্ধ পুরুষ বিরাজমান, সকল স্থানেই পরিপূর্ণ আছেন। শিবনারায়ণ মনে মনে এই বিচার করিয়া গ্রীনাড় পাহাড়ের উপর কিছু দিন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেইস্থানের নিকট শরাওগি নামে এক সম্প্রদায় আছে ও তাহাদের সেখানে একটা বৃহৎ ঠাকুরবাড়ি কিল্লার মতন আছে। তাহার ভিতর হইতে নামিবার সিড়ি ঝুনাগড় অবধি। সেই সিড়ির পথের নিকট সিড়ির কাছ হইতে ১০।১২ হাত অন্তরে জঙ্গলের মধ্যে এক পাথরের নীচে গুহার ন্যায় এক স্থান আছে। শিবনারায়ণ তাহার ভিতরে থাকিতেন। সেখানকার সাধু ও গৃহস্থেরা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিত যে তুমি কে? শিবনারায়ণ বলিতেন—আমি মনুষ্য। তাহারা শুনিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া চলিয়া যাইত। তাহারা যে ঘৃণা করিত তাহার কারণ এই যে, শিবনারায়ণ তাহাদের নিকট সাধু মহাত্মা অথবা পরমহংস বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন না ও তাহারা তাঁহার গেরুয়া কাপড় বা সাধুর অপর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইত না। তিনি ২।১ দিন পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে কোন গৃহস্থ কিম্বা সাধু কেহই জিজ্ঞাসা করিত না যে, আপনি

এখানে কেন থাকেন ও কি আহার করেন। শিবনারায়ণ সেখানে সঞ্জীবনী নামক বৃক্ষের পত্র খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতেন। দেখিলেন যে গৃহস্থ ও সাধুদের সত্যে নিষ্ঠা নাই কেবল মিথ্যা ভেকে ও প্রপঞ্চেতে নিষ্ঠা আছে কাহারও প্রপঞ্চ করিলে সকলে মানে। এইরূপ অবোধদের জন্য প্রাণরক্ষার জন্য কত জ্ঞানিরা পর্য্যন্ত প্রপঞ্চ করিয়া থাকেন। শিবনারায়ণ ও এক দিবস কি করিয়াছিলেন? যেস্থানে বসিয়াছিলেন সেথান হইতে সিড়ি পর্য্যন্ত জঙ্গল পরিস্কার করিয়া যাহাতে তাঁহাকে সকলে দেখিতে পায় এইজন্য পাঁচটা ছোট বড় চিক্কন পাথর লইয়া সেখানে পুঁতিয়া রাখিলেন। একটা মধ্যে একটু নীচু করিয়া পুঁতিলেন ও তাহার চারিদিকে আর চারিটা তাহার অপেক্ষা কিছু উঁচু করিয়া পুঁতিলেন এবং ইট গুঁড়া করিয়া একটা পাথরেতে মাখাইলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন মহাবীর এবং মধ্যের প্রস্তরটার নাম ভুবনেশ্বর বলিয়া কল্পিত করিলেন। অপর পাথর গুলির মধ্যে কাহাকেও বিষ্ণু ভগবান কাহাকেও দেবী মা এবং কাহাকে গণেশ জী নাম দিলেন। সেই জায়গার নাম রাখিলেন পঞ্চতীর্থ। এবং সেই স্থান লেপিয়া পুছিয়া উত্তম রূপে পরিস্কার করিয়া দিলেন এবং জঙ্গল হইতে পত্র পুষ্প তুলিয়া সেই পাঁচটা পাথরের উপর উত্তম রূপে চাপাইয়া দিলেন এবং যত যাত্রী দর্শন করিবার জন্য সেই পথ দিয়া উপরে উঠিত তাহাদিগকে শিবনারায়ণ বলিতেন যে—"তোমরা উপরে দর্শন করিবার জন্য যাইতেছ বটে কিন্তু এই স্থানে প্রথম দর্শন না করিয়া গেলে সে স্থানে যথার্থ দর্শন হইবে না, কেন না এই স্থান স্বর্গের দুয়ার পঞ্চতীর্থ। এবং হনুমানের এখানে পাহারা আছে। এখানে দর্শন করিলে সকল স্থানের দর্শন সফল হইবে। এই কথা শুনিবা মাত্র যাত্রিরা পয়সা আধুলা চাউল দাউল ময়দা ইত্যাদি সেই পাথর ঠাকুরের নিকট রাখিতে লাগিল এবং পত্র পুষ্প দিয়া সেই ঠাকুরের পূজা করিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিতে লাগিল। কোন কোন যাত্রি জিজ্ঞাসা করিত—এই ঠাকুরের নাম কি? শিবনারায়ণ নাম ধরিয়া বলিয়া দিতেন এবং কোন কোন যাত্রি বলিত—"কয়েক বার আমি উপরে দর্শন করিয়া গিয়াছি কিন্তু এখানে তখন এ তীর্থ দেখি নাই, বোধ হয় ইহা নূতন হইয়াছে।" শিবনারায়ণ বলিলেন—"এখানে জঙ্গল ছিল বলিয়া তোমরা তখন দেখিতে পাও নাই। এটা অনাদি কাল হইতে আছে আগে গুপ্ত ছিল এক্ষণে জঙ্গল পরিস্কার করাতে প্রকাশ হইয়াছে।" তাহারা সেই কথা বিশ্বাস করিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত। সন্ধ্যা নাগাইত এক দিনেতে ॥১৫ পৌনে নয় আনা পয়সা পড়িত এবং ১৫। ১৬ সের আন্দাজ চাউল, দাউল, ময়দা ইত্যাদি জমিত। ঐ পাহাড়ের উপর একজন মুদি দোকানদার ছিল। শিবনারায়ণ তাহাকে ডাকিয়া সেই সকল দ্রব্য তাহার কাছে রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে যখন আমার প্রয়োজন হইবে তখন তোমার নিকট হইতে লইব। মুদি বলিল আপনার যত আবশ্যক হয় আমার নিকট লইবেন। শিবনারায়ণ সেই স্থানে ২। ৪ দিন বসিয়া থাকিবার পর ঝুনাগড়ের বাবু এবং মহাজন লোক শুনিতে পাইলেন একজন মহাত্মা কয়েক দিবসাবধি পাহাড়ে আছেন, আহার হয় নাই এবং কাপড়ও তাঁহার কাছে নাই কেবল মাত্র একখানি ছেঁড়া চাদর আছে। সেই কথা শুনিয়া বাবু এবং মহাজন প্রভৃতি এক মোন ময়দা, ডাল, চাউল ঘৃত ছোলা গুড় ইত্যাদি তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ সেই মুটিয়াকে বলিলেন—"বাবা তুমি যে স্থান হইতে এ সমস্ত দ্রব্য আনিয়াছ সেই স্থানে ফিরাইয়া লইয়া যাও, আমি এখানে থাকিব না, এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব। সেই লোক ফিরাইয়া লইয়া গেল না। এবং "আমার উপর বাবু রাগ করিবেন"—এই বলিয়া সেই সকল দ্রব্যাদি সেইখানে রাখিয়া সে চলিয়া গেল। শিবনারায়ণ একজন সাধুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে এখানে এই সমস্ত দ্রব্য আছে, তোমাদের খাইতে ইচ্ছা হয় তো লইয়া খাও, আমি এখন ঝুনাগড়ে যাইতেছি। শিবনারায়ণ এই বলিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া ঝুনাগড় গেলেন। ঝুনাগড় হইতে সুদামাপুরের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতে দ্বারকাধাম যাইলেন।

দ্বারকাতে যেখানে কৃষ্ণ ভগবানের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে সেই মন্দিরে যাইয়া শিবনারায়ণ পাণ্ডাদের বলিলেন—আমি কৃষ্ণ ভগবানকে দর্শন করিব, আমাকে দর্শন করাইয়া দাও। এক জন পাণ্ডার রূপার খড়ম পায়ে ছিল, তিনি বলিলেন কৃষ্ণ ভগবানকে প্রণামি স্বরূপ ২৸৹ টাকা দাও তবে তুমি দর্শন করিতে পাইবে। শিবনারায়ণ বলিলেন তুমি বলিতেছ যে আগে ২৸৹ টাকা প্রণামি দাও তবে কৃষ্ণ ভগবানকে দর্শন হইবে। যাহার নাম কৃষ্ণ ভগবান অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি জগৎ চরাচরকে ভোগ্য বস্তু দিতেছেন এবং পালন করিতেছেন। তাঁহাকে আমরা মনুষ্য হইয়া কি দিব, আমাদের কি আছে, আমরা কি উৎপত্তি করি-

য়াছি যে তাঁহাকে সেই বস্তু দিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার দর্শন পাইব। আমরা একটা তৃণ ঘাস উৎপত্তি করিতে পারি না ও আমরা অহংকার করি যে এই বস্তু আমার, উহা আমি ঠাকুরকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে দিতেছি—এটা আমাদের বলা এবং বুঝা ভুল।আপনারা দিবারাত্রি সেই ঠাকুরের কাছে থাকেন এবং পূজা পাঠ করিতেছেন, তবুও আপনাদের ভ্রান্তি অজ্ঞানতা লয় হইতেছে না, এবং বরঞ্চ তৃষ্ণা ও আপনাদের নিবৃত্তি হইতেছে না আরও তৃষ্ণা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে।" তখন সেই পাণ্ডা রাগ করিয়া বলিল—তুই কে, যে আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আসিয়াছিস, দর্শন করিতে আসিয়াছিস না আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আসিয়াছিস? দর্শন করিস তো টাকা দে নতুবা এখান হইতে চলিয়া যা। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন, যে, এত জ্ঞানের কথা বলিলাম, কিন্তু তৃষ্ণার জন্য ইহারা জড় হইয়া আছে, একটিও সত্যভাব গ্রহণ করিতে পারিল না। যেমন ইহারা জড়কে ইষ্টদেব বলিয়া মানে ইহাদের তো সেই-রূপ বুদ্ধি হইবে, বলহীন শক্তিহীন তেজহীন হইবে। শিবনারায়ণ সেই পাণ্ডাকে বলিলেন, যাহার কাছে পয়সা না থাকিবে সে কিরূপে দর্শন পাইবে। পাণ্ডারা তাহা শুনিয়া বলিল, যাহার কাছে পয়সা না থাকিবে সে দর্শন পাইবে না। শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার নিকটে তো পয়সা নাই, তবে কি আমি দর্শন পাইব না? পাণ্ডারা বলিল, বিনা পয়সায় দর্শন পাইবি না। শিবনারায়ণ বলিলেন, এইখানে মন্দিরের মধ্যে যে কৃষ্ণ ভগবান আছেন, তাহা পাথরের না কাঠের না কোন ধাতুনির্ম্মিত না মৃত্তিকার। যদ্যপি পাথর কাঠ অথবা ধাতুনির্ম্মিত কিম্বা মৃত্তিকার হন তাহা হইলে তো সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে উহা আছে,তোমাদের এখানে দর্শন করিবার প্রয়োজন কি। পৃথিবীতে যত তীর্থে মন্দিরের মধ্যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করা আছে, তাহা কোন ঠাঁই মৃত্তিকা কোন ঠাঁই প্রস্তর ও কোন ঠাঁই ধাতু ইত্যাদির নির্ম্মাণ। এই প্রস্তরাদি ব্যতীত কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইতে পারে না। যদ্যপি ইহা ব্যতীত অন্য পদার্থের হয় তাহা কেবল মাত্র অল্প সময়ের জন্য। বরফেও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারে। এই সকল ধাতুর মধ্যে এই কৃষ্ণ ভগবান কোন ধাতুর। তিনি নিরাকার না সাকার ব্রহ্ম? যদ্যপি সাকার ব্রহ্ম হন তাহা হইলে ত এই সমস্ত সাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ আছেন; যথা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণ। বল দেখি ইহার মধ্যে কোনটা কৃষ্ণ ভগবান হন এবং কোনটাই বা না হন অথবা ইহার সমষ্টি কৃষ্ণ ভগবান হন। যদ্যপি সাকার ব্রহ্মকে তোমরা বল যে ইনি কৃষ্ণ ভগবান নহেন, তবে তোমাদের সাকার ব্রহ্ম কৃষ্ণ ভগবান কোথায়? তাঁহার কি স্বরূপ? আমাকে দেখাইয়া দেও এবং বুঝাইয়া দেও। তখন একজন পাণ্ডা অন্য একজন পাণ্ডাকে বলিল যে, এ বেটাকে কোন যুক্তি দ্বারা এখান হইতে তাড়াইয়া দেও নতুবা কোন যাত্রি যদি এই সকল কথা শুনে তাহা হইলে সকল যাত্রি বুঝি বা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের রোজগার বন্ধ হইবে। পাণ্ডারা এই পরামর্শ করিয়া শিবনারায়ণকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল। শিবনারায়ণ মনে মনে বলি-লেন যে দেখ অর্থলোভের জন্য ইহারা জড় পাথরকে চেতন বলিয়া পূজা করিতেছে। সকলকে কবাইতেছে, এবং প্রত্যক্ষ চেতন কৃষ্ণকে তাড়াইয়া দিতেছে। ইহারা কি নির্বোধ! শিবনারায়ণ, যেখানে যাত্রি দিগকে ছাপ দেয় সেইস্থান দেখিতে যাইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, চারিদিকে যাত্রিরা এবং পাণ্ডারা ও কোম্পানির তরফের লোক সকল বসিয়া আছে। কোম্পানির তরফের লোক যাহারা আছে, তাহারা সকল যাত্রির নাম ও কত যাত্রি আসিল এবং কত পয়সা টাকা আদায় হইল, তাহার হিসাব নিত্য নিত্য করিয়া সরকারে দাখিল করে। যাত্রিদের নিকট হইতে যত টাকা আদায় হয় কো-ম্পানি তাহার অংশ পান। এইরূপ সকল তীর্থ হইতে কোম্পানিরা অংশ পান কেবল কোন কোন তীর্থে নহে। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন যে এত কষ্ট পাইয়া যাত্রিরা এই তীর্থে আসে এবং টাকা পয়সা অনর্থক ব্যয় করিয়া যায়। সেই যাত্রিরা যে-খানে বসিয়া আছে, সেইখানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাম্রের এবং লৌহের ছাপ তাহাতে লাল করিয়া পুড়ায় এবং সেই তপ্ত ছাপ লইয়া সেই সকল যাত্রিদের হস্তে শীঘ্র শীঘ্র লাগাইয়া দেয়। কত যাত্রি ছাপ লাগাইবার সময় কাঁদিতে থাকে, কত যাত্রি ভয়েতে উঠিয়া যায় এবং কত যাত্রি কষ্ট সহ্য করিয়া ছাপ লয়। এই ছাপ দেখিলে সকলে বলিবে যে, ইনি দ্বারকায় গিয়াছিলেন। শিবনারায়ণকে পাণ্ডারা বলিল যে তুমি পয়সা দাও ও ছাপ লও। শিবনারায়ণ বলি-লেন আমার কাছে একটীও পয়সা নাই যে আমি ছাপ লইব। পাণ্ডারা বলিল যদি তোর কাছে বেশি পয়সা না থাকে, তবে দুই আনা পয়সা দে তোকে ছাপ দিব। শিবনারায়ণ বলিলেন আমার কাছে এক-

টাও পয়সা নাই এবং আমি ছাপও লইব না। পাণ্ডারা বলিল তুই যদি ছাপ লইস তো যেখানে মরিবি সেই-থানে তোর মুখঅগ্নি করিতে হইবে না।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৭৯৬।৶/১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩০৯৬।৶/০
সমষ্টি	৪৮৯২৸৵/১৫
ব্যয় ...	১৭৮৮৸৶/১৫
স্থিত	৩১০৩৸৶/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৭০ ৶/১০

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব ও তাঁহার স্ত্রী (কোন্নগর)	১০৲
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত (পাণ্ডুয়া)	৯৲
" " আশুতোস ধর	৫৲
শ্রীমতি সৌদামিনী দেবী	৫৲
" ত্রৈলোক্যমণি দাসী	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মিত্র	৩৲
" " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ (হুগলী)	২৲
" " ক্ষেত্রমোহন ধর	১৲
" " বনমালী চন্দ্র	১৲
" " রামলাল ঘোষাল	১৲
" " ভবদেব নাথ (গোয়াড়ি)	১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
" " মন্মথনাথ লাহিড়ী	১৲
" " বসন্তকুমার গুপ্ত	১৲
" " তারিণীকুমার গুপ্ত	১৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত (পাণ্ডুয়া)	৩

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরে ঘাটা) ১৮১১শকের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন ১৮১১ শকের বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত	২৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	।০
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৶১০
বিবিধ আয়	৸০
	১৭০ ৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২০৩৷০
পুস্তকালয় ...	২২১৸৵৫
যন্ত্রালয় ..	৯৪১ ৶৫
গচ্ছিত ...	২১৮৸ ১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩৮৸৵০
দাতব্য ...	২৲
সমষ্টি	১৭৯৬।৶/১৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২৬৫৷৵/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩১৬৸১০
পুস্তকালয়	১১৩৸/৫
যন্ত্রালয়	৫৮৭ ৻১০
গচ্ছিত	৪৯৭।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৪।/০
দাতব্য	৪৲
সমষ্টি .	১৭৮৮৸৶/১৫
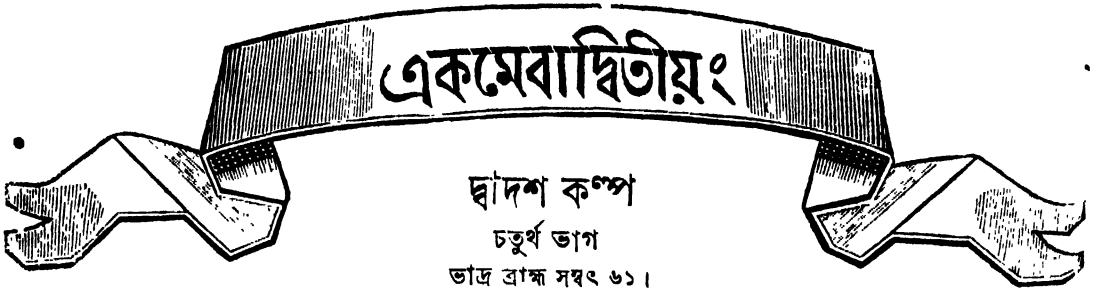
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

দ্বাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

৫৮৫ সংখ্যা ১৮১২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আয়ুর্ব্বেদ।

পরমায়ুঃ।

লোকে যত কাল বাঁচিয়া থাকে, অনেকে স্থূল কথায় সেই সময়কেই আয়ুঃ বা পরমায়ুঃ বলিয়া থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বুঝিতে গেলে, সময়ের নাম আয়ুঃ নহে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আয়ুর লক্ষণ এই—

শরীর বা দেহ, চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতির শক্তিরূপ ইন্দ্রিয়, মনঃ ও জীবাত্মা, এই চারিপ্রকার পদার্থের স্বাভাবিক (ঈশ্বরের নিয়মমত) সংযোগের নাম আয়ুঃ। ইহারই নামান্তর জীবন, ধারী ও জীবিত। [ক] (১)

উক্ত চারি প্রকার সামগ্রীর যথাযোগ্য সংযোগের নামই জীবন; (২) বিনাশের নামই মৃত্যু, শিথিলতার (ঢিলা হইয়া যাওয়া) নামই আয়ুর হ্রাস, এবং দৃঢ়তার (খুলিতে না পারিবার উপযুক্ত অবস্থা) নামই আয়ুর বৃদ্ধি।

আয়ুর প্রকারভেদ।

মনুষ্য মাত্রের বাঁচিবার ইচ্ছা এবং মরিবার ভয় এতই প্রবল যে, জীবন অপেক্ষা হিতকর পদার্থ আর কিছুই নাই, সাধারণের এইরূপ সংস্কার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে, লোকের জীবন বা আয়ুঃ, অবস্থা ভেদে, তাহার নিজের সুখকর ও দুঃখজনক এবং নিজের ও

[ক] "শরীরেন্দ্রিয়সত্ত্বাত্মসংযোগো ধারি জীবিতং।
. . .. পর্য্যায়ৈরায়ুরুচ্যতে॥"
(আয়ুর্ব্বেদ, চরকসংহিতা, সূত্রস্থান, প্রথম অধ্যায়।)

(১) প্রাণ সকলকে ধারণ করিতেছে—(জীবয়তি প্রাণান্ ধারয়তি,) এই অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে, বর্ত্তমানকালে "অন" ও 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া জীবন বা জীবিত। দেহকে ধারণ করিতেছে অর্থাৎ পচিয়া যাইতে দেয় না—(ধারয়তি দেহং পূতিতাং গন্তুং ন দদাতি) এই অর্থে বর্ত্তমানে "ণিন্" প্রত্যয় করিয়া ধারি।

২ আয়ুঃ থাকিলে বাঁচে, আর না থাকিলে মরে এবং আয়ুঃ থাকিলে মরিবে না ও না থাকিলে বাঁচিবে না। এই সকল কথা প্রচলিত থাকাতে অনেকের এরূপ বোধ হইতে পারে যে, জীবনের নাম আয়ুঃ নহে। জীবনের কারণ স্বরূপ পরমায়ুঃ একটী পৃথক পদার্থ। কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অথবা বিবিধ অত্যাচার দ্বারা লোকদিগের উল্লিখিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও আত্মা, এই চতুর্ব্বিধ পদার্থের যথাযোগ্য সংযোগের এমনই ব্যতিক্রম হইয়া যায় যে, তাহা আর স্থির রাখিবার সম্ভাবনা থাকে না। এই নিমিত্তই ঐ সংযোগের বিনাশরূপ মৃত্যু হইয়া থাকে; ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। সুতরাং আয়ুকে বাঁচিয়া থাকিবার কারণ না বলিয়া, আয়ুঃ থাকার নামই বাঁচিয়া থাকা, আর না থাকার নামই মৃত্যু, এইরূপ বলা উচিত।

অপর সাধারণের হিতকর ও অহিত-জনক হইয়া থাকে। (খ)

যে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক কোনওরূপ রোগ নাই; দেহ ও ইন্দ্রিয় সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনাবস্থা ঘটিয়াছে; বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও পরাক্রম, অক্ষীণ ও ব্যাঘাতশূন্য; ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান এবং শাস্ত্র ও লোকাচার বিজ্ঞান, যথাসম্ভব সংগৃহীত হইয়াছে; চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দিগের ন্যূনতা বা বিনাশ হয় নাই ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিবিধ বিষয় সকলের অভাব নাই এবং তৎসংক্রান্ত ভোগ-শক্তির হ্রাস হয় নাই; যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যান, তাহাতেই সফলতা লাভ হয় এবং সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আছে; সেই ব্যক্তির তাদৃশ আয়ুঃ তাহার সুখজনক, আর ইহার বিপরীত হইলেই দুঃখকর হয়। (গ)

যে ব্যক্তি সকলের হিতৈষী; পরের সম্পত্তি অপহরণ করিতে যাঁহার প্রবৃত্তি নাই; যিনি সত্যবাদী ও বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে অসদনুষ্ঠান হইতে নিবারণ পূর্ব্বক আয়ত্ত করিয়াছেন; সকল কার্য্যই বিচার পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কোনও বিষয়ে মত্ত নহেন; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গকে এইভাবে সেবা করেন যে, ইহাদিগের একের দ্বারা অন্যের ব্যাঘাত হয় না; পূজনীয় ব্যক্তিদিগের সম্মান করিয়া থাকেন; ঈশ্বর-জ্ঞান এবং শাস্ত্রাদি-জ্ঞান চর্চ্চাতে যত্নবান আছেন; জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের আনুগত্য করিয়া থাকেন; বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তি এবং ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, মদ ও আত্মাভিমানাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে উত্তমরূপে আপনার আয়ত্ত করিয়াছেন; সর্ব্বদা অপর সাধারণকে জ্ঞান, ধনসম্পত্তি ও নানাবিধ সাহায্যদান করিয়া থাকেন; তপস্যাদি সৎকার্য্যকে নিত্যকর্ম্ম স্বরূপ করিয়াছেন; যথা সম্ভব ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও সকল কর্ত্তব্য কার্য্যে তৎপর আছেন; স্থূলতঃ যিনি ইহ কাল ও পরকাল লক্ষ্য করিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকেন; এবং যাঁহার স্মরণশক্তি অব্যাহত আছে; তাদৃশ ব্যক্তির জীবনই তাঁহার নিজের (উন্নতিসাধক ব-লিয়া) এবং অপর সাধারণের বা জগতের (উপকারক বলিয়া) হিতকর। ইহার অন্যথা হইলেই অহিতকর। (ঘ)

আয়ুর পরিমাণ।

মনুষ্য কতকাল বাঁচিয়া থাকিবে, অর্থাৎ তাহার আয়ুর কোনও নিয়ত পরি-পরিমাণ আছে কি না, এ বিষয়ে শাস্ত্র সকলে মতভেদ আছে। কোনও কোনও শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আয়ুর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সেই নির্দ্দিষ্ট কালেই লোকে মরিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যখন মরিয়া যায়, তখনই তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, বুঝিতে

(খ) "হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্॥"
চরক, সূত্রস্থান, ১ অঃ।

(গ) "তত্রশারীরমানসাভ্যাং রোগাভ্যামনভিদ্রুতস্য বিশেষেণ যৌবনবতঃ সমন্বাগতবলবীর্য্যপৌরুষপরাক্রমস্য জ্ঞানবিজ্ঞানেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থবলসমুদায়ে বর্ত্তমানস্য পরমর্দ্ধিরুচিরবিবিধোপভোগস্য সমৃদ্ধসর্ব্বারম্ভস্য যথেষ্ট বিচরণাৎসুখমায়ুরুচ্যতে। অসুখমতো বিপর্য্যয়েন।"
চরক, সূত্রস্থান, ৩০ অধ্যায়।

(ঘ) "হিতৈষিণঃ পুনর্ভূতানাং পরস্বাদুপরতস্য সত্যবাদিনঃ শমপরস্য পরীক্ষ্যকারিণঃ অপ্রমত্তস্য ত্রিবর্গং পরস্পরেণানুপহতম্ উপসেবমানস্য পূজার্হসম্পূজকস্য জ্ঞানবিজ্ঞানোপশমশীলস্য বৃদ্ধোপসেবিনঃ সুনিয়তরাগরোষের্ষ্যামদমানবেগস্য সততং বিবিধপ্রদানপরস্য তপোজ্ঞানপ্রশমনিত্যস্য অধ্যাত্মবিদস্তৎপরস্য লোকমিমঞ্চামুঞ্চাবেক্ষ্যমাণস্য স্মৃতিমতো হিতমায়ুরুচ্যতে। অহিতমতো বিপর্য্যয়েণ।"
চরক, সূত্রস্থান, ৩০ অধ্যায়।

হইবে। কোনও ব্যক্তিই আয়ুঃশেষ না হইলে, মরে না। (ঙ)

কোনও কোনও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্যের আয়ুঃ, ব্যক্তি বিশেষে ১০০ ও ১২০ বৎসর নিয়ত আছে। শারীরিক অত্যাচার জন্য গুরুতর পীড়া, অথবা বজ্রপাতাদি আগন্তুক ঘটনা না হইলে, লোক সকল সেই সেই নির্দ্দিষ্ট কালই বাঁচিয়া থাকিবে। সুতরাং এই মতে জন সাধারণের আয়ুর একটী স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট সাধারণ পরিমাণ আছে। (৩)

কিন্তু জীবনতত্ত্ব নির্ণয় করাই যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাহার সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। আয়ুর্ব্বেদের মত বা সিদ্ধান্ত এই,—

প্রথমতঃ। সকল মনুষ্যের আয়ুঃ বা জীবনের স্থায়িত্ব কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমিত কালব্যাপী হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে,—

১। আয়ুর পরমাণ যদি নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তবে, ত্রিকালজ্ঞ পরমজ্ঞানী মহর্ষিগণ, আয়ুঃ বর্দ্ধনার্থ নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা, মন্ত্র-প্রয়োগ, নানাবিধ ওষধি ও মণি সকল ধারণ করিতেন না। (কারণ, যাহা বাড়িবার সম্ভাবনাই নাই, তাহার বৃদ্ধির চেষ্টা নিতান্ত অসঙ্গত)। (চ) [৪]

২। মনুষ্যদিগের আয়ুর একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নিয়ত পরিমাণ স্বীকার্য্য হইলে, প্রবল ঝড়, প্রচণ্ড অগ্নি, সুগভীর জল, ব্যাঘ্র ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, বন্দুকের গুলি বা শাণিত তরবারিতে ভয়ের বিষয় কি? (কারণ, আয়ুঃ থাকিলে, মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই)। (ছ)

৩। তবে প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে অস্বাভাবিক ও অনভ্যস্ত অকালমৃত্যুর ভয় কোথা হইতে আসিল? (জ)

৪। ঈশ্বরবাক্য স্বরূপ সনাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের 'রসায়ণ তন্ত্রে' যে, মানবের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিবার নানাবিধ উপায় লিখিত আছে, তাহার ব্যর্থতা স্বীকার করিতে হয়। কারণ, আয়ুঃ কত বৎসর, তাহা যদি নির্দ্দিষ্টই আছে, তবে, চিকিৎসারূপ চেষ্টা দ্বারা সেই ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অন্যথা (বৃদ্ধি) হইবার সম্ভাবনা কি? (ঝ)

৫। আয়ুর নিয়ত পরিমাণ সত্য হইলে, ইন্দ্রদেব কাহারও প্রতি বজ্রপাত করিতেন না (আয়ুঃ থাকিলে মরিবে কেন?) অশ্বিনীকুমার কাহারও চিকিৎসা করিতেন না এবং মহর্ষিগণও তপস্যা দ্বারা

(ঙ) "নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ নাস্তি মৃত্যুরকালজঃ।
যো যস্মিন্ ম্রিয়তে কালে মৃত্যুকালঃ স তস্য হি॥
ব্যাসভট্টারকেনাপি উক্তম্।
"নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
প্রাপ্তকালস্য কৌন্তেয় বজ্রায়স্তে তৃণান্যপি॥"
সুশ্রুত টীকাকার ডল্লনাচার্য্যধৃত।

[৩] ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই সিদ্ধান্ত আছে। তদনুসারে জ্যোতির্ব্বিদেরা লোকের জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

(চ) "যদি হি নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং স্যাৎ আয়ুষ্কামানাং ন মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়নপ্রণিপাতগমনাদ্যাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রযোজ্যেরন্।"
চরক সংহিতা, বিমানস্থান, ৩য় অধ্যায়।

[৪] বিষয় বোধের সুবিধার জন্য, এস্থলে, সংস্কৃত প্রমাণগুলির অবিকল অনুবাদ না করিয়া অতি প্রয়োজনীয় অংশগুলিরই অনুবাদ হইল।

(ছ) "ন উদ্ভ্রান্ত-চণ্ড-চপল-গো-গজোষ্ট্র-খর-তুরগ মহিষাদয়ঃ পবনাদয়শ্চ দুষ্টাঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুঃ। ন প্রপাতাগগিরিবিষমদুর্গাম্বুবেগাঃ। তথা ন প্রমত্তোদ্ভ্রান্তচণ্ডচপললোভমোহাকুলমতয়ো। ন অরয়ো ন প্রবৃদ্ধো হগ্নির্নচ বিবিধবিষাশ্রয়াঃ সরীসৃপোরগাদয়ঃ। ন সাহসং ন দেশকালচর্য্যা ন নরেন্দ্রকোপ ইত্যেবমাদয়ো ভাবা ন অভাবকরাঃ স্যুরায়ুষঃ সর্ব্বস্য নিয়ত কালপ্রমাণত্বাৎ।"
চরক, বিমান, ৩অ।

(জ) "ন চ অনভ্যস্তাকালমরণভয়ানিবারকানাম্ অকালমরণভয়মাগচ্ছেৎ প্রাণিনাম্।"
চরক, বিমান, ৩ অ।

(ঝ) "ব্যর্থাশ্চারম্ভকথাপ্রয়োগবুদ্ধয়ঃ স্যুর্মহর্ষীণাং রসায়ণাধিকারে"।
চরক, বিমান, ৩অ।

দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইতেন না (কারণ, যাহা বাড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাহা বাড়িবে কেন ?)। (ঞ)

৬। যদি আয়ুর বৃদ্ধি বা হ্রাসের সম্ভাবনাই না থাকিত, তবে যাঁহাদিগের কোনও জ্ঞাতব্যই অজ্ঞাত নাই, এতাদৃশ মহর্ষিগণ, আয়ুর বর্দ্ধনার্থ ও হ্রাস নিবারণার্থ, বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান, কেবল আপনারা করিতেন না, এরূপ নহে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে জনসাধারণকে তদ্‌বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন না। (ট)

৭। তাহা হইলে, সচরাচর এরূপ প্রত্যক্ষও হইত না যে, যজ্ঞাদি কার্য্য দ্বারা লোকের আয়ুর বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যজ্ঞাদি না করিলে তাহা হয় না। বালকের জন্মগ্রহণের পরেই স্বাস্থ্যরক্ষা ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইবার প্রক্রিয়া করিলে, তাহার জীবন দীর্ঘ, নতুবা অল্প হয়। বিষ পান করিলে আয়ুর হ্রাস হয়, কিন্তু না করিলে, হ্রাস হয় না। (ঠ)

এই সকল বিষয়ের বিচার করিয়া মহা বৈজ্ঞানিক, সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—

প্রথমতঃ, যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার বিনাশ আছে, এই নিয়মানুসারে মনুষ্যমাত্রের জীবন যে, একদা বিনষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই বিনাশরূপ মৃত্যু, সকল মনুষ্যের পক্ষে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমিত কালে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আয়ুঃ ভিন্ন ভিন্ন কালব্যাপী হইবার পর মৃত্যু হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ। আয়ুঃ বা জীবনের অস্তিত্ব ও বিনাশ এবং আধিক্য ও অল্পতা বিষয়ে স্থূলতঃ দুইটী কারণ থাকে। যথা, দৈব ও পুরুষকার। মনুষ্য পূর্ব্ব জন্মে যে সকল পুণ্য ও পাপ কার্য্য করিয়াছে এস্থলে, তাহার অর্থাৎ তজ্জনিত শুভ বা অশুভ অদৃষ্টের নাম দৈব (দেবতার অধীন)। আর এ জন্মে যে সকল পুণ্য বা পাপ কার্য্য করে, তাহাকে এবং তজ্জনিত শুভ বা অশুভ অদৃষ্টকে [৫] পুরুষকার

(ঞ) "নাপি ইন্দ্রো নিয়তায়ুষং শত্রুং বজ্রেণাভিহন্যাৎ। ন অশ্বিনৌ আর্ত্তং ভেষজেনোপপাদয়েতাং ন ঋষয়ো যথেষ্টম্ আয়ুস্তপসা প্রাপ্নুয়ুঃ।"

চরক, বিমান, ৩অ।

(ট) "ন চ বিদিতবেদিতব্যা মহর্ষয়ঃ সমুপদেশাঃ সম্যক্ পশ্যেয়ুঃ রূপাদিশেয়ুরাচরেয়ুর্ব্বা। অপি চ সর্ব্বচক্ষুষামেতৎ পরং যৎ দিব্যং চক্ষুঃ।"

চরক, বিমান, ৩অ।

(ঠ) "ইদঞ্চ অস্মাকং প্রত্যক্ষং যথা পুরুষসহস্রাণাম উত্থায়োত্থায় আহবং কুর্ব্বতাম্ অকুর্ব্বতাঞ্চ ন তুল্যায়ুষ্ট্বম্। তথা জাতমাত্রাণাং প্রতিকারাৎ অপ্রতিকারাচ্চ, অবিষাবিষপ্রাশিনাঞ্চাপি অতুল্যায়ুষ্ট্বম্।"

চরক, বিমান, ৩অ।

[৫] যে কার্য্য করিলে, পরিণামে সুখ হয়, তাহা সৎকার্য্য। আর যে কার্য্য করিলে, পরিণামে দুঃখ হয়, তাহার নাম অসৎকার্য্য। কোনও একটী কার্য্য যতক্ষণ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, ততক্ষণই তাহার বিদ্যমানতা। অনুষ্ঠান শেষ হইলেই কার্য্যের বিনাশ হইল। কিন্তু সেই কার্য্যহেতু পরিশেষে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে যে একটা শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে, তাহার নিমিত্ত ঐ কার্য্যটী যে, যথার্থই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণকে 'অদৃষ্ট' কহে। সেই প্রমাণটা অন্তর্যামী ঈশ্বরের গোচরমাত্র। চক্ষে দেখিবার যোগ্য নহে বলিয়া তাহার নাম 'অ-দৃষ্ট' হইয়াছে।

শুভ অদৃষ্টের নামই পুণ্য বা ধর্ম্ম। অশুভ অদৃষ্টের নামই পাপ বা অধর্ম্ম। কিন্তু চলিত কথায় সচরাচর অনুষ্ঠিত কার্য্যের নামও পুণ্য, ধর্ম্ম, পাপ ও অধর্ম্মশব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

মনুষ্য যে সকল সৎ ও অসৎকার্য্য করে, তাহার কতকগুলি জনসমাজের ও রাজার গোচর হয়। অপর কতকগুলি হয় না। কিন্তু তাহা অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের গোচর হইয়া থাকে। জনসমাজ বা রাজার গোচররূপ প্রমাণকে অদৃষ্ট বলা যায় না। কারণ, তাহা দৃষ্ট পদার্থ রূপে পরিগত হয়।

মনে কর, রাজশাসনে (আইন) লিখিত আছে যে, "চুরী করিলে, ৩ তিন বৎসর কারাবাস হইবে।" একদা কোনও ব্যক্তি চুরী করিল। তাহার চৌর্য্যক্রিয়া যেন একঘণ্টাতে শেষ হইয়াছে। পরে যখন রাজা, সেই চোরের দণ্ডবিধান করেন, তৎকালে ত চৌর্য্যক্রিয়া হইতেছে না ; তবে ৩ তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ হয় কেন ? অবশ্যই বলিতে হইবে যে, চুরী করিবার কালে, যে সকল সাক্ষী ছিল, তাহাদিগের

(জীবিত পুরুষের কার্য্য) কহে। পুণ্য ও পাপ, ইহাদিগের প্রত্যেকের তিনটী শ্রেণী। যথা, প্রবল, মধ্য ও হীন। লোকদিগের পরস্পর অনুকূল দৈব ও পুরুষকার, উভয়েই প্রবল হইলে, দীর্ঘ ও সুখকর আয়ুঃ হইয়া থাকে। উহারা মধ্যম হইলে, মধ্যম ও মধ্যমসুখকর আয়ুঃ, আর উহারা উভয়েই হীন হইলে অল্প ও দুঃখজনক আয়ুঃ হইয়া থাকে। [ড] (৬)

উদাহরণ দ্বারা এই বিষয় স্পষ্ট করা যাইতেছে।—যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে এতাদৃশ প্রবল পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তজ্জন্য এ জন্মে, তাঁহার নানাবিধ সুখভোগ ঘটিতে পারে, তিনি যদি এজন্মেও সুস্থতা রক্ষা ও আয়ুঃ বৃদ্ধি করিবার উপায় বা চিকিৎসা সকল সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তবে তাঁহার অতিদীর্ঘ ও সুখজনক জীবন বা আয়ুঃ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালীন মহর্ষিগণ এতাদৃশ কারণেই সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন; আয়ুর্ব্বেদে তাহার ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়।

যে ব্যক্তির পরস্পর অনুকূল দৈব ও পুরুষকার, উভয়েই মধ্যমরূপ, অথবা দৈব প্রবল, কিন্তু পুরুষকার মধ্যম, কিংবা দৈব মধ্যম কিন্তু পুরুষকার প্রবল হয় তাঁহার আয়ুঃ দীর্ঘায়ুঃ আপেক্ষা অল্প ও সুখদুঃখমিশ্রিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ আয়ুর উদাহরণ, পৃথিবীতে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তির পরস্পর অনুকূল দৈব ও পুরুষকার উভয়েই হীন, অথবা দৈব মধ্যবিধ, কিন্তু পুরুষকার অতিহীন, অথবা দৈব অতিহীন, কিন্তু পুরুষকার মধ্যবিধ, তাদৃশ ব্যক্তির হীন ও দুঃখপূর্ণ আয়ুঃ হইয়া থাকে। এরূপ অল্প আয়ুর উদাহরণ, পৃথিবীতে অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে।

দৈব ও পুরুষকার, পরস্পর প্রতিকূল হইলে, নিম্ন লিখিতরূপে তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। যথা,—

যে ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মার্জিত দৈব অতিপ্রবল ও হিত-জনক, কিন্তু ঐহিক পুরুষকার অপ্রবল ও অহিত-জনক, তাহার সুখকর দীর্ঘজীবন অথবা অতিদুঃখকর অত্যল্প আয়ুঃ, ইহার কোনও একটী না হইয়া এই উভয়ের মিলিত ফল স্বরূপে সুখদুঃখ-মিশ্রিত হীন আয়ুঃ অথবা মধ্যম আয়ুঃ হইয়া থাকে। ইহ জন্মে অতি পাপাচারী দুরাত্মা ব্যক্তিও এই কারণে অপেক্ষাকৃত অধিক জীবন লাভ করিয়া থাকে। (ঢ)

[illegible] প্রমাণটা রাজপুরুষ দ্বারা লিখিত হইয়া থাকিয়াছে। সেই প্রমাণবশতঃ আইন অনুসারে তাহার দণ্ড হইতেছে। এস্থলে এ জন্মে ঐ লিখিত প্রমাণটা দেখিতে বা দেখাইতে পারা যায়, এই নিমিত্ত উহার নাম দৃষ্ট হেতু বা দৃষ্ট প্রমাণ। চৌর্য্যক্রিয়ার সাক্ষীদিগের গোচরটা এবং তৎসংক্রান্ত ঈশ্বরের গোচরটা অদৃষ্ট পদার্থ বটে, কিন্তু রাজশাসন সম্বন্ধে তাহার উপযোগিতা নাই।

প্রস্তাবিত স্থলে, দৈবটা অদৃষ্ট পদার্থ। পুরুষকারের কিয়দংশ অদৃষ্ট আর কিয়দংশ দৃষ্ট। যথা, দান, স্বস্ত্যয়নাদি সৎকার্য্যগুলি এবং ঔষধ প্রয়োগ কার্য্য দৃষ্ট পদার্থ। আর দানাদিজন্য ঈশ্বরগোচরটা অদৃষ্ট পদার্থ।

[ড] "দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্।
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পূর্ব্বদৈহিকং।
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যৎ ইহাপরম্ ॥
বলাবলবিশেষো হস্তি তয়োরপি চ কর্ম্মণোঃ ॥
দৃষ্টংহি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমং।
তয়োরুদারয়োর্যুক্তি দীর্ঘস্য সুখস্য চ ॥
নিয়তস্যায়ুষো হেতু র্বিপরীতস্য চেতরা।
মধ্যমা মধ্যমস্যেষ্টা কারণং শৃণু চাপরম্ ॥"

চরক, বিমানস্থান, ৩ অং।

(৬) প্রবলতা, মধ্যতা ও হীনতা, ইহাদিগেরও অসংখ্য অংশ কল্পনা করা যাইতে পারে। তদনুসারে দীর্ঘ, মধ্য ও হীন আয়ুও বহু ভাগে পরিগণিত হইবে।

(ঢ) "দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যপহন্যতে।
দৈবেন চেতরং কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে ॥"

চরক, বিমান, ৩ অং।

মহাভারত, অনুশাসনিক পর্ব্ব, ৬ অঃ, ঐ বিষয়।

যে ব্যক্তির জন্মান্তরীণ দৈব অনিষ্ট-জনক, কিন্তু নিতান্ত হীন, আর ঐহিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক পুরুষকার অতি প্রবল ও হিতজনক, সে ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত মধ্যম বা দীর্ঘ ও সুখদুঃখ-মিশ্রিত আয়ুঃ হইয়া থাকে। এইরূপে অন্যান্য অংশও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

যে ব্যক্তির সুখকর দীর্ঘ আয়ুর উপযুক্ত পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত প্রবল দৈব (পুণ্য) আছে, যদি তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে জীবননাশের উপযুক্ত প্রবল ঐহিক ঘটনা (পুরুষকার) উপস্থিত হয়; যথা, জন্মগ্রহণ মাত্রই শত্রুপক্ষের তরবারিতে মস্তকচ্ছেদন হইয়া যায়, তবে তাঁহার উল্লিখিত সমানবল সম্পন্ন দৈব ও পুরুষকার, এই উভয়ের মধ্যে এজন্মে একটী সফল ও অপরটী বিফল হইবে এবং জন্মান্তরে সেই অপরটী সফল হইবে; অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে কিন্তু জন্মান্তরে তাঁহার সুখকর সুদীর্ঘ জীবন হইবে। (৭)

চরকসংহিতা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের কোনও কোন স্থলে (৮) সাধারণতঃ মনু-

---

(৭) এস্থলে, একটী অতিমহতী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, এতাদৃশ ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মফল ব্যর্থ করিয়া মৃত্যু হইবে কেন? বরং সেই কর্ম্মফলে তাদৃশ ব্যক্তির মস্তকচ্ছেদন করিতে শত্রুগণের প্রবৃত্তি না হওয়া অথবা ছেদনের ব্যাঘাত হওয়া, কিংবা ছেদন হইলেও মৃত্যু না হওয়া সম্ভব। কারণ, তাহা না হইলে,

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম॥"

ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের বিফলতা হইয়া উঠে। ইহার উত্তর এই—

১ উল্লিখিত বচনের এইমাত্র তাৎপর্য্য যে, মনুষ্যের অনুষ্ঠিত পুণ্য ও পাপ কার্য্যের ফলভোগ হইবেই হইবে; কোনরূপেই এই ঐশ্বরিক অভিপ্রায়ের অন্যথা হইবে না। কিন্তু ঐফল যে, এ জন্মেই ভোগ করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। এই অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্তের উপপত্তির নিমিত্তই, ত্রিকালদর্শী, ন্যায় ভক্ত আর্য্য মহর্ষিদিগের সকলশাস্ত্রে পর কাল বা জন্মান্তর স্বীকার করিতে হইয়াছে। অতএব, এরূপ স্থলে প্রস্তাবিত ব্যক্তির এজন্মে মস্তকচ্ছেদন হইয়া গেলেও, জন্মান্তরে তাঁহার সুখকর দীর্ঘ জীবন হইবে, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে।

অপরন্তু, মস্তকচ্ছেদন বিষয়ে শত্রুগণের প্রবৃত্তি না হওয়া অথবা তাহার ব্যাঘাত হওয়া স্বীকার করিলে, দৈবের প্রবলতাই স্বীকার করা হইল। এজন্মে পুরুষের (লোকের) অনুষ্ঠিত কার্য্যকেই শাস্ত্রে "পুরুষকার" বলিয়াছেন। যদি সেই পুরুষকার মোটেই না ঘটিল, অথবা অতি অসম্পূর্ণরূপেই ঘটিল, তবে দৈব ও পুরুষকারের সমান বলের স্থল হইল না, বলিতে হইবে। আবার দৈবের বলে, পুরুষকার একেবারেই ঘটিতে পারে না, এরূপ সিদ্ধান্তও সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধ ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। অতএব, প্রস্তাবিত স্থলে, এ জন্মে, মস্তকচ্ছেদন হইয়া যাইবে, সুতরাং মৃত্যু হইবে; অথচ জন্মান্তরে শুভফলের ভোগ হইবে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

২ বেদাঙ্গস্বরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রেও জন্মান্তরীণ পাপ ও পুণ্যের বিষয়ে—এই সিদ্ধান্তের পোষকতা দৃষ্ট হয়। যথা,

"কষ্টাভীষ্টে তুল্যসংখ্যে ফলে চেৎ।
স্যাতাং নাশঃ ফলয়োস্তত্র বাচ্যঃ॥
বাচ্যা পক্তির্যাতিরিক্তা তয়োঃ স্যাৎ।
সর্ব্বৈবং কল্পনৈব প্রদিষ্টা॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব।)

অর্থ এই—মনুষ্যদিগের জন্মকোষ্ঠীতে শুভ ও অশুভ গ্রহের ফল সমান দৃষ্ট হইলে, সেই দুই ফলই কাটিয়া যাইবে। আর, উহাদিগের মধ্যে কাহারও ফল অধিক হইলে, তাহার সেই অতিরিক্ত অংশেরই ভোগ হয়; এই সিদ্ধান্ত।

৩। ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রেও পাপ ও পুণ্যবিষয়ে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পোষকতা আছে। যথা, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বহুতর পাপের খণ্ডন হইয়া থাকে। যে পাপের যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, তাহারই ফল ভোগ করিতে হয়। যদি ভোগ ব্যতিরেকে পাপের ক্ষয় হইবেই না, এরূপ হইত, তবে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইত না।

৪। তপোজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি বাল্মীকিও ইতিহাস স্বরূপ রামায়ণ গ্রন্থে উল্লিখিত তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। যথা,

"দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুং।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি॥"

(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড।)

অর্থ—যে ব্যক্তি পুরুষকার দ্বারা দৈবের বাধা দিতে পারে, সে বিপদগ্রস্ত ও অবসন্ন হয় না।

(৮) "অব্যাহতগতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতৌ স্থিতঃ।
বায়ুর্হি সোঽধিকং জীবেৎ নীরোগঃ শরদাং শতম্॥"

চরক, চিকিৎসিত স্থান, ২৮ অধ্যায়।

"একোত্তরং মৃত্যুশতম্ অথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে।
তত্রৈকঃ কাল সংজ্ঞস্তু শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ॥"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান ৩৪ অঃ।

ষ্যের আয়ুঃ একশত বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অনেকগুলি পুরাণ (৯) ও কোন কোনও ইতিহাস (১০) শাস্ত্রে মনুষ্যের আয়ুঃ সত্যযুগে ৪০০ বৎসর, ত্রেতাযুগে ৩০০ বৎসর, দ্বাপরযুগে ২০০ বৎসর এবং কলিযুগে ১০০ একশত বৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এরূপও উল্লিখিত আছে যে, সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত চারি যুগে মানবগণের আয়ুঃ ক্রমশঃ এক চতুর্থাংশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহা দেখিয়া কোনও ব্যক্তি (১১) পুরাণাদি শাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদের একবাক্যতা করিতে গিয়া সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত মনুষ্যদিগের আয়ুর পরিমাণ, যথাক্রমে ৪০০। ৩০০। ২০০। ১০০ বৎসর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত আয়ুর্ব্বৈদিক তত্ত্বের বিরুদ্ধ এবং ভ্রমাত্মকমাত্র। কারণ,—

প্রথমতঃ, বহুসংখ্যক মনুষ্যের আয়ুঃ একনির্দ্দিষ্ট পরিমিত কাল ব্যাপিয়া হইতে পারে না ; ইহা আয়ুর্ব্বেদে বহুতর অখণ্ডনীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহার সহিত একবাক্যতা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, আয়ুর্ব্বেদে প্রস্তাবিত স্থলে যে "শত" শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা শতসংখ্যাবাচক নহে, তাহার অর্থ "বহুসংখ্যক", পূর্ব্বতন প্রামাণিক টীকাকারেরা, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১২) তৃতীয়তঃ, কোন কোনও শাস্ত্রে (১৩) সত্যাদি যুগে মনুষ্যের আয়ুঃ যথা ক্রমে এক লক্ষ-দশ হাজার, এক হাজার ও এক শত বৎসর লিখিত আছে। তাহার সহিত এক বাক্যতা হয় না। চতুর্থতঃ, সত্যাদি যুগের গ্রন্থ সুশ্রুতসংহিতাদিতে মনুষ্যের যে আয়ুঃ সংক্রান্ত কাল সংখ্যার নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা কেবল কলি যুগ লক্ষ্য করিয়াই হইল, ভ্রম ক্রমেও সত্যাদি যুগ লক্ষ্য করিয়া হইল না, একথা সম্ভবপর হইতে পারে না।

ফলতঃ আয়ুর নির্ণয় বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদেরই প্রধানতা ও অন্যান্য শাস্ত্রের অপ্রধানতা গণ্য করাই যুক্তিসঙ্গত। কেবল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলের মধ্যে পরস্পর মতভেদ থাকিলে, তাহারই একবাক্যতাদি মীমাংসার প্রয়াস পাওয়া উচিত। অতএব, পৌরাণিক মতের সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় মতের একবাক্যতার প্রয়াস, ভ্রমাত্মক হইতেছে।

বস্তুতঃ, সত্যযুগে মনুষ্যের আয়ুর পরিমাণ যত, ত্রেতাদিযুগে বিবিধকারণে, তাহা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, বোধ হয় এই তত্ত্বটী বুঝাইয়া দেওয়াই পুরাণাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। একলক্ষ, দশহাজার, ইত্যাদি, অথবা চারি শত, তিন শত, ইত্যাদি বৎসর-সংখ্যা সকল কল্পনামাত্র।

কাল-মৃত্যু ও অ-কাল-মৃত্যু।

মানবগণের আয়ুর যদি নির্দ্দিষ্ট কাল-

"বয়স্তু ত্রিবিধং বাল্যং মধ্যং বৃদ্ধমিতি। তত্র ঊনষোড়শবর্ষাঃ বালাঃ। ... ... ষোড়শসপ্তত্যোরন্তরে মধ্যং বয়ঃ। ... ... সপ্ততেরূর্দ্ধং ... ... বৃদ্ধমাচক্ষতে।"

সুশ্রুত, সূত্র, ৩৫ অঃ।

(৯) চরক, বিমানস্থান ৩ অঃ, "জল্পকল্পতরু" নামক টীকাতে উদ্ধৃত পুরাণ বচন।

(১০) মহাভারত।

(১১) চরকের আধুনিক টীকাকার গঙ্গাধর কবিরাজ।

(১২) "শত শব্দো হ্যত্র অসংখ্যাবাচকঃ। তেন অসংখ্যা মৃতাবঃ। কারণানামসংখ্যেয়ত্বাৎ।"

[সুশ্রুত টীকাকার ডল্লনাচার্য্যের লিখিত "প্রবন্ধ সংগ্রহ" টীকা]

(১৩) রামায়ণ ইতিহাসে ইহার পোষকতা আছে। যথা,

"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক।
দুঃখেনোৎপাদিতশ্চায়ং ন রামং নেতুমর্হসি॥"

ব্যাপী অপরিবর্ত্তনীয় সংখ্যা না থাকিল, তবে কাল-মৃত্যু ও অ-কাল-মৃত্যু, এই দুইটী কথা বহুশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে কেন? আয়ুর্ব্বেদে তদ্‌বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত আছে। যথা,—

মনে কর, একখানি শকট (গোরুর গাড়ী) কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত লইল। যদি শকটপরিচালক, যথা নিয়মে তাহা চালাইতে পারে, তাহার চাকার মধ্যস্থলে যথা কালে চরবী বা তৈল দেয়, এবং প্রবল ঝড়, অগ্নি প্রভৃতি আগন্তু ঘটনা হইতে তাহা রক্ষা করে, তবে ঐ শকটখানি পূর্ণশক্তিতে কিছুকাল এবং জীর্ণাবস্থাতেও কিছু কাল পরিচালিত হইয়া পরিশেষে অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিবে। এই উভয়-কালের সমষ্টি যদি ২০ বৎসর হয়, তবে স্থির করা যাইতে পারে যে, অমুকপ্রকার কাষ্ঠ দ্বারা যথোপযুক্ত রূপে প্রস্তুত করিলে, এবং উপযুক্ত পরিচালক দ্বারা চালিত হইলে, একটী শকট, ২০ বৎসর থাকে,—অর্থাৎ তাদৃশ শকটের আয়ুঃ ২০ বৎসর। মনুষ্যের আয়ুর বিষয়ও এইরূপ, বুঝিতে হইবে। শকটের অবয়বগুলির যথোপযুক্ত ও কার্য্য সাধনের উপযোগী সংযোগ, অনন্তকাল থাকিবে না। কারণ, সৃষ্টিকর্ত্তা, কাষ্ঠপদার্থকে অনন্তকালের নিমিত্ত অক্ষয় করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। সুতরাং প্রথমতঃ ২০ বৎসরে তাহার শকটরূপের ধ্বংস এবং বহুকাল পরে কাষ্ঠরূপেরও ধ্বংস হইয়া পরিশেষে, তাহা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচটা মূলপদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে। (চ)

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইতেছে যে, কাষ্ঠনির্ম্মিত শকট-পদার্থ, যদি যথোপযুক্ত উপাদানে (নির্ম্মাণের উপকরণ কাষ্ঠ প্রভৃতি) ও উপযুক্ত কারুক্রিয়া দ্বারা নির্ম্মিত এবং উপযুক্ত পরিচালকদ্বারা চালিত, আর আগন্তু ঘটনা হইতে সর্ব্বদা রক্ষিত হয়; তবে তাহা—(ক) নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ অল্পক্ষণস্থায়ী হয় না—(খ) আবার অনন্তকালস্থায়ী নহে;—(গ) কিন্তু প্রায়ই এক নির্দ্দিষ্টকাল, অর্থাৎ ২০ বৎসর, স্থায়ী হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, যদি তাহার উপাদান-পদার্থ বা নির্ম্মাণ-ক্রিয়া, অথবা পরিচালন-কার্য্য কিংবা আগন্তু ঘটনা হইতে রক্ষা বিষয়ে দোষ থাকে, তবে তাহা—(ঘ) অল্পক্ষণস্থায়ী হইতে পারে।—(ঙ) আবার নষ্ট হইবার উন্মুখ দেখিয়া সংস্কার (মেরামৎ) করিয়া দিলে, ২০ বৎসর পর্য্যন্তও থাকিতে পারে।—(চ) অপি চ, ঘটনাক্রমে জল, বায়ু, অগ্নি, ইত্যাদির সংযোগে ঐ শকটের কাষ্ঠ প্রভৃতি উপাদানগুলির শক্তি, এতই অল্প হইয়া যাইতে পারে যে, সুপণ্ডিত কারুকর (ছুতার মিস্ত্রী) দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট সংস্কার করিলেও, তাহা আর উপযুক্ত সময় (২০ বৎসর) পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে না। সুতরাং তাহা অল্প দিন পরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যের আয়ুর বিষয়েও ঐরূপ সিদ্ধান্ত। [ণ] যথা—

(চ) "এবং সতি অনিয়তকালপ্রমাণম্ আয়ুষাং ভগবন্ কথং কালমৃত্যুরকালমৃত্যুর্ব্বা ভবতীতি। তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। শ্রূয়তামগ্নিবেশ! যথা যানসমাযুক্তো অক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈরুপেতঃ সর্ব্বগুণোপপন্নো বাহ্যমানো যথাকালং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছেৎ, তথা আয়ুঃ শরীরোপগতং প্রকৃত্যা যথাবদুপচর্য্যমাণং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছতি। স মৃত্যুঃ কালে।"

চরক, বিমানস্থান, তৃতীয় অধ্যায়।

[ণ] যথা চ, স এব অক্ষঃ অতিভারাধিষ্ঠিতত্বাৎ বিষমপথাৎ অপথাৎ অক্ষচক্রভঙ্গাৎ বাহ্যবাহকদোষাৎ অনির্মোক্ষাৎ পর্য্যসনাৎ অনুপাঙ্গাচ্চ অন্তরা ব্যসনমাপদ্যতে, তথা আয়ুরপি অযথাবলম্ আরম্ভাৎ অযথাগ্ন্যভ্যবহরণাৎ বিষমাভ্যবহরণাৎ বিষমশরীরন্যাসাৎ

যদি বিশুদ্ধ শুক্র শোণিত দ্বারা, বিচক্ষণ পিতা, মাতা, সন্তানের উৎপাদন করেন, আর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের লিখিত নিয়মানুসারে তাহার শরীর-বর্দ্ধন ও সুস্থতা রক্ষার চেষ্টা অর্থাৎ সে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক নিয়ম রক্ষা হয়, এবং তাহাকে জল, অগ্নি প্রভৃতি আগন্তু অনিষ্ট হইতে রক্ষা করা হয়, তবে সে ব্যক্তি—(ক) নিতান্ত অল্পজীবী হয় না ;—(খ) অনন্তকালের জন্য অমরও হয় না ;—(গ) কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে ১০০০। ২০০০। ৩০০০। ৪০০০। ইত্যাদি সংখ্যক বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। এইরূপ জীবনের পর যে মৃত্যু হয়, তাহার নাম "কালমৃত্যু।" কিন্তু যদি উপাদান শুক্র শোণিত দূষিত ও যথাবিধি জন্ম-দান-ক্রিয়ার অন্যথাভাব, শরীর-বর্দ্ধন ও সুস্থতা-রক্ষার ব্যাঘাত, আগন্তু বজ্রপাত, সর্পাদি-দংশন ও ঝড়, জল প্রভৃতি হইতে যথোপযুক্ত রক্ষার অভাব ঘটে, তবে,—(ঘ) সে ব্যক্তি নিতান্ত অল্পজীবী হইতে পারে।—(ঙ) আবার অসাধ্যস্থল ব্যতিরেকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য-সাধন করিয়া তাহাকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত (১০০। ২০০ বৎসর ইত্যাদি) জীবিত রাখা যাইতে পারে।—(চ) আবার বিবিধ কারণে, তাহার আয়ুর উপাদানগুলির মধ্যে পাঞ্চভৌতিক দেহের শক্তি প্রভৃতি এমনই বিকৃত হইয়া যাইতে পারে যে, তাহার পীড়া সুপণ্ডিত বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হইলেও, শান্তিলাভ করে না। প্রত্যুত, মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে। ইহাকেই "অকাল মৃত্যু" কহে।

অচেতন পদার্থের সহিত চেতন পদার্থের সর্ব্বাংশে তুলনা হইতে পারে না। অতএব, পূর্ব্বের উপমাগুলি, মনুষ্যদিগের অচেতন জড়দেহের অবস্থা বুঝিবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু অচেতন দেহ ভিন্ন ইন্দ্রিয়, মনঃ ও আত্মা, এই তিনটী চেতন পদার্থ আয়ুর এক একটী অঙ্গ। ঐ সকলের সম্পর্ক আছে বলিয়াই আয়ুর বিষয়ে পূর্ব্বে ইহকাল ও পরকালের পাপ ও পুণ্য কার্য্যের বিবরণ কথিত হইয়াছে। পাপ হইতে দুঃখ ও পুণ্য হইতে সুখ জন্মে, ইহা পৃথিবীর পণ্ডিত-চূড়ামণি, ত্রিকালদর্শী পরমযোগী আর্য্য মহর্ষিদিগের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব। যে সকল জাতি বা ব্যক্তি, কতকগুলি অচেতন জড়পদার্থ ঘটিত জড়-বিজ্ঞান মাত্র জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা ঐ তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া উহাকে অকর্ম্মণ্য বা অপ্রয়োজনীয় বোধ করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদিগের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের ইচ্ছা ও বুঝিবার শক্তি আছে, তাঁহাদিগের পক্ষে উহা অমূল্য রত্ন স্বরূপ।

যুগভেদে আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, শাস্ত্রে এই চারিটী যুগ নির্দ্দিষ্ট আছে। বৎসরের গণনা দুই প্রকারে হইয়া থাকে। যথা মানবীয় ও দৈব। আমরা ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ডে যে এক বৎসর গণনা করিয়া থাকি, তাহা মানবীয় বৎসর। ঐরূপ ৩৬০ বৎসরকে শাস্ত্রে দৈব, অর্থাৎ দেবতাদিগের এক বৎসর কহে। যুগ সকলের পরিমাণ দৈববৎসর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা, সত্যযুগের পরিমাণ ৪,৮০০ দৈব বৎসর। ত্রেতা যুগের পরিমাণ ৩,৬০০ দ্বাপর-

---

অতিমৈথুনাৎ অসৎসংশ্রয়াৎ উদীর্ণবেগবিনিগ্রহাৎ বিধার্য্যবেগাবিধারণাৎ বিষাগ্ন্যুপতাপাৎ অভিঘাতাৎ আহারবিবর্জ্জনাচ্চ অন্তরা ব্যসনম্ আপদ্যতে। স মৃত্যুরকালে। তথা জ্বরাদীনপি আতঙ্কান্ মিথ্যোপচরিতান অকালমৃত্যুন্ পশ্যামঃ।

চরক বিমান, ৩অ।

যুগের পরিমাণ ২,৪০০ এবং কলিযুগের পরিমাণ ১,২০০ দৈববৎসর। (১৪)

স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যুগে যুগে, ধর্ম্মের পাদক্রমে অর্থাৎ চতুর্থাংশ করিয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। তদনুসারে পৃথিবীস্থিত মানবদিগের শরীর ধারণ ও পোষণ এবং রোগ বিনাশের উপযুক্ত যাবতীয় দ্রব্যেরও রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব প্রভৃতি (১৫) ধর্ম্ম বা শক্তিরও চতুর্থাংশ করিয়া হ্রাস হইতে থাকে। কাজে কাজেই মনুষ্যের পরমায়ুরও ক্রমশঃ চতুর্থাংশ করিয়া হ্রাস হইয়া আইসে। (ত)

মনুষ্য-শরীরের সুস্থতা-রক্ষা ও পুষ্টি-সাধন বিষয়ে আহারীয় দ্রব্য এবং রোগ নাশ বিষয়ে ঔষধদ্রব্যই প্রধান সাধন। (থ) দ্রব্য সকলের রস গুণাদি ধর্ম্মের উৎকর্ষ থাকিলেই ঐ কার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন হইবে। আর অপকর্ষ থাকিলেই ঐ কার্য্যের অল্পতা হইবে; ইহা অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের অধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে, পার্থিব অচেতন বা উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের স্বতঃসিদ্ধ শক্তির হ্রাস হইবে, এ কথা অচেতন-জড়-বিজ্ঞান মাত্র অবলম্বন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, ভিন্ন পদার্থ। সেই বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া, প্রাচীন মহর্ষিগণ স্থির করিয়াছেন যে, অচেতন জড় সকল, চৈতন্যময় সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়োগ অনুসারে স্ব স্ব শক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিতেছে। অতএব, পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ডদান, যে জগদীশ্বরের কার্য্য, তাঁহার রাজ্যে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে মনুষ্যগণের সুখসাধনস্বরূপ দ্রব্য সকলের শক্তি, প্রয়োজন মতে কমিয়া যাওয়া, বিচিত্র কি?

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে দ্রব্যের শক্তি ও মনুষ্যের আয়ুঃ ক্রমশঃ অল্প হইতেছে কি না, তাহা উপরিতন ৫। ৭ পুরুষের আয়ুঃ এবং ১০০ বা ১৫০বৎসরের দ্রব্যশক্তির বিষয় নিরপেক্ষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলেই চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের বোধগম্য হইতে পারে। বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থানী, তদপেক্ষা কাবুলী ও তদপেক্ষা কোন কোনও ইউরোপীয়, আবার তদপেক্ষা দক্ষিণ আমেরিকাবাসীদিগকে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী দেখিয়া, মূল সিদ্ধান্তের অন্যথা ভাবিতে হইবে না। কারণ, কি দুর্ব্বল বাঙ্গালী, কি বলিষ্ঠতম আমেরিকান, উভয়ের পক্ষেই পূর্ব্ব পুরুষের সহিত তুলনা করিলে, মূলতত্ত্ব খাটিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে যে জাতি যত পরিমাণে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী জল, বায়ু প্রভৃতি প্রাপ্ত হয় এবং তৎসংক্রান্ত নিয়ম পালনে সমর্থ হয়, তাহার আয়ুর তত পরিমাণে আপেক্ষিক দৃঢ়তা হইতেছে, এইমাত্র প্রভেদ।

ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে যুগেযুগে মানবগণের যে যথাক্রমে চতুর্থাংশ করিয়া আয়ুর হ্রাস হইতেছে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহা হিসাব করিয়া লইবার গণিতসংক্রান্ত নিয়ম পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,

(১৪) পুরাণশাস্ত্র সকলে, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে।

(১৫) দ্রব্যের রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব, ইহাদিগের সবিশেষ বিবরণ, অতঃপর যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

(ত) "যুগে যুগে ধর্ম্মপাদঃ ক্রমেণানেন হীয়তে।
গুণপাদশ্চ ভূতানামেবং লোকঃ প্রলীয়তে॥"
চরক, বিমান, ৩অ।

(থ) "প্রাণিনাং পুনর্ম্মূলমাহারো বলবর্ণোজসাঞ্চ।
স ষট্‌সু রসেষ্বায়ত্তো রসাঃ পুনর্দ্রব্যাশ্রয়াঃ" ইত্যাদি।
সুশ্রুত, সূত্র, ১অ।

"তদ্দ্রব্যমাত্মনা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বীর্য্যেণ সেবিতং।
কিঞ্চিদ্রসবিপাকাভ্যাং দোষং হন্তি করোতি বা॥"
সুশ্রুত সূত্র ৪০ অ।

যুগপরিমাণ দৈব বৎসরের শতাংশের একাংশ গত হইলে, মানবদিগের আয়ুর মানবীয় এক বৎসর হ্রাস হইবে। এই-রূপে সত্যযুগের প্রথম দিনে, মনুষ্যের আয়ুর পরিমাণ যত, ত্রেতাযুগের প্রথম দিনে, তাহার আয়ুর পরিমাণ তাহার চতুর্থাংশ ন্যূন হইবে, ইত্যাদি। (দ)

গণিত শাস্ত্রের সমানুপাত-ঘটিত নিয়ম দ্বারা এই অঙ্ক নিষ্কাশন করিতে হয়। যথা,

মনে কর, সত্যযুগের প্রথম দিনে যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সম্ভাবিত আয়ুর পরিমাণ যেন মানবীয় ৪০০ বৎসর। এদিকে সত্যযুগের নির্দ্দিষ্ট যুগ পরিমাণ ৪,৮০০ দৈব বৎসর। ঐ দৈব বৎসরকে এক শত ভাগ করিলে প্রতি ভাগে ৪৮ বৎসর হইল। অতএব সমানুপাতটী এই—

প্রথমকারণ	দ্বিতীয়কারণ	প্রথমকার্য্য	দ্বিতীয়কার্য্য
দৈববৎসর	দৈববৎসর	মানববৎসর	মানববৎসর
গত ৪৮ :	গত ৪৮০০ ::	ক্ষয় ১ :	ক্ষয় অ

অতএব ৪৮ × অ = ৪৮০০ × ১ = ৪৮০০।

অতএব, অ = ৪৮০০ ÷ ৪৮ = ১০০ বৎসর ক্ষয়।

তাহা হইলে, ত্রেতাযুগের প্রথম দিনে, যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সম্ভাবিত আয়ুর পরিমাণ, ৪০০—১০০= ৩০০ মানববৎসর হইল। ইত্যাদি। *

(দ) "সংবৎসরশতে পূর্ণে যাতি সংবৎসরঃ ক্ষয়ং।
দেহিনামায়ুষঃ কালে, যত্র যন্মানমিষ্যতে॥"
চরক, বিমান, ৩ অঃ।

* এই আয়ুর্ব্বিজ্ঞান প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বিশারদ কবিরাজ কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদ অবলম্বনে সঙ্কলিত। এই আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের কোন কোন স্থল আমাদের অনুমোদিত না হইলেও আয়ুর্ব্বেদ কিরূপ যুক্তি পরম্পরা লইয়া স্বমত স্থাপন করিতেছেন এই কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত আমরা ইহা প্রকাশ করিলাম।
সং।

বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা।*

যে সকল শক্তির দ্বারা পৃথিবীর মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং মানবসমাজ আলোড়িত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ধর্ম্ম-বিপ্লবের শক্তিই সর্ব্বপ্রধান। এই শক্তিই মানব সংসারে কি মনোবিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞান, কি শিল্প ও সাহিত্য সকল বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্থান অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আবৃত ছিল, যেখানকার অধিবাসিরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অত্যাবশ্যক বিষয় সকলে সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ থাকিয়া বনচর পশুর সহিত নগ্ন দেহে নর-মাংস ভোজন করিয়া বেড়াইত, আশ্চর্য্যের বিষয়; ধর্ম্মান্দোলনের শক্তিতে তথায় নিবিড় অরণ্যানীর পরিবর্ত্তে সুরম্য প্রাসাদাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে, শ্বাপদসঙ্কুল স্থান সকলে বিদ্যামন্দির ও ধর্ম্মমন্দিরের চূড়া উত্থিত হইয়াছে, এবং তথাকার লোকেরা বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্য ও বাণিজ্য লইয়া আলোচনা করিতেছে। এই কারণেই পণ্ডিতেরা ধর্ম্মকে মানব সমাজের স্তম্ভরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় যে, বাঙ্গলা-সাহিত্য; তাহার মূলে অবতরণ করিলেও আমরা তথায় ধর্ম্মবিপ্লবের শক্তির বিদ্যমানতাই বিশিষ্ট-রূপে দেখিতে পাই।

অনেকে বাঙ্গলা সাহিত্যের বিগত ইতিবৃত্তকে তিন অংশে—তিনযুগে বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম যুগ,—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় যুগ,—ষোড়শ শতা-

* গত ৩রা আগষ্ট রবিবার আলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, ইহা তাহার সারাংশ।

ব্দীর আরম্ভ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় যুগ তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত। প্রথম যুগের নেতা জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস প্রভৃতি। দ্বিতীয় যুগের চৈতন্যদেব, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবনদাস, মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি। তৃতীয় যুগের মহাত্মা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি। কিন্তু আমার বোধ হয়, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনযুগে বিভক্ত না করিয়া, প্রথম যুগ বাদ দিয়া দুই যুগে বিভাগ করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতির রচনাবলীতে বাঙ্গলা অপেক্ষা মৈথিলী ভাষার আধিক্যই প্রচুররূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে যখন তান্ত্রিক ধর্ম্মের শুষ্কভাব বিরাজমান এবং ব্যভিচার ও সুরাপান প্রভৃতি জঘন্য ও জুগুপ্সিত ক্রিয়া ধর্ম্মের নামে আধিপত্য করিতেছিল, তখন খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর অবসানে মহাত্মা চৈতন্য দেব অভ্যুদিত হইয়া ভগবৎ-ভক্তির প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে কেবল নবদ্বীপ বা বঙ্গদেশ নয়, কিন্তু উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর এবং পশ্চিমে বৃন্দাবন হইতে পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশকে আন্দোলিত করিয়াছিলেন। এই প্রবল ধর্ম্মান্দোলনের শক্তি যেমন বঙ্গের তাৎকালিক সমাজ ও চিন্তারাজ্যকে আলোড়িত করিয়াছিল, সেইরূপ ইহা দ্বারা অন্যদিকে বঙ্গীয় সাহিত্যের ভিত্তি ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ এবং তৎশিষ্যেরা প্রবল মত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন, আলোচনা এবং বক্তৃতাদির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়াও এই ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত এবং বৃন্দাবন দাস প্রণীত চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থকে বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রথম পুস্তক বলিয়া ঘোষণা করিলেও বোধ হয় কিছুমাত্র অতিবাদ দোষে দূষিত হইতে হয় না। তারপর মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কাশীরাম, কৃত্তিবাস প্রভৃতির গ্রন্থাবলী উত্তরোত্তর বাঙ্গলা-সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও দ্বিতীয় যুগের, বা আমার মতে প্রথম যুগের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্যে গদ্য লেখার প্রবর্ত্তনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সময়ের সাহিত্য সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

তৎপরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে একটী, একটী কেন,—দুইটী প্রবল ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। যখন ইংরাজ বণিকদিগের বাহুবলে বা কৌশলে মোগল সাম্রাজ্য হীনশক্তি হইয়া পড়িতেছিল, এবং অবশেষে যখন মোগলদিগের শাসনদণ্ড ইংরাজদিগের করায়ত্ত হইল, তখন একজন অসাধারণ মানসিক বীর্য্য সম্পন্ন ব্রাহ্মণ সন্তান আবির্ভূত হইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং প্রায় এই সময়েই কয়েক জন সাধুচরিত্র পুরুষ ইংরাজ রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট ধর্ম্মের সুসংবাদ ঘোষণার নিমিত্ত এদেশে পদার্পণ করেন। ইহাঁরা একদিকে যেমন খৃষ্ট ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নিজেদের লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন

এবং অবশেষে আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত সামান্য হলচালনাতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে দেশীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পেও বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, অধিক কি, ইহাঁরাই বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশিত করেন এবং যে ছাপার অক্ষরে আজ আমরা হাজার হাজার গ্রন্থ ছাপাইতেছি, সেই ছাপার অক্ষরও তাঁহারা নিজ হস্তে প্রথম প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং এই অংশে আমরা সকলেই এই বিজাতীয় ধর্ম্মাক্রান্ত বিদেশীয় ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট চিরদিনের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা-ঋণে নিবদ্ধ। মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া বেদান্তসূত্র, দশখানি প্রধান প্রধান উপনিষৎ, ভট্টাচার্য্য গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতের সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব ইত্যাদি নানা প্রস্তাব বঙ্গীয় সাহিত্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন—অধিক কি তিনিই বঙ্গীয় সাহিত্যে গদ্য রচনার প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর আদি ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়াস পাইয়াছেন। পূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় এদেশে তত্ত্ববিদ্যা বিস্তারের জন্য 'তত্ত্ববোধিনী' সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভার উদ্যোগে একটী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হয়। এই পত্রিকার প্রচার অবধি পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ইনি তৎকালে যেরূপ যোগ্যতা এবং গভীর বিদ্যাবত্তার সহিত এই পত্রিকা সম্পাদিত করিতেন, তদ্দ্বারা তত্ত্ববোধিনী বঙ্গবাসীর অত্যন্ত প্রীতির বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই পত্রিকার নিমিত্ত তখন গ্রাহকেরা মাসান্তে উৎসুক অন্তরে অপেক্ষা করিতেন, এবং ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ইয়োরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কেহ কেহ এই পত্রিকা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন। তত্ত্ববোধিনীর গদ্য রচনাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ গদ্য বলা যাইতে পারে। কি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচার, কি আদিসমাজ হইতে প্রকাশিত অন্যান্য বঙ্গীয় গ্রন্থ এ সমস্তই প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের যত্ন ও প্রভূত অর্থব্যয়ে সাধিত হইয়াছে। তিনি অকাতরে অর্থরাশি ব্যয় না করিলে এবং নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সমস্ত না দেখিলে কি তত্ত্ববোধিনীর প্রচার, আর কি অক্ষয় বাবুর প্রতিভা বিকাশ এ সকল কোথায় থাকিত, তাহা কে বলিতে পারে ?

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু এতদুভয়ের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের গদ্যাংশের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাস" প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থের সুললিত বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল রচনার ন্যায় গদ্য রচনা বাঙ্গলায় অতি বিরল। অধিক কি, ইহা বলিতে আমি বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত নহি যে, এই দুই জনের ন্যায় প্রতিভাশালী মনস্বী লোক তৎকালে জন্মগ্রহণ না করিলে বাঙ্গলা ভাষা কখন এত পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিত না। এই কারণে কেহ কেহ বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবুকে বঙ্গীয় সাহিত্যরূপ আকাশের চন্দ্র ও সূর্য্য রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক সূর্য্য চন্দ্র না থাকিলে জগতের যেরূপ অবস্থা হয়, ইহাঁরা না থাকিলেও আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সেইরূপ অবস্থা হইত। ইহাঁদের পর আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যে অনেক প্রতিভাশালী তেজস্বী লেখক লে-

খনী ধারণ করিয়াছেন, যাঁহাদের নাম আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এতক্ষণ আমি যাহা বলিলাম, তাহা কেবল বঙ্গীয় সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত মাত্র। এখন ইহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১ম। বাঙ্গলার বর্ত্তমান গদ্যের অবস্থা আলোচনা করিলে তত উন্নতিশীল বলিয়া মনে হয় না। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের পর কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রজনীকান্ত গুপ্ত, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এবং অদ্যকার সভাপতি চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রভৃতিকেই গদ্যলেখক শ্রেণীর আসন প্রদান করা যাইতে পারে। ইহাঁদিগের রচনা সুখপাঠ্য চিন্তাপূর্ণ প্রাঞ্জল সুললিত এবং বিশুদ্ধ। তার পর আর যে সকল গদ্য রচনা দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে কোনটিতে চিন্তার সমাবেশ আছে, কিন্তু প্রাঞ্জলতা নাই, কোনটি বেশ ভাবপূর্ণ, কিন্তু ভাষা একেবারেই বিশ্রী ও বিকলেন্দ্রিয়। আধুনিক গদ্যলেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশের এই ত্রুটি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, তাঁহারা ভাষার স্বাভাবিক ভাব বিকাশের পথে যে সকল উপায় আছে, একদিকে যেমন তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন না, সেইরূপ অন্যদিকে রচনাকে মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন করিবার নিমিত্ত তত প্রয়াস পান না। আমি জানি এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক লিখিলে বেশ বিশুদ্ধ ভাবে লিখিতে পারেন, কিন্তু অনবধানতাই বলুন বা উপেক্ষাই বলুন, অথবা অন্য যে কোন কারণই বলুন, তাঁহারা তাহার বশবর্ত্তী হইয়া সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। আজ কাল এমন অনেক গদ্য রচনা সচরাচর পরিদৃষ্ট হয়, যাহার ভাষা না বাঙ্গলা, না ইংরাজি।

২য়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায়, নবীনচন্দ্র সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ব্যক্তি বাঙ্গলা সাহিত্যের কবিতাবিভাগে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। গদ্যের সহিত পদ্যের তুলনা করিলে, গদ্যাংশ যতটুকু পুষ্টি বা উন্নতি লাভ করিয়াছে; কবিতাংশে ততটুকু উন্নতি হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। এই সকল কবির মধ্যে অনেকের রচনা কবিত্বাংশে কতটুকু উপযুক্ত, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে অনেক স্থলে আশার পরিবর্ত্তে নিরাশারই সঞ্চার হয়। গবর্ণমেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি হইতে বাঙ্গলা পুস্তক সম্বন্ধে তিন মাস অন্তর যে তালিকা প্রচারিত হয়, তাহা আপনাদের মধ্যে অনেকেই পাঠ করিয়া থাকেন। তাহাতে দেখা যায় বাঙ্গলা ভাষায় অজস্র রাশি রাশি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, বলা বাহুল্য যে, সে সকল পুস্তকের মধ্যে কবিতা ও উপন্যাস সংক্রান্ত পুস্তকের সংখ্যাই অধিকতর। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান গতিকে উপন্যাস ও কবিতার দিকেই কিছু প্রখরা বলিতে হইবে। এই যে কবিতাসংক্রান্ত ভূরি ভূরি পুস্তক পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের বর্ণিত বিষয়, রচনা, এবং কবিত্বের কথা আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? এই সকল কবিতার মধ্যে অনেক কবিতার ভাষা অধিকাংশ স্থলেই দুর্বোধ এবং অপরিস্ফুট। "কি জানি কি জানি", "না জানি কি জানি না" ইত্যাদি অর্থশূন্য অলক্ষ্যোদ্দিষ্ট শব্দে আধুনিক অনেক কবিতাই অলঙ্কৃত। জোছনার হাসি,

ঘুমন্ত প্রেম, অভাগার বিলাপ, কেন ভালবাসি, প্রিয়তমার কপোলে চুম্বন ইত্যাদি বিষয়ই নব্য কবিদিগের আলোচ্য ; প্রণয় ও বিরহ ছাড়া এখনকার পুংজাতীয় ও স্ত্রীজাতীয় উভয় জাতীয় কবিরা আর কোন বিষয়ে লিখিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। তার পর আধুনিক গদ্য লেখকেরা যেমন ব্যাকরণকে আপনাদের রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ কবিগণও ব্যাকরণকে আপনাদের সীমার বাহির করিয়াছেন। কবিতা স্থলবিশেষে ব্যাকরণের অনুগামিনী না হইলেও যদিও তাহা তত একটা দোষের বিষয় নয় ; তথাপি একেবারে সীমার বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত নয়। ইহাঁরা বলেন অন্বয় আবার কি ? অন্বয় না হইলেই যে কবিতা হইল না, তাহার অর্থ কি ? কিছুদিন হইল এই জাতীয় একজন কবির সহিত আমার পরিচয় হয়, তাঁহার সহিত আলাপে জানা গেল যে, বাঙ্গলা ভাষায় চারিটীর অধিক কারক নাই।

ক্রমশঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

শিবনারায়ণ বলিলেন যে এই স্থূল শরীর কি অপরাধ করিয়াছে ? কেন অনর্থক তাহাকে দাগ দেওয়া। স্থূল শরীরকে দাগ দিলে আমার সূক্ষ্ম শরীরের কি লাভ হইবে। অথবা স্থূল শরীরকে দাগ না দিলে তাহাতে আমার কি ক্ষতি হইবে। যদ্যপি স্থূল শরীরে দাগ দিলে মুক্তি হয় তাহা হইলে পৃথিবীর উপর কত পশুদিগকে অর্থাৎ ঘোড়া গরু ইত্যাদিকে দাগ দেওয়া যাইতেছে এবং নম্বর দেওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে তো তাহারাও সকলেই মুক্ত হইবে। অনর্থক তোমরা কেন ভ্রমে পতিত হইতেছ ও প্রজাদিগকে ভ্রমেতে পতিত করিয়া কষ্ট দিতেছ। এবং যাঁহার নাম কৃষ্ণ ভগবান অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু তাঁহাতে যাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা নিষ্ঠা আছে তাঁহার স্থূল শরীরে ছাপ লইবার প্রয়োজন কি ? তাঁহার জ্ঞানরূপ ছাপ অন্তরে বাহিরে লাগান আছে। অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মা পরিপূর্ণরূপে ছাপ লাগান আছে, বাহিরের ছাপে কোন প্রয়োজন নাই। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যেই হউন যে ব্যক্তি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে বিমুখ হইবেন সেই ব্যক্তি এই ছাপ লইবার ইচ্ছা করিবেন। শিবনারায়ণ দ্বারকানাথের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া সমুদ্র পার হইয়া কচ্ছ ভুজ দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কচ্ছ ভুজ হইতে আন্দাজ ৩০। ৪০ ক্রোশ দূরে নারায়ণ সরোবর তীর্থে যাইলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন যে একটি পুকুর আছে। সেই পুকুরে যাত্রিরা যাইয়া স্নান করে এবং পাণ্ডাদিগকে দান করে, বক্ষঃস্থলেও ছাপ লয়। একটী পাণ্ডা এক যাত্রির নিকট হইতে অন্য অন্য পাণ্ডা অপেক্ষা এক পয়সা বেশি পাইযাছিল। অন্য অন্য পাণ্ডারা বলিল তুমি এক পয়সা বেশি পাইয়াছ তাহা হইতে আমাদিগকে অংশ দেও। সেই পাণ্ডা বলিল অন্য কোন সময় তোমরাও পাইলে লইও, এক পয়সা এখন কি করিয়া ভাঙ্গাইব। তাহাতে অপর পাণ্ডারা বলিল যে কড়ি ভাঙ্গাইয়া লইয়া আইস ও তাহা আমাদের অংশ করিয়া দাও। সে ভাঙ্গাইল না, সে ব্যক্তি বলিল এখন আমি ভাঙ্গাইতে পারি না। এই কথা শুনিবা মাত্র পাণ্ডারা তাহাকে গলাগালি দিতে লাগিল। সেই পাণ্ডাও তাহাদিগকে দুই একটা গালি দিল। সকল পাণ্ডারা পড়িয়া তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিল, মারিতে মারিতে সেই পাণ্ডাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল এবং পয়সা কড়ি যাহা কিছু ছিল সে সমস্ত তাহারা কাড়িয়া লইল। শিবনারায়ণ এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, যিনি নারায়ণ সরোবরে দিবারাত্র বাস করিতেছেন এবং পূজা ও স্নান করিতেছেন তাহাদের তো এই অবস্থা, এককড়া কড়ির তরে মনুষ্যকে হত্যা করিতেছে। যাত্রিরা আসিলে তাহাদের না জানি কি অবস্থাই ঘটে। যে জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের নাম নারায়ণ সরোবর সেই সরোবরে যে ব্যক্তি স্নান করিবেন তিনি সদা মুক্ত আনন্দ স্বরূপ থাকিবেন। বক্ষঃস্থলে ছাপ লইবার অর্থ বিরাট পরব্রহ্মের আকাশরূপি বক্ষঃস্থল মধ্যে চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের ছাপ দিবা রাত্রি প্রকাশমান আছেন। এই জ্যোতির্মূর্ত্তি ঈশ্বরের ছাপ রাজা প্রজাদিগকে বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ হৃদয়েতে শ্রদ্ধা

ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করা চাই, তাহা হইলে, সকল ভ্রম কষ্ট নিবারণ হয়। পরে সেখান হইতে শিবনারায়ণ জাহাজে উঠিয়া সমুদ্র পার হইয়া সিন্ধুদেশে আসিলেন, এবং করাচি বন্দর সহরে যাইলেন। সেখান হইতে নগরঠাট্টা নামে এক গ্রামে যাইলেন, সেখান হইতে সন্ন্যাসি সাধুরা হিংলাজ তীর্থে যায়। সেই নগরঠাট্টা হইতে সাধু সন্ন্যাসি যাত্রিরা দ্রব্যাদি সমুদায় প্রস্তুত করিয়া ও জল সংগ্রহ করিয়া, উষ্ট্রের উপর তুলিয়া লয়; সেইখানে একজন সেথো আগে আগে পথ দেখাইয়া হিংলাজে লইয়া যায়। নগরঠাট্টা হইতে হিংলাজ যাইতে পথি মধ্যে কোন গ্রাম পাওয়া যায় না, যদ্যপি কোন স্থানে গ্রাম পাওয়া যায় তাহাতে কেবল মুসলমানেরা বাস করে, এবং পথি মধ্যে কেবল জঙ্গল এবং বালুকাময় মরুভূমি। নগরঠাট্টা হইতে হিংলাজ যাইতে এবং আসিতে ১২। ১৪ দিন লাগে, এবং পথি মধ্যে অত্যন্ত ক্লেশ হয়, অন্ন জল পাওয়া যায় না। যদ্যপি কেহ উষ্ট্রে চাপাইয়া জল না লইয়া যায় তাহা হইলে কষ্টের পরিসীমা থাকে না। সেই হিংলাজ তীর্থে যাইয়া যাত্রিরা কি দর্শন করেন? একটা ছোট কুণ্ড আছে, এবং সেইখানে একটী মুসলমানের বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। যে দিবস যাত্রিদিগের যাইবার সময় হয় সেই দিবস একটা প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। দিবারাত্র সেই প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। সেই খানে যাইয়া যাত্রিরা স্নান করিয়া বিভূতি লইয়া মাখিয়া সেই প্রদীপের জ্যোতিকে দর্শন করিয়া এবং দান পুণ্য করিয়া আহারাদি করিয়া ওখান হইতে সিন্ধুদেশে চলিয়া আইসেন, এবং হিংলাজ তীর্থে যে পয়সা যাত্রিদের ব্যায় হয় তাহা নগরঠাট্টা মহন্ত প্রথমে লন ও যে সেথো পথ দেখাইয়া লইয়া যায় সেই ব্যক্তিও কিছু লয় আর মুসলমান বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী কিছু লয়। অন্য অন্য প্রপঞ্চ অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনাও করিয়া রাখে।

শিবনারায়ণ কাহার সঙ্গে যান নাই, একলা যাইয়া সমস্ত দেখিয়া সিন্ধুদেশের মধ্যে হায়দারাবাদ সহরে ঘুরিয়া আসিলেন। হায়দারাবাদ হইতে রোড়িশক্কর সহরে যাইলেন। সেখান সাত ভেলা নামে নদী আছে। তাহার মধ্যে একটী ছোট দ্বীপে একটী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া কতকগুলি ভেকধারি সাধু আছেন। শিবনারায়ণ সেইখানে যাইলেন কিন্তু তাহাদের ভেকের সহিত শিবনারায়ণের মিল না হওয়াতে একজন মোহান্তের চেলা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। শিবনারায়ণ নদী পার হইয়া ক্রমে ক্রমে মুলতান সহরে চলিয়া আসিয়া দেখিলেন, যে মুলতান সহরের নিকট যে কেল্লা আছে তাহার মধ্যে মুসলমানদিগের বড় বড় মস্‌জিদ আছে ও কেল্লার নিকটে হিন্দুদিগের একটা মন্দিরও আছে। সেই মন্দির মধ্যে প্রহ্লাদ ও সুদামের এবং শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত। সেই মন্দির পূর্ব্বে ছোট ছিল। এখন হিন্দুরা তাহাকে বড় করিয়া নির্ম্মাণ করাইতে লাগিল। তাহাতে মুসলমানেরা আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, তোমরা বড় মন্দির তুলিও না, যত বড় আছে অত বড় থাকিতে দাও, যদ্যপি তোমাদের মন্দির বড় কর তাহা হইলে আমাদের মস্‌জিদ ছোট দেখাইবে। তোমরা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, আমরা তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তোমাদের পূজার স্থান ছোট হওয়া উচিৎ এবং আমাদের বৃহৎ হওয়া চাই। হিন্দুরা বলিল "যত দিন তোমাদের উপরে ঈশ্বরের কৃপা ছিল ততদিন রাজ্য ভোগ করিয়াছিলে এবং বড় বড় মস্‌জিদ তুলিয়াছিলে। টাকার জোর। এখন পরমেশ্বর আমাদের টাকা দিয়াছেন আমরাও বড় মন্দির তুলিব।" এই কথা বলিয়া হিন্দুরা মন্দির তুলিতে লাগিল। পরে অনেক মুসলমান একত্র হইয়া মন্দিরে আসিয়া গরু কাটিয়া একটা কূপে ও মন্দির মধ্যে ঠাকুরের কাছে ফেলিয়া দিল এবং সেখানে যত সাধু ছিল তাহাদিগকে ভয়ানক প্রহার করিতে লাগিল। সাধুরা প্রহারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল এবং সেখানে যাহা কিছু ছিল মুসলমানেরা তাহা কাড়িয়া কুড়িয়া লুঠিয়া লইল। এক জন স্ত্রীলোক সেই স্থানের মোহান্ত ছিলেন, তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য মুসলমানেরা অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক প্রাণ রক্ষার জন্য একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া ছিল বলিয়া তাহাকে ধরিতে পারিল না। এই সকল ঘটনার কিছুক্ষণ পরে হিন্দুরা শুনিতে পাইয়া গ্রাম হইতে দৌড়িয়া আসিল। এবং মুসলমানেরাও অধিক পরিমাণে জুটিয়া উভয় দলে মারামারি হইতে লাগিল। কিন্তু সেই দেশে হিন্দুর ভাগ অতি অল্প এবং হিন্দুরা অতি ধীরপ্রকৃতি সেই কারণে মুসলমানেরা তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রহার করায় হিন্দুদিগের মধ্যে হাহাকার রব উঠিল। সেখানে কোম্পানির পল্টনের মধ্যে খবর হওয়াতে অনেক সিপাহী হিন্দুস্থানী এবং পঞ্জাবী আসিয়া মুসলমানদিগকে মার ধর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া হিন্দুদিগকে রক্ষা করিল, এবং উভয় পক্ষে

আদালতে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। ভগলপুরের মুসলমান নবাব এই কথা শুনিয়া আপনার রাজ্য মধ্যে গ্রামে সহরে হিন্দু প্রজাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন এবং গরু কাটিয়া হিন্দুদিগের দোকানে দোকানে টাঙ্গাইয়া দিতে চাকরদিগকে আজ্ঞা দিলেন। নবাবের হিন্দু চাকরদিগের বাসাতেও গোমাংস টাঙ্গাইয়া দিতে লাগিল। তাহাতে হিন্দু চাকরেরা চাকরী ছাড়িয়া দেশে দেশে পলাইতে লাগিল। এ সকল কথা শুনিয়া এবং সাহেব হাকিম আসিয়া নবাবকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "যদি তুমি এই রকম দৌরাত্ম্য কর তাহা হইলে তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোরে লইয়া যাইয়া কয়েদ করিব।" পরে যে কি কি ঘটনা হইয়াছিল। তাহা শিবনারায়ণ জানেন না, কেননা শিবনারায়ণ এই পর্য্যন্ত দেখিয়া সেখান হইতে লাহোর চলিয়া আসিলেন এবং পরে কি ঘটিয়াছিল তাহা তিনি জানেন না।

শিবনারায়ণ স্বামী যখন সিন্ধু দেশ হইতে মুলতান প্রত্যাগমন করিতেছিলেন সেই সময় একজন শ্রীবৈষ্ণবও সেই মুলতানে আসিয়া স্বামিজীর সহিত একত্রিত হইলেন। তাঁহার স্কন্ধে বহু সংখ্যক ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত ঠাকুর ছিল। ওজনে ৩০।৩৫ সের হইবার সম্ভব, তদ্ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য বাসন ও বস্ত্র ইত্যাদি ছিল। সেই সকল দ্রব্যাদি ঘাড়ে করিয়া তিনি দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেন। সেই দুঃখ দেখিয়া শিবনারায়ণ তাঁহাকে সৎ উপদেশ দিতে লাগিলেন। কহিলেন হে মহাত্মা তুমি শুন এবং গম্ভীর ও শান্তভাবে বিচার করিয়া দেখ, তুমি যে ভেক ধরিয়াছ সেটা বোঝা ফেলিবার জন্য না বোঝা ধারণ করিবার জন্য? সাধু বলিলেন, হাঁ, বোঝা ফেলিবার জন্য ধারণ করিয়াছি। শিবনারায়ণ বলিলেন তবে তুমি অত বোঝা কেন বহিয়া কষ্ট পাইতেছ। উহার মধ্যে যা কিছু নিতান্ত দরকার তাহাই কেন রাখ না। সাধু বলিলেন যে মহারাজ আমার ব্যবহার্য্য থাল গেলাস বাটি লোটা কাপড় ইত্যাদি ইহাতে আছে। আর গুরু আমাকে যে সকল ঠাকুর দিয়াছেন তাহা এবং যে তীর্থে গিয়াছি সেইখানে ভাল ভাল ঠাকুর যাহা পাইয়াছি তাহাও ইহাতে আছে। এখন গুরুদ্বারে যাব এবং এই সকল ঠাকুর তাঁহাকে দিব। শিবনারায়ণ বলিলেন গুরুকে সকল তীর্থের ঠাকুর দিবে ইহা ভাল কথা। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ যে ঠাকুর কি বস্তু এবং তুমি কি বস্তু আর তুমি কি বস্তু হইয়া তুমি কোন্ বস্তু ঠাকুরকে পূজা করিতেছ। এই আকাশের মধ্যে এবং তোমার ভিতরে বাহিরে তোমা হইতে কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু আছেন, আপনা হইতে যে শ্রেষ্ঠ হয় তাহার সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহাকে পূজা করিতে হয়, কারণ তিনি জ্ঞান দিবেন, ইহাতে তুমি মুক্ত স্বরূপ হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে। আর এই যে বস্তু তুমি ঘাড়ে করিয়া বহিয়া কষ্ট পাইতেছ এত পিতল, তাম্র এবং পাথর, ইহাকে তো ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছেন কেবল তোমাদের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য। তোমা হইতে সে শ্রেষ্ঠ, না তুমি তাদের হইতে শ্রেষ্ঠ। তুমি সৎ অসৎ সকল বস্তু'কে বিচার করিতেছ অতএব তুমি সৎকে ধারণ কর এবং ভক্তি প্রীতি কর তাহা হইলে তুমি জ্ঞান পাইয়া মুক্ত স্বরূপ থাকিবে। সাধু বলিলেন মহারাজ, আমি এই ধাতু পাথরেতে কল্পনা করিয়া ভগবান্কে পূজা করিতেছি। শিবনারায়ণ বলিলেন হে সাধু, যখন তুমি এই জড় পদার্থেতে ভগবানকে বিশ্বাস করিয়া পূজা করিতেছ তখন তুমি বিচার করিয়া দেখ যে তুমি প্রত্যক্ষ চেতন ষোলকলার পূর্ণ আছ—তুমি আপনার অন্তরেতে তাঁহাকে না বিশ্বাস করিয়া আর উল্টা ধাতুতে বিশ্বাস করিতেছ। যখন ধাতু জড় পদার্থেতে তিনি আছেন তখন তোমাতে কেন তিনি নাই? আপনার মধ্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ভক্তি প্রীতি কর। সাধু বলিলেন যে আপনাতে যদিও বিশ্বাস করি তাহা হইলেও শুনিয়াছি জড়পদার্থ ইত্যাদিও তো ভগবানের স্বরূপ। তাহাতে পূজা করিলাম তো কি হইল। শিবনারায়ণ বলিলেন যে তাহা বটে, যত বস্তু দৃশ্যমান আছে সকলি তো তাঁহার স্বরূপ এবং তুমিও তো তাঁহারি স্বরূপ, কিন্তু বিচার করিয়া দেখ যে যদ্যপি গঙ্গাজল ও নর্দ্দামার জল স্বরূপে একই পদার্থ, কেন না, গঙ্গাজল পান করিয়া সেই জল নির্গত হইলে নর্দ্দমার জল হয় ও দুর্গন্ধ হয়, তাহা এক বলিয়া কি আমি তোমাকে সেই নর্দ্দমার জল খাইতে বলিব? নর্দ্দমার জল খাইলে নানা প্রকার রোগ ইত্যাদি জন্মিবে। অতএব গঙ্গাজল পান করিতে বলিব যাহাতে তোমার কোন রোগ না জন্মায় এবং পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া আনন্দিত থাক। আরও মাটি ও অন্ন ইত্যাদি ও বিষ্ঠা একই পদার্থ, তা বলিয়া কি তোমাকে আমি মাটি ও বিষ্ঠা আহার করিতে বলিব, না অন্ন আহার করিতে বলিব? মূর্খ ও চোর ডাকাইত ও পণ্ডিত মহাত্মা স্বরূপেতে একই কিন্তু তা বলিয়া কি মূর্খ ও চোর ডাকাইতের কাছে তোমাকে রাখিব, যাহাতে চোর ডাকাতের মতন বুদ্ধি হবে ও কষ্ট পাবে, না জ্ঞানি পণ্ডিত ও মহাত্মার কাছে রাখিব, যাহাতে তাঁহারা সৎবুদ্ধি দিবেন সৎপথে লইয়া যাইবেন। যাহাতে তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি হইয়া

জ্ঞান উৎপত্তি হইবে, যাহাতে ভগবানকে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপকে চিনিয়া ভক্তি প্রেম করিয়া তাঁহাতে অভেদ হইয়া সদা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে ? আর প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখ তোমার শাস্ত্র বেদেতে সাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ আছেন। ইহাও লেখা আছে আত্মা নির্গুণ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সূর্য্যনারায়ণ বিরাট বিষ্ণু ভগবানের নেত্র ও চন্দ্রমাজ্যোতি মন হন, আকাশ হৃদয়, বায়ু প্রাণ, জল তাঁহার নাড়ি ও পৃথিবী তাঁহার চরণ হন। এখানে ভাবিয়া দেখ, যখন প্রত্যক্ষ তোমার সাকার ব্রহ্ম আছেন তখন তুমি ইহাঁকে পূজা না করিয়া কাহাকে ভাবনা করিতেছ ? সকল শাস্ত্রে ধ্যান ধারণার স্থানে এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণ করিতে লেখা আছে। অতএব এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে তোমরা প্রেম ভক্তি দ্বারা ধ্যান ধারণা কর। ঐ তেজ জ্যোতি এবং তুমি যখন ভাবিতে ভাবিতে এক স্বরূপ হইয়া যাইবে, তখন সহজে তুমি নির্গুণ পরব্রহ্মতে লয় পাইয়া আনন্দরূপ থাকিবে। এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের আত্মা গুরু মাতা পিতা। ইহাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করিয়া অনর্থক তোমরা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। মিথ্যা পদার্থেতে আসক্ত হইয়া বলহীন হইয়াছ। যে যে নামে উপাসনা কর না কেন কিন্তু এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণা করিয়া উপাসনা কর। আপনার স্বরূপ এবং আপনার ইষ্ট গুরু অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু একরূপ ভাবিয়া ধ্যান ধারণা কর। যেরূপ পিতাপুত্র ভাব, পিতা হইতে পুত্র হইয়া স্বরূপে একই কিন্তু সুপাত্র পুত্র কন্যার ধর্ম্ম এই যে মাতা পিতাকে ভক্তি প্রেম করা ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করা। শ্রীবৈষ্ণব সাধু বলিলেন—যে ঠিক বলিতেছেন। মহারাজ, এরূপ আর একজন পরমহংস বলিয়াছিলেন কিন্তু বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু আপনার বলাতে আমার নিষ্ঠা বিশ্বাস হইয়াছে যে এই আকাশের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ ছাড়া আর তো কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ইহাঁকে না বিশ্বাস করিয়া বৃথা ভ্রমেতে পতিত হইয়া বেড়াই। অতএব আপনি আমাকে কৃপা করিয়া কিছু দিন সঙ্গে রাখুন,যাহাতে আমার অজ্ঞানতা দূর হইবে। এত দিন এই যে সব পাথর ও ধাতু নির্ম্মিত ঠাকুর লইয়া বেড়াইতেছি ইহা এখন আমি কি করিব, অনর্থক এতদিন আমি বোঝা বহিয়া বহিয়া কষ্ট পাইতেছি। শিবনারায়ণ বলিলেন যে অন্তর্যামি তোমার অন্তরেতে প্রেরণ করাইয়া যাহা তোমাকে বিশ্বাস করান তাহাই তুমি কর। সাধু বলিলেন মহারাজ, আমার তো এই বিশ্বাস ও বিচার আসিতেছে যে ইহার মধ্যে ভাল ভাল পাথরের ঠাকুর যা আছে সে সকল এই পুকুরেতে ফেলিয়া দেই। শিবনারায়ণ বলিলেন যাহা তোমার মনে আইসে তাহাই কর। তৎকালে সাধু সেই কয়েকটা রাখিয়া আর সকলগুলা পুকুরেতে ফেলিয়া দিলেন। এবং সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে সাকার ব্রহ্ম আপনার ইষ্ট জানিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। এবং গুরু বলিয়া ওঙ্কার মন্ত্র জপিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে সাধু শিবনারায়ণকে বলিলেন যে এই কয়েকটা পাথর যাহা লইয়া বেড়াইতেছি তাহাতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছে। যখন আমার প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন তখন অনর্থক আমি কেন এই গুলি বহিয়া মরি। এই সকলকে কাপড়ে বাঁধিয়া গাছে ঝুলাইয়া দেই, যাহার ইচ্ছা হয় লইয়া লইবে। পরে সাধু তাহাই করিলেন এবং থাল ঘটীও কাপড় প্রভৃতি অনেক বোঝা ছিল সে সকল ক্রমে ক্রমে বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং নির্ব্বাহ উপযোগী মাত্র রাখিয়া দিলেন। পরে শিবনারায়ণকে করযোড়ে বলিলেন যে আপনাকে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি যে আপনি এই মহাজাল হইতে আমাকে বাহির করিয়াছেন। এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যে সর্ব্বদা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাতে যাহাতে ভক্তি প্রেম থাকে এবং উনি ভিন্ন অপর পদার্থ আমার হৃদয়েতে না ভাষে। শিবনারায়ন তাহাকে এবং তাহার কুল ও দেশকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন যখন তোমার এরূপ প্রেম পূর্ণ পরব্রহ্মে হইয়াছে ইহা হইতে অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে।

শিবনারায়ণ লাহোর হইতে মুশুরি পাহাড়ে যাইয়া পাহাড়ের উপরে এক গাছের নীচে বসিয়া আছেন ও বৃষ্টি পড়িতেছে এমন সময় একজন শীক্ আসিয়া তাঁহাকে জলে ভিজিতে দেখিয়া বলিল, "মহারাজ আপনি কে, কেন এখানে বসিয়া ভিজিতেছেন, গ্রামের মধ্যে যাইয়া কোন ঘরের মধ্যে বসুন। শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি বন্য জন্তু, আমাকে গ্রাম্য জন্তুরা স্থান দিবে না। দেখিলেই বিরোধ ঘটিবে।" শীক বলিল, "মহারাজ আপনি আমার সহিত আসুন, একজন উদাসীন মহাত্মার স্থান আছে, সেখানে আপনাকে রাখিয়া দিব, সুখে স্বচ্ছন্দে রাত্রি যাপন করিবেন।" শিবনারায়ণ তাঁহার সহিত বাজারের মধ্যে যে সাধুর স্থান আছে সেখানে উপস্থিত হইলেন। সাধুদিগকে বলিয়া দেওয়ায় তাঁহারা শিবনারায়ণকে থাকিবার জন্য স্থান দেখাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ

কিছুকাল বসিয়া থাকিয়া পা ছড়াইয়া শয়ন করিলেন। তাহাতে সেইখানকার একজন সাধু মহাত্মা শিবনারায়ণকে গালিদিয়া বলিলেন "বেটা ওদিকে মহাত্মার সমাধি (কব্বর) আছে।" শিবনারায়ণ সে দিক হইতে পা ফিরাইয়া অপর দিকে করিলেন। সেই মহাত্মা বলিলেন, "বেটা দেখিতে পাইতেছিস না ওদিকে যে গ্রন্থ সাহেব আছেন।" নানককৃত ধর্ম্মউপদেশের পুস্তকের নাম গ্রন্থ সাহেব। শিবনারায়ণ অন্য দিকে পা ছড়াইয়া শুইলেন। সাধু বলিলেন, "ওদিকে মোহান্ত সাহেবের বসিবার সিংহাসন আছেন। তুই বেটা কোথাকার বোকা, দেখিতে পাস্ না?" শিবনারায়ণ সেদিক হইতে পা ফিরাইয়া অপর দিকে রাখিলেন। তখন সেই সাধু রাগ করিয়া মারিতে উঠিলেন। বলিলেন, "বেটা তুই দেখিতে পাইতেছিস্ না ওদিকে গ্রন্থ সাহেবের চৌকি আছেন। ঐ চৌকিতে রাত্রি ১০টার পর গ্রন্থ সাহেবকে শয়ন করাইতে হয়, বেটা এখান হইতে ওঠ, এখান হইতে দূর হইয়া যা।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "ভাই বল পা টা কোথায় রাখিব, দাড়াইয়া থাকিব না পা টা আকাশে তুলিব। এবং তোমরা কোন্ দিকে পা করিয়া শয়ন কর?" সাধু বলিলেন "বেটা আমার সহিত তর্ক করিতেছিস্, আমরা যখন গ্রন্থ সাহেবকে এদিক হইতে ও দিকে চৌকির উপরে শয়ন করাইয়া দিই তখন এদিকে আমরা পা করিয়া শুই।" শিবনারায়ণ বলিলেন, বেশ্ তোমরা সেই প্রকারে শয়ন কর। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে ইহারা নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্মকে মানে, কিন্তু এমন জড়ীভূত পশু হইয়া আছে যে এ বিচার নাই যে নিরাকার পরব্রহ্ম কোন্ স্থানেতে আছেন এবং কোন্ স্থানেতে নাই, কোন্ দিকে আছেন কোন্ দিকে নাই, এবং কোন্ বস্তুতে আছেন, কোন্ বস্তুতে নাই। এবং তিনি পায়ের মধ্যেও আছেন এবং গ্রন্থ সাহেব অর্থাৎ পুস্তক কাগজ কালীর মধ্যেও আছেন। উত্তম মধ্যম সকল স্থানেই তিনি পরিপূর্ণ আছেন এবং সকলই তিনি—এই ভাব না বুঝিয়া ইহারা পশুতুল্য হইয়া আছে। প্রত্যক্ষ চেতনকে এদিক ওদিক পা করিতে দিতেছে না। পুস্তক কাগজ কালী এবং মৃত দেহ যাহাকে পুতিয়া রাখাতে মাটি হইয়া গিয়াছে এই সকল মিথ্যা বস্তুকে শ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া মান্য করিতেছে। এবং প্রত্যক্ষ সত্য যে চৈতন্য, যিনি সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন তাহাকে ঘৃণা করিয়া অপমান করিতেছে: এই জন্যই রাজা প্রজা এবং সাধুরা বলহীন তেজোহীন শক্তিহীন হইয়া সকল বিষয়ে পরাধীন হইয়া আছে। কষ্টের পরিসীমা নাই এবং তাহাতেও জ্ঞান হইতেছে না, অহংকারে মত্ত হইয়া সকলে পশুবৎ হইয়া আছেন। কিন্তু কি করিবেন কেহ স্মরণে নাই। নেত্র থাকিতেও অন্ধকার ঘরে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, এইরূপ অজ্ঞানাবস্থা থাকিলে কিছুই বোধাবোধ থাকে না ও কিছুই দেখিতে পায় না। পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুকে চিনিতে পারে না এবং আপনাকেও জানিতে পারে না যে আমি কে?" পরে সেখান হইতে শিবনারায়ণ ঐ প্রকার অপর এক উদাসীন সাধুর স্থানে যাইলেন। সেই স্থানে দেখিলেন যে সেখানকার মহাত্মা গ্রন্থ সাহেবের সম্মুখে একটী কলসী পুতিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই কলসীর তলায় একটী ছিদ্র করিয়া একটী সরু নর্দামার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। কলসীটী মাটির ভিতর এরূপ ভাবে পোঁতা যে কেহ সহজে আসল ব্যাপার না জানিতে পারে। কলসীর মুখে একটী তাম্র পাত্র তাহার উপর একটী ঘটি। দেখিলে সহসা সহজে জানিতে পারে যে, এই ঘটি কেবল মাত্র মাটির উপর বসান আছে। সেই ঘটিরও তলায় একটী ছিদ্র। সেই ছিদ্র সহজে বন্ধ করিবার জন্য এরূপ উপায় করিয়া রাখিয়াছে যে কেহ কোন প্রকারে টের না পায়। যাত্রিরা সেই গ্রন্থ সাহেবকে দর্শন করিতে যাইলে গ্রন্থ সাহেবের জন্য সরবৎ ও মোহনভোগ লইয়া যায়। মহাত্মারা যাত্রিদের হস্ত হইতে সরবতের ঘটি লইয়া ঐ ঘটীর মধ্যে ঢালিয়া দেন। এবং যাত্রিদিগকে বলেন যে নিরাকার নানক জি খাইয়া ফেলিলেন। যাত্রিরা তাহা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হয় যে নিরাকার নানক বাবা আমার সরবৎ খাইয়া ফেলিলেন। মহাত্মা যে যাত্রিকে কিছু ধনী বলিয়া বোধ করেন তাহার কাছে কিছু অর্থ লইবার অভিপ্রায়ে সেই কৌশলযুক্ত ঘটীর তলায় ছিদ্র বন্ধ করিয়া সেই যাত্রির সরবৎ ঐ ঘটীর মধ্যে ঢালিয়া দেন। এবং সেই যাত্রিকে বলেন, "তোমার সরবৎ নিরাকার নানক বাবা খাইলেন না। তোমাতে পাপ আছে সেই কারণে খাইলেন না। তুমি ১০।২০ টাকা গ্রন্থ সাহেবকে দান কর তাহা হইলে তোমার সকল পাপ উনি মোচন করিয়া সরবৎ পান করিবেন। যাত্রিরা এই কথা শুনিয়া যথাসাধ্য ক্ষমতানুসারে ১০।৫ টাকা দান করে। যখন যাত্রিরা দান করিতে থাকে সেই সময় সেই ঘটির ছিদ্রটী কৌশলের দ্বারা খুলিয়া দেয়। এবং সেই সরবৎ ঘটি হইতে

কলসীর মধ্যে পড়িয়া যায় এবং কলসী হইতে নর্দ্দমা দিয়া গিয়া অপর কোন পাত্রে যাইয়া পড়ে। সেই সাধু তখন যাত্রিদিগকে ঘটি দেখাইয়া বলেন, "দেখ নানক বাবা তোমার সরবৎ খাইয়া ফেলিলেন। তোমার অতি সৌভাগ্য" যাত্রিরা তাহা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হয়। যাহারা মহনভোগ লইয়া যাইত তাহাদের মহনভোগের উপর কৌশল দ্বারা তামা হাতের পাঁচটী অঙ্গুলির ছাপ দিয়া দিতেন, বলিতেন, "নানক বাবা তোমার মহনভোগের উপর ছাপ দিয়া গিয়াছেন।" যাত্রিরা শুনিয়া বড় প্রসন্ন হইয়া বলিতেন যে তাহাদের ধন্য ভাগ্য। যে যাত্রির নিকট তাহার টাকা লইবার ইচ্ছা হইত তাহার মহনভোগে ছাপ দিতেন না। তাঁহার নিকট হইতে উপরোক্ত কৌশল করিয়া টাকা লইয়া তবে মহনভোগে ছাপ দিতেন। রামসিং নামে এক জন শিক অতি বুদ্ধিমান ছিলেন। বহুদিবস পরে তিনি সাধুদিগের এই সকল চাতুরী জানিতে পারিয়াছিলেন এবং অপর ২।৪ জন শিকের সহিত মিলিয়া তাহাদের সেই সকল মিথ্যা চাতুরী ভুলিয়া দিলেন ও তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, তোমরা পুনরায় এরূপ করিও না। সেথানে গুরুমুখ সিং নামে একজন বুদ্ধিমান মহাত্মা শিক ছিলেন। তিনি শিবনারায়ণকে বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যে কত প্রকার ছল কপটতা প্রয়োগ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে তাহার সীমা নাই, তাহাদের মনুষ্যের উপর কিছুমাত্র দয়া ধর্ম্ম নাই।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১০৯৬৷৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১০৩৸৴০
সমষ্টি	৪২০০৷৴১০
ব্যয় ...	১১০০ ৶১৫
স্থিত	৩১০০৷৴১৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৩৬৷৴০

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়

ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য ১৮১০ শকের ফাল্গুন হইতে ১৮১২ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত	৮৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরে ঘাটা) ১৮১১ শকের ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন ১৮১১ শকের পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত	১৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	১০৲
" " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " শিবচন্দ্র নন্দী	৫৲
" " ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
" " লালবিহারী বড়াল	২৲

নববর্ষের দান

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৲
দানাধারে প্রাপ্ত	১৬৷৴০
	১৩৬৷৴০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৩৫৷৶১০
পুস্তকালয় ...	১৮৷৷৴০
যন্ত্রালয় ..	৭১৮৷৶১০
গচ্ছিত ...	৮০৷৶১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৭৷৷০
সমষ্টি	১০৯৬৷৷৶১০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩৭৭৸৴১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৭১ ৶১৫
পুস্তকালয়	৭১৸৶১০
যন্ত্রালয়	৩৯৭৷৷৶১৫
গচ্ছিত	৮১৷৷০
সমষ্টি .	১১০০ ৶১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা।

এই প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

আমাদের দেশে যখন জাতি-ভেদের গোড়াপত্তনও হয় নাই সেই মান্ধাতারও পূর্ব্বের আমলে একটি নবাভ্যাগত পরাক্রমশালী জাতি উত্তর অঞ্চল হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম কোণে আড্ডা গাড়িয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্য বলিতেন এবং ভারতবর্ষের আদিম নিবাসীদিগকে দস্যু বলিতেন। তাহার পরে যখন জাতিভেদের সবে-মাত্র গোড়া-পত্তন আরম্ভ হইয়াছে সেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক মান্ধাতার আমলে আর্য্য বলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন-বর্ণ-সম্বলিত একটি জেতৃজাতি বুঝাইত এবং শূদ্র বলিতে অধীনস্থ বিজিত দস্যুগণ বুঝাইত। এই প্রাচীন কালের ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতিকে যদি একটা মৎস্যরূপে কল্পনা করা যায় তবে এইরূপ দাঁড়ায় যে তাহার মুড়াখানি ব্রাহ্মণ, পেটিখানি ক্ষত্রিয় এবং ল্যাজাখানি বৈশ্য; কিন্তু এক্ষণকার এই কলিযুগে সে মৎস্যটির ল্যাজা এবং পেটি, অর্থাৎ বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়, কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া অবশিষ্ট থাকিবার মধ্যে কেবল মুড়াখানি মাত্র অর্থাৎ একা কেবল ব্রাহ্মণ মাত্র অবশিষ্ট আছে—তাহাও না থাকারই মধ্যে; কেন না, কাল-রাক্ষস কাহাকেও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে—বিশেষতঃ অমন একটা শাঁসালো সামগ্রীকে! বলিব কি—নিদারুণ রাক্ষসটা সেই শত-যোজন-ব্যাপী তিমি মৎস্যের দশযোজন-ব্যাপী মুড়াখানির ভিতর হইতে তাহার সমস্ত রস কস শুষিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছে—তাহার বিন্দু বিসর্গও অবশিষ্ট রাখে নাই। ফলেও তাই দেখা যায় যে, এক্ষণকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মস্তকের—উপরি-অঞ্চলে শিখা দেদীপ্যমান কিন্তু তাহার ভিতর-অঞ্চলে শাস্ত্র-চিন্তার পরিবর্ত্তে অন্নচিন্তা বলবতী! এক্ষণকার ব্রাহ্মণও যেমন তাঁহার উপনয়নের শ্রীও তেমনি! পৈতার সময়ে নূতন ব্রহ্মচারী কোথায় বারো বৎসর গুরু-গৃহে বাস করিয়া বেদ অভ্যাস করিবেন—তাহা না করিয়া তিনি তিন দিবস কারাগৃহে বাস করিয়া নিছক আলস্যে দিনপাত করেন! পূর্ব্বতন কালে যাঁহারা সত্যসত্যই উপবীত গ্রহণান্তে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারা প্রত্যহই নগরে পল্লীতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন এবং সেই সূত্রে প্রত্যহই তাঁহারা গণ্ডা গণ্ডা শূদ্রের মুখ দর্শন করিতেন—তাহাতে তাঁহাদের সাদা পৈতা কালো হইয়া যাইত না! কিন্তু এক্ষণকার নূতন ব্রহ্মচারীরা শূদ্রের ভয়েই অস্থির—পাছে শূদ্রের অপবিত্র মুখ কোনো গতিকে তাঁহাদের নয়নপথে নিপতিত হয় এই ভয়ে তাঁহারা তিন দিবস ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন। ইহার অর্থ আর কিছু না—"আমি যখন শূদ্রের মুখ দেখিতেছি না তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আমি তপোবনে বাস করিতেছি!" মনকে প্রবোধ দিবার কি চমৎকার যুক্তি-কৌশল! এইরূপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্ত্তী হইয়াই—বালকেরা জল-শূন্য ক্ষুদ্র কলসীতে করিয়া পুতুলের মাথায় জল ঢালিবার সময় মুখে ঘট্ ঘট্ শব্দ করে, কেননা তাহা না করিলে "জল

ঢালা হইতেছে” এ বৃত্তান্তটি একেবারেই অপ্রমাণ হইয়া যায়; এইরূপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্ত্তী হই-য়াই—দুই এক জন বাঙ্গালী সাহেব কথায় কথায় ইংলণ্ডকে হোম্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেননা তাহা না করিলে তিনি যে বাঙ্গালী নহেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই সাহেব এ বৃত্তান্তটি অপ্রমাণ হইয়া যায়; শূদ্রের মুখ নূতন ব্রহ্মচারীর নয়নগোচর হইলে “তিনি যে তপোবনে গুরুর সম্মুখে বসিয়া বেদ অধ্যয়ন করি-তেছেন” এ বৃত্তান্তটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া যায়! এসব ছেলেমি কাণ্ড পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না—এগুলি হ’চ্চে অধুনাতন টোলের অধ্যাপকদিগের নস্যান্ধ মস্তিষ্কের নূতন সৃষ্টি! একজন নৈয়ায়িক স্মার্ত্তবাগীশ বলিতে পারেন যে, কলিযুগের বিধানে তিন দিবস কারাগৃহে বদ্ধ থাকা’র নামই বারো বৎসর গুরুগৃহে বেদাভ্যাস করা; তাহা যদি তিনি বলেন, তবে তাঁহার প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, অতগুলা কথা না বলিয়া দুই কথায় তিনি এইরূপ বলিলেই তো বলিতে পারিতেন যে,কলিযুগের বিধানে সূত্র-গুচ্ছ-ধারী শূদ্রের নামই ব্রাহ্মণ!

মুড়া যিনি ব্রাহ্মণ—তাঁহারই যখন এই দশা, তখন, পেটি যিনি ক্ষত্রিয় তাঁহার তো কথাই নাই। মুড়াটির মজ্জা না থাকুক্—কঙ্কালখানা আছে, পেটির আবার তাহাও নাই! কাল রাক্ষস এমনি তাহাকে নিকিয়া পুঁছিয়া পরিস্কাররূপে উদরস্থ করিয়াছে যে, কুত্রাপি তাহার চিহ্ন মাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান অব্দে ক্ষত্রিয় শব্দ কেবল পরশুরামের কোপা-গ্নিকেই আমাদের মনে পড়াইয়া দেয়। আমরা আমাদের চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে, রাম সিংহ শ্যাম সিংহ প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশীয় সিংহেরা নামেই কেবল সিংহ; তা ভিন্ন ভারতের এ মুড়া-হইতে ওমুড়া-পর্য্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইলেও কেহ বলিতে পারিবেন না যে, তাহার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে তিনি কোথাও একটা সিংহ দেখিয়াছেন অথবা কোথাও একজন ক্ষত্রিয় দেখিয়াছেন! ত্রেতাযুগে পরশুরাম যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাকি রাখিয়াছিলেন—দ্বাপর-যুগে কুরুক্ষেত্র তাহা সমূলে নিঃশেষিত করিয়া ছাড়িয়াছে। বৈশ্য আবার ততোধিক রহস্য! বর্ত্তমান অব্দে কে যে বৈশ্য আর কে যে বৈশ্য নয় তাহা “দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!” খুব সম্ভব যে, পুরা-প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহের দ্বিমুণ্ড রাক্ষস, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই মুখের শোষণ বলে, সমস্ত বৈশ্য-শোণিত ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিয়া অবশেষে অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনই যখন সশরীরে বর্ত্তমান ছিল, তখন সেই তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জ্ঞাপন করিবার জন্য আর্য্য-শব্দেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এক্ষণকার এই কলিযুগের কঠোর অব্দে আর্য্যের মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বাদে একা কেবল ব্রাহ্মণই অবশিষ্ট। বর্ত্তমান কালে তিন বর্ণ যখন এইরূপ এক বর্ণে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখন আর্য্য-শব্দের সাহায্যে তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জোড়া দিবার জন্য কাহার কি এত মাথাব্যথা পড়িয়াছে বলিতে পারি না; তিন-বর্ণই যখন নাই—তিন বর্ণের মধ্যে যখন এক বর্ণ-ই কেবল আছে—তখন তিন বর্ণকে এক শব্দে জ্ঞাপন করিবার জন্য আর্য্য-শব্দের সাহায্য যাচ্ঞা করা নিতান্তই “শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া”—মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। তবে কি একা কেবল ব্রাহ্ম-ণকেই আর্য্যের কোটায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে? তাহা করিলে নিরীহ ব্রাহ্মণ-বেচারীর প্রতি নিতান্তই জুলুম হয়! রাজ-পুরুষেরা আমাদের দেশের কোনো মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে Gentleman এর Certi-ficate প্রদান করিলে তাহাতে যত তাঁহার মান-মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হয় তাহা বুঝাই যাইতেছে! সেরূপ করিলে শুধু যে কেবল তেলা মাথায় তেল দেওয়া হয় তাহা নহে, তাহাতে প্রকারান্তরে লোককে জানানো হয় যে, পূর্ব্বে ইঁহার মাথায় তেল ছিল না—দয়ার্দ্রচিত্তে আমরা ইঁহার মস্তকে বিলাতি পোমেটম লেপন করাতে ইঁহার পদতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইল, অর্থাৎ পূর্ব্বে ইনি ভদ্রলোক ছিলেন না—আমরা ইঁহার হস্তে জেণ্টেলম্যানের সার্টিফিকেট প্রদান করাতে তাহারই অমোঘ প্রসাদ-বলে আজ অবধি ইনি ভদ্র-লোকের শ্রেণীভুক্ত হইলেন! আমা-দের দেশের কোনো চির-প্রসিদ্ধ বংশের ভদ্রলোককে Gentelmanএর Certificate প্রদান করা এবং ব্রাহ্মণ জাতিকে আর্য্য উপাধি প্রদান করা দুইই অবিকল সমান। ফলে, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া আর্য্য বলিলে ব্রহ্মণ্যদেব তাহাতে তুষ্ট না হইয়া বরং রুষ্টই হ’ন; তাঁহার রোষের কারণ এই যে আর্য্য তো সকলেই—ক্ষত্রিয়ও আর্য্য—বৈশ্যও আর্য্য—এবং কলিযুগের নূতন শাস্ত্র অনুসারে যাঁহার লোহার সিন্দুকে টাকা আছে কিম্বা নামের অন্ত-ভাগে দুই চারিটা ইংরাজী অক্ষর আছে তিনিই আর্য্য! ব্রাহ্মণ তো আর সেরূপ আর্য্য নহে! শাস্ত্রের বিধান মতে ক্ষত্রিয়-বীর্য্যও ব্রহ্মতেজের নিকটে নত-মস্তক! তাহার সাক্ষী—বা-ল্মীকির রামায়ণে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে “ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়-বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং” ক্ষত্রিয়-বল ছার

বল—তাহাকে ধিক্! ব্রহ্ম তেজ বলের বল মহাবল!" ভাগীরথী শুধু তো আর নদী ভাগীরথী নহে, শাস্ত্রের বিধান মতে তিনি দেবী ভাগীরথী; তেমনি ব্রাহ্মণ শুধু তো আর আর্য্য-শর্ম্মা নহে—শাস্ত্রের বিধান মতে তিনি দেব শর্ম্মা। গঙ্গাস্নানকে গঙ্গাস্নান না বলিয়া কেহ যদি বলেন নদী-স্নান, তবে তাহা শ্রবণ মাত্রে—এমন যে শীতলসলিলা দেবী, ভাগীরথী, রোষের বাড়বানলে তিনিও উষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ওঠেন বা! তেমনি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজকে ব্রহ্মতেজ না বলিয়া কেহ যদি বলেন "আর্য্যতেজ"—ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রকে ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র না বলিয়া বলেন "আর্য্য-শাস্ত্র"—ব্রাহ্মণ জাতিকে ব্রাহ্মণ-জাতি না বলিয়া বলেন "আর্য্যজাতি", তবে তাহাতে ব্রহ্মণ্য দেবের কর্ণে শেল বিদ্ধ হইবারই কথা।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, এক্ষণকার কালে তিন বর্ণকে এক শব্দে বাচন করিবার জন্য আর্য্য শব্দের সাহায্য যাচ্ঞা করা শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া এবং এক্ষণে দেখা গেল যে, ব্রাহ্মণকে আর্য্য উপাধি প্রদান করিলে ব্রহ্মণ্য দেবকে প্রকারান্তরে অপমান করা হয়;—তবেই হইতেছে যে, বর্ত্তমান কলিযুগে ভারত বর্ষের কোনো জাতি-বিশেষকে অথবা কোনো জাতি-সমষ্টিকে লক্ষ করিয়া জাতি-বাচক অর্থে আর্য্য-শব্দ ব্যবহার করা নিতান্তই বিড়ম্বনা। অতএব অধুনাতন কালে আর্য্য শব্দ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে কিরূপ স্থলে তাহাকে কিরূপ অর্থে প্রয়োগ করা যুক্তি-সঙ্গত তাহা একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা করিতে গেলে আর্য্য-শব্দের অর্থ কাল-ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া কোথাকার জল কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক; এই বিবেচনায় এইখানে তাহার একটা চুম্বক আলেখ্য প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমাদের দেশে আর্য্য-শব্দের প্রয়োগ প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের চতুঃসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল; তাহার পরে তাহা ভারতবর্ষের দক্ষিণাভিমুখে এবং পূর্ব্বাভিমুখে ক্রমশই দূরে দূরে পরিব্যাপ্ত হইয়া কলিকাতার বাজারের সুলভ গোদুগ্ধের ন্যায় সর্ব্ব-ঘটেই অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। মহানগরীর অভিধানে যেমন পোনেরো আনা জল-মিশ্রিত এক আনা দুগ্ধও দুগ্ধ শব্দের বাচ্য—কলিযুগের অভিধানে তেমনি ভদ্রাভদ্র যে-সে-বংশীয় ভদ্রলোক আর্য্য নামের অভিধেয়। এই খেদে আর্য্য-শব্দ আমাদের দেশে এতকাল পর্য্যন্ত অমর-কোষের কোটরাভ্যন্তরে মুখ মুড়িমুড়ি দিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে কালাতিপাত করিতেছিল—লোকালয়ে তাহাকে বড় একটা বাহির হইতে দেখা যাইত না;—বিশেষতঃ মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব কালে আর্য্য-নারী দিগের দেখাদেখি আর্য্য-শব্দেরও বাহ্যস্ফূর্ত্তি একেবারেই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ অকস্মাৎ একি বজ্রাঘাত! বিদ্বজ্জন-পুরের পথে ঘাটে মাঠে হাটে আর্য্যশব্দের একি প্রবল বন্যা! আমাদের দেশে আর্য্য-শব্দের রাতারাতি এই যে নূতন অভ্যুদয়, ইহার মূল প্রবর্ত্তক মনুও নহেন, যাজ্ঞবল্ক্যও নহেন, পরাশরও নহেন, বেদব্যাসও নহেন—তবে কে? আর কে—উক্ষতরণ (অর্থাৎ Oxford) চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীমন্ ম্যাক্স্ মুলার ভট্ট।

ইতিপূর্ব্বে আর্য্য-জাতিকে একটা মৎস্যরূপে কল্পনা করা গিয়াছে, এক্ষণে আর্য্য-শব্দের প্রয়োগ-পদ্ধতিকে সেইরূপে কল্পনা করা হো'ক্। পুরাণের একস্থানে এইরূপ একটা উপন্যাস আছে যে, একটা মৎস্য প্রথমে এক হাঁড় জলে প্রতিপালিত হইয়াছিল; কাল ক্রমে যখন সে বড় হইয়া হাঁড়ির সীমা ছাড়াইয়া উঠিল তখন তাহাকে একটা ডোবার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; যখন সে আরো বড় হইয়া ডোবার সীমা ছাড়াইয়া উঠিল তখন তাহাকে পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; এরূপ করিয়া মৎস্যটা ক্রমশই যত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে যখন সমুদ্র হইতে মহা-সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইল তখন ক্রমে সেখানেও তাহার স্থান-সংকুলন হওয়া ভার হইয়া উঠিল; কিন্তু আমাদের দেশে আর্য্য শব্দের প্রয়োগ-পদ্ধতি এতকাল পর্য্যন্ত ঠিক্ তাহার বিপরীত পথ অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল; ক্রমশই তাহা ক্ষুদ্র-হইতে ক্ষুদ্রতর জলাশয়ে সংক্রামিত হইয়া—এককালে যাহা শত-যোজনব্যাপী তিমি মৎস্য ছিল কালক্রমে তাহা কীট হইতে কীটাণুতে পরিণত হইতে লাগিল; ইউরোপ এসিয়া এবং আফ্রিকার ত্রিবেণী-সঙ্গম হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পুষ্করিণীতে এবং তথা হইতে অমর-কোষের ডোবার ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিরীহ মৎস্যটি মর্ত্ত্যলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পন্থা অন্বেষণ করিতেছিল—তাহার যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত তখন মহাত্মা ম্যাক্সমূলার ভট্ট দয়ার্দ্র চিত্তে তাহাকে সেই সংকীর্ণ কারাগার হইতে আলোকে বাহির করিয়া আনিয়া—আবার তাহাকে তাহার পুরাতন বাসস্থানে—সূর্য্যের উদয়াস্তস্পর্শী মহা-সমুদ্রে—প্রত্যানয়ন করিলেন। অতএব ম্যাক্সমূলারের আর্য্য স্বতন্ত্র এবং অমর-কোষের আর্য্য স্বতন্ত্র।

এতদিন ধরিয়া আর্য্য-শব্দ আমাদের দেশে কচিৎ কোনো সংস্কৃত পুঁথির অসূর্য্যম্পশ্য নিভৃত নিকেতনে কীটে কীটে জর্জ্জরিত হইতেছিল—কেহই তাহাকে পুছিত না; সম্প্রতি শ্রীমন্ ম্যাক্স্ মূলার ভট্ট বঙ্গীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর কর্ণকুহরে আর্য্য-মন্ত্রের ফুৎকার প্রদান করিয়া তাঁহাদের প্রসুপ্ত আর্য্যতেজ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন—এখন আর রক্ষা নাই! যখন ম্যাক্স-মূলারের নামও কেহ জানিত না—ম্যাক্স্মূলার যখন পাঠশালায় হামাগুড়ি দিতেছেন—সেই মান্ধাতার আমল হইতে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণের মর্ম্ম-নিহিত সার সার বচনগুলি ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে—সে দিকে কেহই বড় একটা কাণ পাতি-লেন না; রামমোহন রায়ের আমল হইতে মহানগ-রীর বক্ষ-প্রদেশে বেদ-উপনিষদের প্রশান্ত গম্ভীর অথচ অগ্নিময় বাক্য-সকল বিশুদ্ধ সংস্কৃত-স্বরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে—তাহা কাহারো গ্রাহ্যে আসিল না; বিলাত-হইতে আর্য্য-মন্ত্রের আমদানি হইল—আর আমাদের দেশশুদ্ধ সমস্ত কৃতবিদ্য যুবক আর্য্য আর্য্য করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন; তাঁহাদের সহস্র কণ্ঠের উদ্গীরিত আর্য্য-নামের চীৎকার জয়-ধ্বনিতে ইয়ঙ্-বেঙ্গলের গাত্রে থরহরি কম্প উপস্থিত হইল; ব্রাহ্ম-ণের ব্রহ্মণ্য দেব দানোয়-পাওয়া শবদেহের ন্যায় মৃত্যু-শয্যা হইতে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া পৈতা মাজিতে মাজিতে ফিরে-ফিত্তি কোমর বাঁধিয়া বসিয়া সন্ধ্যা গায়ত্রী মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন; ইতি-পূর্ব্বে কোনো পুরুষেই যাঁহারা অধ্যয়ন-অধ্যাপনার চৌকাট মাড়াইতে সাহসী হ'ন নাই সেই সকল ব্রাহ্ম-ণেতর বংশের তত্ত্ববাগীশেরা অকস্মাৎ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইতে আরম্ভ করিলেন;—শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ঠেলিয়া আপনারা জ্ঞান-সমুদ্রের উঁচা পাড়ে আরোহণ-পূর্ব্বক যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি যেখানকার যতকিছু নিগূঢ় রহস্য সমস্তই বিস্মৃতির রসাতল-গর্ত্ত হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য সুধীবর বেশে (সু ধীবর-বেশে) কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন; কাঁহারো জালে একটা তাঁবার চাক্তি উঠিল, তিনি ভাবিলেন "এমন উজ্জ্বল স্বর্ণ তো একালে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!" কাঁহারো জালে একটা সাত রাজার ধন মাণিক উঠিল অমনি "এ আবার কি—দূর" বলিয়া তিনি তদ্দণ্ডেই তাহা রসাতলে ফেরত পাঠাইলেন। ম্যাক্স্ মূলার ভট্টের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আর্য্য বলিয়া যে একটা শব্দ অভিধানে আছে তাহা তাঁহারা জানিতেন কি না সন্দেহ! তাহার পরে ম্যাক্স্ মূলার যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীময় আর্য্য-মন্ত্রের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহার দুই একটি ছিটা ফোঁটা তাঁহা-দের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহাদের মানস-ক্ষেত্রে আর্য্যামির অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। এই বৃত্তান্তটি স্মরণে জাগ্রত রাখিবার মানসে ম্যাক্স্মূলার ভট্টকে আমরা গোস্বামী বলিয়া সম্বোধন করিব এবং বঙ্গীয় নব্য আর্য্যদিগকে গোস্বা-মীর শিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিব। গোস্বামী শব্দের মুখ্য অর্থ ধরিতে গেলে গোস্বামী বলিতে যদিচ গো-রক্ষক বুঝায়, কিন্তু সে অর্থে গোস্বামী উপাধি ম্যাক্স্ মূলার ভট্টকে কিছুতেই শোভা পায় না; কেননা তিনি খড়দ'র গোস্বামীও নহেন—শান্তিপুরের গোস্বামীও নহেন—তিনি উক্ষতরণের অর্থাৎ Oxfordএর গো-স্বামী; অনেক উক্ষ Ox এবং গো যেখানে নিত্য নিত্য গোলোকে তরিয়া যায় সেই উক্ষতরণের তিনি গোস্বামী! তাঁহাকে যদি গোরক্ষক অর্থে গোস্বামী বলা যায় তবে প্রকারান্তরে বলা হয় "যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক!" অতএব তাহাতে কাজ নাই! আমরা তাঁহাকে চলিত অর্থেই গোস্বামী বলিব। গোস্বামী কিনা মন্ত্র-দাতা দীক্ষাগুরু—এই অর্থেই আমরা তাঁহাকে গোস্বামী বলিব। অনতিপরেই প্রকাশ পাইবে যে, গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্য এবং তাঁহার শিষ্যদিগের সঙ্ আর্য্য দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

ফল কথা এই যে, আর্য্য চারি প্রকার—(১) বৈদিক আর্য্য, (২) পৌরাণিক আর্য্য, (৩) বৈজ্ঞানিক আর্য্য, (৪) সঙ্ সাজা আর্য্য।

প্রথম, বৈদিক আর্য্য;—ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আর্য্য যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের মূল উপাদান তাহাই বৈদিক আর্য্য।

দ্বিতীয়, পৌরাণিক আর্য্য;—পৌরাণিক আর্য্যের চতুর্দ্দিকে কোনো প্রকার জাতীয় গণ্ডির ঘের দেওয়া নাই—সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই তাহার উদার ক্রোড়ে স্থান পাইতে পারেন; তাহার সাক্ষী—পুরাণে লিখিত আছে "কর্ত্তব্যমাচরণ্ কার্য্যমকর্ত্তব্য-মনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ।" "অর্থাৎ কর্ত্তব্য আচরণ করিয়া এবং অকর্ত্তব্য অনাচরণ করিয়া যিনি প্রকৃত আচারে অবস্থিতি করেন তিনিই আর্য্য শব্দের বাচ্য।"

তৃতীয় বৈজ্ঞানিক আর্য্য;—এই আর্য্যই গোস্বামীর আর্য্য; এ আর্য্যের বিশাল পরিধির অভ্যন্তরে বাঘে গরুতে একত্রে জল-পান করে; ইংরাজ বাঙ্গালী, ফরাসীস্ জর্ম্মান্, রুষীয় পোল্ সকলেই সকলকে

ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে; এ আর্য্যের সুবিস্তীর্ণ ললাটে এই মন্ত্র-বচনটি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে যে, "উদারচেতসাং পুংসাং বসুধৈব কুটুম্বকং" উদারচেতা পুরুষদিগের সমস্ত পৃথিবীই জ্ঞাতি কুটুম্ব।

চতুর্থ, সঙ্‌সাজা আর্য্য;—এইটিই গোস্বামীর শিষ্যদিগের আর্য্য; এ আর্য্য বৈদিক আর্য্য নহে ইহা বলা বাহুল্য; কেননা, সত্য-যুগের বৈদিক আর্য্য যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের মূল উপাদান এবং ত্রেতা-যুগের বৈদিক আর্য্য যাহা ঐ তিন বর্ণের সমষ্টি এ দুই আর্য্য কলি-যুগের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে পারে না—কেমন করিয়াই বা স্থান পাইবে? এ ছার কলিযুগে ক্ষাত্রিয়ও নাই, বৈশ্যও নাই; কাজেই এক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সমষ্টি বলিতে কেবল আকাশ-কুসুমই বুঝায়—তা ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। এ আর্য্য পৌরাণিক আর্য্যও নহে; কেননা পৌরাণিক আর্য্য জাতি-বিচার না করিয়া সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রকেই ক্রোড়ে লইতে প্রস্তুত—গুহ চণ্ডালকেও তিনি ত্যজ্য পুত্র করেন নাই। পৌরাণিক আর্য্য সদাচারের পক্ষপাতী—সঙ্‌ আর্য্য সদসৎ সকল-প্রকার লোকাচারের পক্ষপাতী; এ আর্য্য সামান্য একটি লোকাচারের পান হইতে চুন খসিলেই—কি যেন একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছে মনে করে; গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হইয়া বিলাত-ফের্তাদিগের প্রতি গোবরের ব্যবস্থা করে; ঢাল নাই খাঁড়া নাই নিধিরাম সর্দ্দার হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীয় বিজ্ঞানকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে; নিরীহ সেকেলে পৌরাণিক আর্য্যের সাধ্য কি যে, এ আর্য্যের নিকটে এগোয়! এ আর্য্য বৈজ্ঞানিক আর্য্যও নহে; কেননা, গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্য ইংরাজ বাঙ্গালি ফরাসীস্ জর্ম্মান প্রভৃতি সকল আর্য্য জাতিকেই ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করে; কিন্তু এ আর্য্য আপনার মূষিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত আর্য্য ছাড়া আর আর সমস্ত আর্য্যকেই—সিংহ-সম্প্রদায়-ভুক্ত আর্য্যকেও—ম্লেচ্ছ বলিয়া অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গোস্বামীর শিষ্য-দিগের আর্য্য—বৈদিক আর্য্যও নহে, পৌরাণিক আর্য্যও নহে, বৈজ্ঞানিক আর্য্যও নহে—তাহা যে কোন্ আর্য্য সেইটিই বিষম সমস্যা! স্পষ্ট কথা বলিতে কি—এ আর্য্য আর্য্যই নহে কেবল আর্য্যের একটা ভান—আর্য্যের একটা প্রহসন! একটি জ্যেষ্ঠতাত বালক যে-রকমের জ্যেষ্ঠতাত—এ আর্য্যটি ঠিক্ সেই রকমের আর্য্য। জ্যেষ্ঠতাত বালকের জ্যেটামি যেমন একটা রোগ, এ আর্য্যের আর্য্যামি তেমনি একটা রোগ। অতঃপর গুরুর বৈজ্ঞানিক আর্য্য এবং শিষ্যের সঙ্‌-সাজা আর্য্য উভয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কাহার কিরূপ ভাবগতি তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক্।

মহর্ষি ব্যাসের প্রণীত স্মৃতির অভ্যন্তরে সুন্দর একটি বচন আছে,—সেটি এই;—"নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণ-স্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ" "ব্রাহ্মণের এমন বিত্ত আর নাই যেমন একতা সমতা এবং সত্যতা" এই ঋষিবাক্যটির নিক্তির ওজনে গুরু এবং শিষ্য দোঁহার দুইরূপ বিভিন্ন আর্য্যকে তৌল করিয়া দেখি-লেই কাহার কি রূপ মূল্য তাহা তদ্দণ্ডেই ধরা পড়িবে।

ব্যাস-ঋষি বলেন যে, একতা ব্রাহ্মণের একটি প্রধান পরিচায়ক লক্ষণ;—গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্যের একতা এমনি জগদ্ব্যাপী যে, তাহা ইংরাজ বাঙ্গালী ফরাসীস প্রভৃতি নানা দেশের নানা আর্য্য-জাতিকে সাজাত্য-পাশে বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছে। পক্ষান্তরে তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের আর্য্য একতা'র এমনি বিরোধী যে, যদিও তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্য এক্ষণে ক্ষত্রিয়-শূন্য এবং বৈশ্য-শূন্য সুতরাং হাত-পা খোঁড়া, আর, ব্রাহ্মণ-জাতি সে আর্য্যের মস্তক হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান-বিহনে তাহা মস্তিষ্ক বিহীন, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাঁহারা গায়ের জোরে বলিতে ছাড়েন না যে, সেই হাত-পা-খোঁড়া মস্তিষ্ক-বিহীন ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সন্তানেরাই প্রকৃত পক্ষে আর্য্য, আর, ইউরোপের হস্ত-পদ-বিশিষ্ট, মস্তিষ্ক-ভূয়িষ্ঠ, জ্ঞানবান্ এবং তেজীয়ান আর্য্যেরা আর্য্যই নহে—তাহারা সকলেই ম্লেচ্ছ নরাধম!

ব্যাস-ঋষি বলেন "সমতা ব্রাহ্মণের আর একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ";—বৈজ্ঞানিক আর্য্যের এমনি উদার সমতা-গুণ যে, তাহা ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যস্থিত জাতিগত উচ্চ-নীচ ভাব একেবারেই কোপাইয়া সম-ভূম করিয়া দিয়াছে; পক্ষান্তরে, গোস্বামীর শিষ্যদিগের সঙ্‌ আর্য্য আত্ম-গরিমায় ভোঁ হইয়া আপনার বেলায় তিলকে তাল দেখেন এবং অন্যের বেলায় তালকে তিল দেখেন। এটা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত আর্য্য-জাতির ভাল মন্দ স্বভাব-চরিত্র হরে দরে সমান—তাই কতক গুলা ছেলে-ভুলানিয়া অমূলক যুক্তি দ্বারা সকল লোককেই তাঁহারা এই নিগূঢ় তত্ত্বটি বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং ইউরোপীয় আর্য্যেরা শকুনি-মাতুলের প্রপিতামহ! অর্থাৎ যেন পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশে শকুনি ছিলেন না—দ্যূতক্রীড়া ছিল না—ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ছিল না—রমণীহরণ ছিল না—দ্বেষ হিংসা মদ মাৎসর্য্য এসব কোনো বালা-

ইই ছিল না—প্রত্যুত সকলেই ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে তপস্যা করিয়া বেড়াইতেন! তাহার পরে কালিদাসের সময়ে যেন ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা মদ্য-পান বেশ্যাসক্তি অভিসার এ সকল কিছুই জানিতেন না—সকলেই জিতেন্দ্রিয় যোগী পুরুষ ছিলেন! তাহার আরো কিছু দিন পরে যেন চানক্য ছিলেন না—নরহত্যা ছিল না! রঘুনন্দনের ন্যায় দিগ্বিজয়ী স্মার্ত্তবাগীশেরা মূল-গ্রন্থ-সকলের শব্দ এবং অর্থ অবলালাক্রমে উল্টাইয়া দিয়া (এমন কি ব-য়ের পেট কাটিয়া তাহাকে র করিয়া গাড়য়া তুলিয়া) যেন হয়কে নয় করিতেও জানিতেন না, নয়কে হয় করিতেও জানিতেন না—প্রবঞ্চনা প্রতারণা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না! ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা সকলেই যুধিষ্ঠির, সকলেই রামচন্দ্র! আর, ইউরোপীয় আর্য্যেরা সকলেই চানক্য, সকলেই শকুনি! কি চমৎকার সমতা!

ব্যাস-ঋষি বলেন যে, সত্যতা ব্রাহ্মণের তৃতীয় আর-একটি পরিচয়-লক্ষণ;—গোস্বামীর আর্য্যের সত্যতা সূর্য্যালোকের ন্যায় দেদীপ্যমান! সে সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাবতীয় আর্য্য ভাষার অস্থিতে অস্থিতে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রোমে রোমে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে গোস্বামীর শিষ্যদিগের যত কিছু সত্যতা সকলই মুখের ফুঁ, হাতের ফক্কা! তাঁহারা বলিবার সময় বলেন "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি—গঙ্গা হইতে শত যোজন দূরে থাকিয়াও যিনি গঙ্গা গঙ্গা বলেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন" অথচ প্রায়শ্চিত্ত বিধানের সময়—যিনি প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করেন তাঁহারও যে-পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন আর যিনি কোনো জন্মেই গঙ্গার ত্রিসীমা মাড়া'ন না তাঁহারও সেই পাপের সেই প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন; "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ" এ বচনটির প্রতি এতই যদি তাঁহাদের অটল শ্রদ্ধাভক্তি তবে বিলাতফের্তা বঙ্গীয় যুবকদিগের প্রতি গোবর খাইবার বিধান না দিয়া গঙ্গাস্নানের বিধান দিলেই তো হইতে পারে—তাহা তাঁহারা না দে'ন কেন? তবেই হইতেছে যে, তাঁহদের শাস্ত্রের বিধানে নিষ্পাপ ব্যক্তিরই পাপ ধৌত হইয়া যায়, পাপী ব্যক্তির কেনো পাপই স্বস্থান হইতে তিল মাত্রও বিচলিত হয় না! তাঁহাদের ঔষধ-সেবনে নীরোগ ব্যক্তিই আরোগ্য লাভ করে—রোগী ব্যক্তি যেমন আছে তেমনিই থাকে! কি চমৎকার সত্যতা!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্য যেমন একতা সমতা এবং সত্যতার একটি জ্বলন্ত আদর্শ, তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের সঙ্ আর্য্য তেমনি অনৈক্য বৈষম্য এবং অসত্যতার একটি অদ্বিতীয় আদর্শ। গোস্বামী তাঁহার আপনার মতো কার্য্য করিতেছেন—মহতের মতো কার্য্য করিতেছেন—পৃথিবীস্থ বিভিন্ন আর্য্যজাতির অন্তর্নিহিত ভ্রাতৃবিচ্ছেদের মূলে কুঠার আঘাত করিয়া সকলের মধ্যস্থলে একতা সমতা এবং সত্যতার জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন; তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যেরাও তাঁহাদের আপনাদের মতো কার্য্য করিতেছেন—ইতরের মতো কার্য্য করিতেছেন—অনৈক্য বৈষম্য এবং কপট ব্যবহারের জিলিপির পাক ক্রমাগতই অধিকাধিক পেঁচাও করিয়া পাকাইয়া তুলিতেছেন—ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের জ্বলন্ত হুতাশনে ক্রমাগতই অধিকাধিক আহুতি প্রদান করিতেছেন;—এখন কে আর্য্য, কে অনার্য্য, শ্রোতৃ-মহোদয়েরা তাহা মনে মনে নিস্তব্ধে ঠাহরিয়া দেখুন্। এই পুরাতন ঋষি-বাক্যটি যদি সত্য হয় যে, "নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ" ব্রাহ্মণের এমত বিত্ত আর নাই• যেমন একতা সমতা এবং সত্যতা, তবে অগত্যা এইরূপ স্বীকার করিতে হয় যে, গোস্বামীর আর্য্যই প্রকৃষ্ট রূপে ব্রাহ্মণলক্ষণাক্রান্ত এবং তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের আর্য্য চণ্ডালেরও অধম লক্ষণাক্রান্ত। অতঃপর অনুসন্ধান করা যাইতেছে—প্রথমতঃ আর্য্যামি রোগটা কি? দ্বিতীয়তঃ সে রোগের গোড়ার সূত্রটা কি? তৃতীয়তঃ সে রোগের চিকিৎসা-প্রণালী কি রূপ?

প্রথম, আর্য্যামি রোগটা কি? রোগটা আর কিছু না—বাতুলের প্রলাপ! আর্য্যামি করা স্বতন্ত্র এবং আর্য্যোচিত কার্য্য করা স্বতন্ত্র! যাঁহারা পৃথিবীতে একতা সমতা এবং সত্যতার জ্যোতি বিকীর্ণ করেন তাঁহারাই আর্য্যোচিত কার্য্য করেন। পৃথিবী-মাতার মুখ উজ্জ্বলকারী বঙ্গের শিরোভূষণ রামমোহন রায় আর্য্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন; কঠোর অধ্যবসায়ী পরহিত-পরায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরজীবন আর্য্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন এবং অদ্যাপি আর্য্যোচিত কার্য্য করিতেছেন; অকূল পুরাতত্ত্ব সাগরের অদ্বিতীয় রত্নধীবর ম্যাক্স্ মূলার আর্য্যোচিত কার্য্য করিতেছেন; ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য; আর, যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত—না কিছু করিয়া বেয়াল্লিস কর্ম্মা, যাঁহারা হাসির জায়গায় কাঁদেন কান্নার জায়গায় হাসেন এমনি যাঁহাদের কবিত্ব-রসবোধ, তাঁহারা যখন বুক ফুলাইয়া বলেন "আমরাই আর্য্য—ইংরাজ ফরাসীস্

জর্ম্মান প্রভৃতি আর আর যাবতীয় সভ্য জাতি ম্লেচ্ছ নরাধম; আমাদের পুষ্পক বিমান ছিল—ইউরোপের রেলগাড়িই সার: আমাদের অগ্নি অস্ত্র বরুণ অস্ত্র ছিল—ইউরোপের কামান বন্দুকই সার; আমাদের স্বর্গমর্ত্ত্য-রসাতল-ভেদী ধ্যান-বার্ত্তাবহ ছিল—ইউরোপের তাড়িত বার্ত্তাবহই সার;" এই যে সব শূন্যগর্ত্ত আস্ফালন এবং গগনভেদী স্পর্দ্ধাবাণী (ইতর ভাষায় যাহাকে বলে ছোটো মুখে বড় কথা) ইহারই নাম আর্য্যামি!

দ্বিতীয়, আর্য্যামি রোগের গোড়া'র সূত্রটা কি? গোড়া'র সূত্রটা আর কিছু না—ইংরাজদিগের "ওঠ্ বোস্" মন্ত্র! ইংরাজেরা যখন আমাদিগকে "বোস্" বলিয়াছিল তখন আমরা এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া তদ্দণ্ডেই বসিয়া পড়িয়াছিলাম; ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী আমাদিগকেমুখ রাঙাইয়া বলিলেন "তোমরা আফ্রিকাবাসী কালো নিগর" আর অমনি আমরা করযোড়ে বলিলাম "আমরা দীন হীন অধম কাফ্রী, আমাদের কোনো সঙ্গতি নাই, তোমরাই আমাদের মাবাপ, তোমরাই আমাদের সর্ব্বস্ব!" ইংরাজেরা "বোস্ বলিতেই যেমন আমরা বসিয়া পড়িয়াছিলাম—"ওঠ্" বলিতেই তেমনি আমরা উঠিয়া দাড়াইলাম। ইংরাজি টোলের অধ্যাপকেরা আদর করিয়া আমাদিগকে বলিলেন "তোমরা আর্য্য!" আর আমাদের আর্য্যতেজ দেখে কে? তদ্দণ্ডেই আমরা উঠিয়া দাড়াইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া বুক ফুলাইয়া সিংহনাদে বলিয়া উঠিলাম "তোমরা ম্লেচ্ছ—আমরা আর্য্য! তোমাদের আছে কি—আমাদের নাই কি? তোমাদের সম্বল বিজ্ঞানের গোটাকত পুঁথি বই তো আর নয়—আমাদের বেদ আছে, পুরাণ আছে, স্মৃতি আছে, তন্ত্র আছে, মন্ত্র আছে—নাই কি? আমাদের জাতির সঙ্গে কি তোমাদের জাতির ঘুণাক্ষরেও তুলনা হইতে পারে!" কি আশ্চর্য্য! ওঠ্ মন্ত্রের চোটে এক নিমেষের মধ্যেই আমাদের বুলি ফিরিয়া গিয়া—পূর্ব্বে যেমন আমরা নেঙ্ঠে ইঁদুর হইয়া তলে গুঁড়ি মারিয়াছিলাম, এক্ষণে তেমনি আমরা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হইয়া গর্জ্জন করিতে সুরু করিলাম! ঈশ্বর করুন্ যেন এ-হেন সুখ স্বপ্ন হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই "পুনর্ম্মূষিকো ভব" শুনিয়া হঠাৎ আমাদের চক্ষুস্থির না হয়!

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা গোস্বামীর নিকট হইতে আর্য্য-মন্ত্রটি চুপি চুপি আদায় করিয়াছেন ইহা দেশ-শুদ্ধ সকল লোকেই জানে, অথচ সে বৃত্তান্তটি চাপিয়া রাখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের দীক্ষা-গুরুকে ভাবে-গতিকে নূতন একপ্রকার গুরু দক্ষিণা প্রদান করিলেন—সে গুরু-দক্ষিণা রজতের পূর্ণচন্দ্র নহে—তাহা হস্তের অর্দ্ধচন্দ্র! অর্থাৎ তাঁহারা এইরূপ ভাণ করিলেন—যেন জাতিবাচক আর্য্য-শব্দের আবিষ্কর্ত্তাও তাঁহারা, আর, আর্য্যও তাঁহারা; তা বই—ম্যাক্স্ মূলার যেন কেহই নহে—জাতিবাচক আর্য্য-শব্দের আবিষ্কর্ত্তাও তিনি নহেন, আর্য্যও তিনি নহেন; প্রত্যুত তিনি ম্লেচ্ছ নরাধম! ইহারই নাম "তোমার শীল তোমার নোড়া ভাঙ্‌ব তোমার দাঁতের গোড়া!" আর কিছু না—একটি দুগ্ধ-পোষ্য শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার হস্তে একখানি শাণিত ছুরি প্রদান করিলে প্রদাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই তাহাতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা; প্রদাতার শক্ত হাড়ে শিশুর হস্তের ছুরির এক আধ আঁচড়ে বেশী কি আর হইবে—তাহা মহিষ-শৃঙ্গে মশক-দংশন বই আর কিছুই নহে! কিন্তু দুগ্ধ পোষ্য বালকের কচি হাড়ে তাহা একটা-না-একটা কাণ্ড না বাধাইয়া সহজে ছাড়ে না। মূষিক যদি সিংহকে গোখাদক ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করে, তবে সিংহের তাহাতে কিছুই হয় না—তাহার লাঙ্গূলের একগাছি লোমও বিচলিত হয় না; কিন্তু তাহাতে ক্ষান্ত না থাকিয়া মূষিকের পো যদি আপনাকে সিংহ অপেক্ষাও বড় মনে করিয়া বিড়ালকে তাড়া করে, তবে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়; তাহাই এক্ষণে ঘটিয়াছে! বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা ম্যাক্স্ মূলার প্রভৃতি আচার্য্যগণকে ম্লেচ্ছই বলুন আর বর্ব্বরই বলুন তাহাতে সেই সকল প্রবীণ সমরাগ্নি-পরীক্ষিত মহাবণীগণের কিছুই আসিবে না যাইবে না; কিন্তু তাহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া—একা বীর ডন্ কুইক্সোট যেমন রজিনাণ্টিতে আরোহণ করিয়া—অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া—প্রিয়তমা ডল্‌সিনিয়ার অমোঘ প্রসাদ-বলে বলী হইয়া—পৃথিবী উল্টাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও যে তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা উল্টাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে—কেহ বা টিকি রাখিয়া, কেহ বা ফোঁটা কাটিয়া, কেহ বা গেরুয়া পরিয়া, কেহ বা পৈতার গোচ্ছা দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত করিয়া, এক এক জন এক এক মহামহোপাধ্যায় আর্য্য হইয়া আসরে নাবিয়া তাল ঠুকিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতেছেন—এটা তাঁহারা ভাল করিতেছেন না! তাঁহাদের কি স্মরণ নাই যে, লা-মাঙ্কা নগরের বীর কেশরী ডন্‌কুইক্‌সোট্ যত বার কোমর বাঁধিয়া পৃথিবী উল্টাইয়া দিতে গিয়াছেন, ততবার উল্টাইয়া পড়িবার মধ্যে তিনিই অশ্ব হইতে উল্টাইয়া পড়িয়াছেন—তা বই পৃথিবী এক তিলও উল্টায় নাই! এইরূপ করিয়া যখন তাঁহার সমুদয় দন্ত-গুলি একে একে অন্তর্ধান

করিল তখন তিনি দর্পণে আপনার ভগ্নদন্ত চপেটিত-কপোল মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া আপনিই আপনার নাম দিলেন "বিষণ্ণ মুখাকৃতি বীর" knight Of the sorrowful figure !" রোগ তো আর গাছে ফলে না ! এই উন্নত শতাব্দীর পরিস্ফুট দিবালোকে মান্ধাতার আমলের অপরিস্ফুট বিধান সকল প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ানো—হাতের লেখা পুঁথি ছাড়া গ্রন্থ পাঠ না করা—গেরুয়া বস্ত্র ছাড়া বস্ত্র পরিধান না করা—খড়ম ছাড়া পাদুকা পরিধান না করা—শুদ্ধ কেবল পুরাণের রূপক এবং হেঁয়ালি ভাঙিয়া সেই উপকরণের সাহায্যে বিজ্ঞানের মহোচ্চ শিখর-পর্য্যন্ত একটা প্রশস্ত রাজমার্গ চালাইয়া দিয়া স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ করিতে যাওয়া—এইরূপ যাহার অশেষ বিশেষ উপসর্গ—তাহা যদি না রোগ হয় তবে রোগ যে আর কাহাকে বলে তাহা জানি না !

তৃতীয়, রোগের চিকিৎসা। আর্য্যামি রোগের চিকিৎসা সাম্যপন্থী মতে হইলেই ভাল হয় ; সে মতের মূল মন্ত্র এই যে "সমে সাম্যং প্রযোজয়েৎ"—সমানে সমানপ্রয়োগ করিবেক। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, "কে বলে আর্য্যামি একটা রোগ বরং তাহা একটা গুরুতর রোগের মহৌষধ—তাহা সাহেবিআনা রোগের মহৌষধ !" বটে—কিন্তু সে কিরূপ ঔষধ ? সে ঔষধ নিজেই একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি !—তাহার বাতাসে জ্ঞানের দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং কর্ম্মের হস্তপদ অসাড় হইয়া যায় ! তবে আর তাহা সাহেবিআনাকে দমন করিবে কি প্রকারে ? বরং আরো তাহা সাহেবিআনাকে খোঁচা দিয়া উস্কাইয়া তোলে। সাহেবিআনার ঔষধ স্বতন্ত্র ;—ইংরাজদিগের বাহ্য আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গীর অনুকরণই সাহেবি-আনা, আর,ইংরাজদিগের বিজ্ঞান, শিল্প, কার্য্য-নৈপুণ্য, কার্য্যদক্ষতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তেজস্বিতা, এই গুলির নাম ঊনবিংশ-শতাব্দীয় সভ্যতা ; এই ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতাই সাহেবিআনা-রোগের মহৌষধ ; তা ভিন্ন আর্য্যামিও সাহেবিআনা রোগের ঔষধ নহে, সাহেবি-আনাও আর্য্যামি-রোগের ঔষধ নহে ; আর্য্যামি-রোগের ঔষধ তবে কি ? না "সমে সাম্যং প্রযোজয়েৎ"—আর্য্যোচিত কার্য্যই আর্য্যামি-রোগের একমাত্র ঔষধ।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আকাশ হইতে পড়িয়াই আর্য্য হইয়াছিলেন ; তবে কি ? না পৃথিবীস্থ সমস্ত আর্য্যজাতি যেরূপ করিয়া আর্য্য হইয়াছে তাহারাও সেইরূপ করিয়া আর্য্য হইয়াছিলেন ; দুই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আর্য্য-পদবীতে সমুত্থান করিয়াছিলেন —কি দুই নিয়ম ? না বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাকে বলেন সন্ততির নিয়ম Law of heredity এবং সঙ্গতির নিয়ম Law of adaptation। সন্ততি বা সন্তান শব্দের অর্থ সংতান—তান কি না ধারাবাহিক প্রবাহ, একটানা প্রবাহ ; জীবজন্তু সকলের আনুপূর্ব্বিক একটানা প্রবাহ যে-একটি সার্ব্বভৌমিক মৌলিক নিয়মে নিয়মিত হয়, তাহারই নাম সন্ততির নিয়ম ; সে নিয়ম এই যে, সন্তান-সন্ততিরা কোনো-না-কোনো অংশে পিতৃপুরুষদিগের অনুধর্ম্মী হইতে চায়ই চায় ; এ নিয়মের মূল মন্ত্র এই যে, বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া। সঙ্গতির নিয়ম কি ? না চতুর্দ্দিকের অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাফিক চলিতে না পারিলে কোনো জীবই পৃথিবীতে টেকিয়া থাকিতে পারে না—ইহাই সঙ্গতির নিয়ম। চারিদিকের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাফিক চলিতে গেলেই জীবের পৈতৃক গুণসকল অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে থাকে। এই জন্য সঙ্গতির নিয়মকে পরিবর্ত্তনের নিয়ম বা গতির নিয়ম বা উন্নতির নিয়ম বলিলে তাহার ভাবার্থের কোনো প্রকার ব্যতিক্রম হয় না। সঙ্গতির নিয়মকে সংক্ষেপে আমরা বলিব পারিবর্ত্তিক নিয়ম, এবং সন্ততির নিয়মকে সংক্ষেপে আমরা বলিব কৌলিক নিয়ম। কৌলিক নিয়মের মূল-মন্ত্র হ'চ্চে "যেমন পিতা মাতা তেমনি সন্তান-সন্ততি ;" পারিবর্ত্তিক নিয়মের মূল-মন্ত্র হ'চ্চে "যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা ;" এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে কৌলিক নিয়মানুসারে জন-সমাজের স্থিতি নিয়মিত হয়, এবং পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে জন-সমাজের গতি এবং উৎপত্তি নিয়মিত হয়।

বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা কেবল কৌলিক নিয়মই জানেন—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা এইটিই জানেন ; তা বই এটা জানেন না যে, মহাজন যিনি—তিনি মহাজনই হইতেন না যদি পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে তিনি তাঁহার নিজের সময়ের নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না করিতেন। দুই হাত নহিলে তালি বাজে না ; এই জন্য জীব-রাজ্যে স্থিতির নিয়ম এবং গতির নিয়ম দুইই সমান আবশ্যক। কৌলিক নিয়মটিই স্থিতির নিয়ম, আর, স্থিতির নিয়ম বলিয়াই—কি পশুর মধ্যে—কি বর্ব্বর জাতির মধ্যে—কি আর্য্যজাতির মধ্যে—সর্ব্বত্রই তাহা সমান-ভাবে কার্য্য করে ; পায়রা'র বাচ্ছা পায়রা হয়, কাকের বাচ্ছা কাক হয়, কাফ্রীর পুত্র কাফ্রী হয়, বাঙ্গালির পুত্র বাঙ্গালি হয়, ইংরাজের পুত্র ইংরাজ হয় ; জাতির

ইতর-বিশেষে কৌলিক নিয়মের কার্য্যকারিতার ইতর-বিশেষ হয় না—কৌলিক নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান-ভাবে কার্য্য করে; পক্ষান্তরে, পারিবর্ত্তিক নিয়মটি গতির নিয়ম—তাই তাহা গতিশীল, আর, গতিশীল বলিয়াই—তাহা সকল জাতির মধ্যে সমান-ভাবে কার্য্য করে না, প্রত্যুত যে যেমন জাতি তাহার অভ্যন্তরে তেমনি-ভাবে কার্য্য করে; জাগ্রত জাতির মধ্যে জাগ্রত ভাবে কার্য্য করে, প্রসুপ্ত জাতির মধ্যে প্রসুপ্ত ভাবে কার্য্য করে। ফলেও তাই দেখা যায় যে "যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা" এ নিয়মটি মনুষ্যের মধ্যে যেমন চক্ষুষ্মান্-ভাবে কার্য্য করে—পশুদিগের মধ্যে তাহার সিকির সিকিও সে ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। গ্রীষ্মদেশের হস্তী শীত-দেশে সহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে "নৈসর্গিক দম্পতি নির্ব্বাচন" (Natural selection) এবং "যোগ্য-তমের উদ্বর্ত্তন" (Survival of the fittest) এই দুই জৈবিক নিয়মে পরিগঠিত হইতে থাকিলেও তাহার পৃষ্ঠ-দেশে ঘন-লোমরাজি আবির্ভূত হয় কি না সন্দেহ; কিন্তু এক জন বাঙ্গালী ইংলণ্ডে যাইতে না যাইতেই তাঁহার পৃষ্ঠ দেশ হইতে ফিন্‌ফিনে উড়ানী ঝরিয়া পড়িয়া চারি আঙ্গুল পুরু শীত বস্ত্র তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা এ নিয়মটি পশু অপেক্ষা মনুষ্যের মধ্যে বেশী প্রবল; তেমনি তাহা বর্ব্বর-জাতি অপেক্ষা সভ্য-জাতির মধ্যে বেশী প্রবল। সুয়েজের নৈসর্গিক সেতুবন্ধ জাহাজের পথ-রোধ করে বলিয়া সেই অপরাধে সেই শতযোজন-ব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে রসাতলে পাঠাইয়া দেওয়া যে-সে জাতির কর্ম্ম নহে। কৌলিক নিয়ম এবং পারিবর্ত্তিক নিয়ম উভয়ে যদিচ পরস্পরের প্রতিযোগী, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, উভয়ে পরস্পরের বিরোধী; বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক্—পতি-পত্নীর ন্যায় দোঁহে দোঁহার প্রাণ-পরিপোষক। পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে বাঙ্গালিরা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ইংরাজদিগের সহিত সম্ভব-মতো বিদ্যাবুদ্ধিতে টক্কর দিতে পারিতেছেন ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কৌলিক নিয়ম রীতিমত কার্য্য করিতেছে—প্রমাণ হইতেছে যে, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেই আর্য্য-সন্তান। নচেৎ বাঙ্গালিরা যদি কৌলিক নিয়মের গোঁড়া পক্ষপাতী হইয়া পারিবর্ত্তিক নিয়মকে ঘরে ঢুকিতে না দিতেন, তবে তাহাতে প্রমাণ হইত যে, তাঁহারা আর্য্য সন্তান হইয়াও কাফ্রীদিগের ন্যায় অসভ্য বর্ব্বর। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কৌলিক নিয়মের অনুচিত পক্ষপাতী হইলে কৌলিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়; যে ডালে উপবেশন করা হইতেছে সেই ডালের মূলোচ্ছেদ করা হয়। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, গের্দা ঠেসান্ দিয়া পায়ের উপরে পা দিয়া বসিয়া থাকিয়া এবং শুধু পূর্ব্ব পুরুষদিগের নামের দোহাই দিয়া কোন আর্য্যজাতিই আর্য্য হ'ন নাই, প্রত্যুত অন্তরের এবং বাহিরের প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়াই আর্য্যেরা আর্য্য-পদবীতে সমুত্থান করিয়াছেন। দুই অস্ত্রে মনুষ্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করে—বিজ্ঞান-অস্ত্রে এবং ধর্ম্ম-অস্ত্রে; বিজ্ঞান-অস্ত্রে ভৌতিক প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে স্বীয় বশে আনয়ন করে, এবং ধর্ম্ম-অস্ত্রে মানসিক প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে স্বীয় বশে আনয়ন করে। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আর্য্যেরা উভয় অস্ত্রেই প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে জয়-লাভ করিয়া আর্য্য-পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন; নচেৎ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই ঘুম পাড়ানো মাসিপিসি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শুদ্ধ কেবল কৌলিক নিয়মের লাঙ্গুল ধরিয়া চলিয়া, এযাবৎকাল পর্য্যন্ত কোনো আর্য্যজাতিকেই আর্য্য হইতে দেখা যায় নাই। কেহ যদি সত্য সত্যই মনে করেন যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা শুদ্ধ কেবল এক হাতে তালি বাজাইতেন, শুধু কেবল কৌলিক নিয়মেই চলিতেন—পারিবর্ত্তিক নিয়মকে ঘরের চৌকাট মাড়াইতে দিতেন না, তবে তাঁহাদের সে ভ্রমটি ঘুচাইয়া দিবার জন্য দুইটি উদাহরণ পরে পরে প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথম উদাহরণ। এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিজ্ঞান-অস্ত্রে কুসংস্কারের সহিত রীতিমত সংগ্রাম করিতেন। বহু পূর্ব্বে যে সময়ে আপামর সাধারণ সকল লোকেরই এইরূপ ধ্রুব-জ্ঞান ছিল যে, পৃথিবী সমতল, এবং তাহার পোষকতায় পুরাণের এটা একটা অকাট্য সিদ্ধান্ত ছিল যে, পৃথিবী ত্রিকোণ, সেই সময়ে জ্যোতির্বিৎ ভাস্করাচার্য্য ঐ প্রচলিত লৌকিক এবং পৌরাণিক মতের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে বলিলেন যে,

"সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং
মন্যন্তে খে যতো গোলস্তস্য কোর্দ্ধং কচাপ্যধঃ॥"

ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্রই লোকে স্বস্থানকে উপরিস্থিত মনে করে, যেহেতু পৃথিবী গোল, তাহার ঊর্দ্ধই বা কি আর অধোই বা কি? (এখানে "কু" শব্দের অর্থ পৃথিবী)

পুনশ্চ

"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীংতলস্থাং
আত্মানমস্যা উপরিস্থিতংচ

স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থসংস্থা
মিথশ্চতে তির্য্যগিবামনন্তি।
অধঃশিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থা *
শ্ছায়া মনুষ্যা ইব নীর তীরে
অনাকুলা স্তির্য্যগধঃস্থিতাশ্চ
তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাত্র॥”

“যিনি যেস্থানে থাকেন, তিনি পৃথিবীকে তলস্থ এবং আপনাকে তাহার উপরিস্থ মনে করেন; যাঁহারা পরস্পর হইতে পৃথিবীর চতুর্থাংশ দূরে অবস্থান করেন, তাঁহারা পরস্পরকে ত্যাড়্চা ভাবে (অর্থাৎ কাত হইয়া পড়া ভাবে) অবস্থিত বলিয়া মনে করেন। পৃথিবীর উল্টা পিটে জলাশয়ের তীরস্থ ব্যক্তির জল-বিন্যস্ত প্রতিবিম্বের ন্যায় মনুষ্যেরা অধোমস্তক, কিন্তু আমরা যেরূপ ভাবে এখানে অবস্থিতি করিতেছি, উপরি-উক্ত অধঃস্থিত এবং তির্য্যক্-স্থিত ব্যক্তিরা ঠিক সেইরূপ অনাকুল ভাবে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।” ভাস্করাচার্য্যের স্বহস্ত-রচিত এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের কিরূপ মনে হয়? এইরূপ কি মনে হয় যে, তিনি লৌকিক এবং পৌরাণিক মত শিরোধার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন—না উল্টা আরো এইরূপ মনে হয় যে, তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন? পৃথিবীশুদ্ধ লোক যেখানে একবাক্যে বলিতেছে যে, পৃথিবী ত্রি-কোণ, সেখানে তিনি একাকী শুদ্ধ কেবল বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বলে—কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই কর্ণে শোনে নাই এইরূপ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইলেন; অসংকুচিত চিত্তে অম্লান বদনে বলিলেন যে, “পৃথিবী গোল”—ইহা কি যে-সে লোকের কাজ? ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য। এইরূপ আর্য্যোচিত কার্য্যের পরিবর্ত্তে তিনি যদি আ-য্যামি করিতেন, তিনি যদি বলিতেন “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা” পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক্—পুরাণ যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক্—সকলে যাহা একবাক্যে বলে তাহাই ঠিক্—পৃথিবী ত্রিকোণ ইহাই ঠিক, তবে আমাদের দেশের পুরাতন জ্যোতিষের আ-য্যতাই বা কোথায় থাকিত, প্রামাণিকতাই বা কোথায় থাকিত? তাহা হইলে আজিকের এই উনবিংশ শতাব্দীতে সে জ্যোতিষকে কে-ই বা পুছিত আর কেই বা তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত?

দ্বিতীয় উদাহরণ। এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ধর্ম্ম অস্ত্রে লোকাচারের অনুমোদিত কুরীতির সহিত সংগ্রাম করিতেন। অতীব পুরাকালে—বেণ রাজার আমলে—আমাদের দেশে রাক্ষস বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলা অসভ্য বিবাহ-পদ্ধতি লোক-সমাজে প্রচলিত ছিল। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সেই সকল পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া—উঠিয়া পড়িয়া-লাগিয়া সেগুলিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া—তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মবিবাহের সুসভ্য পদ্ধতি জনসমাজে চালাইয়া দিলেন; ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য; তাহা না করিয়া তাঁহারা যদি আর্য্যামি করিতেন—লোকাচারের জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দিয়া বলিতেন “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা” আর্য্য পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই ঠিক—রাক্ষস বিবাহই ঠিক্” তবে আজিকের এই হিন্দু-সমাজের আর্য্যত্বই বা কোথায় থাকিত—ভদ্রত্বই বা কোথায় থাকিত! এই দুই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট; ইহাতেই এক আঁচড়ে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা লৌকিক কুসংস্কার এবং কুরীতির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান-অস্ত্রে এবং ধর্ম্ম-অস্ত্রে সংগ্রাম করিয়া—সত্য এবং মঙ্গলের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া—নিক্তির ওজনে উচিত মূল্য প্রদান করিয়া—আর্য্যকীর্ত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য আর্য্যেরা কি করিয়াছেন? তাঁহারা কি লৌকিক অথবা পৌরাণিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটিও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন? দেশের কোনো প্রকার লোক-প্রচলিত কুরীতির বিরুদ্ধে আলস্য-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটিবারও উঠিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছেন? তাহা দূরে থাকুক—আদুরে ছেলেরা যেমন অষ্টপ্রহর যার তার নিকট হইতে আদর ভিক্ষা করে তাহারা তেমনি ভদ্রাভদ্র সকল-প্রকার প্রচলিত লোকাচারের স্বপক্ষে অলীক বাচালতা করিয়া ভদ্রাভদ্র সকল-শ্রেণীস্থ বঙ্গজনেরই আদর ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং সেই ভিক্ষার ধনে আপনাদের আর্য্য-গরিমার ভাণ্ডার দিন দিন স্ফীত করিয়া তুলিতেছেন! এইরূপে যাঁহারা সিকি পয়সা দিয়া লাখ টাকা মূল্যের আর্য্যকীর্ত্তি ক্রয় করেন, তাঁহাদিগকে আমরা শুধু এই কথাটি বলিয়াই এ যাত্রা ক্ষান্ত হইতে চাই যে, **সস্তার তিন অবস্থা**! এই সকল নব্য আর্য্যদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য ইহার অধিক

* “কুদলান্তরস্থা”—কু শব্দে পৃথিবী; পৃথিবীর দলান্তরস্থ” অর্থাৎ ছোলার যেমন দুইটি দল আছে, তেমনি ভূগোলককে দুইটি দলে বিভক্ত মনে করা যাইতে পারে—একটি দল তাহার উপরিস্থিত অর্দ্ধ খণ্ড, আর একটি দল তাহার নিম্নস্থিত অর্দ্ধ খণ্ড; নিম্নস্থিত অর্দ্ধ খণ্ডের ভূপৃষ্ঠে যাহারা বাস করে তাহারাই “কুদলান্তরস্থ”।

যদিচ আর কিছুই নাই কিন্তু উঁহাদের প্রতি মনু ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি পুরাতন আর্য্যদিগের বাৎসল্যপূর্ণ উপদেশ এখনো-পর্য্যন্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তাহা এই যে, "সত্যসত্যই যদি তোমরা আর্য্য হইতে চাও, তবে পূর্ব্বে আমরা যাহা করিতাম তাহাই কর; লৌকিক এবং পৌরাণিক ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে জ্ঞান-ধর্ম্মের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত কর; তোমাদের মধ্যে রামমোহন রায়ের ন্যায় প্রকৃত আর্য্যদিগের জন্মগ্রহণ যেন নিস্ফল না হয়। আর্য্যামি করিলে কিছুই হইবে না! নিশ্চিত জানিও যে আর্য্যামি একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি, আর, তাহার একমাত্র ঔষধ আর্য্যোচিত কার্য্য।" আর্য্যামি এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট অতঃপর সাহেবিআনা কিরূপ তাহার প্রতি একবার মনঃ সমাধান করা যাক্।

আর্য্যামিও যেমন, সাহেবিআনাও তেমনি—দুইই সমান। দুই নারিকেলের শাঁস ফেলিয়া ছোব্ড়া ভক্ষণ। আমাদের দেশের জ্ঞান ধর্ম্ম ধৈর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য অহিংসা ক্ষমা ঋজুতা এইগুলিই শাঁস, আর, টিকি রাখা, ফোঁটা কাটা ভিতরে সার নাই মুখে বামনাই, দলাদলির মোড়ল-গিরি, এই গুলিই ছোবড়া; এই ছোবড়া-গুলিই আর্য্যামির প্রধান সম্বল; তেমনি আবার, উন্নত বিজ্ঞান, উন্নত শিল্প, প্রবল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কর্ম্মিষ্ঠতা কার্য্য-নৈপুণ্য, তেজস্বিতা, এইগুলিই উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা'র মূল উপাদান—এই-গুলিই শাঁস; আর, ইংরাজদিগের ন্যায় চটুল-ধরণের চাল্ চোল্, ইংরাজদিগের ন্যায় জড়ানে জড়ানে বুলি, ইংরাজদিগের ন্যায় রক্ত চলাচলের ব্যাঘাতজনক আঁটা সাঁটা অশোভন পরিচ্ছদ, এই গুলিই ছোব্ড়া; এই ছোবড়াগুলিই সাহেবিআনার প্রধান সম্বল। তাই আমরা বলি যে, আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা দুইই এপিট্ ওপিট—এ বলে আমায় দ্যাখ্, ও' বলে আমায় দ্যাখ্।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইংরাজেরা যে-কোনো প্রণালীতে যে-কোনো কার্য্য করে, বাঙ্গালীরা সেই প্রণালীতে সেই কার্য্য করিলে তাহাতেই তাঁহাদের সাহেবিআনা হয়; তাহা যদি কেহ মনে করেন—সেটি তাহার বড়ই ভুল! কেননা তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, ইংরাজেরা যেহেতু ইংরাজি লিখিবার সময় বামদিক্ হইতে ডাহিন দিকে লেখনী চালনা করে এই জন্য বাঙ্গালিদের উচিত যে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবার সময় ডাহিনদিক্ হইতে বামদিকে পারসীক ধরণে লেখনী চালনা করেন; নহিলে যেন তাঁহাদিগকে সাহেবিআনা-দোষে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হইবে! ফলে, এ কথা কোনো কাজের কথা নহে যে, ইংরাজদিগের যে-কোনো রীতিনীতি বা যে-কোনো আচার ব্যবহার বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সাহেবিআনার লক্ষণ। ম্যাক্স মূলার ভট্টের এ কথা যদি সত্য হয় যে, ইংরাজ বাঙ্গালী ফরাসীস্ প্রভৃতি সকল আর্য্য-জাতিই গোড়ায় একজাতি ছিল, তবে ইংরাজ-বাঙ্গালি জাতি-দ্বয়ের মৌলিক আচার-পদ্ধতি যে একই ধাঁচা'র হইবে তাহা তো হইবারই কথা বরং তাহা না হওয়াই বিচিত্র; তবও যদি এ বিষয়ে কাহারো মনে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে—তবে বক্ষ্যমান দুইটি উদাহরণ শুনিলে, সে সন্দেহ তাঁহার মন হইতে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

প্রথম উদাহরণ;—বন্ধুগণের সম্মিলন-কালে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যেরূপ কর-নিপীড়নের (Shake-hand এর) প্রথা প্রচলিত আছে আমাদের মধ্যে যে, সেরূপ নাই বা ছিল না, তাহা নহে; কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীর প্রথম অঙ্কের প্রথম ঘটনাটিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরূরবা ইন্দ্রপুরী-হইতে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথিমধ্যে যখন চিত্ররথ-গন্ধর্ব্বের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল, তখন উভয়ে স্ব স্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পরস্পরের হস্ত নিপীড়ন করিলেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ;—বিবাহোদ্যত বর-কন্যার বয়সের ব্যবস্থা ইউরোপে যেরূপ—আমাদের দেশেও পূর্ব্বে সেইরূপ ছিল; তাহার সাক্ষী—মনুর বিধানে পুরুষের ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম এবং কন্যার বারো বৎসর বয়ঃক্রম বিবাহের উপযুক্ত বয়স। এখানে ইহা বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশের বারো বৎসর ইংলণ্ডের পোনেরো বৎসর অপেক্ষা বেশী বই কম নহে।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ উভয়েরই মধ্যে এরূপ কতকগুলি মৌলিক আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রচলিত আছে যাহা আর্য্যজাতি মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি—একা কেবল ইংরাজদের নিজস্ব সম্পত্তি নহে; সে গুলিতে—কি ইংরাজ—কি বাঙ্গালি কি ফরাসীস্—সকলেরই তুল্য অধিকার; কাজেই সেগুলি সাহেবিআনার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তা ছাড়া, তদপেক্ষা ব্যাপকতর এরূপ কতক-গুলি বিষয় আছে যাহাতে আর্য্যানার্য্য সকল জাতিরই সমান অধিকার—যেমন মনুষ্যত্ব, জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদি; কাজেই এ-গুলিও সাহেবিআনার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। একজন অতিবৃদ্ধ টোলের ভট্টাচার্য্য হয় তো মনে করিতে পারেন যে, ইংরাজি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা সাহেবিআনারই সামিল; কিন্তু তাঁহার সে কথা

কোনো কাজের কথা নহে; এটা বস্তুতঃ তাঁহার জানা উচিত যে, সকল-প্রকার জ্ঞান-চর্চ্চাতেই সকল জাতিরই সমান অধিকার;—জ্ঞান এবং ধর্ম্ম জাতীয়-শৃঙ্খলের বন্ধন-হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিতি করে। পূর্ব্বতন গ্রীকজাতি যে, মিসরীয় জাতির নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা বলিয়া তাহারা কি মিসরী হইয়া গিয়াছিল? পাদ্রী জনেরা যে বাঙ্গালা শিক্ষা করেন—তাহা বলিয়া তাঁহারা কি বাঙ্গালী হইয়া যা'ন? সার্ উইলিয়ম জোন্স্ যে, কোনো দেশের কোনো ভাষাই শিক্ষা করিতে বাকি রাখেন নাই—তাহা বলিয়া তিনি কি স্বজাতির পদবী হইতে তিলমাত্রও বিচ্যুত হইয়াছিলেন। স্বর্ণ যাহা—তাহা সকল দেশেই সমান—কেবল স্বর্ণের অলঙ্কার দেশ-ভেদে ভিন্ন; তেমনি জ্ঞানের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সকল-দেশেই সমান; কেবল—জ্ঞানের বিকাশের তারতম্য-প্রযুক্ত তাহার ভাব-ব্যঞ্জক ভাষা দেশ-ভেদে বিভিন্ন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা জ্ঞানের বিভিন্ন পরিচ্ছদ বই আর কিছুই নহে। জ্ঞান ইংরাজীও নহে—বাঙ্গালিও নহে—সংস্কৃতও নহে, জ্ঞান জ্ঞানই। যাহার ভাণ্ডারে রৌপ্য আছে তাহাকেই আমি বলিব—ধনী; তা সে-রৌপ্য সিলিঙ্ বেশেই থাক্ আর আদুলি বেশেই থাক্ আর যে-কোনো বেশেই থাক্ তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। সিলিঙ্ অপেক্ষা আদুলি আমাদের দেশে সমধিক ব্যবহারোপযোগী—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া আমাকে যদি কেহ এক রাশ সিলিঙ্ দেয়—তাহা কি আমি লইব না? অবশ্যই লইব—দুই হাত পাতিয়া লইব—লইতে ছাড়িব না; কিন্তু লইয়াই টাকশালে দৌড়িব;—ও সেখানে সেই সিলিঙ্-গুলি দিয়া মনের সাধে টাকা আদুলি সিকি গড়াইয়া লইব, তাহার বাট্টা যত লাগে লাগুক্ সে জন্য কাতর হইব না। ইংরাজেরা কি করে? আমাদের দেশ হইতে কাঁচা মাল ধূলিরাশির ন্যায় ঝাঁটাইয়া লইয়া যায়, এবং তাহা দিয়া স্বদেশের ব্যবহারোপযোগী কত কি নূতন নূতন অপূর্ব্ব সামগ্রী রচনা করে; আমরা যদি তেমনি তাহাদের পুঁথি হইতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সকল সংগ্রহ করিয়া সেই উপাদান-গুলিকে স্বদেশীয় ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া দেশোপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে জো পাই, তবে সে সুবিধাটি আমরা ছাড়িব কেন?* ফল কথা এই যে, জ্ঞান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কার্য্য-নৈপুণ্য, তেজস্বিতা, এই সকল মনুষ্যোচিত গুণ জাতি-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের এক-চেটিয়া পণ্য দ্রব্য হইতে পারে না; এ গুলির প্রতি হস্ত প্রসারণ করিবার অধিকার সকল জাতীয় সকল মনুষ্যেরই সমান; অতএব জ্ঞান-উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা কোনো গতিকেই সাহেবিআনা শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান-উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করা স্বতন্ত্র, আর, বাবাকে পাপা বলিবার জন্য অথবা দারাকে ডিয়ার বলিবার জন্য ইংরাজি শিক্ষা করা স্বতন্ত্র! জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করিলে লোকে মানুষের মতো মানুষ হয়; ঢঙ উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করিলে লোকে বনমানুষের মতো মানুষ হয়;—দুয়ের মধ্যে এইরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যে-সকল রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সমস্ত-আর্য্যজাতির সাধারণ-সম্পত্তি—সাহেবিআনার উপকরণ-গুলি তাহার ভিতরে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না; এক্ষণে দেখিলাম যে, জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি মনুষ্যত্বের সার উপাদান যাহা মনুষ্য-জাতির সাধারণ সম্পত্তি, তাহার ভিতরেও সাহেবিআনার কোনো প্রকার উপকরণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, ইংরাজদিগের এরূপ-কতকগুলি বিশেষ-রকমের হাব-ভাব আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গী চাল চোল যাহা আর্য্যগণেরও সাধারণ সম্পত্তি নহে, আর, মনুষ্য জাতিরও সাধারণ সম্পত্তি নহে—সেই গুলিই সাহেবিআনার উপকরণ। এই তো গেল উপকরণ; সাহেবিআনার প্রকরণ কি যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এক কথায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে; কি? না—অনুকরণ। পূর্ব্বোক্ত উপকরণগুলি শেষোক্ত প্রকরণের মধ্য দিয়া সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইলেই তাহাকেই আমরা বলি—সাহেবিআনা। এমতে দাঁড়াইতেছে যে, অনুকরণই সাহেবিআনা-রোগের মূল-সূত্র।

অনুকরণ কেবল একটা দিক্-বিদিক্-শূন্য অন্ধ চপলতা—তাহার ভিতরে কোনো পদার্থ নাই। অনেক সময় অনুকরণের এটা মনে থাকে না যে, "যার যা তারে সাজে অন্যে তাহা লাঠি বাজে" তাই

* এই সুযোগে ফাঁকতালে একটি কথা বলিয়া লই;—ইংরাজী ভাষার বাঙ্গালা অনুবাদ-কালে অনেক লেখক কিম্ভূত কিমাকার নূতন এক-তরো ভাষা গড়িয়া তোলেন,—এইটি বড় দোষের কথা! আমরা তাই "Letter killeth' spirit giveth life" এই বচনটির অনুবাদ করিতে হইলে এইরূপ অনুবাদ করি যে, মৌখিক শব্দ বাক্যের প্রাণবধ করে, আন্তরিক ভাব বাক্যের প্রাণদান করে; নচেৎ এরূপ অনুবাদ করি না যে, "অক্ষর বধ করে ও আত্মা জীবন-দান করে!" "স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট" এরূপ ধরণের অনুবাদ শুনিলে আমাদের গাত্রে জ্বর আইসে!

সে প্রায়ই বিস্‌মোল্লায় গলদ্ করিয়া বসে; প্রায়ই সে ভাল মনে করিয়া একটা কাজ করিতে যায়—করিয়া বসে একটা বেতালা বেসুরা বেমানান্ কিম্ভূত কিমাকার কাণ্ড! * হিন্দু সন্তানের (Esquire) ইস্কোএস্কার পদবী ইহার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ;—ইউরোপের মধ্যম অব্দের শাস্ত্র অনুসারে স্কোএস্কার পদবী সাধারণ লোক-জনের পদবী অপেক্ষা এক ধাপ উচ্চে অবস্থিত। ব্রাহ্মণের নীচেই যেমন কায়স্থ—নাইটের নীচেই তেমনি স্কোএআর। ইউরোপের মধ্যম অব্দে নাইট্ যখন ঘোড়ায় চড়িবার উপক্রম করিতেন—স্কোএআর তখন রেকাব ধরিতেন; নাইট্ যখন দ্বন্দ-যুদ্ধে যাত্রা করিতেন—স্কোএআর তখন তাঁহার সাজ-সজ্জা বহন করিতেন; ইহাতেই স্কোএআর পদবীর এত মান-মর্য্যাদা। শুধু যে কেবল ইংরাজদের মধ্যেই এরূপ তাহা নহে, আমাদের দেশের মান্য গণ্য শ্রেণী-বিশেষের মধ্যেও নাইটের সেবক স্কোএআর পদবীর ন্যায় ব্রাহ্মণের সেবক দাস পদবী বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। তবে, এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে সজ্জন কায়স্থেরা আপনাদের পদবীর সংস্রব হইতে দাস শব্দটি উঠাইয়া দিয়াছেন—খুবই ভাল করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই; কিন্তু তা'ও বলি—একটা উপসর্গকে তাঁহারা এক দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিয়া তদপেক্ষা গুরুতর আর-একটা উপসর্গকে কোন্ যুক্তিতে তাঁহারা আর-এক দ্বার দিয়া ঘরে ঢোকা'ন্—এইটি বড় রহস্য! ব্রাহ্মণের খালি চরণের পদধূলিকে যাঁহারা ডরা'ন—নাইটের বুট্-মণ্ডিত চরণের পদধূলি দিয়া কোন্ লজ্জায় তাঁহারা ললাটে তিলক কাটেন—এইটিই বুঝিতে পারা সুকঠিন! শুক্রাচারী ব্রাহ্মণের গাড়ু গামছা বহন করা যদি এতই নীচ কার্য্য হইল, তবে ম্লেচ্ছ নাইটের রেকাব ধরা এবং বুট্ পরিষ্কার করা বড় যে একটা ভদ্রজনোচিত কার্য্য তাহার প্রমাণ কি? ফল কথা যে, "যার যা তারে সাজে" ইস্কোএআর পদবী দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরাজকেই সাজে, দাস পদবী দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দু সন্তানকেই সাজে; কিন্তু অন্যে তাহা লাঠি বাজে—ম্লেচ্ছ নাইটের রেকাব ধরা হিন্দু সন্তানকে লাঠি বাজে, হীনের ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করা ইংরাজ সন্তানকে লাঠি বাজে। * এইটি না বুঝিবার

---

* এই প্রসঙ্গে মহামান্য সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অতি সরস গল্প বলিলেন—সেটি এই;—একজন পল্লীগ্রামের কবিরাজ তাঁহার একটি ছাত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার হাতের একজন রোগীকে দেখিতে গেলেন। রোগীর হাত দেখিয়া তিনি বলিলেন "নাড়ীতে কিঞ্চিৎ রসাধিক্য দেখিতেছি—পথ্য-বিষয়ে আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম তাহার তো কোনো অন্যথাচরণ কর নাই?" রোগী বলিল "আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন আমি সেই রূপই করিয়াছি—তাহার একচুলও এদিক্ ওদিক্ হয় নাই," কবিরাজ বলিলেন "তোমার হাতটা দেও দেখি—আর-একবার দেখি"—হাত দেখিয়া বলিলেন "সত্য বল দেখি তুমি ইক্ষুরস ভক্ষণ-করিয়াছ কি না?" রোগী বলিল "আপনি ঠিক্ আঁচিয়াছেন—আমি যথার্থই ইক্ষুরস ভক্ষণ করিয়াছি;" কবিরাজ বলিলেন "তোমার নাড়ী দেখিয়াই তাহা আমি বুঝিয়াছি—ওরূপ কার্য্য আর যেন না হয়" কবিরাজের এইরূপ অসাধারণ নাড়ী-জ্ঞান দেখিয়া বাড়ি-শুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল, এবং সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কবিরাজ ছাত্র-সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে তাঁহার ছাত্রটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কবিরাজ মহাশয়, পুঁথিতে কোথাও তো এরূপ লেখে না যে, নাড়ী দেখিয়া কে কি খাইয়াছে না খাইয়াছে তাহার উপলব্ধি সম্ভবে; আপনি তবে নাড়ী দেখিয়া কেমন করিয়া ইক্ষু ভক্ষণের ব্যাপারটা অনুমান করিলেন—সেইটি আমাকে বুঝাইয়া বলুন?" কবিরাজ বলিলেন "বাপু! এটা আর বুঝিলে না! রোগীর ঘরের চারিদিকে আকের ছিবড়া পড়িয়া আছে দেখিলাম—দেখিয়া ভাবিলাম যে, সে ঘরে আর কে আক খাইতে যাইবে—রোগীরই এ কাজ! এখন বুঝিলে?" ছাত্র বলিল "এই বই নয়?—এতো আমিও পারি! কবিরাজ মহাশয়—এবারে যখন আপনি রোগী দেখিতে যাইবেন তখন রোগ নির্ণয়ের ভারটা আমার উপর সমর্পণ করিবেন।" কবিরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন। ছাত্রটি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সেখানে একঘর লোক বসিয়া আছে—ইহা দেখিয়া তাহার উৎসাহানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সে রোগীর নাড়ী দেখিতেছে আর ঘরের চারিদিকে নেত্র-পাত করিতেছে—আকের ছিবড়া বা আর কোনো খাদ্য-সামগ্রীর কোনো নিদর্শনই খুঁজিয়া পাইতেছে না—অবশেষে চৌকাটের কাছে কতকগুলা জুতা পড়িয়া আছে দেখিয়া মনে ভাবিল "এতক্ষণে ঠিক্ পাইলাম!" আর তদ্দণ্ডেই রোগীকে বলিল "তোমার নাড়ীর গতি যে রূপ দেখিতেছি নিশ্চয়ই তুমি জুতা ভক্ষণ করিয়াছ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই!" ইহা শুনিয়া রোগীর বাড়ির লোকেরা তাঁহাকে উত্তম মধ্যম জুতা ভক্ষণ করাইয়া বিদায় করিল। অনুকরণের এইরূপই বিচিত্র গতি।

* Esquire উপাধিতে যাঁহারা স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পা'ন—বাবু উপাধি তাঁহাদের চক্ষের বিষ! ইংরাজ কেরাণী-পতি বাঙ্গালী কেরাণীদিগকে বাবু বলিয়া সম্বোধন করে—এই খেদে তাঁহারা বাবু-শব্দের প্রতি এত বীতরাগ! তাঁহারা এতই যদি সূক্ষ্মচর্ম্মী যে, সাহেবেরা বাবু-শব্দের অপব্যবহার করে বলিয়া সেই খেদে তাঁহারা বাবুশব্দকে আপনাদের নামের

দরুণ—অনুকরণ-রূপী চঞ্চল হরিণ দন্তহীন নখহীন ঝি-মন্ত দিশী নেকড়ে বাঘের হস্ত এড়াইবার জন্য প্রত্যহই নূতন নূতন ফন্দি বাহির করিতেছে অথচ দন্ত-নখ-বিশিষ্ট বিলাতি জাত-বাঘটাকে ঘরে ঢোকাইবার জন্য

- - -

কাছ ঘেঁসিতে দিতে নারাজ, তবে দেশশুদ্ধ লোক যে বাঙ্গালির গায়ের হ্যাট্ কোট্‌কে ফিরিঙ্গি পোষাক্ বলিয়া খোঁটা দেয়, তাহার বেলায় তাঁহাদের সে সূক্ষ্ম-চম্ম কোথায় থাকে? তা'র বেলা—দেশ-শুদ্ধ লোকের লাঞ্ছনা তাঁহারা গায়ে পাতিয়া লইবেন তাহাও স্বীকার তবুও বিলাতি পরিচ্ছদের মায়া প্রাণ থাকিতে ছাড়িতে পারিবেন না -এ যা তাঁহারা বলেন এটা কিরূপ কথা? এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন? ইংরাজ কেরাণী পতিদিগের মতই কি তাঁহাদের সদারাধ্য লোক মত (public opinion)? দেশ-শুদ্ধ লোকের মত কি লোক-মত নহে? নকল সাহেবেরা যাহা বলিতে যাহাই বুঝুন্ না কেন—আসল বিলাতি সাহেবেরা public opinion বলিতে আপনাদের দেশের লোক-মতই বোঝেন; তা ছাড়া, ভিন্ন দেশীয় লোকের মত (বিশেষতঃ ভিন্ন দেশীয় কেরাণীপতিদিগের মত) ইউরোপীয় কোন্ সভ্যজাতির মধ্যে লোক-মত বলিয়া সমাদৃত হয় তাহা আমরা জানি না। ইংরাজদিগের মধ্যে এমনও তো দেখিতে পাওয়া যায় যে, বচসা-কালে উচ্চ পদবীস্থ লোক নীচের লোককে কঠোর-ভাবে Sir বলিয়া সম্বোধন করে যথা,—"You hold your tongue sir;" Sir Richards Temple যদি বলেন যে, খানসামাকে ধমক দিবার সময়েও লোকে Sir শব্দ উচ্চারণ করে—অতএব Sir উপাধি অতীব লজ্জাস্পদ উপাধি—ফের যদি আমাকে কেহ Sir উপাধি-যুক্ত শিরোনামায় পত্র লেখে তবে তাহার নামে আমি লাইবেলের মোকদ্দমা আনিব"—তবে লোকে তাঁহাকে কি বলিবে? আসল্ কথা এই যে, খানসামাকে Sir বলাতেও Sir উপাধি কাঁচিয়া যায় না, আর, কেরাণীকে বাবু বলাতেও বাবু উপাধি কাঁচিয়া যায় না। বাবু শব্দের মূল বৃত্তান্ত আর কিছু না- Sire শব্দ হইতে যেমন Sir হইয়াছে—বাবা শব্দ হইতে তেমনি বাবু হইয়াছে; তাহার সাক্ষী—হিন্দুস্থানীরা যখন তখন বাবা অর্থে বাবু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। Sire শব্দের অর্থ বাবা বই আর কিছুই নয়, আর, Sir শব্দ Sire শব্দেরই অপভ্রংশ। এইরূপ, Sir শব্দ এবং বাবু শব্দ উভয়েরই মূল অর্থ যখন একই প্রকার, তখন বাঙ্গালি সাহেবেরা কোন্ যুক্তিতে Sir উপাধিকে স্বর্গের সোপান এবং বাবু উপাধিকে পাতালের সোপান বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন—বুঝিতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয় যে, মাণ্ডারীন্ উপাধি চীন্‌কেই সাজে আর কোনো জাতিকেই সাজে না; সেখ্ উপাধি মুসল্মানকেই সাজে—ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেও সাজে না—পাদ্রিকেও সাজে না; বাবু উপাধি বাঙ্গালিকেই সাজে—ইংরাজকে সাজে না; Sir উপাধি ইংরাজকেই সাজে বাঙ্গালিকে সাজে না।

লালায়িত। বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরাও আবার তেমনি—যার যা তারে সাজে এ বোধ তাঁহাদের মূলেই নাই; এ বোধ তাঁহাদের নাই যে, গেরুয়া বসন উদাসীনকেই সাজে—গৃহীকে সাজে না; মাথায় টিকি ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেই সাজে—বিষয়ী ব্যক্তিকে সাজে না; রুদ্রাক্ষমালা শাক্তকেই সাজে আর কাহাকেও সাজে না; তাঁহারা সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের দেখাদেখি নির্বিশেষে সকল বেশ ধারণ করিতেই প্রস্তুত—যেহেতু তাঁহারা সার্ব্বভৌমিক আর্য্য! এইরূপ দেখা যাইতেছে যে অনুকরণ—আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা উভয় রোগেরই একটি সাধারণ উপসর্গ।

অনুকরণ কি? না দেখাদেখি কার্য্য করা। সাহেব দের দেখাদেখি কার্য্য করা'র নাম সাহেবিআনা। সাহেবদের দেখাদেখি বাঙ্গালিরা কি করেন? যাহা করেন তাহা বুঝাই যাইতেছে; -বাহ্য আকার প্রকার ভাবভঙ্গী চাল্ চোল্ কথাবার্ত্তার ঢঙ এইগুলিই চক্ষে দেখিবার সামগ্রী—এইগুলিই একজনের দেখাদেখি আর একজন চট্ আদায় করিতে পারে—বাঙ্গালিরা তাহাই করেন। কিন্তু মনুষ্যের আভ্যন্তরিক ভাব এবং চরিত্র চক্ষে দেখিবার সামগ্রী নহে—তাহা অন্তরে অনুভব করিবার সামগ্রী; কাজেই কোনো প্রকার আন্তরিক ভাব এবং চরিত্র একজনের দেখাদেখি আর একজন আদায় করিতে পারে না—কেমন করিয়াই বা পারিবে? যাহা চক্ষে দেখা যায় না তাহা একজনের দেখিয়া আর একজন কেমন করিয়া শিখিবে? সেক্‌স্‌পিয়রের হাতের লেখা সকলেই অনুকরণ করিতে পারে কিন্তু সেক্‌স্‌পিয়রের কবিত্ব-রসের অনুকরণ দেবতারও অসাধ্য; -ইহার কারণ অন্বেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেক্‌সপিয়রের হাতের লেখা প্রত্যক্ষের গোচর বলিয়াই তাহা অনুকরণের আয়ত্তাধীন; আর, সেক্‌স্‌পিয়রের অন্তর্নিহিত কবিত্বরস প্রত্যক্ষের অগোচর বলিয়াই তাহা অনুকরণের আয়ত্ত-বহির্ভূত। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কালিদাসও সেক্সপিয়রকে অনুকরণ করিয়া দিশী সেক্সপিয়র হ'ন নাই, সেক্সপিয়রও কালিদাসকে অনুকরণ করিয়া বিলাতি কালিদাস হ'ন নাই; নেল্‌সন্‌ও নেপোলিয়নকে অনুকরণ করিয়া জলপথের নেপোলিয়ন হ'ন নাই, নেপোলিয়নও নেল্‌সনকে অনুকরণ করিয়া স্থলপথের নেল্‌সন্ হ'ন নাই; রামমোহন রায়ও লিউথরকে অনুকরণ করিয়া দিশী লিউথর হ'ন নাই—লিউথরও রামমোহন রায়কে অনুকরণ করিয়া বিলাতি রামমোহন রায় হ'ন নাই। যা'র যা তারে সাজে—

সেক্সপিয়রের কবিত্ব সেক্সপিয়রকেই সাজে, কালিদাসের কবিত্ব কালিদাসকেই সাজে; সুবিখ্যাত Emerson তাই বলিয়াছেন "Shakespeare never will be made by the study of shakespeare" সেক্স্‌পিয়র পড়িয়া কোনো জন্মেই কেহ সেক্স্‌পিয়র হইতে পারিবেন না; নেপোলিয়নের যুদ্ধ-কৌশল নেপোলিয়নকেই সাজে, নেল্‌সনের যুদ্ধ-কৌশল নেল্‌সনকেই সাজে; একজনের অনুকরণ আর এক জনকে সাজে না—একজাতির অনুকরণ আর এক জাতিকে সাজে না। Museকে সাড়ী পরা সাজে না; সরস্বতীকে গৌন পরা সাজে না; (কোনো বঙ্গ কবি যদি সম্রাট্ হংসের (Swan) কণ্ঠের সহিত রূপসীর কণ্ঠের তুলনা দেন, তবে তাঁহারই নাম সরস্বতীকে গৌন্ পরানো); পদ্মমৃণালের আগায় গোলাপফুল সাজে না, গোলাপের ডালে পদ্ম-ফুল সাজে না,—যাহা সাজে না তাহা আপনার গাত্রে বল পূর্ব্বক সাজাইতে যাওয়ার নামই অনুকরণ।

অনুকরণ যে কাহাকে বলে সে বিষয়ে এক্ষণে আর অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না, কিন্তু অনুকরণ যে, কাহাকে বলে না, সে বিষয়ে যৎসল্প একটি কথা এখনো আমাদের বলিবার আছে—সেটি এই যে, আদর্শের প্রতিকৃতি অনুকৃতি শব্দের বাচ্য নহে। মনে কর দুই জন চিত্রকর এক পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন; আর মনে কর যে, প্রথম চিত্রকর সুন্দর একটি দৃশ্য চিত্র-পটে উদ্ভাবন করিয়াছেন; সেই অঙ্কিত চিত্রটি দেখিয়া দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্বোধন হইল; তাহার পরে সেই দ্বিতীয় চিত্রকর উদ্বোধিত ভাবটিকে পটে অভিব্যক্ত করিতে গিয়া প্রথম চিত্রটির অবিকল অনুরূপ দ্বিতীয় আর একটি চিত্র তাঁহার হস্তদিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এরূপ স্থলে প্রথম চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি—আদর্শ, এবং দ্বিতীয় চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি—তাহার প্রতিকৃতি; এ ভিন্ন - দ্বিতীয় চিত্রটিকে প্রথম চিত্রের অনুকৃতি বলিতে পারি না; তাহার কারণ এই যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটি চিত্র দুই জনের সমান মনের ভাব হইতে উৎপন্ন হওয়াতেই সমান আকার ধারণ করিয়াছে, তা বই—একটার দেখা দেখি আর একটা তাহার সমান হইয়া ওঠে নাই; একটার দেখাদেখি যখন আর একটা জন্মগ্রহণ করে নাই তখন কাজেই একটা আর একটার অনুকৃতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন যে, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র-হইতে ভাবলইয়া তবে তো দ্বিতীয় চিত্রটি উৎপাদন করিয়াছেন—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, দ্বিতীয় চিত্র প্রথম চিত্রের অনুকৃতি নহে? ইহার উত্তর এই যে, লোকে যেমন জলাশয় হইতে জল তুলিয়া কলস পূরণ করে সেরূপ করিয়া কেহ কোনো একটি ভাবকে বাহির হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্তরে পুরিতে পারে না—কেমন করিয়াই বা পারিবে? ভাব তো আর আকাশ-ব্যাপী ভৌতিক পদার্থ নহে যে, তাহাকে একস্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া আরেক স্থানে রাখিতে পারা যাইবে; ভাব মানসিক পদার্থ—আকাশের মধ্য দিয়া মূলেই তাহার চলাচলি সম্ভবে না। অতএব, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র হইতে ভাব লইয়াছেন, ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, প্রথম চিত্রটির গায়ে একটি ভাব আটা দিয়া জোড়া ছিল, সেখান হইতে তিনি তাহা উঠাইয়া লইয়া আপনার মনের ভিতরে পুরিয়াছেন; ইহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, প্রথম চিত্রটি দেখিবা-মাত্র দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি ভাবের উদ্বোধন হইল—বাহির হইতে ভাবের আগমন হইল না কিন্তু অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধন হইল;—তাঁহার অন্তরে যাহা প্রসুপ্ত ছিল তাহাই উদ্বোধিত হইল, যাহা মুকুলিত ছিল তাহাই বিকসিত হইল, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাই প্রাদুর্ভূত হইল; কাজেই ভাব-গ্রহণ বলিতে বাস্তবিকই কিছু-আর বাহির হইতে ভাব-গ্রহণ বুঝায় না, প্রত্যুত অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধনই বুঝায়। এই জন্য, উদ্বোধিত ভাব হইতে যদি দৃষ্টপূর্ব্ব আদর্শের অবিকল অনুরূপও একটা প্রতিকৃতি উদ্ভাবিত হয়, তথাপি তাহা প্রতিকৃতি ভিন্ন অনুকৃতি-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। এক নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে যখন শত সহস্র ফরাসীস সেনা তোপের মুখে জরাজীর্ণ সেতু অতিবাহন করিয়া শত্রুদের উপরে জয়লাভ করিল, তখন তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইল যে, যেমন নেপোলিয়ন—তেমনি তাঁহার ফরাসীস্ সৈন্য; সে সৈন্য সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে না যে, তাহারা নেপোলিয়নের দেখাদেখি সেই মুহূর্ত্তেরই ভুঁই-ফোঁড় বীর, কেন না—তাহারা গোড়া হইতেই বীর; যে বীরভাব গোড়া হইতেই তাহাদের অন্তঃকরণে পুঁজি করা ছিল, নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে তাহাই উদ্বোধিত হইয়া উঠিল—এ বই আর কিছুই নহে। যেরূপ বীর-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নেপোলিয়ন স্বয়ং তোপের মুখে একপদ অগ্রসর হইলেন, সেইরূপ অন্তর্নিহিত বীর-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহার সৈন্যেরা তোপের মুখে শত পদ অগ্রসর হইল; নেপোলিয়নের দেখা-দেখি তাহারা তাহা করেও নাই—করিতে পারিতও

না; কেন না, তাহারা যখন তোপের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তখন নেপোলিয়নের আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গী নকল করিবার অবকাশ তাহাদের কোথায়? নেপোলিয়নের সৈন্যেরা যদি নেপোলিয়নের ধরণে ওয়েষ্ট্‌ কোটের পাকেটে হাত দিয়া সমাহিত-ভাবে দাঁড়াইত, নেপোলিয়নের ধরণে থাবা থাবা নস্য লইত, নেপোলিয়নী ঢঙের কোর্ত্তা পরিত, তাহা হইলেই প্রকাশ পাইত যে, তাহারা নিজের কোনো আন্তরিক ভাবের বশবর্ত্তী না হইয়া শুদ্ধ কেবল নেপোলিয়নের দেখাদেখি কার্য্য করিতেছে; এইরূপ কার্য্যই অনুকৃতি শব্দের বাচ্য। এরূপ অনুকৃতি-পরায়ণ সৈন্যদিগের কোনো কার্য্যের মধ্যেই বীরত্বের প্রতিকৃতি সহস্র খুঁজিলেও পাওয়া যাইতে পারে না। ফল কথা এই যে, আন্তরিক ভাবের পুঁজি হইতে যে কার্য্য উদ্গীরিত হয়, তাহা দৃষ্ট আদর্শের অবিকল অনুরূপ হইলেও তাহা অনুকৃতি-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না—তাহা প্রতিকৃতি শব্দেরই বাচ্য। অন্তরে ভাবের খাঁকতি এবং বাহিরে চটক এই পিতা মাতা হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম অনুকৃতি। মোটামুটি সংক্ষেপে বলিতে হইলে—ভাব-মূলক কার্য্য যদি আদর্শের অনুরূপ হয়, তবে তাহা প্রতিকৃতি শব্দের বাচ্য, আর, ভাব-শূন্য কার্য্য যদি যথা-দৃষ্টং তথা লিখিতং ভাবে কৃত হয় তবে তাহাই অনুকৃতি-শব্দের বাচ্য। অনুকৃতির ললাটে এই বাক্যটি ছাপ দেওয়া আছে যে, Letter killeth মৌখিক শব্দ বিনাশের পথ এবং প্রতিকৃতির ললাটে এইরূপ ছাপ দেওয়া আছে যে, Spirit giveth life আন্তরিক ভাব অমৃতের সোপান। মূলেই যাঁহার সুরবোধ নাই তিনি যত বড়ই ওস্তাদের নিকটে গান শিখুন্ না কেন—শিখিবার মধ্যে তিনি কেবল ওস্তাদের মুদ্রা-দোষটিই শেখেন—যেহেতু তাহা তাঁহার চক্ষের প্রত্যক্ষ বিষয়; সুর-বোধ যদি চক্ষে দেখিবার বস্তু হইত তবে ওস্তাদের দেখাদেখি যেমন করিয়া তাঁহার মুদ্রা-দোষ জন্মিয়াছে তেমনি করিয়া তাঁহার সুরবোধ জন্মিতে পারিত। একজন উদ্যানের মালী দিবা-রাত্রি ফুল লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছে অথচ ফুলের সৌন্দর্য্য যে, কাহাকে বলে, তাহার বিন্দু বিসর্গও সে হয় তো জানে না; একজন কবি কোনো একটি ফুলের হয় তো নাম ধাম কিছুই জানেন না—অথচ ফুলটি দেখিবা মাত্র তিনি হয় তো তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যা'ন; মালীটি যদি কবির সেই বিমোহিত অবস্থার ভাবভঙ্গী অনুকরণ করিলেই কবির সৌন্দর্য্য-রস-বোধটি স্বীয় মনোমধ্যে আঁকড়িয়া পাইত—তবে পৃথিবীতে আর কবি ধরিত না! অতএব বীরত্বই হউক্, রসবোধই হউক্, প্রীতিই হউক্ ভক্তিই হউক্, নয়নের অপ্রত্যক্ষ অন্তঃকরণের যে কোনো ভাবই হউক্, তাহারই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যাহার অন্তরে যাহা নাই তাহা তাঁহাকে অনুকরণের ঝিনুকে করিয়া কোনো মতেই গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তবে কি? না সহবাস দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষার গুণে যাহার অন্তরে যাহা প্রসুপ্ত আছে তাহাই উদ্বোধিত হয়, যাহা মুকুলিত আছে তাহাই বিকসিত হয়, যাহা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই অঙ্কুরিত হয়। ভস্মে আহুতি দিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে না—অগ্নিতে আহুতি দিলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

এ সম্বন্ধে মহাত্মা যেশু অতীব একটি সারবান্ বাক্য উদ্গীরণ করিয়াছেন, সেটি এই;—"Unto every one that hath shall be given and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away even that which he hath." "যাহার আছে সে আরো পাইবে—একগুণের জায়গায় শতগুণ পাইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে তাহাও তাহার নিকট হইতে অপহৃত হইবে"; এ কথাটির মূল্য লক্ষ টাকা। তাহার সাক্ষী—যৎকিঞ্চিৎ যাহার সুরবোধ আছে সে ওস্তাদের সাক্‌রেতে করিলে আরো অধিক পরিমাণে সুরবোধ উপার্জ্জন করিবে; কিন্তু যাহার মূলেই সুরবোধ নাই সে ওস্তাদের সাক্‌রেতি করিলে উপার্জ্জন করিবার মধ্যে কেবল মুদ্রা-দোষ উপার্জ্জন করিবে—গুণ উপার্জ্জন না করিয়া দোষ উপার্জ্জন করিবে। যাহার ঘটে নাই পুঁজি—সে যদি ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যায়, তবে সে ধন উপার্জ্জন না করিয়া ঋণ উপার্জ্জন করিবে; পূর্ব্বে তাহার টাকা না থাকার দুঃখ যেমন ছিল—আর এক দিকে—ঋণ না থাকার সুখ তেমনি ছিল, সে-সুখটিও তাহার ঘুচিয়া যাইবে। অতএব, বাহির হইতে ভাবের পুঁজি সংগ্রহ করিতে হইলে, অন্তরে ভাবের পুঁজি পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত থাকা আবশ্যক; বিদেশীয় ভদ্র রীতি নীতি উপার্জ্জন করিতে হইলে স্বদেশীয় ভদ্র রীতি নীতিই তাহার একমাত্র গোড়াবন্ধন; কেন না, জল যেমন জল আকর্ষণ করে, টাকা যেমন টাকা আকর্ষণ করে, ভাবের পুঁজি তেমনি ভাবের পুঁজিকে আকর্ষণ করে; তা ভিন্ন, ভাবের খাঁকতি ভাবের পুঁজিকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

কি ইউরোপ কি ভারতবর্ষ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতার স্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয়

ভদ্র রীতি নীতি আচার ব্যবহার শৈশব কাল হইতে ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তির প্রাণের অভ্যন্তরে দিন দিন ক্রমশই গাঢ় হইতে গাঢ়তর-রূপে বদ্ধমূল হইয়া আসিতে থাকে। এইরূপ করিয়া সকল দেশেরই ভদ্রসমাজে সদ্‌ভাব এবং সদাচারের একটানা স্রোত ক্রমাগতই প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাকে। বাঙ্গালী-সন্তান যেমন বাঙ্গালা ব্যাকরণ না পড়িয়াও অনর্গল বাঙ্গালা কহিতে শেখেন, তেমনি বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও স্বদেশীয় ভদ্র রীতি নীতি আচার ব্যবহার চতুর্দ্দিক্‌ হইতে আত্মসাৎ করিতে থাকেন। স্বদেশীয় ভাষার ব্যাকরণ এবং সমাজের ব্যবস্থা-প্রণালী যদি প্রতি ব্যক্তিকেই নিজের প্রযত্নে গড়িয়া লইতে হইত, তবে মাতৃভাষাও কোনো দেশে ভূমিষ্ঠ হইতে পারিত না, আর, ভদ্রসমাজও কোন দেশে মস্তক তুলিতে পারিত না। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, বঙ্গ সন্তানের শৈশব কাল হইতে অন্যূন আঠারো বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিক্ষা উপার্জনের কাল; সেই মুখ্য সময়টির মধ্যে স্বদেশীয় ভদ্র রীতি নীতি আচার ব্যবহার যাঁহাদের মনের অভ্যন্তরে রীতিমত আড্ডা গাড়িতে না পায়,—সেই মুখ্য সময়টিতে যাঁহারা স্বদেশে থাকিয়াও স্বদেশীয় ভালো কোনো কিছুরই মর্ম্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষার বয়সটি চলিয়া গেলে, তাঁহারা যে, কিরূপে বিদেশীয় ভদ্র রীতি নীতি আচার ব্যবহার উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিবেন—তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। অতএব ক্রাইষ্টের এ কথাটি অতীব সত্য যে, যাহার আছে সে আরো পায়, কিন্তু যাহার নাই তাহার যাহা আছে তাহাও যায়; তাহার সাক্ষী—স্বদেশের ভাষা-জ্ঞান এবং ভদ্র রীতি নীতির সংস্কার গোড়া হইতেই যাঁহাদের অন্তঃকরণের মধ্যে পুঞ্জীভূত আছে তাঁহারা বিদেশে গেলে সেখানকার সার সার বস্তুগুলি আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করেন—বিজ্ঞান শিল্প কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা কার্য্য-নৈপুণ্য তেজস্বিতা মহত্ত্ব পরানুকরণে বিরাগ এইগুলি আত্মসাৎ করেন; পূর্ব্ব হইতেই যাঁহাদের আছে তাঁহারা আরো পা'ন; কিন্তু যাঁহাদের গোড়া থাঁক্‌তি—স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার ব্যবহারের মর্ম্মরসের আস্বাদ যাঁহারা জানেনও না জানিতে চাহেনও না, তাঁহারা শিক্ষার্থে বিদেশে গেলে হিতে বিপরীত করিয়া বসেন; যাঁহাদের নাই তাঁহাদের যাহা আছে তাহাও যায়। তাঁহাদের আপনাদের দেশের ভদ্রাভদ্রের তুলাদণ্ড যদি তাঁহাদের মনের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিত, তবে তাহা দিয়া তাঁহারা অন্য দেশের ভদ্রাভদ্র তৌল করিয়া দেখিয়া—তাঁহাদের পক্ষে যাহা ভাল তাহাই কেবল তাঁহারা গ্রহণ করিতেন; কিন্তু সে তুলাদণ্ড যখন তাঁহাদের মনোমধ্যে নাই, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত বিদেশীয় রীতি নীতির ভালমন্দ যে, তাঁহারা কিরূপে বোধায়ত্ত করিবেন, তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। ফলেও তাই দেখা যায়, অপক্ব-বুদ্ধি লঘুচিত্ত বঙ্গীয় যুবক ইংলণ্ডে গেলে, সেখানকার সু কু এবং যৎসামান্য এই তিন প্রকার বিরোধী সামগ্রীকে তিনি একাসনে বসাইয়া সু'য়ের অপমান করেন, কু'য়ের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া তোলেন, এবং অজ্ঞানের প্রবর্দ্ধক কাচের মধ্য দিয়া তিল-প্রমাণ ক্ষুদ্র বিষয়কে তাল-প্রমাণ বড় দেখেন। * জ্ঞান-শিক্ষার জন্য তাঁহারা এখান হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন—ঢঙ শিক্ষা করিয়া তাঁহারা সেখান হইতে এখানে ফিরিয়া আসেন! এইরূপ করিয়াই আমাদের দেশে সাহেবিআনার সূত্রপাত হইয়াছে এবং এখনো তাহার জের চলিতেছে। অতঃপর সাহেবিআনা রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া অচিরাৎ তাহার একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আনুপূর্ব্বিক নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগের যন্ত্রণা হইতে আপনাদিগকে শীঘ্রই অব্যাহতি প্রদান করিতেছি—আপনারা সুস্থির হউন্‌।

ইতিপূর্ব্বে বারবার বলিয়াছি যে আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা উভয় রোগেরই পক্ষে সাম্য-পন্থী চিকিৎ-

* বাঙ্গালি সাহেবেরা যে, বাস্তবিকই ইংরাজী তিলকে তাল দেখেন এবং বাঙ্গালি তালকে তিল দেখেন, তাহার প্রমাণ সেদিনকার সভাস্থলে হাতে হাতে পাওয়া গেল। একজন বক্তা উঠিয়া বলিলেন "মেষের চামড়া মেষকে সাজে—বৃকের চামড়া বৃককে সাজে, বাঙ্গালিরা আগে বৃক হো'ন্‌ তবেই বৃকের চামড়া তাঁহাদের গাত্রে মানাইবে; আগে তাঁহারা সাহেবদের মতো তেজস্বী পুরুষ হো'ন তবেই তাঁহাদের গাত্রে সাহেবি ঢঙের কোর্ত্তা মানাইবে"—যেন হ্যাট-কোট তেজস্বিতার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ! পুরাণের ভীমসেন তো আর মেষ ছিলেন না—বৃকোদর তিনি বৃকই ছিলেন; তিনি কি ইংরাজি ঢঙের কোট পরিতেন? হানিবাল্‌ কি রোমান ঢঙের পরিচ্ছদ পরিতেন? পরানুকরণ তো আর তেজীয়ান্‌ বীর পুরুষের লক্ষণ নহে—তাহা লেজিয়ান্‌ বীর পুরুষেরই লক্ষণ। তাহার সাক্ষী—ইংরাজিতে Aping (হনুকরণ) বলিয়া যে একটি শব্দ আছে তাহা আপনিই আপনার বীর-বংশের পরিচয় দিতেছে! ইংরাজি তিল'কে যাঁহারা তাল দেখেন আর বাঙ্গালি তালকে যাঁহারা তিল দেখেন তাঁহারাই ইংরাজি ঢঙের কোর্ত্তাকে সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন, আর, দোধূয়মান সহজশোভন ধুতিচাদরের যে, একটি অকৃত্রিম শোভা, তাহার প্রতি তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ।"

সাই সবিশেষ ফলপ্রদ। "সমে সাম্যং প্রয়োজয়েৎ"—সাহেবিয়ানার ভিতরেই সাহেবিআনার ঔষধ জাগিতেছে, এখন তাহাকে বাহির করিয়া লইতে জানিলে হয়! সাহেবদিগের আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গী প্রভৃতি বাহ্য আবরণের ভিতরে বিজ্ঞান তেজস্বিতা আত্মনির্ভর কর্ত্তব্য নিষ্ঠা কার্য্য-নৈপুণ্য কর্ম্মিষ্ঠতা এই সার পদার্থগুলি জাগিতেছে; সেগুলিকে এক কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে, তাহার নাম ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা; এইটিই হ'চ্চে সাহেবী উপকরণ-গুলির মাতৃক সত্ব কিনা mother tincture; এই মাতৃক সত্বটি জলে গুলিয়া গুলিয়া তাহার তেজ কমানো চাই—নহিলে তাহা বাঙ্গালিদিগের সেবনোপযোগী হওয়া দুষ্কর। এই ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার যেরূপ মহত্ত্ব এবং তেজস্বিতা তাহাতে পরানুকরণের নীচত্ব তাহার ত্রিসীমায় অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না; তাহার সাক্ষী—ইংরাজেরা জর্ম্মানদিগের নিকট হইতে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান আদায় করিতে কিছু মাত্র সংকোচ করিবে না কিন্তু জর্ম্মানদিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গী, রকম সকম, আপনাদের মধ্যে চালাইতে কিছুতেই সম্মত হইবে না; জর্ম্মনেরা ইংরাজদিগের নিকট-হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের রীতি পদ্ধতি আদায় করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইবে না, কিন্তু ইংরাজদিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গী কখনই আপনাদের মধ্যে প্রচলিত করিতে চাহিবে না। ইউরোপের সর্ব্বত্রই এইরূপ। †

† নিতান্ত কাছাকাছি দেশস্থ ব্যক্তিদিগের মনের ভাব যেহেতু অনেক অংশে সমান, এই জন্য তাহাদের মধ্যে বেশ-ভূষাদির অনুকরণ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত পক্ষে অনুকরণ নহে; কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমান মনের ভাব হইতে সমান কার্য্য অভিব্যক্ত হইলে তাহা অনুকৃতি শব্দের বাচ্য নহে—তাহা প্রতিকৃতি শব্দেরই বাচ্য। ইহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি; তাহা হইলেই এখানকার এই কথাটির মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে আর কোনো গোল থাকিবে না। "নাচের উপযোগিতা" এই ভাব হইতে ইংরাজ এবং ফরাসাস্ উভয় জাতিরই মজ্‌লীবী গাউনের ঢঙ (কোর্ত্তাদিরও ঢঙ্) উদ্ভূত হইয়াছে; উভয় জাতির মনের ভাব এইরূপ সমান হওয়াতে ইংরেজেরা পারিস্ ঢঙ্ অনুকরণ করিলে তাহাদের স্বপক্ষে এইরূপ একটি কথা বলিবার থাকে যে, সেরূপ ঢঙ্ তাহাদের নিজের মনের ভাবেরই প্রতিকৃতি। পক্ষান্তরে "নাচের উপযোগিতা" এ ভাবটি বাঙ্গালিদের মনে কোনো পুরুষেই নাই—এ অবস্থায় বাঙ্গালিরা যদি উঁহাদের দেখাদেখি ঐরূপ ঢঙের অনুকরণ করেন, তবে তাঁহাদের স্বপক্ষে কাহারো এরূপ কথা বলিবার জো থাকে না যে, সে ঢঙ্ তাঁহাদের মনের ভাবের প্রতিকৃতি; যেহেতু তাহা অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তেমনি বাঙ্গালিদের সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন—"জল-খাবার" এই ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (কেননা মিষ্ট দ্রব্য জল-পিপাসার উদ্দীপক); পক্ষান্তরে—ইংরাজদের শুক্‌না বিস্কুট আদি ভক্ষ্য সামগ্রী "মদ-খাবার" এই ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (কেন না সেইরূপ সামগ্রীই মদ্যের চাটের উপযোগী); এ অবস্থায়—বাঙ্গালিরা যদি সন্দেশ-আদির পরিবর্ত্তে বিস্কুট-আদির ব্যবহার আপনাদের মধ্যে চাল'ন্—তাহা হইলে তাহা অনুকৃতি-ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তবে, এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে দ্বিতীয় উদাহরণটি অনেক স্থলে না খাটিবারই কথা।

বাঙ্গালিরা যদি ইউরোপীয়দিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া শুদ্ধ কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতাটি তাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আপনাদের দেশের ছাঁচে ঢালিয়া আপনাদের মতো করিয়া গড়িয়া ল'ন, তবে তাঁহারা সাহেবিআনা রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একটা জাতির মতো জাতি হ'ন। তাই আমরা বলি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতাই সাহেবিআনা রোগের মহৌষধি।

উপসংহারকালে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই বচনটি আমার মনের সম্মুখে আসিয়া দুই হাত দুইদিকে প্রসারণ পূর্ব্বক পথ-রোধ করিয়া দণ্ডায়মান—ইহাকে আমি লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। আর্য্যামি এবং সাহেবিআনার বিপক্ষে আমি অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু দোঁহার স্বপক্ষে একটি কথা যাহা আমার বলিবার আছে তাহাতেই উভয়ের সাত খুন মাপ! সেই কথাটি বলিয়াই আমি প্রস্তাব সাঙ্গ করিতেছি। আর্য্যামিকে আমি এই জন্য ভাল বলি যেহেতু তাহার গর্ভে আর্য্যোচিত কার্য্য ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জাগিতেছে; আর, সাহেবিআনাকে আমি এইজন্য ভাল বলি যেহেতু তাহার গৃহাভ্যন্তরে ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা গোকুলে বাড়িতেছে। আর্য্যামির গর্ভ হইতে যখন আর্য্যোচিত কার্য্য ভূমিষ্ঠ হইয়া কালক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিবে তখন সে ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার পাণিগ্রহণ করিবে; তাহার পরে আর্য্যোচিত কার্য্যের ঔরষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার গর্ভে তিলোত্তমার ন্যায় একটি পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে; তাহার নাম পঞ্চবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা; এ সভ্যতার গাত্রে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং ইউরোপীয় আর্য্যদিগের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ দুইই একাধারে সম্মিলিত হইবে—এইটি যে দিন হইবে, সেই দিন ভারতের সমস্ত দুঃখদুর্দ্দিনের অবসান হইবে। এই খানেই শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

শিবনারায়ণ সেখানকার সকল অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে পুনরায় জ্বালামুখী তীর্থের মন্দিরেতে যাইলেন। সেখানে দেখিলেন যে মন্দিরের মধ্যে একটা কুণ্ড খুঁড়িয়া রাখিয়াছে, তাহার ভিতরে ছয় সাতটা অগ্নির জ্যোতি জ্বলিতেছে। দেওয়ালের চারিদিকে যেরূপ গ্যাস জ্বলে সেইরূপ সেই মন্দিরে জ্যোতি জ্বলিতেছে। কোনটার শিখা অতিশয় প্রজ্বলিত কোনটার বা তদপেক্ষা কম। এবং মধ্যে কুণ্ডের ভিতর যে অগ্নিজ্যোতি জ্বলিতেছে সেই জ্যোতিতে কাষ্ঠ দিয়া চারিদিক হইতে আহুতি প্রদান করিতেছে। জ্যোতি মন্দিরের ভিতরেও আছে এবং মন্দিরের বাহিরে ও দেওয়ালের নিকটে কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে জ্বলিতেছে। যাত্রিরা কোন প্রকার মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া ভিতরে দেওয়ালেতে যে জ্যোতি জ্বলিতেছে সেই জ্যোতিতে টিপিয়া দেয়। কাহারও না পড়িয়া যায় এবং অল্প যাহা লাগিয়া থাকে তাহা অগ্নিতে পুড়িয়া যায়। যেরূপ অন্যত্র অগ্নিতে কোন দ্রব্য দিলে ভস্ম হইয়া যায় সেখানেও সেইরূপ ভস্ম হইয়া যায় কিন্তু অবোধ লোকেরা কল্পনা করেন যে, হস্তে অথবা কোন পাত্রে কোন দ্রব্য ধরিলে অগ্নির শিখা সেই পাত্রের উপর পতিত হইয়া আহুতি ভক্ষণ করেন; কিন্তু ইহা মিথ্যা। তিনি জিহ্বা বাহির করিয়া অন্য পাত্র হইতে লইয়া খান না। কিন্তু অগ্নিতে কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে তাহা ভস্ম হইয়া যায়। যদিই বা অগ্নিব্রহ্ম জিহ্বা বাহির করিয়া কোন পাত্র হইতে লইয়া খান তাহাও কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কেন না অগ্নিব্রহ্মের সামর্থ্য আছে! ইনি তো সকলি করিতে পারেন, প্রত্যক্ষ দেখ, আকাশে দিবারাত্র প্রকাশমান আছেন। সূর্য্যনারায়ণ যৎকিঞ্চিৎ তেজ প্রকাশ করিলে দেশে দেশে হাহাকার হয়, পৃথিবী জ্বলিতে থাকে। এবং যখন সমুদ্র হইতে তেজের দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীর উপর বর্ষণ করেন তখন পৃথিবী ও জীব জন্তু প্রভৃতি শীতল হন।

শিবনারায়ণ একজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কুণ্ড কে খনন করিয়াছেন এবং এই মন্দির কে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই মন্দির যে সোণার গিল্টির পাত দিয়া ঢাকা আছে তাহাই বা কে করিয়াছেন। এই জ্যোতি কি পূর্ব্বকালাবধি জ্বলিতেছে না. তোমরা কোন কৌশল করিয়া যেরূপ গ্যাস জ্বলে সেইরূপ জ্বালিয়া রাখিয়াছ—আমাকে সত্য বল।" ঐ পাণ্ডা বড় ধীর ও শান্ত স্বভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি হাত জুড়িয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, "মহাশয় ইহার অনেক বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। আগে আওরংজীব প্রভৃতি যে বড় বড় মুসলমান বাদসাহ হইয়াছিলেন ও মহম্মদ ফকির ইত্যাদি ছিলেন সকলেই এই পৃথিবীর উপর তীর্থে তীর্থে হিন্দুদিগের দেব দেবী প্রতিমূর্ত্তি যাহা ছিল সে সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্র বেদ প্রভৃতি লইয়া অগ্নিতে পুড়াইয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে মুসলমান করিয়া লইতেন। সেই মুসলমান বাদসাহরা কাশীতে যাইয়া বিশ্বনাথের মন্দিরেতে যে বিশ্বনাথ-মূর্ত্তি স্থাপিত ছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া চারি খণ্ড করিয়া এক খণ্ড সেইখানকার কূপে ফেলিয়া দিলেন অপর তিন খণ্ড দিল্লিতে লইয়া গিয়া একটা মসজিদের সিড়িতে লাগাইয়া দেন; তাহার উপর সকলে জুতা রাখিত। এবং অপর একটা আপনার সিংহাসনের দরবারের সিড়িতে জুতা রাখিবার জন্য ব্যবহার কারন। আর একটা মক্কা কি মদিনার মসজিদের সিড়িতে লাগাইয়া দেন, তাহার উপরে ও সকলে জুতা রাখিত। উহারা বলিত যে হিন্দুদিগের প্রত্যক্ষ দেবতা নাই। এ সকল মিথ্যা। ইহারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। ইহাদের দেবতাদের কোন শক্তি নাই ও ইহাদের দেবতাও নাই। তাহাদের মধ্যে একজন মুসলমান বলিল—যে ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটা প্রজ্বলিত অগ্নি দেবতা জ্বালামুখিতে আছেন। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া বলিল যে চল সেখানে গিয়া দেখি এটা সত্য কি মিথ্যা। জ্বালামুখিতে তাহারা আসিয়া দেখিল যে অগ্নিজ্যোতি যথার্থ পৃথিবী হইতে উৰ্দ্ধমুখে জ্বলিতেছে। দেখিয়া উহারা বলিল—যে পাণ্ডারা তো কোন কৌশলের দ্বারা জ্বালাইয়া রাখে নাই। আমরা মাটি খোঁড়াইয়া দেখি যে ইহা কিরূপে জ্বলিতেছে। ভিতরে কোন কৌশল আছে কি না। এই বলিয়া মাটি খুঁড়িয়া দেখিল তত্রাচ তাহার ভিতর হইতে জ্বলিতে লাগিল—তাহারা এইরূপ জ্যোতি দেখিয়া লোহার তাওয়া লইয়া সেই জ্যোতির উপর ঢাকা দিয়া বন্ধ করিয়া দিল—কিন্তু সেই লোহার তাওয়া ভেদ করিয়া অগ্নির শিখা উৰ্দ্ধমুখে উঠিতে লাগিল। এইরূপে সাতবার উপরি উপরি লোহার তাওয়া দেওয়াতেও ভেদ করিয়া অগ্নির জ্যোতি উৰ্দ্ধমুখে উঠিতে লাগিল। তখন মুসলমান বাদশাহ বলিলেন যে হিন্দু দেবতার মধ্যে এক অগ্নি দেবতাই কেবল সকল দেশে প্রজ্বলিত দেখা যাইতেছে, ইহাকে মান্য করা উচিত। এই বলিয়া বাদসাহ আজ্ঞা দিলেন

যে এই ছোট মন্দির ভগ্ন করিয়া সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও। মন্দির প্রস্তুত হইল এবং স্বর্ণের দ্বারা সেই মন্দির মোড়াই করিয়া দিল। কেবল যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের হাত যায় সেই পর্য্যন্ত প্রস্তর ফাঁক রাখিয়াছে।” পাঠকগণ কোন আশ্চর্য্য বোধ করিয়া যেন জ্বালামুখি তীর্থে যাইয়া অগ্নিজ্যোতিকে দর্শন না করেন, কেন না সেই অগ্নিজ্যোতি তো সকল স্থানে দর্শন হইয়া থাকে। তোমরাও তো নিজ নিজ ঘরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া থাক, সেই অগ্নি তো তোমাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে আছেন। যিনি প্রত্যক্ষ পরম জ্যোতি সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা দিবারাত্র জ্বলিতেছেন ও যাঁহার তেজ তৈল ঘৃত সংযোগ ব্যতীত স্বয়ং প্রজ্বলিত আছেন এই সূর্য্যনারায়ণ এবং চন্দ্রমা জ্যোতিকে দর্শন করিলে তিনি তোমাদের সকল দুঃখ পাপ মোচন করিয়া আনন্দস্বরূপ রাখিবেন। শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, যে সকল তীর্থের তো একই রূপ ভাব, তবে আর বদ্রিনারায়ণ যাইবার প্রয়োজন কি, সেখানেও তো এইরূপ প্রস্তর ও বরফে আবৃত পাহাড় আছে। এই ভাবিয়া অনর্থক বদ্রিনারায়ণ না গিয়া জ্বালামুখি হইতে বরাবর দিল্লী চলিয়া আসিলেন। দিল্লী হইতে মাড়ওয়ারে পুষ্কররাজ মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি পুষ্করণী আছে। সেই পুষ্করণীতে সকলে স্নানাদি পুণ্যকার্য্য করে। পুষ্করিণীর পাশ্চমদিকে দুইটা পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের উপর দুইটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরের মধ্যে একটাতে সাবিত্রী মাতা ও একটাতে গায়ত্রী মাতা স্থাপিত আছেন। ইহাঁদের এইরূপ প্রভাব যে ইহারা সকল দুঃখ পাপ হইতে মোচন করেন। সাবিত্রী এবং গায়ত্রী মাতা শাস্ত্রাদিতে যে বর্ণিত আছেন তাহার সার অর্থ এইরূপ; সাকার ব্রহ্ম অর্থে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। তাঁহারই সাবিত্রী এক্ষ নাম কল্পনা করা হইয়াছে এবং চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্মের গায়িত্রী নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর জীবকে সকল দুঃখ পাপ হইতে মুক্ত করেন। ইহাঁকে না চিনিয়া রাজা প্রজা সকলে কল্পিত স্থানে যাইয়া ভ্রমেতে পতিত হন। অনন্তর সেথান হইতে শিবনারায়ণ আজমেড় আসিলেন। আজমেড় সহরের মধ্যে এক মুসলমান খাজা সাহেবের কবর-স্থান ও তাহার এক পার্শ্বে মস্‌জিদ আছে। যেখানে খাজা সাহেবের কবর আছে, সেই ঘরের মধ্যে চতুর্দ্দিক ঝাড় লণ্ঠন ইত্যাদির দ্বারা উত্তম রূপে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই কবর দর্শন করিবার জন্য হিন্দু এবং মুসলমান সকলেই যাইতেন। খাজা সাহেবের স্থানের ফকিররা সেই দেশের চারিদিকের রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকে, এবং পুষ্করতীর্থ দর্শনে যে সকল হিন্দু যাত্রিরা যান তাহাদিগকে সেই মুসলমান ফকিররা ডাকিয়া আনে আর বলে, “আমাদের এই তীর্থ দর্শন করিলে তোমরা সকল ফল প্রাপ্ত হইবে”।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত—কলিকাতা ব্রাহ্মমিসন প্রেস ১২৯৬। এই পুস্তক বাঙ্গলা ভাষার জীবন চরিত বিভাগে একটি আদর্শ পুস্তক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। অতএব ইহার বিষয় অধিক বলা অনাবশ্যক। নগেন্দ্র বাবু এই দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক নূতন বিষয় ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কতকগুলি নূতন গল্প দিয়াছেন। বিশেষত রামমোহন রায়ের যে সকল বন্ধু ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন ও যাঁহাদিগের নামের আদ্যক্ষর নিজ নিজ রচিত গানের শেষে সংযুক্ত আছে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পুস্তকের শেষে যাহা দিয়াছেন তাহা নিতান্ত নূতন ও ইহাদ্বারা পুস্তকের মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা শক্তি উৎকৃষ্ট এবং গল্প (আমরা মিথ্যা গল্প বলিতেছি না, সত্য গল্প) জমাইবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। এই পুস্তক রচনাতে বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় সংস্করণে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নানা পুস্তক ও নানা লোকের নিকট হইতে সম্বাদ সংগ্রহ কার্য্যে যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা তাহার পক্ষে অতীব গৌরব জনক। ভরসা করি পাঠকবর্গ প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা এই দ্বিতীয় সংস্করণ অধিক ক্রয় করিয়া তাহার পরিশ্রম সার্থক করিবেন।

অয়ুর্ব্বেদীয়ম্ ভৈষজ্যবিজ্ঞানম্।

শ্রীমতা ঈশানচন্দ্র বিশারদেন সঙ্কলিতম্। গ্রন্থকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের উপকরণ দ্রব্য সমূহের পরিভাষা অর্থাৎ পরিমাণাদি মূল আয়ুর্ব্বেদীয় বহুবিধ প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক শ্লোকের নিজরচিত টীকা ও বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকটন করিয়াছেন। তিনি স্থানে স্থানে নিজের রচিত সিদ্ধান্ত ও নিয়মাদি প্রকাশ করিয়া অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। গ্রন্থ খানি অয়ুর্ব্বেদীয় মতানুযায়ী চিকিৎসক মাত্রেরই মহোপকারক হইয়াছে। ইহার প্রণয়ন বিষয়ে বিশারদ মহাশয় স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য গভীর গবেষণা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রাভিনেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভরসা করি তিনি অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশ করিয়া বৈদ্যক সমাজের একটী বিশেষ অভাব নিবারণ করিবেন।

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান প্রস্তাবে প্রমাণতত্ত্ব।

প্রমাণ-শব্দ করণ বাচ্য অনট্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন। অর্থ এই যে, যাহা প্রমার করণ * তাহা প্রমাণ। যাহার যাহার সাক্ষাৎ ব্যাপারে প্রমা জন্মে—তাহা তাহাই প্রমাণ। প্রমা একপ্রকার বোধ বা জ্ঞান, তাহার লক্ষণ এই—

যে জ্ঞানের বিষয় অনধিগত ও অবাধিত † অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বানুভূত নহে ও মিথ্যা নহে, তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান প্রমা। প্রমা যথার্থজ্ঞানের নামান্তর, অন্য কিছু নহে। এই লক্ষণে স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ-জ্ঞান ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত হইতেছে। কারণ, স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় (অবগাহ্য) অবাধিত হইলেও অনধিগত নহে। যাহা পূর্ব্বে অনুভূত হয়—পরে তাহাই স্মৃতিপথারূঢ় হয়। স্মৃতি-জ্ঞানকে প্রমা মধ্যে গণনা করিতে হইলে অনধিগত বিশেষণটী (কথাটী) ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ অবাধিত বিষয়ক জ্ঞানই প্রমা, এই পর্য্যন্ত বলিলেই স্মৃতি প্রমা মধ্যে পরিগণিত হইবে।

ক্রিয়া বা বস্তুর আণবিক কম্পন ক্ষণস্থায়ী—এক ক্ষণের অধিক থাকে না। জ্ঞানও ক্রিয়া,—মনের ক্রিয়া। সে জন্য তাহাও এক ক্ষণের অধিক থাকে না; আমরা যে কখন কখন দুই একটী জ্ঞানকে দীর্ঘকালস্থায়ী অর্থাৎ পল, দণ্ড ও মুহূর্ত্তাদিকালস্থায়ী হইতে দেখি, তাহা একটী জ্ঞান নহে। তাহা পর পর অব্যবধানে সমুৎপন্ন অনেক শত জ্ঞানের প্রবাহ। চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট ঘটে পর পর সংলগ্ন ভাবে অর্থাৎ অবিচ্ছেদে সমুৎপন্ন ঘট-ঘট-ঘট—ইত্যাকার জ্ঞানধারা বহিলে তাহা

* ব্যাপার বিশিষ্ট সাক্ষাৎ কারণের নাম ‘করণ’। যাহার সাক্ষাৎ ব্যাপারে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহা। দাত্রের সাক্ষাৎ ব্যাপারে ছেদন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, সেই জন্য দাত্র ‘করণ’। এইরূপ, যাহার সাক্ষাৎ ব্যাপারে প্রমা জন্মে তাহা প্রমাণ বা প্রমার করণ। প্রমাণ ও প্রমার করণ তুল্য কথা।

† বাধ শব্দের অর্থ বিনাশ। মুষলপ্রহারে ঘটাদির বিনাশ হয়, এখানে সে বিনাশ অভিপ্রেত নহে। বিরোধি জ্ঞান জন্মিলে যে পূর্ব্বজ্ঞানের অন্যথা হয়, সেই অন্যথাভাব ঐ বাধ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া স্থির হওয়াই বাধ। শুক্তি-রূপ্য, রজ্জু-সর্প, ইত্যাদিবিধ ভ্রম স্থলে বাধ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভ্রম জ্ঞানের জ্ঞেয় মাত্রেই বাধিত। মিথ্যা অথবা নাই। তাহার অস্তিত্ব কোনও কালে ছিল না ও নাই।

ধারাবাহী জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। এই ধারাবাহী জ্ঞানের প্রথমাংশ (প্রথমক্ষণোৎপন্ন জ্ঞান) ব্যতীত অপরাংশ সমস্তই অধিগত বিষয়ক হওয়ায় প্রথমোক্ত প্রমালক্ষণ অর্থাৎ অনধিগত-শব্দ-ঘটিত প্রমালক্ষণটী অব্যাপ্তি দোষাক্রান্ত ‡ হইতে পারে। সত্য বটে; কিন্তু রূপবিহীন কালের ইন্দ্রিয়-গোচরতা স্বীকার করিলে প্রোক্ত অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা থাকে না। কেন? তাহা প্রণিধান কর—ঘট-জ্ঞানের সঙ্গে কালেরও জ্ঞান হয়। কালের জ্ঞান "এখন ঘট আছে" ইত্যাদি আকারে উল্লিখিত হইয়া থাকে। এক ধারাবাহী-জ্ঞানের স্থিতি-কাল মধ্যে যতগুলি ক্ষণ (সূক্ষ্মাংশ) থাকুক না কেন, সমুদায় গুলিই জ্ঞানের গোচর হয় সত্য; পরন্তু সে সকল জ্ঞান ও সে সকল ক্ষণ বিভিন্ন। একই ক্ষণ ক্ষণান্তরীয় জ্ঞানের অবগাহ্য নহে। যে ক্ষণ অতীত হয় সে ক্ষণ ফিরিয়া আইসে না। ক্ষণ সকল উৎপন্নস্বভাব; উৎপন্ন হইয়া মরিয়া যায়, তজ্জন্য দ্বিতীয়াদি ক্ষণ নূতন। সেই কারণে প্রত্যেক ক্ষণই অনধিগত অর্থাৎ অননুভূত থাকে। ক্ষণগুলি অনধিগত থাকায় তদ্বিশিষ্ট ঘটও অনধিগত বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং অনধিগত শব্দ ঘটিত প্রমালক্ষণ ধারাবাহী জ্ঞানে অব্যাপ্ত হয় না; প্রত্যুত ব্যাপ্তই হয়। ঘট এক বটে; কিন্তু প্রথম-ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘট ও দ্বিতীয়-ক্ষণবিশিষ্ট ঘট বিভিন্ন। যেমন একই ঘট শ্বেতবিশেষণে এক ও পীত বিশেষণে অন্য; তেমনি বিশেষণের ভেদে বিশেষ্যের ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্বেতত্ব বিলোপের পর ঘটে পীতত্ব আশ্রয় করিলে তখন কি আর তাহা শ্বেত ঘট বলিয়া প্রতীত হয়? তাহা হয় না। অতএব, বর্ণিত প্রকারে প্রথমোক্ত প্রমা-লক্ষণ ধারাবাহী জ্ঞানেও সমন্বিত হয়; এবং অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কাও নিবারিত হয়। যদি এ সমাধান পরিতোষকর না হয় তবে সমাধানান্তর শুন।

বস্তুতঃ বেদান্ত সিদ্ধান্তে ঐ জ্ঞান নানা জ্ঞানের প্রবাহ নহে। উহা একই জ্ঞান। ঘট যাবৎ পর্য্যন্ত স্ফুরিত হইবে, জ্ঞানে ভাসমান থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহা একটী জ্ঞান। হেতু এই যে, অন্তঃকরণের তাবৎ কালস্থায়ী ঘটাকারা বৃত্তি একটী। (বৃত্তি=অবস্থা। অর্থাৎ অন্তঃকরণের সেই সেই আকারে পরিণাম) যাবৎ না বিরোধি বৃত্তি জন্মে তাবৎ তাহা এক বলিয়া গণ্য। (যাবৎ না পটজ্ঞান অথবা অন্য কোন জ্ঞান জন্মে তাবৎ ঘটজ্ঞান জীবিত থাকে)। যেহেতু বৃত্তি এক, সেই হেতু তৎপ্রতি-ফলিত চৈতন্যও এক। জ্ঞান কি? বৃত্তি-প্রতিফলিত চৈতন্যই জ্ঞান। সুতরাং বেদান্তসিদ্ধান্তে ধারাবাহী জ্ঞানেও কথিত প্রকারের প্রমালক্ষণ যাইতেছে বা থাকি-তেছে।

বলিতে পার, বেদান্তসিদ্ধান্তে বিশ্ব-সংসার মিথ্যা, ঘট পট সমস্তই মিথ্যা, মিথ্যাপদার্থেরই নামান্তর বাধিত, তবে কিরূপে বাধিত ঘট পটাদি বিষয়ক জ্ঞান

‡ লক্ষ্যে লক্ষণ না গেলে অব্যাপ্তি দোষ হয়। অর্থাৎ তাহাতে লক্ষ্য স্থির হয় না। ধারাবাহী জ্ঞানের প্রথমাংশ ব্যতীত অপরাংশে অনধিগত শব্দ ঘটিত লক্ষণ যায় না। না যাওয়ায় তাহা অব্যাপ্ত। কোন এক দার্শনিক পণ্ডিতের মত এই যে, দ্রব্য প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে 'এখন' 'তখন' 'ছিল' 'আছে' ইত্যাদি উল্লেখে কালের (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান রূপ কালের) জ্ঞান হয়। সে জ্ঞানও প্রত্যক্ষজ্ঞান। অর্থাৎ তাহাও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভূত। চক্ষু ঘট দেখে; সঙ্গে সঙ্গে তদবচ্ছিন্ন কালকেও দেখে। কালের জ্ঞান হয়, বর্ত্তমানতাদির জ্ঞান হয়, তাহা অনুমানজ অথবা অন্য কোন প্রমাণজন্য বলিবার উপায় নাই। কাজেই মানিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, কাল রূপবিহীন হইলেও রূপাদিমৎ দ্রব্যান্তরের ন্যায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ীকৃত বা গৃহীত হয়।

প্রমা বলিয়া গণ্য বা স্বীকার্য্য হইতে পারে? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, যাবৎ সংসার ভ্রান্তি জীবিত থাকে তাবৎ ঘটাদি বস্তু অবাধিত অর্থাৎ মিথ্যা নহে। অবাধিত শব্দের অভিপ্রেতার্থ এই যে, সংসার দশায় যে যে দৃশ্যের বাধ দৃষ্ট হয়—সেই সেই দৃশ্যই বাধিত। শ্রুতি এ কথা বলিয়াছেন। যথা—"আত্মা যখন দ্বৈতের ন্যায় হন অর্থাৎ যখন সংসারী হন, তখন ভিন্ন হইয়া ভিন্ন দর্শন করেন।" শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পরমার্থ পক্ষে অদ্বৈতই তত্ত্ব; দ্বৈত মিথ্যা, অর্থাৎ ভ্রান্তিকল্পিত। অতএব, ঐ অবাধিত শব্দের বিবক্ষিতার্থ সংসার দশায় অবাধিত অর্থাৎ অমিথ্যা। তদনুসারে লৌকিক ঘটপটাদি জ্ঞান অপ্রমা নহে, প্রত্যুত প্রমা। যাবৎ সংসার—তাবৎ ঘট পটাদি জ্ঞানে প্রমালক্ষণ অব্যাপ্ত নহে। এ কথা বেদান্তবাদী আচার্য্যেরা বলিয়াছেন। যথা—"যাবৎ না আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়—তাবৎ পর্য্যন্ত দেহাত্মজ্ঞান যদ্রূপ প্রমা, এই লৌকিক ঘট পটাদি জ্ঞানও তাবৎ পর্য্যন্ত তদ্রূপ প্রমা। অর্থাৎ প্রমাণপরিনিষ্ঠিত সত্য অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক।"

প্রমাণ ষড়্বিধ অর্থাৎ ছয় প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। এই ষড়্বিধ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ জ্যেষ্ঠ ও অন্যান্য প্রমাণের উপজীব্য; সেই কারণে প্রথমে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বিবেচিত হয়।

প্রত্যক্ষপ্রমাণ কি? তাহা কিংস্বরূপ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলা যায়, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমার করণ তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমা কি? প্রত্যক্ষ প্রমা চৈতন্য। যাহার অন্য নাম চৈতন্য—সেই নিত্যাপরোক্ষ মুখ্য জ্ঞান এই বেদান্তশাস্ত্রে প্রত্যক্ষপ্রমা নামে কথিত হয়। এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্য যথা—"যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ—তাহা ব্রহ্ম।" সাক্ষাৎ শব্দের অর্থ অব্যবধান অথবা অনধীন। অপরোক্ষ শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ—নিরতিশয় বৃহৎ। বেদান্ত মতে এক মাত্র চৈতন্য পদার্থই নিরতিশয় বৃহৎ। অর্থাৎ পূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী। মিলিতার্থ এই যে, চৈতন্যই স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ নিত্যাপরোক্ষ। ইহা স্বাধীনপ্রকাশ, সেই জন্য সাক্ষাৎ নামের নামী। ঘট পটাদির প্রকাশ চক্ষুরাদির অধীন, মনোবৃত্তির দ্বারা ব্যবহিত, অর্থাৎ অগ্রে ঘটাকার মনোবৃত্তি হয়, তৎপরে ঘট প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চৈতন্য সেরূপ নহে। চৈতন্য স্বয়ম্প্রকাশ। এই স্বয়ম্প্রকাশস্বভাব চৈতন্য পদার্থই বেদান্তশাস্ত্রের মুখ্য প্রত্যক্ষপ্রমা। যাহা যাহা তাহার করণ (উৎপাদক) তাহা তাহা এই শাস্ত্রে প্রত্যক্ষপ্রমাণ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ তাহার করণ, সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণই প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া গণ্য।

প্রশ্ন।—বেদান্তমতে চৈতন্য অনাদি, নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাই। তবে কি রূপে চক্ষুরাদি তাহার করণ (উৎপাদক) হয়? হইয়া প্রত্যক্ষপ্রমাণ নামে কথিত হয়?

প্রত্যুত্তর।—চৈতন্য অনাদি সত্য; কিন্তু অন্তঃকরণের বৃত্তিনিচয় তাহার অভিব্যঞ্জক। অন্তঃকরণবৃত্তি ব্যতীত অন্যত্র তাহার অভিব্যক্তি বা প্রতিফলন নাই বা হয় না। সুতরাং অন্যত্র তাহা থাকা না থাকা তুল্য অর্থাৎ তাহার প্রকাশ অবরুদ্ধপ্রায় থাকে। অতএব, যাহার ব্যাপারে চৈতন্যের অভিব্যক্তি, তাহাই তাহার করণ। চৈতন্যের উৎপত্তি না থাকিলেও

অভিব্যক্তি আছে, অভিব্যক্তি থাকিলেই তাহার করণ থাকিবেক, মনোবৃত্তি-নিচয় অভিব্যক্তি ক্রিয়ার করণ, সে সকল সাদি অর্থাৎ জন্মবান্। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাদির দ্বারা মনের বৃত্তি হয়, তাহাতে চৈতন্যের প্রতিফলন হয়, সেই প্রতিফলনাত্মক দ্বিগুণিত চৈতন্য সাদি অর্থাৎ জন্মবান্ বলিয়া গণ্য। যাহা জন্মবান্ তাহার করণ অসিদ্ধ নহে। জ্ঞান-শব্দের মুখ্যার্থ চৈতন্য, তাহার অবচ্ছেদক বলিয়া বৃত্তিতেও জ্ঞান শব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ গৌণকল্পে মনোবৃত্তিকেও জ্ঞান বলা যায়। এ কথা বিবরণ গ্রন্থেও লিখিত আছে। যথা—উপচার ক্রমে অন্তঃকরণের বৃত্তিতে জ্ঞান-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।"

প্রশ্ন।—অন্তঃকরণ নিরবয়ব, তাহার আবার বৃত্তি কি? বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তিত অবস্থার বা বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম বৃত্তি, তাহা সাবয়ব পদার্থেই সম্ভবে, নিরবয়ব অন্তঃকরণে তাহা অসম্ভব।

প্রত্যুত্তর।—অন্তঃকরণ নিরবয়ব নহে। অন্তঃকরণ সাবয়ব। যাহা যাহা জন্মে তাহা তাহাই সাবয়ব। অন্তঃকরণেরও জন্ম আছে; সুতরাং অন্তঃকরণও সাবয়ব। শ্রুতি অন্তঃকরণের জন্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—"তিনি (ঈশ্বর) মন সৃজন করিলেন।"*

* স্বচ্ছ মণিরত্নে সৌরালোক ও চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হয়। ঐ প্রতিফলন স্বাভাবিক আলোকের দ্বিগুণ ত্রিগুণ। এই প্রতিফলন ভাষান্তরের Refraction মণিরত্নে সৌরালোক প্রতিফলিত হওয়ার ন্যায় স্বচ্ছমনোবৃত্তিতে সর্ব্বব্যাপী আত্মচৈতন্য প্রতিফলিত হয়, হইয়া জ্ঞান আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

নিরবয়ব পদার্থের উপচয় অপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি হ্রাস নাই। কিন্তু মনের তাহা আছে। আহারাদির দ্বারা মনের বৃদ্ধি অর্থাৎ পুষ্টি বা উপচয় হয়, এবং আহারাভাবে তাহার হ্রাস বা অপচয় হয়। ইহা প্রত্যেক মানবের অনুভবগম্য। এই বৃদ্ধি ও হ্রাস মনের সাবয়বতার অনুমাপক। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী আখ্যায়িকায় এই বিষয়টী বিশদরূপে বিবেচিত হইয়াছে।

বলা হইল যে; মনোবৃত্তির গৌণ নাম জ্ঞান। কিন্তু সে কথা সঙ্গত হয় কৈ? ন্যায় মতে জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম, সুতরাং তাহা মনোধর্ম্ম নহে। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ বলা হইল, বৃত্তিরূপ জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম নহে। তাহা মনেরই ধর্ম্ম। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—

"কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী ও ভী।" *

প্রভৃতি সমস্তই মন অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম। ধী-শব্দের অর্থ বুদ্ধি, যাহার অন্য নাম জ্ঞান। শ্রুতি বলিতেছেন, তাহা মনোবৃত্তি বিশেষ অর্থাৎ মনেরই ধর্ম্ম।

বলিতে পার ইচ্ছাদি যদি মনেরই ধর্ম্ম হয়, বৃত্তি হয়, আর আত্মার ধর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে "আমি ইচ্ছা করি" "আমি ভীত" "আমি জানি" ইত্যাদিবিধ আত্মাবগামা অনুভব ও প্রয়োগ হয় কেন? কিরূপেই বা উহা উপপন্ন করিবে? এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐরূপ অনুভব ও প্রয়োগ। বক্ষ্যমান প্রকারে উপপন্ন হইতে পারে। লৌহে দাহিকা শক্তি নাই। না থাকিলেও তাহা যেমন বহ্নিতাদাত্ম্যাধ্যাসে (বহ্নির সহিত একীভাব প্রাপ্ত হওয়ায়) দাহক বলিয়া গণ্য হয়; লোকে বলে—অবিচারিত ভাবে অনুভব করে,—লোহায় দগ্ধ হইয়াছে; তেমনি, ইচ্ছাদি-আকারে পরিণত অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অতি সন্নিধান বশতঃ তাদাত্ম্যাধ্যাস ঘটনা হওয়ায় "আমি ইচ্ছাকরি" "আমি জানি" "আমি সুখী" "আমি ভীত" ইত্যাদিবিধ অবিচারিত অনুভব ও বাক্য প্রয়োগ সহজেই উপপন্ন হইতে পারে।

প্রশ্ন। অন্তঃকরণও এক প্রকার ই-

* কাম = ইচ্ছা। সংকল্প = ইহা করিব, ইত্যাকার মনোবৃত্তি। বিচিকিৎসা = সন্দেহ। হ্রী = লজ্জা ধী = বুদ্ধি = ভী = ভয়।

ন্দ্রিয়, সে বিধায় তাহা অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অগোচর। অথচ প্রকারান্তরে বলা হইল, অন্তঃকরণ প্রত্যক্ষের গোচর। ভাব এই যে, প্রত্যক্ষ পদার্থের ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ পদার্থের ধর্ম্ম অপ্রত্যক্ষ, ইহাই দৃষ্ট হয়। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় হইলে উক্ত নিয়মানুসারে অন্তঃকরণধর্ম্ম সুখাদি সাক্ষাৎ অনুভূত হইতে পারে না। অথচ তাহা হন। সুতরাং জিজ্ঞাস্য হয়, সেরূপ হওয়ায় তাৎপর্য্য বা কারণ কি?

প্রত্যুত্তর।—অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় নহে। অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়ত্বে প্রমাণ নাই। ভগবদ্গীতার "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি—মন যাহাদের ষষ্ঠ অর্থাৎ ষট্‌সংখ্যার পূরক, সেই সকল ইন্দ্রিয়—" এই বচন প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মন ইন্দ্রিয় না হইলেও তদ্দ্বারা ষট্‌সংখ্যার পূরণ হইতে পারে। ইন্দ্রিয়গত সংখ্যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই পূরণ করিতে হইবে, অন্য কিছুর দ্বারা নহে এমন কোন নিয়ম নাই। বিজাতীয় পদার্থের দ্বারাও বিজাতীয় পদার্থের সংখ্যা পূরিত (গণনা) হইতে দেখা যায়। যথা—"যাহাদের পঞ্চম যজমান সেই সকল পুরোহিত ইড়া ভক্ষণ করিবেন।" * দেখ, এই বাক্যে যজমানের দ্বারা পুরোহিতনিষ্ঠ পঞ্চসংখ্যার পূরণ হইয়াছে। "মহাভারত যে সকলের পঞ্চম সেই সকল বেদ অধ্যাপনা করিলেন।" এখানেও অবেদ মহাভারতের দ্বারা বেদগত পঞ্চ সংখ্যার পূরণ বা গণনা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, মন যে ইন্দ্রিয় নহে তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অর্থ অর্থাৎ বিষয় সকল ইন্দ্রিয়াপেক্ষা পর এবং মন ঐ অর্থ অপেক্ষা পর (শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট।" কেন পর? তাহা যথাস্থানে বক্তব্য)। বলিতে পার, মন যদি ইন্দ্রিয় না হয় তবে তজ্জনিত সুখাদি জ্ঞান অপরোক্ষ (সাক্ষাৎকার) হয় কেন? যে যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত সেই সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, এই নিয়মানুসারে মনোজনিত বা মানস সুখাদি জ্ঞান পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ থাকাই ত উচিত? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, জ্ঞানের সাক্ষাত্ত্ব বা প্রত্যক্ষতা ইন্দ্রিয়-জন্যতা-মূলক নহে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জনিত হইলেই সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান হয় অন্যথা পরোক্ষ জ্ঞান হয়, এরূপ কার্য্যকারণ ভাব নহে। এমন কেহই বলিতে পারিবেন না যে, ইন্দ্রিয়জন্যতাই প্রত্যক্ষতার প্রযোজক বা নিয়ামক হেতু। ঐরূপ কার্য্যকারণ ভাব হইলে মনোজন্য অনুমিতি-জ্ঞানে প্রত্যক্ষতার (অনুমানপ্রমাণজ জ্ঞান মাত্রেই পরোক্ষ থাকে; প্রত্যক্ষ হয় না) ও অজন্য (নিত্য) ঈশ্বরীয় জ্ঞানের পরোক্ষতার আপত্তি হইবে। (ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্যাপরোক্ষ; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সাক্ষাৎকারে ভাসিতেছে; পরোক্ষ জ্ঞান তাঁহাতে নাই।)

প্রশ্ন।—তবে বেদান্তসিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষতার প্রয়োজক (নিয়ামক হেতু) কি? অর্থাৎ কিরূপ হইলে পরিষ্কার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়?

প্রত্যুত্তর।—তোমরা কি জানিতে চাও? জ্ঞানগত প্রত্যক্ষতার * প্রয়োজক জানিতে চাও? কি বিষয়প্রত্যক্ষের প্রয়োজক জানিতে চাও? যদি জ্ঞানগত

* ইড়া॥ হোম দ্রব্যের অবশেষ।

* "জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ" এ কথার অর্থ জ্ঞানের জ্ঞান। ঘট জানা হইয়াছে এই ঘট, ইহা ঘটপ্রত্যক্ষের বোধক। তৎপরে যে আমি ঘট জানিয়াছি, আমার জানা হইয়াছে, ইত্যাদি প্রকারে যে অলংবুদ্ধি অর্থাৎ তৃপ্তিবিশেষ জন্মে, তাহাই ঘটজ্ঞানের জ্ঞান এবং তাহাই জ্ঞান প্রত্যক্ষ। ন্যায়শাস্ত্রে ইহা অনুব্যবসায় ও জ্ঞাতা নামে প্রসিদ্ধ।

প্রত্যক্ষতার প্রয়োজক (মূল নিয়ম) জানাই তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তবে সে সম্বন্ধে আমরা এইরূপ বলিব। যেস্থলে প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়চৈতন্যের অভেদ সংঘটন হয়, সেইস্থলে, সেই অভেদ, জ্ঞান-প্রত্যক্ষের প্রয়োজক। কথাটীর বিস্তার এই—

পরমার্থকল্পে চৈতন্য এক হইলেও ব্যবহারে বা উপাধিভেদে তাহা ত্রিবিধ। বিষয়চৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্য। ঘটাদি বিষয় তাহার অর্থাৎ চৈতন্যের অবচ্ছেদক হয়, সেই জন্য তাহা বিষয়-চৈতন্য। বিষয়চৈতন্য ও বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য সমান কথা। বিষয়াকারা মনোবৃত্তিও অবচ্ছেদক সুতরাং তাহা প্রমাণ-চৈতন্য। মন বা অন্তঃকরণও তাহার অন্য প্রকার অবচ্ছেদক সে জন্য তাহা প্রমাতৃচৈতন্য। ইহারই অন্য নাম জীব। যেমন পুষ্করণীর জল ছিদ্র দিয়া নির্গত ও প্রণালীপথে গমন করতঃ কেদার মধ্যে (কেদার—ক্ষেত্রের আলি) প্রবেশ করে, অনন্তর তাহা কেদারবেষ্টিত ক্ষেত্রের অনুরূপ চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ প্রভৃতির আকার প্রাপ্ত হয়, তেমনি, তৈজস অন্তঃকরণও চক্ষুঃপথে বহির্গত ও ঘটাদিদেশে সংযুক্ত হওয়ায় ঘটাদির আকারে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের এবম্বিধ পরিণামের নাম বৃত্তি; ইহার দ্বারা সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ব্যবচ্ছিন্ন (পরিমিত বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণবিশিষ্টের ন্যায়) হওয়ায় বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য আখ্যা প্রাপ্ত হন। অনুমিত্যাদি স্থলে বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদির সন্নিকর্ষ না হওয়ায় অন্তঃকরণ বিষয়দেশে যায় না; সুতরাং বিষয়াকারা বৃত্তি বাহিরে অর্থাৎ বিষয় দেশে অবস্থান করে না। কিন্তু যখন চক্ষুঃ-সন্নিকৃষ্ট ঘটে "এই ঘট" ইত্যাকার প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান হয় তখন ঘট ও ঘটাকারা বৃত্তি উভয়ই বাহিরে ও একস্থানে অবস্থান করে। উক্ত উভয় এক স্থানে অবস্থান করে বলিয়াই উভয়া-বচ্ছিন্ন চৈতন্য এক হয়। অর্থাৎ ভেদক অভাবে ভেদ থাকে না। বিষয় ও বিষয়াকারা মনোবৃত্তি উভয়ই চৈতন্যের উপাধি ও বিভাজক (ভেদক বা পার্থক্যকারক) সত্য; কিন্তু যদি তদুভয়ে ভিন্নস্থানে থাকে। একস্থানস্থ হইলে তদুভয়ের বিভাজকত্ব থাকে না। সেই কারণে গৃহান্তর্ব্বর্ত্তী ঘটাকাশ গৃহাকাশ হইতে ভিন্ন বা পৃথক বলিয়া গণ্য হয় না †। অতএব, প্রদর্শিত কারণে স্থির হইতেছে "এই ঘট" এতদ্রূপ প্রত্যক্ষ স্থলে ঘটাকারা মনোবৃত্তি ঘটদেশেই বিরাজিত বা বিদ্যমান (সংযোগ সম্বন্ধে উৎপন্ন) হওয়ায় ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও তদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য এক বা অভিন্ন হয়, সেই কারণে ঘট পরোক্ষ পথ হইতে অপরোক্ষ পথে আইসে। সুখ ও সুখাকারা বৃত্তি নিয়তই ঐরূপে একস্থানস্থ, এক স্থানে বিরাজ করে, সেই কারণে তদুভয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ভেদ থাকে না। ভেদ না থাকায় সুখও নিয়মিতরূপে অপরোক্ষ পথে আইসে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়।

সময়ে সময়ে অতীত সুখ দুঃখের স্মরণ হয়, সেই স্মর্য্যমাণ সুখ দুঃখ অপ্রত্যক্ষ পথেই থাকে। প্রত্যক্ষ পথে না আসিবার কারণ এই যে, তাহা অতীত অর্থাৎ তৎকালে অবিদ্যমান বা অনুপস্থিত থাকে।

† আকাশ সর্ব্বব্যাপী, এক বা অখণ্ড। তাহার যে অংশে ঘট বিরাজিত তাহা ঘটাকাশ ও ঘটছিদ্র। ছিদ্র, আকাশ, ফাঁক, ফুটা, অবকাশ, সমস্তই তুল্য কথা। ঘটের দ্বারা অপরিমিত আকাশের অপরিমিত পরিমাণতা প্রতীতি হয় বলিয়া ঘট আকাশের অবচ্ছেদক। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের সম্বন্ধেও ঐরূপ অবচ্ছেদকতা কল্পিত হইয়া থাকে।

সুখাদি বিদ্যমান থাকে না, অতীত হইয়া যায়, সেই অতীত সুখাদির অনুরূপ মনোবৃত্তি মাত্র উদিত হয়। পূর্ব্বে সুখ দুঃখ অনুভূত হইয়াছিল, কালান্তরে তাহার স্মরণ অর্থাৎ তদাকারা মনোবৃত্তি হওয়ার মধ্যে কাল ব্যবধান থাকে। কালব্যবধান হওয়ায় সুখাবচ্ছিন্ন ও তদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং স্মর্য্যমাণ সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষ পথে না আসিয়া পরোক্ষ পথেই থাকে। বিষয় ও বিষয়াকারা বৃত্তি এই দুই উপাধি যদি একস্থানস্থ এ এককালীন হয়, তবেই তাহা চৈতন্যাভেদের প্রয়োজক হয়। উক্ত উপাধি দ্বয়ের একদেশস্থতাকে চৈতন্যাভেদের প্রয়োজক বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বিষয়ের গাত্রে বর্ত্তমানতা বিশেষণ দিতে হইবেক। তাহা হইলে আর "আমি এখন পূর্ব্বসুখবিশিষ্ট" ইত্যাদিবিধ স্মরণজ্ঞানে প্রত্যক্ষ লক্ষণ যাইবেক না। কেন-না, সে সুখ অতীত সুখ; বিদ্যমান সুখ নহে।

আপত্তি।—অন্তঃকরণ প্রদেশে ধর্ম্মাধর্ম্মও বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহা অপ্রত্যক্ষ। কোন আপ্ত পুরুষ "তুমি ধার্ম্মিক" "তুমি অধার্ম্মিক" এরূপ বলিলে তজ্জনিত যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান হয়, সে জ্ঞান পরোক্ষই থাকে, অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু তোমরা যে প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলিলে সে লক্ষণ উপরোক্ত শাব্দ জ্ঞানে অতিব্যাপ্ত হইতেছে। (লক্ষ্যে লক্ষণ না গেলে অতিব্যাপ্তি হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ লক্ষণের লক্ষ্য নহে, অথচ তাহাতে প্রত্যক্ষ লক্ষণ যাইতেছে; সুতরাং অতিব্যাপ্তি দোষ হইতেছে।) কেন না, বিদ্যমান ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তদাকরা বৃত্তি এক দেশস্থ ও এককালীন হওয়ায় তদুভয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ অবশ্যই হইয়াছে।

আপত্তিনিরাস।—অতিব্যাপ্ত হয় সত্য; কিন্তু সে দোষের পরিহারার্থ বিষয়াংশে "যোগ্য" বিশেষণ নিবিষ্ট কর। করিলে উক্ত দোষ পরিহৃত হইবেক। অভিপ্রায় এই যে, যাহা যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য ভাব পদার্থ তাহা তাহাই প্রদর্শিতপ্রকারে প্রত্যক্ষ হয়, অবশিষ্ট অপ্রত্যক্ষ থাকে। সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, এ সকল সমানরূপে অন্তঃকরণ ধর্ম্ম; তবে কেন সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার হয় আর ধর্ম্মাধর্ম্ম সাক্ষাৎকার হয় না? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ফলানুমেয় স্বভাবের শরণ লইতে হইবে। ন্যায় মতেও আত্মধর্ম্ম সুখাদি সাক্ষাৎকারের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম সাক্ষাৎকৃত না হয় কেন? এ আপত্তি নিরাকৃত হয় না।

আখ্যানমালা।

(২)

১। এক ব্যক্তি পারস্য দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এক খণ্ড মৃত্তিকা কুড়াইয়া লইয়া আঘ্রাণ করিয়া দেখিল যে উহা চমৎকার ঘ্রাণ বিশিষ্ট। সে মৃৎখণ্ডকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত সামান্য মাটির ঢেলা, কিন্তু দেখিতে কদর্য্য হইলেও অতি সুঘ্রাণ বিশিষ্ট। আমি তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি তোমাকে আমার হৃদয়ে রাখিব এবং পথের সঙ্গী করিব। তুমি এ সুসৌরভ কোথায় পাইলে?" সে উত্তর করিল "কেন! আমি যে গোলাপের সঙ্গে বাস করি।"

সাধুসঙ্গের এমনি মাহাত্ম্য!

২। কালিফ্ আবদুর্ রহ্মান্ স্পেন-দেশের সুলতান্ (অধীশ্বর) ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নিজ হস্তে লিখিত একখানি কাগজ পাওয়া যায়। তাহাতে

লিখিত ছিল, "পঞ্চাশ বৎসর হইল আমি কর্ডোভার কালিফ্ হইয়াছি। যতপ্রকার ধন, মান, সুখ, মিত্র, ঐশ্বর্য্য হইতে হয় সকলি করুণাময় পরমেশ্বর আমার মস্তকে ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি এবং বেশ বলিতে পারি যে, এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে মোট্ চৌদ্দ দিন সুখে কাটাইয়াছি।" নিশ্বাস লওয়াই জীবন নহে। ইন্দ্রিয়-সুখই সুখ নহে। ধর্ম্ম-জীবনই প্রকৃত জীবন।

৩। একদা মেসিড়নের রাজা ফিলিপ্ অলিম্পিক্ মেলার সময় এক জন প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত দ্বন্দযুদ্ধ করিতে করিতে ভূতলে বালুকা-রাশির উপর পড়িয়া গিয়াছিলেন। উত্থান করত বালুকার উপর নিজ শরীরের আয়তন দেখিয়া বলিয়াছিলেন "হায়! আমাদের মৃত্যু হইলে এই দেহ কতটুকু স্থানের মধ্যে লুকাইবে! কিন্তু জীবদ্দশায় আমরা সমগ্র পৃথিবী লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছি।" ইহা কেবল পথ না দেখিয়া চলারই ফল।

৪। স্বর্গ কোথায়? প্লেটো বলিবেন, "তুষারাবৃত অলিম্পাস্-শিখরে।" সুইডেন্‌বর্গ বলিবেন "উহা সর্ব্ব স্থানেই।" কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিবেন "শৈশবে উহা আমাদের নিকটেই থাকে।" অন্য কেহ হয় ত বলিবেন "কাশিতে বা হিমালয়ে।" এইরূপ যাঁহার যাহা ধারণা তাহাই বলিবেন। কিন্তু তিন বৎসর বয়স্ক আমার ভ্রাতৃপুত্র "রঞ্জিৎকে জিজ্ঞাসা কর, "স্বর্গ কোথায়? সে বলিবে, "সেই যে, যেখানে পরমেশ্বর থাকেন!"

বস্তুতঃ শিশুর উত্তর জ্ঞানী, মহাজনদের উত্তর অপেক্ষাও খাঁটি। যে আত্মাতে, যে কার্য্যে রঞ্জিতের "পরমেশ্বর" আছেন, সেই খানেই স্বর্গ; আর যেখানে তিনি নাই সেই খানেই নরক।

৫। এক দিবস জগদ্বিখ্যাত কলাবৎ হেড্‌ন্ এক দল "বড়লোকের" সহিত ছিলেন, এমৎ সময়ে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে কি প্রকারে অবসাদ দূর করিয়া পুনরায় পাঠাদি দুরূহ বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করা যায় তাহাই আলোচনা হইতে লাগিল। এক ব্যক্তি বলিলেন "অবসন্ন হইলে আমি এক গেলাস্ মদ্ খাই।" দ্বিতীয় জন বলিলেন "আমি বন্ধু বান্ধবের সহবাসে স্ফূর্ত্তি লাভ করি।" হেড্‌ন্ পৃষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন "অবসন্ন হইয়া পড়িলে আমি প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রার্থনা করি। তাহাতেই আমি এত সুখ, বল ও আরাম পাই যে আর কিছুতেই তেমন পাই না।" অথচ হেড্‌ন্ যে এক জন বড় ভক্ত ছিলেন তাহা নহে।

৬। রোম্‌সম্রাট্ অগাষ্টাস্ শুনিয়াছিলেন যে ঋণে এক ব্যক্তির মস্তকের কেশ পর্য্যন্তও বিকাইয়া যাইবে, তথাপি সে অক্লেশে নাসারন্ধ্রে তৈল প্রদান পূর্ব্বক নাসিকাভেরী ধ্বনিত করিতে করিতে নিদ্রার জয় ঘোষণা করিয়া থাকে। এতৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি ঐ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির বিস্মৃতিজনক শয্যাটী ক্রয় করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, কারণ মস্তকে ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও মানুষ যে শয্যায় অকাতরে নিদ্রা যাইতে পারে, তাহা নিশ্চয়ই অত্যাশ্চর্য্য শয্যা হইবে।

আমরাও যে পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-ঋণের বিষয় মুখে সর্ব্বদা বলিয়াও যথাপূর্ব্ব দিব্য নিদ্রায় অভিভূত থাকি, ইহা আরও বিচিত্র। মহারাণীর শ্রবণগোচর হইলে তিনি আমাদের শয্যা ক্রয়ের অভিলাষ প্রকাশ করিতে পারেন!

৭। একজন পৌত্তলিক সূর্য্য, প্রস্তর-মূর্ত্তি, ইত্যাদির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মহাত্মা অগষ্টাইন্‌কে বলিয়াছিল, "এই সব আমার দেবতা ; তোমার দেবতা কই ? তোমার দেবতা দেখাও দেখি। কেবল মুখে ত খুব শরফরাজি কর !"

অগষ্টাইন্, "আমি যে দেখাইতে পারি না বলিয়া দেখাইতেছি না তাহা নহে ; তোমার দেখিবার চক্ষু কোথায় ?"

৮। একজন ধর্ম্মপ্রচারক একজন অল্প পরিচিত সামান্য ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেন "সুপ্রভাত !" তিনি বলিলেন, "আমার জীবনে কুপ্রভাত কখনও হয় নাই।"

ধর্ম্মপ্রচারক সবিস্ময়ে, "আশ্চর্য্য বটে! আহা চিরদিনই তুমি এমনি সৌভাগ্যবান থাক।"

উত্তর,—"আমি কখনও দুর্ভাগ্য ছিলাম না।"

ধর্ম্মপ্রচারক—"আশা করি তুমি চিরদিন এমনি সুখীই থাকিবে।"

উত্তর—"আমি চিরদিনই সুখী।"

ধর্ম্ম-প্র, "কথার মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার ব্যাখ্যা করুন।"

উত্তর,—"আনন্দের সহিত বলিতেছি। আমার কুপ্রভাত হয় না, কারণ প্রত্যহ প্রাতে আমি ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করি। দুঃখ সুখ যাহাই ঘটুক না, পরমেশ্বরকে তাহারই জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই ; তাই চিরদিনই আমার "সুখ-প্রভাত।" আমি নির্ধন ও যশোহীন ; কিন্তু সকলি মঙ্গলময় পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা, তাই আমি চিরসৌভাগ্যবান। আপনি সুখী হইতে বলিতেছেন ; আমি দুঃখী হইতেই পারি না, কারণ তাঁহারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ইহাই আমার ইচ্ছা।" প্রচারক অবাক্ ! কে ধর্ম্মপ্রচারক ?

বিশ্বাসী মুলার।*

আজকাল আমরা অনেকেই প্রার্থনার আবশ্যকতা লইয়া আলোচনা করিয়া থাকি। কেহ কেহ হয় ত এক কালে প্রার্থনায় বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু এখন আর করি না। আমাদের এই অবস্থাকে "আধ্যাত্মিক বিলোম" বলা যাইতে পারে। এই বিলোমাবস্থাতে মুলারের জীবনী পাঠ করিলে কেবল যে আমাদের প্রার্থনা বিষয়ে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস দূর হইতে পারে তাহা নহে, কিন্তু অনেকের আবার পরমেশ্বরে বিশ্বাসও বদ্ধমূল হইবে।

ঊনবিংশতি শতাব্দিতে মুলারের ন্যায় জ্বলন্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। জর্জ মুলারকে বিশেষ ভাবে একজন "বিশ্বাসী' বলা যাইতে পারে।

যে স্থানে আমাদের প্রিয়তম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই ব্রিষ্টল নগরের সমীপবর্ত্তী 'এশ্‌লিডাউন্' (Ashley Down) নামক স্থানে পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকাদিগের আশ্রয়ার্থে অনেকগুলি অনাথাশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাকেই জিজ্ঞাসা কর "এই পাঁচটী বৃহৎ অনাথাশ্রম কাহার ?" সকলেই বলিবে, "জান না ? প্রসিদ্ধ জর্জ মুলার এই সকল আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।" জর্জ মুলার কে ? ইহাঁর নাম ত তত বিখ্যাত নহে ! তাহার কারণ এই যে, মহাত্মা মুলার জগতের সমক্ষে নিজের অপেক্ষা ভগবানেরই নাম ঘোষণা করিতে চিরদিন যত্ন করিয়াছেন,

* Mrs E. R. Pitman রচিত George Muller and Andrew Reed নামক ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। এই প্রবন্ধটী "ধর্ম্মবন্ধু" পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এমন কি নিজের চিত্র তুলাইবার জন্য কখনও কোন চিত্রকরের নিকট গমন করেন নাই; বরং যাহাতে তিনি জগতের নিকট অজানিত থাকেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি যেমন বিশ্বাসী, তেমনি বিনয়ী।

কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি "Narrative of the Lord's dealings" নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। ইহা হইতে তাঁহার বাহ্য-জীবনের বিষয় যাহা অবগত হওয়া যায় তাহার স্থূল স্থূল কথা সঙ্ক্ষেপে বলা যাইতেছে।

খ্রীষ্টীয় ১৮০৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর জগতে বিশ্বাসের জয়ঘোষণা করিবার জন্য এবং অনাথ আতুরগণের চক্ষের জল মুছাইবার জন্য জর্ম্মাণ দেশীয় প্রুসীয়া রাজ্যে ক্রপেন্‌ষ্টড্ নগরে (Kroppenstaldt) এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জর্জ মুলার জন্ম গ্রহণ করেন। জর্জের একজন অগ্রজ ছিলেন। কিন্তু জর্জের পিতা মাতা জর্জকেই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক আদর করিতেন এবং ভালবাসিতেন। শৈশব কালে জর্জ বড়ই অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন।

দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জর্জকে সন্নিকটস্থ হেলবার্ষ্টড্ (Halberstaldt) নামক গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি নর্দ্ধসেন (Nordhausen) নগরস্থ একটী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েন; ১৮২৫ সালে হেল (Halle) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং লুথারের ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অনুমতি লাভ করেন। জর্জের পিতা পুত্রদ্বয়কে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন। কিন্তু উভয়েই ঐ অর্থ অসৎ কার্য্যে ব্যয় করিতেন। জর্জের পিতা হার্ মুলারের (Herr Muller) ইচ্ছা জর্জ বিদ্যালাভ করিয়া একজন ধর্ম্ম-যাজক হয়েন। জর্জের এই সময়কার জীবনের বিষয় পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, প্রচারকের উপযুক্ত জর্জের কোনই সদ্‌গুণ ছিল না।

পঞ্চদশ বর্ষকালে জর্জ মাতৃহীন হইলেন। মাতৃশোক অধিক দিন জর্জকে অভিভূত করিতে পারে নাই। অচিরে জর্জ পুনরায় সুরাপান ও আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময় হইতে অল্পে অল্পে তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মের অগ্নি জ্বলিতে লাগিল, তাহা আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না।

কুসঙ্গে পড়িয়া জর্জ অনেক অসদাচরণ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে গভীর অনুতাপ আসিয়া তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। অবশেষে ১৮২০ সালে কিছুকাল নির্জ্জন ধ্যানে অতিবাহিত করিলেন এবং মনে বহু সাধু সঙ্কল্প লইয়া পুনরায় জীবন-পথে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিয়াছেন "আমি ঈশ্বরের শক্তির বিষয় না ভাবিয়া, আত্মনির্ভর করিতে গিয়াছিলাম বলিয়া সকল চেষ্টাই বৃথা হইল এবং জীবন আরও মন্দ হইল।" এই সময়ে তাঁহার পিতা মেগ্‌ডিবার্গ নামক স্থানের নিকট একটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। জর্জও কুসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক পিতার সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। জর্জ চিরকালই অমিতব্যয়ী ছিলেন। একদা ব্রান্সউইক্ নগরে এক পান্থনিবাসে জর্জ এত অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন যে অর্থাভাবে গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত দিতে হইয়াছিল। অনেক সময়েই এইরূপ ঘটিত। এমন কি ঋণের জন্য জর্জকে কারাগারে পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছিল। আবার অনুতাপের ঝড় বহিতে লাগিল। এই সময়ে জর্জ ফরাসিস্, লা-

টিন্ ও জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুনরায় তিনি নর্দ্ধসেন্ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। তথায় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে শীঘ্রই অনেক ভাষা শিক্ষা করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। এখন তাঁহার বয়স বিংশতি বর্ষ। এইবার তিনি জীবনগ্রন্থের আর এক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে যদিও বাহ্য জীবনের পরিবর্ত্তন হইল, তথাচ তাঁহার অন্তর্জ্জীবন এমনই মেঘাচ্ছন্ন ছিল যে এই সময়ে তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন, "আমি তখন লজ্জাহীন হইয়া অকাতরে মিথ্যা কথা বলিতে পারিতাম।" কিন্তু ভগবান এই দুষ্ট বালকেরই জীবন তাঁহার লীলাভূমি করিলেন। হেল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতেই জর্জের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার লাম্পট্য ও অমিতব্যয়িতা এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তিনি অযথা উপায়ে, বা স্পষ্ট কথায় বলিতে হইলে, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা এবং অপহরণ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

নূতন অধ্যায়; ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ।

মুলার এখন বিংশতি বর্ষবয়স্ক যুবা।

ভগবান মুলারকে বেটা নামক পুরাতন বন্ধুর সহিত মিলিত করিলেন। তাঁহার সহিত মুলার শনিবার সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন ও প্রার্থনার্থে একজন ধার্ম্মিকের গৃহে গমন করিতেন। যে সন্তান বিশ্বপিতার ভবন পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিল। জর্জ এই সময়ে লিখিয়াছেন "একবারেই যে পাপশূন্য হইলাম তাহা নহে, তবে কুসঙ্গ, "আড্ডায়" যাওয়া, মিথ্যা কথা বলা পরিত্যাগ করিলাম।"

নূতন সঙ্কল্প,—স্বয়ং পাপের ভীষণ আবর্ত্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জর্জ জগতের পাপীদিগকে মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। জর্জ প্রচারক হইবেন শুনিয়া তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। পিতার আশা ছিল যে জর্জ ধর্ম্মযাজক হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে; সেই জন্যই তাঁহার শিক্ষার জন্য হার্ এত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহার পর জর্জ আরও দুই বৎসর অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তিনি পিতার নিকট আর অর্থ সাহায্য না লইয়া পরমেশ্বরের নিকট সাহায্য চাহিতেন।

এই সময় হইতে বিশ্বাসের জীবন আরম্ভ হইল। মুলারের জীবন উনবিংশতি শতাব্দির ধর্ম্মজগতের এক অত্যাশ্চর্য্যজনক অভিনব আধ্যাত্মিক দৃশ্য। মুলার এখন অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ হেল নগরে কয়েক জন আমেরিকাবাসী ভদ্রলোক আসিলেন। ঘটনাক্রমে মুলার তাঁহাদিগকে জর্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক নিয়োজিত হইলেন। তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে মুলারকে বেতন দিয়াছিলেন। এইবার মুলারের হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইল। তিনি নিজের জীবন ও প্রার্থনার ফলের বিষয় অনেক বন্ধুকে বলিলেন। অনেকেরও জীবন সংশোধিত হইয়া গেল। এইবার তিনি রোগীর শুশ্রূষা করিতে এবং সকলকে মুক্তির বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জর্জ প্রথম ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। হেলস্থ ফ্রান্কার অনাথাশ্রমে (Franke's orphan house, থাকিয়া মুলার ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বিদেশে

ধর্ম্মপ্রচার করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহুদী-দিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ লণ্ডনস্থ সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর। হঠাৎ এক অন্ত-রায় উপস্থিত হইল। প্রুসীয়ার প্রত্যেক পুরুষকে অন্ততঃ তিন বৎসর কাল সৈনি-কের কার্য্য করিতে হয়; কিন্তু যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েন তাঁহাদিগকে এক বৎসর মাত্র ঐ কার্য্য ক-রিতে হয়। ইহা না করিলে কেহ দেশের বাহিরে যাইতে পারে না। কিন্তু যিনি প্রভুর কার্য্যে অনুরক্ত তাঁহার সম্মুখে কোন বাধা বিঘ্ন দাঁড়াইতে পারে না। অনেক চেষ্টার পর শারীরিক অসামর্থ্য প্রযুক্ত মুলার এই "বেগার" হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। বাগ্মী কিছুকাল লণ্ডনের ইহুদিদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তাঁ-হার বিবেক তৃপ্ত হইল না বলিয়া তিনি এ কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে টেইন্-মাউথ্ নামক স্থানে অষ্টাদশ সংখ্যক মাত্র ধর্ম্মপিপাসু লইয়া একটী উপাসকমণ্ডলী গঠন করিলেন। এই সময়ে মূলার বিবাহ করিলেন এবং বাৎসরিক ৫৫ পাউণ্ড বা প্রায় ছয়শত টাকা বেতন লইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে বেতন পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বলিতেন "ভগবান আ-মার অভাব যোগাইবেন, আমি বেতন লইব না।" এই সময় হইতে উপাসক-গণ যাহা উপহার দিতেন বা শ্রদ্ধার সহিত দান করিতেন তাহা দ্বারাই মুলার ও মুলা-রের স্ত্রীর সকল ব্যয় চালিত। কখন কখন তাঁহারা নিঃস্ব হইয়া পড়িতেন বটে, কিন্তু এক দিনও তাঁহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয় নাই, প্রার্থনা করিবা মাত্রই ঈশ্বর কোন না কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে সাহায্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন যে দ্রব্যের অভাব হইত তখন তাহাই পাইয়াছেন; বস্ত্রের অভাবে বস্ত্র, আহারের অভাবে আহার, ও অর্থের অভাবে অর্থ পাইয়াছেন। একবার গৃহে কিঞ্চিৎ মাখন ব্যতীত আহারীয় আর কিছুই ছিল না, কিন্তু ভজনালয়ে যাইবামাত্র প্রায় ২০ টাকা পাইয়াছিলেন।

তিনি আর কখনও ঋণ করিতেন না; মনে করিতেন, অনাহারে কষ্ট পাওয়াও বরং ভাল, তথাচ ঋণ করা ভাল নহে। এইরূপে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড আয় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অজানিত দাতাগণের নিকট হইতে দান পাইয়া প্রথম বৎসর ১৩০, ২য় বৎসর ১৫১, ৩য় বৎসর ১৯১, ৪র্থ বৎসর ২৬১ পাউণ্ড আয় হইল।*

বিশ্বসেবা-ব্রতারম্ভ। টেইন্‌মাউথে দুই বৎসর ছয়মাস কাল অবস্থান করণানন্তর ব্রিষ্টল নগরে গমন পূর্ব্বক হেন্‌রি ক্রেক্ (Rev. Henry Craik) নামক জনৈক প্রচা-রকের সহিত মুলার ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইলেন। এখানেও সেইরূপেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ব্রিষ্টলে অনেকগুলি অনাথ বালক বালিকাকে দেখিয়া ফ্রাম্‌কাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হেলস্থ অনাথাশ্রমের স্মৃতি মুলারের প্রাণে জা-গিয়া উঠিল। মুলার ভাবিলেন যে, যখন কোন আয়োজন না করিলেও ভগবান তাঁহার অভাব সমূহ যোগাইতেছেন, তখন তিনিই অনাথদিগেরও আহার যোগাই-বেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে, ১২ জুনের দৈন-ন্দিন লিপিতে মুলার লিখিয়াছেন "অদ্য প্রাতে মনে হইল যে, যে সকল দরিদ্র লোকদিগকে খাইতে দেওয়া যায়, তাহা-

* এক পাউণ্ড প্রায় ১৩ টাকা হইবে।

দিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষাও দিতে পারা যায়।” সেই জন্য পর দিবস হইতেই তিনি কতকগুলি দরিদ্র লোককে একত্রিত করিয়া কিছু খাইতে দিতে, পড়িতে শিখাইতে এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে স্বদেশে এবং বিদেশে শাস্ত্রজ্ঞান প্রচারার্থ এক সভা সংগঠন করিলেন। কিন্তু ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মুলার এক দিনেরও জন্য চাঁদার পুস্তক বাহির করেন নাই। "Scriptural knowledge Institution for Home and Abroad" সংস্থাপনের সময় হইতে ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত ৯৫, ১৪৩ জন ইহাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে; দশ লক্ষ ধর্ম্মগ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে; প্রচার কার্য্যে ১৯৬, ৬৩৪ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে; এবং ৬, ৮৯২ জন অনাথ বালক বালিকা স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; ইহাদের শিক্ষার জন্য ৬৬১, ১৮৬ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ইহা একজন মাত্র দীন হীন বালকের আজীবন চেষ্টার ফল।

জর্জ কিছুদিন অনাথদিগের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং অর্থ সাহায্য পাইয়া একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু কোন অনাথ আসিল না। আবার অনাথের জন্য প্রার্থনা আরম্ভ হইল। পর দিবস এক জন আশ্রয়ের জন্য আবেদন করিল, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ্বাসী প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এসলিডাউন্ নামক স্থানে উইল্‌সন্ ষ্ট্রীটে প্রথম অনাথাশ্রম খোলা হইল। চতুর্দ্দিক হইতে সাহায্য আসিতে লাগিল। অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহের আসবাব্ যাহার যাহা সামর্থ্য সে তাহা দিয়াই সাহায্য করিতে লাগিল। তাঁহার পত্নী হইতে মুলার বিশেষ রূপে এই ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও অপরাপর অনেক সদাশয় নরনারী সুখ এবং স্বার্থ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অনাথ সেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলেন। খৃষ্টীয় ১৮৩৬ সালে, ১১ই এপ্রিল তারিখে প্রথম অনাথ নিবাস খোলা হইল। আট মাস গত হইতে না হইতেই আর একটী অনাথাশ্রম খোলা হইল। দুই গৃহে সপ্ততি জন অনাথ বালক বালিকা আশ্রয় লাভ করিল। প্রেমময় সর্ব্বশক্তিমান ভগবান যাঁহার আশ্রয় এবং উৎসাহের উৎস তাঁহার উৎসাহ হ্রাস পাইবে কি প্রকারে?

অনাথদিগের জন্য প্রার্থনাই মুলারের জীবনের প্রধান কার্য্য হইল। পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস হইত না বলিয়া মুলার কখনও ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা বা সঞ্চয় করিতেন না।

মুলার এক ব্যক্তির নিকট হইতে এককালে লক্ষাধিক টাকাও দান স্বরূপ পাইয়াছেন। এক একটী অনাথাশ্রম নির্ম্মাণ করিতে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। চারিটী অনাথাগারে ২১০০টী অনাথ মস্তক রক্ষা করিবার স্থান লাভ করিয়াছে। এখনও দিন দিন অনাথের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্দ্ধ শতাব্দী অপেক্ষা অধিক কাল মুলার অচল ভাবে স্থির বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অনেক সময় এরূপ ঘটিয়াছে যে আহার কালে এক কপর্দ্দকও তাঁহার হস্তে ছিল না, কিন্তু যিনি বিশ্বসংসারকে আপনার স্নেহক্রোড়ে রক্ষা করিতেছেন, তিনি ব্রিষ্টলের অনাথগণকে বিস্মৃত হয়েন নাই, এবং তাঁহার করুণা ছায়াতে থাকিয়া তাহাদি-

গকে এক দিবসও অনাহারে কাটাইতে হয় নাই। মুলারের দৈনন্দিন লিপি হইতে তুই একটী ঘটনার বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে ঐ মহাত্মা কি রূপে দিনাতিপাত করিতেন এবং করেন।

"অদ্যকার মত কোনও দিন নিঃস্ব হওয়া যায় নাই। দিবসে সাহায্যার্থ প্রার্থনানন্তর এক ঘটিকার সময় আশ্রম হইতে নির্গত হইলাম। আশ্রম হইতে ৪০ হস্ত যাইতে না যাইতেই এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার সহিত আশ্রমে আসিয়া অল্প কথা বার্ত্তার পর আমাকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের সাহায্যার্থে ২০ পাউণ্ড দান করিলেন।

চারি দিবসের মধ্যেই পুনরায় একেবারে নিরুপায় হওয়া গেল। মধ্যাহ্নে সহকারিগণের সহিত প্রার্থনারম্ভ হইল। প্রার্থনাকালে সম্মুখস্থ টেবিলের উপর একটী পত্র আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মধ্যে ১০ দশ পাউণ্ড ছিল। এবং দাতা পরে আরও দশ পাউণ্ড প্রেরণ করেন। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে ১০০ পাউণ্ড পাওয়া গেল।"

সকল প্রকার ব্যয় চালাইবার জন্য বাৎসরিক সাত আট লক্ষ টাকা প্রয়োজন হয়। প্রায় তুই শত প্রচারক, এক শত বিদ্যালয়, চারি কোটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং দশ সহস্র ধর্ম্মগ্রন্থ প্রতি বৎসর বিনা মূল্যে বিতরণের ব্যয়ভার মুলারকেই বহন করিতে হয়। তজ্জন্য মুলার কদাপি চিন্তা করেন না। তিনি সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত এবং প্রশান্ত। তিনি বলেন, "তাঁর কাজ, তিনিই করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতেও তিনিই করিবেন।"

কিছু কাল পূর্ব্বে এই মহাত্মা কলিকাতা নগরীতে আসিয়া আত্মজীবন-রহস্য বিবৃত করিয়াছিলেন।

প্রভু পরমেশ্বরের ভৃত্য মুলার জগতে বিশ্বাসের বিজয়-নিশান উড্ডীয়মান করিয়াছেন। ইহাঁর পূর্ব্ব জীবন স্মরণ করুন, এবং দেখুন যে বিশ্বাস স্পর্শমণির স্পর্শে সেই মলিন জীবন কেমন উজ্জ্বল এবং সুন্দর হইয়াছে। কেবল বিশ্বাসেরই বলে এক জন যুবা পুরুষ ঊনবিংশতি শতাব্দীর সভ্য সমাজকে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাঁহার বাল্য জীবন আলো এবং ছায়ায় পরিপূর্ণ, সেই ক্রপেন্‌ষ্টেড্ নিবাসী জর্জ মুলার প্রার্থনারই বলে আজ সহস্র সহস্র পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকার নয়নবারি মোচন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভগবানের যজ্ঞ এখনও সমাধা হয় নাই, তাই অদ্যাবধি তিনি তুঃখজরাপূর্ণ মর্ত্তলোকে রহিয়াছেন, তাই অদ্যাবধি ব্রিষ্টলবাসী অনাথগণ সেই অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের সহাস্য বদন দর্শনে সর্ব্ব তুঃখসন্তাপ বিস্মৃত হইতেছে, এবং তাঁহা দ্বারা দয়াময় নামের জয় পৃথিবীময় ঘোষিত হইতেছে। ঘনান্ধকার-নিমগ্ন তরঙ্গসঙ্কুল সংসার-সমুদ্র মধ্যে পথভ্রান্ত যাত্রিগণের পক্ষে মুলারের জীবন তীরস্থ জ্যোতিগৃহের আলোক স্বরূপ। অবিশ্বাস-গিরির শিরোদেশে তিনি যে বিশ্বাসালোক স্থাপন করিয়াছেন তাহার ছটা চতুর্দ্দিকে দেশ বিদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং দূর ভবিষ্যতেরও তমোজাল ভেদ করিবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ধন্য সেই সাধু, যিনি ব্রহ্মের নামরূপ কৃপাণের সাহায্যে সর্ব্ব বাধা বিঘ্নকে ধরাশায়ী করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন! ধন্য সেই আত্মা, যাহা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, এবং

পরমাত্মাই যাহার একমাত্র আশ্রয় এবং অবলম্বন !

পাঁচ ফুলের সাজি।

প্রথম সংখ্যা।

"শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চ হৃদি ধার্য্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি ন পরেষাং সমাচরেৎ॥"
—চাণক্য।

১। Jeremy Taylor—

"Can any man be faithful in much, that is faithless in little."

—যে ব্যক্তি সামান্য বিষয়ে বিশ্বাসহীন, সে কি গুরুতর বিষয়ে বিশ্বাসযুক্ত হইতে পারে ?

২। হাফেজ—

"যে পর্য্যন্ত তাঁহার অধরোষ্ঠ বংশীর ন্যায় আমাকে কৃতার্থ না করিবে, সে পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর উপদেশ আমার কর্ণে বায়ুর ন্যায় নিষ্ফল।

আপন পক্ষযোগে পথ চলিও না, শর কিয়ৎক্ষণ আকাশে উঠে, পরে ভূতলে পড়িয়া যায়।

তোমার অত্যাচারের হস্তে পড়িয়া বলিয়াছিলাম, নগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। তুমি হাসিয়া বলিয়াছিলে "হাফেজ ! চলিয়া যাও, কিন্তু তোমার পদ বাঁধা আছে।"

যদি আমাকে বধ করা তোমার ইচ্ছা হয়, তবে যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। আমি যখন তোমারই সম্পত্তি তখন লুণ্ঠনের প্রয়োজন কি ?

সখে ! হৃদয়সভাতে তোমার মুখের প্রকাশ শত দীপ প্রজ্বলিত করিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তোমার মুখের উপর শতবিধ আবরণ রহিয়াছে।

যে উদ্যানে সখার চূর্ণকুন্তলের সুগন্ধি গ্রহণ করিয়া সমীরণ প্রবাহিত হয়, তাহা কি তাতার দেশীয় কস্তূরিকা সঞ্চারের স্থল ?

অত্যাচাররূপ শ্যেনপক্ষী সকল সমুদায় নগরে পক্ষ বিস্তার করিয়াছে; নির্জ্জনবাসরূপ ধনু, এবং "হায় ! হায় !!" ধ্বনি ব্যতীত তাহা নিবারণের বাণ নাই।"

৩। R. W. Emerson—

"Our faith comes in moments ; our vice is habitual."

—আমাদের বিশ্বাস সময়ে সময়ে আইসে ; আমাদের দুর্নীতি অভ্যাসগত।

"Belief and love a believing love will relieve us of a vast load of care."

বিশ্বাস এবং প্রেম—বিশ্বাসযুক্ত প্রেম আমাদিগকে চিন্তার মহৎ ভার হইতে মুক্ত করে।

৪। Thomas Carlyle—

"Unity itself divided by Zero will give Infinity. Make thy claim of wages a Zero ; then, thou hast the world under thy feet. Well did the Wisest of our time write, "It is only with renunciation that Life, properly speaking, can be said to begin."

—এককে শূন্য দ্বারা ভাগ করিলে অনন্ত ফল হয়। পারিশ্রমিকের প্রতি স্বার্থশূন্য হও ; তবেই, জগৎকে পদতলে পাইবে। আমাদের কালের জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বেশ লিখিয়াছেন, যে, "প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে কেবল স্বার্থ বিসর্জ্জনের সঙ্গেই জীবনের আরম্ভ হয় বলা যাইতে পারে।"

৫। Matthew Arnold—

"Calm's not life's crown, though calm is well."

—যদিও শান্তি ভাল বটে, তথাচ উহা জীবনের মকুট (শ্রেষ্ঠ অধিকার এবং সুখের পরাকাষ্ঠা) নহে।

৬। Worsdworth—

"Whence can comfort spring,
When prayer is of no avail?"

—প্রার্থনাতে যদি কোন ফল না হয়, তবে কোথা হইতে সুখ উৎসারিত হইতে পারে ?

"Oh! there is never sorrow of heart
That shall lack a timely end,
If but to God we turn and ask
Of Him to be our end."

—হৃদয়ের এমন কোন দুঃখ নাই, উপযুক্ত সময়ে যাহার অবসান হইবে না, যদি আমরা কেবল ভগবানেরই দিকে ফিরি এবং তাঁহাকেই আমাদের লক্ষ্য হইতে বলি।

৭। এপিক্‌টিটাস্—

"আমরা কি অন্বেষণ করিতেছি? শ্রেয়ঃ। আচ্ছা; ইহাকে ওজন ও পরিমাণ করিয়া দেখ। যাহা শ্রেয়ঃ তাহাতে বিশ্বাস করা যায় কি? অবশ্য। যাহা অস্থির তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত কি? না। প্রেয়ের স্থিরতা আছে কি না? না, নাই। তবে উহাকে শ্রেয়ের স্থান হইতে দূরে নিক্ষেপ কর।

সিজারের সহিত কুটম্বিতা রহিলে, বা কোন রোমীয় বড়লোকের সহিত বন্ধুত্ব হইলেই কি আমরা নির্ভয়ে, নিরাপদে, এবং অগ্রগণিত (সম্মানিত) হইয়া বাস করিবার উপযুক্ত হইব? কিন্তু মহান পরমেশ্বর যখন আমাদিগের স্রষ্টা, পিতা, এবং রক্ষক রহিয়াছেন, তখন এই সম্বন্ধও কি আমাদিগকে দুঃখ এবং ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না?"

৮। St matthew—

"Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly father feedeth them. Are ye not much better then they?

Which of you by taking thought can add one cubit unto your stature?

And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin.

And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these."

—তোমরা আপনাদের জীবনের জন্য, কি আহার করিবে, কি পান করিবে ভাবিও না; অথবা তোমাদের শরীরের জন্য, কি পরিধান করিবে ভাবিও না। ভক্ষ্য অপেক্ষা জীবন এবং বস্ত্র অপেক্ষা শরীর কি গুরুতর বিষয় নহে?

আকাশের বিহঙ্গ কুলকে দেখ, তাহারা (শস্য) বপনও করে না, ছেদন ও করে না, গোলাতে সঞ্চয়ও করে না, তথাচ তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন। তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহ?

তোমাদের মধ্যে কে ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনার আকার এক হস্ত বৃদ্ধি করিতে পার?

তবে আর বস্ত্রের ভাবনাই বা ভাব কেন? ক্ষেত্রের কুসুমগুলির (Lilies) বিষয় চিন্তা কর, দেখ কেমন তাহারা বর্দ্ধিত হয়, তাহারা পরিশ্রমও করে না, সূতাও কাটে না; তথাচ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, সলমন্ মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও তাহাদের ন্যায় সুশোভিত ছিলেন না।

৯। St John—

"And this is love, that ye walk after His commandments. This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it."

—তাঁহার আদেশ সমূহের অনুগমন করাই প্রেমের লক্ষণ। আদেশ এই যে, প্রথমাবধি যাহা শ্রবণ করিয়াছ তদনুযায়ী আচরণ করিবে (চলিবে)।

১০। Wilberforce—

"Lovely flowers are the smiles of God's goodness."

—সুন্দর পুষ্পসমূহ মঙ্গলময় ভগবানের হাসি।

১১। Hesiod.—

"The seeds of our punishment are sown at the same time we commit sin."

—যখনই আমরা পাপ করি, সেই সময়েই শাস্তির বীজ রোপিত হয়।

১২। Bishop Hopkins.—

"Our prayer and God's mercy are like two buckets in a well; while the one ascends, the other descends."

—আমাদের প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের করুণা কূপস্থ দুইটী বারিপাত্রের(বাল্‌তির) মত; একটী উঠিলেই অন্যটী নামিতে থাকে।

——

১৩। Adam.—

"One reason why the world is not reformed, is, because every man would have others make a beginning and never thinks of himself."

—পৃথিবী সংস্কৃত হয় না তাহার একটী কারণ, প্রত্যেকেই চাহে যে অন্যে আরম্ভ করুন এবং নিজের বিষয় কখনও ভাবে না।

——

১৪। Keshub Chundra Sen.—

"Faith liveth in anticipation: the future is its dwelling house."

—আশাতে বিশ্বাস বাঁচিয়া থাকে। ভবিষ্যৎ উহার বাসগৃহ।

——

১৫। Confucius.—

'The mind of the superior man is conversant with righteousness; the mind of the mean man is conversant with gain."

—মহৎ লোকের মন ধর্ম্মের ভাবে মগ্ন, (ধর্ম্মভাবের সহিত সুপরিচিত), এবং নীচ ব্যক্তির মন লাভালাভের চিন্তায় পূর্ণ।

——

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

খাজা সাহেবের কাছে যে যাহা প্রার্থনা করিবেন তিনি সেই ফলই প্রদান করিবেন। সেই কথা শুনিয়া যাত্রিরা খাজা সাহেবের কবর স্থানে আইসে। কৌশল করিয়া সেই কবর স্থানের মধ্যে একজন মুসলমান বসিয়া থাকে, এবং অপর একজন বৃদ্ধ মুসলমান ফকির যাত্রিদিগকে বলে যে, তোমরা ইহার ভিতরে এক এক জন করিয়া হাত দাও, এবং ধন অথবা পুত্র যাহা হয় ইচ্ছা কর তাহাই খোদা তোমাদিগকে দিবেন। এই কথা শুনিয়া যে যাত্রী তাহার মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দেয়, সে যদি স্ত্রীলোক হয় তাহা হইলে কবরের ভিতর কৌশল করিয়া যে মুসলমান বসিয়া থাকে সেই ব্যক্তি তাহার হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে টানে এবং স্ত্রীলোক উপর দিকে টানে। তখন বৃদ্ধ ফকির সেই স্ত্রীলোককে বলিয়া দেয় যে তুমি হাত টানিও না খোদা খোদ তোমার হাত ধরিয়াছেন, তোমার ভাগ্য ভাল, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। এখন তুমি শীঘ্র দান পুণ্য কর। ১।০ শিকা হাত ধরাই এবং ১।০ শিকা হাত ছাড়াই এই ২।।০ টাকা তুমি এখানে দিয়া দাও। খোদা শীঘ্র তোমার হাত ছাড়িয়া দিবেন। যাত্রী বলেন, যে আমার কাছে ২।।০ টাকা নাই। এই ১।০ শিকা দিতেছি হাত ছাড়াইয়া দাও। তখন সেই বৃদ্ধ মুসলমান ফকির বলেন, যে খোদ্ খোদা হাত ধরিয়াছেন, ১।০ শিকাতে হইবে না। যাত্রী কি করে কষ্ট পাইতেছে অতএব ২ টাকা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লয়। সে দিন আরও এক জনকে ডাকিয়া এইরূপ করিল। তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, যে তোমরা যাত্রিদিগকে কেন অনর্থক কষ্ট দিতেছ, যাহা উহারা শ্রদ্ধা করিয়া দেয় তাহাই সন্তোষ পূর্ব্বক গ্রহণ কর। ইহা শুনিয়া সেই বৃদ্ধ মুসলমান ফকির শিবনারায়ণকে বলিল, যে তুমি ফকির মানুষ, তোমার এ সকল কথায় প্রয়োজন কি? তুমি দর্শন করিয়া চলিয়া যাও। এই বলিয়া শিবনারায়ণের গলায় এক ছড়া ফুলের মালা দিল ও হাতে কতকগুলি ফুল দিয়া বলিল আপনি এস্থান হইতে যান। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন মুসলমান ও হিন্দুদিগকে ধিক্ যে আপনার সনাতন ধর্ম্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মৃত কবরস্থানে বিশ্বাস করিয়া পড়িয়া আছে ও তাহাতে তেজোহীন, বলহীন, শক্তিহীন,পরাধীন হইয়া রসাতলে যাইতেছে।

শিবনারায়ণ কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া দুই এক জন ভদ্র মুসলমানের নিকটে এই সকল কথা বলিলেন, যে এই সকল বড় অন্যায়। সেই ভদ্র জ্ঞানবান মুসলমানেরা শুনিয়া বলিল যে মহাশয়, আমরা ইহা তদন্ত করিয়া দেখিব যদি ইহা যথার্থ হয় তাহা হইলে বড় লজ্জার কথা এবং তাহা হইলে আমরা গোপনে এই প্রপঞ্চ তুলিয়া দিব। আপনি কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করিবেন না।

সেখান হইতে শিবনারায়ণ গুজরাটী অহমদাবাদ সহর হইয়া কাঠিওয়ার দেশে সুরথ নগরে যাইলেন এবং সুরথ নগর দেখিয়া বোম্বাই সহরে সমুদ্রের ধারে বালকেশর নামক গ্রামে যাইলেন। ঐ গ্রামের শ্মশানে যেখানে চিতার উপরে মৃত ব্যক্তির নামখোদিত প্রস্তর আছে শিবনারায়ণ সেই স্থানে সর্ব্বশরীর কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া একটা প্রস্তরের উপর তিন দিবস পড়িয়া রহিলেন। তিন দিবসাবধি কেহই

তাঁহার তত্ত্ব লইল না। যাহারা মৃত দেহ পুড়াইতে আসিত তাহারা বলিত যে কোন পাগল পড়িয়া আছে। এই বলিয়া শিবনারায়ণকে কোন কথা তাহারা জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিয়া যাইত। শ্মশানের অনতি দূরে মাড়োয়ারিদের প্রতিষ্ঠিত একটা ঠাকুর বাটী আছে। সেখানে শ্রীবৈষ্ণব বৈরাগী সাধুরা বাস করিত। তাহারা প্রতিদিন শিবনারায়ণকে দেখিতে পাইত কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করিত না এবং তাঁহাকে মুদ্দফরাস জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকটেও আসিত না। ঠাকুর-বাটী ছুইতলা, যাহারা ঠাকুর স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের অভিপ্রায় ছিল এই যে অভ্যাগত সাধু মহাত্মা সেই বাটীতে বিশ্রাম করিবেন। যে মাড়ওয়ারিরা সেই বাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাঁহাদের একজনের নাম জুয়াহরমল্ আর একজনের নাম শিবনারায়ণ এবং অপরের নাম যমুনা দাস। সেই ঠাকুর বাটীর তত্ত্বাবধানের জন্য এক জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। সেই পণ্ডিতের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল এই যে অযাচক অভ্যাগত মহাত্মা সাধুগণ কোন প্রকারে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট না পান। এইরূপ মহাত্মাদিগকে তিনি অনুসন্ধান করিয়া ঠাকুরবাটীতে আনিয়া তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। সেই পণ্ডিতের নাম জালিরাম পণ্ডিত। জালিরাম পণ্ডিত এক দিবস শিবনারায়ণকে দেখিতে পাইয়া একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া শিবনারায়ণের নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন? তুমি কাহাকে নমস্কার করিলে? জালিরাম বলিলেন, আপনাকে নমস্কার করিলাম। শিবনারায়ণ বলিলেন, আপনি কে যে আমাকে নমস্কার করিলেন? জালিরাম উত্তর করিলেন, হে মহারাজ, আমরা নরাধম, আমরা বিষয়-ভোগে আসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কাতর হইয়া আছি, আপনাকে জানিতে পারি নাই এবং পরমাত্মাকেও জানিতে অপারক। আপনি কে আমি কেমন করিয়া চিনিব কিন্তু এই জানিতে পারিতেছি যে আপনি মহাত্মা এবং ত্যাগিপুরুষ, পরমাত্মার জানিত লোক এবং আপনি পরমাত্মা এইরূপ জানিয়া আমি নমস্কার করিলাম। শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি যে তুমিও তো সেই ব্যক্তি তোমার চিন্তা কি? জালিরাম বলিলেন যে শাস্ত্রেতে এইরূপ লেখা আছে বটে কিন্তু আপনার মতন অভ্যাস করিয়া যদি স্বরূপে নিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে জীব কৃত কার্য্য হয়। শিবনারায়ণ বলিলেন, যদ্যপি তোমার স্বরূপে নিষ্ঠা না হইয়া থাকে তাহা হইলে ও স্বরূপেতে তুমিই আছো তাহাতে তোমার চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। জালিরাম পণ্ডিত শিবনারায়ণকে উত্তর করিলেন, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বলুন আপনি কত দিন এইখানে আসিয়াছেন এবং আপনার আহারের কিরূপ হইতেছে। আপনাকে কেহ দেখিয়াছে কি? তাহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি তিন দিবস আসিয়াছি। আমাকে অনেকে দেখিয়াছে। কিন্তু কেহই আহারের জন্য জিজ্ঞাসা করে নাই। জালিরাম পণ্ডিত বলিলেন, কি আহার করিবেন আমাকে আজ্ঞা করুন তাহা এইখানে আনিয়া দিই। না হয় ঠাকুরবাড়ীতে চলুন, সেই খানে আপনাদের জন্য বৃহৎ বাটী আছে। আপনার যতদিন ইচ্ছা হয় দোতালায় থাকিবেন। আহারাদির ব্যবস্থা সেই খানেই হইবেক এবং বড় বড় জ্ঞানী ধনিলোক আপনার চরণ দর্শন করিতে আমার সঙ্গে আসিবেন। শিবনারায়ণ বলিলেন, যে আমার ধনিলোকের সহিত কোন প্রয়োজন নাই। এবং আমার বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবারও প্রয়োজন নাই। যদ্যপি তোমার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অন্ন এই স্থানে পাঠাইয়া দিতে পার। জালিরাম পণ্ডিত বলিলেন আমি পাঠাইয়া দিতে পারি এবং নিজেও আনিয়া দিতে পারি। কিন্তু আপনি যে স্থানে আছেন, সেখানে শবদাহ হয়। লোকে এইখানে আসিতে ঘৃণা করে। স্নান করিয়া থাকে এবং আপনি কৃপা করিয়া গা তুলিয়া একবার আমার সহিত ঠাকুর বাটীতে আসুন। তাহার প্রার্থনামত শিবনারায়ণ সেই স্থান হইতে ঠাকুর বাটীতে আসিয়া আহার করিয়া বিশ্রাম করিলেন। সেই সময় জালিরাম পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বন্ধু মহাজনেরা আসিয়া শিবনারায়ণকে দর্শন করিলেন, এবং তাহাকে যাইবার সময় বলিলেন মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া আমাদের সঙ্গে চলুন এবং আমাদের বাটী পবিত্র করিয়া দিন। শিবনারায়ণ বলিলেন যে তোমার বাটীতো সর্ব্বদাই পবিত্র আছে, এইটী কেবল মনের ভ্রম। তাঁহারা কোন মতে শিবনারায়ণকে না ছাড়িয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

সেই সময় তদ্দেশীয় জয়কিষণ নামক একজন প্রধান পণ্ডিতের কোন শিষ্য শিবনারায়ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। তাহার প্রার্থনা মত তিনি জয়কিষণ পণ্ডিতের নিকটে যাইতে সম্মত হইলেন। জয়কিষণ পণ্ডিত অতিশয় ধীর ও বিজ্ঞ, এবং নম্র প্রকৃ-

ভিন্ন লোক এবং নিত্য যোগবাশিষ্ঠ পুরাণ ও গীতাদি ধর্ম্ম পুস্তক সকল পাঠ করিতেন। শিবনারায়ণকে দেখিয়া তিনি অতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে বিধি পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া বসাইলেন, এবং তাঁহার সমস্ত ভাব লক্ষণ দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এবং শিষ্যকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, উত্তম মহাত্মাকে আমার নিকটে আনিয়াছ। তৎকালে সেই স্থানে অনেক অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন জ্ঞানী মাড়ওয়ারি কএকটী অতি উত্তম সর্ব্বলোক হিতকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন।

প্রথম প্রশ্ন।

জয়কিষণ পণ্ডিতকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ জগতের মধ্যে ত্যাগী ব্যক্তি কে? জয়কিষণ পণ্ডিত উত্তর করিলেন, যখন সম্মুখে মহাত্মা বসিয়া আছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর আমি আর কি বলিব, আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যাঁহার অন্তর হইতে ত্যাগ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ত্যাগী; তত্রস্থ অপর একজন পণ্ডিত বলিলেন যে সাধু মহাত্মারাই ত্যাগী ব্যক্তি। শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, যে সাধু মহাত্মারা ত্যাগী বটে। কিন্তু এখানে গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে মহাত্মাগণ কোন্ বিষয়ে ত্যাগী; ত্যাগের মধ্যে তো গৃহস্থেরাই প্রধান ত্যাগী, কেন না সাধু মহাত্মাগণ এই দৃশ্যমান মায়াময় জগতকে স্বপ্নবৎ অসৎ পদার্থ জ্ঞান করিয়া মিথ্যা বোধে ত্যাগী হন এবং তাহার মধ্যে কেহ কেহ অহঙ্কার প্রযুক্ত মনে করেন যে আমি বড় ত্যাগী এবং অপর লোকে ও মনে করেন যে এই সাধু মহাত্মা বড়ই ত্যাগী কেন না ইনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মিথ্যা বস্তুকে ত্যাগ করিয়া অহংকার করিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তিগণ সৎ বস্তুকে ত্যাগ করিয়া অসৎ পদার্থে আসক্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ সৎস্বরূপ যিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতা যাঁহার দ্বারা যাবতীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকেই ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করিতেছেন অতএব এরূপ স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এই উভয়ের মধ্যে কাহারা প্রকৃত ত্যাগী এবং ইহাদের ও উভয়ের বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখা উচিত যে, আমার কি বস্তু ছিল যে আমি ত্যাগ করিয়াছি ও এমন কি বস্তু আছে যে আমি গ্রহণ করিব, যখন আমার একটী তৃণ ঘাস পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আমার কি আছে যে আমি অহংকার প্রযুক্ত বলিয়া থাকি যে আমি ত্যাগ করিয়াছি ও আমি গ্রহণ করিয়াছি? অতএব আমার ত্যাগ ও গ্রহণের কিছুমাত্র সাধ্য নাই; কারণ যাবতীয় পদার্থ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের এবং আমিও তাঁহারই অংশ মাত্র অর্থাৎ যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান আছেন, যখন তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই তখন কি ত্যাগ করিব ও কি গ্রহণ করিব? এবং যে ব্যক্তি গ্রহণ ও ত্যাগ হইতে মুক্ত আছেন, এবং যিনি সকলেতেই সমভাবে আছেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ত্যাগী, তিনিই যথার্থ ত্যাগ ও গ্রহণের ভাব বুঝেন। গৃহস্থ ধর্ম্মেই থাকুন অথবা সন্ন্যাস ধর্ম্মেই থাকুন—যে কোন ধর্ম্মেই থাকুন -তাঁহার পক্ষে সকলই সমান।

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

পুনরায় ঐ মাড়ওয়ারী জয়কিষণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ ওকার, ব্রহ্মগায়িত্রী যজ্ঞাহুতি ও বেদ অধ্যয়ন ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকদিগের কি কারণে অধিকার নাই? তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন, কোন কোন শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে লেখা আছে যে উহাদের অধিকার নাই, কেন যে অধিকার নাই তাহা সম্মুখস্থিত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর।" তাহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, অধিকার ও অনধিকার সকলের মধ্যে আছে। আমি স্থূল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি তোমরা সূক্ষ্ম করিয়া ভাব গ্রহণ কর। যেমন যাহার জলের পিপাসা হইয়াছে তাহাকে অন্ন দিলে সে কথনই তাহাতে প্রীত হইবেক না। অতএব সে অন্নের অনধিকারী। এবং যে ব্যক্তির অন্নের ক্ষুধা লাগিয়াছে তাহাকে জল দিলে তাহার ক্ষুধার শান্ত হইবেক না। অতএব সে জলের অনধিকারী। সেইরূপ যে ব্যক্তির কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মিথ্যা অসৎ পদার্থে অত্যন্ত আসক্তি প্রযুক্ত ভোগ করিবার ইচ্ছা আছে, সত্য যে সৎপদার্থ তাহাতে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই সেই ব্যক্তিকে সৎ পদার্থ অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার কথা গ্রহণ করিতে বলিলে তাহা তাহার প্রিয় হইবে না। অতএব সে তখন শ্রেষ্ঠ কার্য্যে অনধিকারী। শূদ্র কিম্বা স্ত্রী অথবা ব্রাহ্মণ যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিমাত্রই অনধিকারী। এবং যে ব্যক্তির অসৎ পদার্থে ইচ্ছা নাই, এবং অসৎ পদার্থে লিপ্ত থাকিয়াও সৎপদার্থের প্রতি একান্ত ইচ্ছা আছে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে যাহার অভেদ হইতে একান্ত ইচ্ছা আছে অথবা প্রেমও ভক্তি সহকারে তাঁহাকে জানিবার জন্য

তাহার একান্ত ইচ্ছা আছে সেই ব্যক্তি অসৎ পদার্থে অনধিকারী। এবং সৎপদার্থে অধিকারী। অর্থাৎ ওঁকার, ব্রহ্মগায়ত্রী যজ্ঞাহুতি ও বেদাদি শাস্ত্র এবং ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে তিনি অধিকারী হইবেন। শ্রেষ্ঠ কার্য্য সকল করিলে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হইবে। স্ত্রী হউক অথবা পুরুষ হউক শূদ্র হউক অথবা ব্রাহ্মণ হউক—যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন-শ্রেষ্ঠ কার্য্য কবিলেই শ্রেষ্ঠফল প্রাপ্ত হইবেক। তোমাদের মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও তো লেখা আছে যে—

শূদ্রঃ ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূদ্র ও বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে সেই ব্রাহ্মণ হইবে। এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি নিকৃষ্ট কার্য্য করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায় যথা—

বিপ্রা দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত মনো বচনে হিতার্থ
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবৎ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্র যে ব্রাহ্মণ তিনি যদি জ্ঞান, সত্য, দম, শাস্ত্র জ্ঞান, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, ক্ষমা, ক্রোধ শূন্যতা, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য, শম—এই বার গুণ সম্পন্ন হইয়াও বিষ্ণু ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যো-তিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তিযুক্ত না হন তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম। পৃথিবীও তাঁহার ভার সহ্য করিতে অক্ষম এবং যদি চণ্ডাল হইয়া আপনার তনু, মন, ও ধন ইত্যাদি বিষ্ণু ভগবানেতে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে প্রেম ভক্তি সহকারে অর্পণ করেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও তিনিই শ্রেষ্ঠ। নিরবলম্ব উপনিষদেও লেখা আছে যে—

কো ব্রাহ্মণঃ।
যো ব্রহ্মবিদ্ সএব ব্রাহ্মণঃ॥

যে ব্যক্তির সমদৃষ্টি হইয়াছে, পরিপূর্ণ ব্রহ্মময় দেখি-তেছেন সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ শব্দে কথিত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে শাস্ত্রোক্ত গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কোটীর মধ্যে এক আধ্ জন যথার্থ ব্রাহ্মণ পাইবার সম্ভব। এবং যজুর্ব্বেদে লেখা আছে—

যথেমাং বাচং কল্যাণি মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম ইত্যাদি॥

ইহার অর্থ, ভগবান্ বলিতেছেন। কল্যাণি মা বদানি জনেভ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ আমি যে এই কল্যাণকর বাক্য কহিতেছি ইহা সকলেই গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সকলেই বেদ পাঠ করিয়া বেদের সার ভাবকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও অতি শূদ্র, চণ্ডাল প্রভৃতি স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক অথবা পারমার্থিক ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন ইহাতে কোন বাধা নাই। এবং ওঁকার মন্ত্র জপ এবং ব্রহ্ম গায়ত্রী অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে উপাসনা অর্থাৎ তাঁহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জ্জন করা তাহাকেই বেদ পাঠ বলে অর্থাৎ জ্ঞানের নামই বেদ। যে শাস্ত্রেতে সত্য বাক্য আছে ও যিনি সত্য বলেন তাহাকেই বেদ জানিবে; সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতর বাহিরে জ্যোতিঃস্বরূপে পরিপূর্ণ আছেন এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন। তাহাতে মাড়ওয়ারী ব্যক্তি বলিলেন, মহারাজ শাস্ত্রেতে ইহাও তো লেখা আছে যে—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

অর্থাৎ জীব যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন তাহার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপেতে কোন বোধ থাকে না সেই অবস্থাকেই শূদ্র বলে। এবং যখন সেই জীবের সংস্কার পড়ে তখন তাহাকে দ্বিজ সংজ্ঞা বলা হয়। এবং সেই জীব যখন বেদ পাঠ করেন তখন তাহাকে বিপ্র বলা হয়, অর্থাৎ যখন জ্ঞান উপাজ্জন করেন তখন বিপ্র শব্দে কথিত হয়। এবং যখন জীব ব্রহ্মকে জানেন তখন তাহাকে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা বলা হয়, এবং জীবের যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা গুরুর উপাসনার অদ্বৈত জ্ঞান উদয় দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে অভেদ হইয়া যান, তখন ঐ অবস্থাপন্ন জীবকে ব্রহ্ম বলা হয়।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ।

তান্ত্রিকদিগের রহস্যময় জুগুপ্সিত ভীষণ ব্যবহারে যখন বঙ্গদেশ শুষ্ক নীরস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, ন্যায় শাস্ত্রের বাদ-বিতণ্ডা, তান্ত্রিকাচারের পঞ্চ"ম" কার ও প্রাণশূন্য আড়ম্বরময় বাহ্য ক্রিয়া মাত্র যখন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল, সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপধামে জন্ম গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত মরুময় বঙ্গদেশে হরিভক্তির প্রবল বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি-গদ-গদ দিব্যকান্তি সন্দর্শন করিয়া ও অমৃতায়মান ভক্তি-পরিপ্লুত উপদেশ বচন শ্রবণ করিয়া সংসার-তাপে উত্তপ্ত শত শত ব্যক্তির প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। তিনি অনুচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে প্রমত্তভাবে হরিগুণানুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া যখন মহাভাব-রসে মগ্ন হইতেন, তখন কেহই অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিত না। চৈতন্য-চন্দ্রের প্রেমভক্তির প্রবল তরঙ্গে শত শত ব্যক্তির মোহবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সহস্র সহস্র জ্ঞানী মানী বিষয়ী লোক জ্ঞানের অভিমান মানের গৌরব ও বিষয় বিভবের মায়া ছিন্ন করিয়া হরিভক্তিতে উন্মত্ত হইয়াছে। পর্ণকুটীরবাসী দীন দরিদ্র সন্ন্যাসী হইতে রাজ্যেশ্বর পাৎসা উজির সকলেই চৈতন্যচন্দ্রের মাহাত্ম্য ও প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। জাতি বর্ণ আচার বিচারের প্রাচীর ভেদ করিয়া পরা ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া তিনি হিন্দু মুসলমান স্ত্রী পুরুষ সকলেরই নিকট ভক্তিধন বিলাইতেন। কেবল বঙ্গদেশ নয়, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ বারাণসী প্রয়াগ শ্রীবৃন্দাবন যেখানেই তিনি পদার্পণ করিয়াছেন সেইখানেই প্রেমভক্তির বিপুল উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। জগাই মাধাইয়ের ন্যায় মহাপাষণ্ডীগণ তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমা বৈরাগ্য ও হরিভক্তি দর্শন করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে। রূপ সনাতন ও রঘুনাথ দাসের ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য্যবান ও ক্ষমতাবান লোকেরা শ্রীচৈতন্যের সুবিমল মুখকান্তি সন্দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখবিনিঃসৃত প্রাণপরিতৃপ্তিকর অমৃতস্যন্দি প্রেমভক্তির উপদেশ শ্রবণ করিয়া সংসারের ধন জন মান সম্ভ্রম বিষবৎ পরিত্যাগ করত অতিদীন-

ভাবে দিনপাত করিয়া কেবল হরিকথা প্রসঙ্গে কালযাপন করিয়াছেন। চৈতন্যানুচরদিগের কঠোর বৈরাগ্য ও অহেতুকী হরিভক্তির বিষয় চিন্তা করিলে আমাদের সংসারাসক্ত নীরস চিত্ত ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া উঠে।

আমাদের দেশে অনেকেই রূপ সনাতনের নাম শুনিয়াছেন। "চৈতন্য কবিতামৃত" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে রূপ সনাতনের বিষয় অবগত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গ বিহার ও উড়িস্যার তাৎকালিক রাজধানী গৌড় নগরে সৈয়দহুসেন সা নামক একজন মুসলমান রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রূপ ও সনাতন উক্ত রাজার উজির অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ। প্রচুর অর্থলোভেও ব্রাহ্মণসন্তানেরা তখন ম্লেচ্ছসংস্পর্শে আসিতেন না। যাঁহারা রাজকার্য্যে যবন সহবাসে থাকিতেন, হিন্দু সমাজে তাঁহারা নিন্দনীয় হইতেন। মুসলমান রাজারা যখন এদেশে অধিকার বিস্তার করিয়া জাতিনির্ব্বিশেষে উপযুক্ততানুসারে দেশীয় লোকদিগকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেতর কায়স্থ ইত্যাদি জাতিই রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া দেশ মধ্যে সম্ভ্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখনকার ন্যায় সে সময়ে ব্রাহ্মণজাতি আশ্রমাচারপরিভ্রষ্ট হইতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হয়েন নাই। প্রমাণস্থলে আমরা রূপ সনাতনের নাম উপন্যস্ত করিতে পারি। রূপ সনাতন কোন্ জাতীয় ছিলেন, ইহা লইয়া অনেকে বিবাদ করেন। কেহ বলেন, তাঁহারা মুসলমান ছিলেন এবং কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, তাঁহারা যদিও ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পাৎসার দাসত্ব করাতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন, এবং কিয়ৎ পরিমাণে মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। রূপের দবিরখাশ ও সনাতনের সাকর মল্লিক এই দুই যাবনিক নাম ছিল। "চৈতন্য চরিতামৃত" পাঠে অবগত হওয়া যায় রূপ সনাতন নানাস্থানে আপনাদিগকে ম্লেচ্ছসংস্পর্শী অস্পৃশ্য হীনজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহারা যে বিপ্রকুলোদ্ভব উচ্চবংশজাত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে জীব গোস্বামী প্রণীত "বৈষ্ণব তোষিণী" গ্রন্থই প্রমাণ। জীব গোস্বামী রূপ সনাতনের ভ্রাতুস্পুত্র। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞের পৌত্র রাজ্যচ্যুত হইলে তদীয় পুত্র বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। রূপ সনাতন তাঁহারই বংশ সম্ভূত।

রূপ সনাতন কেবল সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন না, বিদ্যাবুদ্ধি ও ভগবৎভক্তিতেও পরম প্রবীণ ছিলেন। রাজকার্য্যের অবকাশ কালে ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও হরিকথাপ্রসঙ্গে পবিত্রচেতা সাধু সজ্জনদিগের সঙ্গ লাভ করিতেন। এই অবস্থায় ইহাঁরা "হংসদূত" ও "পদ্যাবলী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন এইরূপ প্রবাদ। যখন গৌরাঙ্গদেব নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করত কলনাদিনী ভাগীরথীর উভয়তীরবর্ত্তী জনপদবাসীগণকে হরিভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে আপ্লুত করিয়া গৌড়নগর রামকেলী গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং নাম সংকীর্ত্তনের মধুর নিনাদে নগরবাসীগণকে চমকিত করিয়া তুলিলেন; তখন শ্রী চৈতন্যের মুখারবিন্দনিঃসৃত হরিনামসুধা পান করিবার জন্য এবং তাঁহার পবিত্র সহবাসসুখ সম্ভোগ করিবার জন্য

তাঁহার উদ্দেশে জনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। যুবজনোচিত যৌবনশ্রীর সহিত সন্ন্যাসীবেশ গৈরিক বস্ত্রাদির সমাবেশ হওয়াতে প্রাতঃসূর্য্যের তরল কিরণচ্ছটার ন্যায় গৌরের অপূর্ব্ব রমণীয় শোভা হইয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন, লোক সকল আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে আসিত। তাঁহাতে অশ্রু পুলক স্বেদ কম্প প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক মহাভাবের লক্ষণ দেদীপ্যমান দেখিয়া সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া যাইত। গৌরাঙ্গের আগমনে গৌড়নগরে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

"গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজে তার রামকেলি নাম॥
দিন পাঁচ সাত প্রভু সেই পুণ্যস্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে॥
সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সর্ব্বলোকে শুনিলেন চৈতন্য বিজয়॥
সর্ব্বলোকে দেখিতে আইসে হর্ষমনে।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জ্জনে॥
নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেম ভক্তি বিনা আর নাহি কোন রঙ্গ॥
হুঙ্কার গর্জন কম্প পুলক ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পাড়েন ঘনে ঘন॥
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
তিলার্দ্ধেক অন্যকর্ম্ম নাহি কোন ক্ষণ॥
হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া।
লোক শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া॥
যদ্যপিও ভক্তিরসে অজ্ঞ সর্ব্বলোক।
তথাপিও প্রভু দেখি সভার সন্তোষ॥
দূরে থাকি সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ করি।
সবেমিশি উচ্চকরি বলে হরি হরি॥
শুনিমাত্র প্রভু হরি নাম লোকমুখে।
বিশেষ উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ সুখে॥
... ...
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর রায়।
যবনেও বলে হরি অন্যের কি দায়॥
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য অবতার॥
নির্ভয় হইয়া সর্ব্বলোক বলে হরি।
দুঃখশোক ঘর দ্বার সকল পাশরি।
... ...
নিরন্তর সন্ন্যাসীর উর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় যেন পুলক মণ্ডলী॥
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্র জনেও ধরিবারে শক্তি নয়॥
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে॥
কখন বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্ট অট্ট দুই প্রহরেও ক্ষমা নয়॥
কখন মূর্চ্ছিত হয়, শুনিয়া কীর্ত্তন।
সবে ভয় পায় কিছু না থাকে চেতন॥
কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি নাহি শুনি॥
কহিলাম এই মহারাজ তোমাস্থানে।
দেশ ধন্য হইল এ পুরুষ আগমনে॥"

চৈতন্য ভাগবত—অন্তখণ্ড।

যে দুর্দ্ধর্ষ যবনরাজ হুসেন সা উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এক সময়ে হিন্দু দেবমূর্ত্তি দেউলাদি নষ্ট করিয়াছিল, সেই হুসেন সা নগররক্ষকের প্রমুখাৎ চৈতন্যের অলৌকিক মহিমা ও কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কোন প্রকার উৎপীড়ন করা দূরে থাকুক গৌরচন্দ্র যাহাতে স্বচ্ছন্দে গৌড়নগরে প্রেমভক্তি বিলাইতে পারেন তাহার উপায় করিয়া দিলেন।

"এই আজ্ঞা করি রাজা গেল অভ্যন্তর।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর॥
যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥

হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।”

চৈতন্য ভাগবত অন্তখণ্ড।

এই অবস্থায় রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্যের সহিত রূপ সনাতনের মিলন হয়। রূপ সনাতনের ভক্তি নিষ্ঠা বিনয় দৈন্য দেখিয়া চৈতন্য পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, তোমরা যখন বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনাদের হীনতা অনুভব করিতেছ, এখন শ্রীহরি তোমাদিগকে সত্বরেই উদ্ধার করিবেন। তোমরা বিষয় ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তমানস হও। আমি পশ্চাৎ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সবিশেষ বলিব। এই বলিয়া গৌরাঙ্গ যাবনিক নামের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে রূপ সনাতন এই দুই নাম দিয়া বিদায় করিলেন।

“আমার ঠাঁই আইল।
রূপ সনাতন নাম॥
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥
বিদ্যাভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন॥
তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হয়্যা তবে কহিল তাঁহারে॥
উত্তম হয়্যা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে॥”

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড।

“আইলেন যবে শুনি রূপ সনাতন।
রাত্রি যোগে গিয়া লইল চরণে স্মরণ॥
বহু স্তুতি নতি করি চরণে পড়িয়া।
আর্ত্তনাদ করে অতি বিষাদিত হইয়া॥
প্রভু বড় কৃপা কৈল দয়ার্দ্র হইয়া।
সংক্ষেপে কহিল কিছু উপদেশ দিয়া॥
বিষয় ত্যজিয়া হও নিশ্চিন্ত মানস।
পশ্চাৎ মিলিব আমি কহিব বিশেষ॥
... ...
রূপ সনাতন নাম দুহুঁকারে দিয়া।
পুনঃ ফিরি পুরুষোত্তম গেলেন চলিয়া॥”

ভক্তমাল গ্রন্থ।

রূপ সনাতন গৌরচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। পৃথিবীর ধন জন সম্ভ্রম সম্পত্তি সুখ সৌভাগ্য সমস্তই অসার, বিষয়লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মানস হইয়া হরিচরণাশ্রয় করাই কেবল মানব জীবনের সার্থকতা ও শান্তিলাভের হেতু এই ভাব তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইল। বৈরাগ্যের তীব্র অনল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রূপ সনাতন দরিদ্র ছিলেন না। পাৎসাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মান সম্ভ্রম অর্থ বিত্তে তাঁহারা পাৎসাহের নিম্নেই পরিগণিত হইতেন। কিন্তু “ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ” অর্থ বিত্তেতে মানবাত্মার তৃপ্তি নাই। মনুষ্য শতবর্ষজীবী পুত্র পৌত্র লাভ করুক, হস্তী হিরণ্য অশ্বাদির অধিপতি হউক অথবা মহদায়তন ভূমির অধিকারী হউক, তাহার অন্তরাত্মা কিছুতেই যথার্থ তৃপ্তি ও আরাম লাভ করিতে পারে না। “যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি” ক্ষুদ্র বিষয় রাজ্যে সুখ নাই, ভূমা পরমেশ্বরেতেই মানবাত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি। মানবের অন্তরে যে মুহূর্ত্তে অনন্ত ভূমা পরমেশ্বরের মঙ্গল ভাব প্রস্ফুটিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি তাহার অনুরাগ হ্রাস হইয়া যায়। যথার্থ বৈরাগ্যের লক্ষণ এই যে, প্রাণ মন যতই ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হইবে তদিতর পদার্থের প্রতি ততই বিরাগ উপস্থিত হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষয়কামনা ও বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তের বিক্ষিপ্তি অপরিহার্য্য। বিক্ষিপ্ত চিত্তে পরমাত্মার শ্রবণ

মনন অসম্ভব। এই জন্য ভক্ত সাধক ও যোগার্থীরা বিষয়কামনা পরিহার করিয়া নিশ্চিন্তমানস হইবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। সংসারের সহিত সমুদায় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা বিষয়কামনা ত্যাগের অর্থ নহে। বিষয়ের প্রতি পূর্ণ আসক্তি পরিত্যাগ করাই তাহার তাৎপর্য্য। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বোধে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহারা বিষয়বিষে জর্জ্জরিত না হইয়া শান্তি সম্ভোগ করেন। ফলতঃ সুমিষ্ট সুপক্ক সুরসাল ফল ভক্ষণ করিলে যেমন আর নিম্বফলের প্রতি আস্থা থাকে না, সেইরূপ যাঁহারা জীবনে একবারও ঈশ্বরপ্রেমের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর কুটিল সংসারের সেবা করিতে পারেন না। সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ শ্রীচৈতন্যের পবিত্র সহবাস ও ভক্তিবিগলিত মধুর উপদেশ এবং দেবপ্রসাদে রূপ সনাতনের চিত্তভূমিতে প্রেমভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। মধুমত্ত মধুকরের ন্যায় হরিচরণারবিন্দ তাঁহাদের এখন একমাত্র আশ্রয়। বৈরাগ্যের কি অমোঘ প্রভাব! এই বৈরাগ্যের প্রভাবেই কপিলবস্তুর রাজকুমার ইন্দ্রের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য প্রমোদকানন জীবনতোষিণী পতিপ্রাণা প্রণয়িনী ও সুকুমার শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা নিমাইচন্দ্র বৈরাগ্যের তেজে উদ্দীপ্ত হইয়াই শচীমাতার স্বর্গীয় স্নেহের বন্ধন ছেদন করিয়াছেন। নিরপরাধা বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রুসিক্ত বিষণ্ণ মূর্ত্তিকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

রূপ সনাতনের কঠোর বৈরাগ্য ও ভগবৎনিষ্ঠার বিষয় শ্রবণ করিলে স্বার্থান্ধ ঘোর বিষয়ী ব্যক্তিরও মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রূপ সনাতন বিষয়বন্ধন মোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ রূপ গোস্বামী গৌড়নগর পরিত্যাগ করিয়া নৌকারোহণে বাসগ্রামে আসিলেন, এবং বিত্ত বিভব ধন রত্ন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও কুটুম্বগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন। সনাতন যদি সংসারধর্ম্মে থাকেন, তবে তাঁহার সাহায্য হইবে এই মনে করিয়া দশ হাজার মুদ্রা গৌড়ে কোন ব্যবসায়ীর নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া দিলেন। এ যাত্রায় গৌরাঙ্গের বৃন্দাবন যাওয়া হইল না। বহু লোক সমারোহে আড়ম্বর করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করা অবৈধ জ্ঞান করিয়া তিনি কানাই নাট্যশালা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার নীলাদ্রি অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং নীলাদ্রি হইতে শৈলকন্দরলতাকুঞ্জবেষ্টিত বনপথে বৃন্দাবন গমন করিতে মনস্থ করিলেন। শ্রীরূপ এই সংবাদ অবগত হইয়া গৌরের উদ্দেশে পুরুষোত্তমে দুইজন ভৃত্যকে প্রেরণ করিলেন। ভৃত্যেরা গৌরচন্দ্রের বৃন্দাবন গমনবার্ত্তা প্রেরণ করিবামাত্র শ্রীরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভকে সঙ্গে লইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ত্রিধারাধারিণী ত্রিবেণী সঙ্গম প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বল্লভের আর এক নাম অনুপম। "ষট্ সন্দর্ভ" প্রভৃতি বৈষ্ণশাস্ত্র প্রণেতা ভক্তিমান পণ্ডিতপ্রবর জীব গোস্বামী ইহাঁরই সন্তান।

"শ্রীরূপ সনাতন রহে রামকেলী গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে॥
দুই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল।
... ...
শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘর আইল বহুধন লঞা॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে॥

দস্তবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে রহে যদি ঘরে ॥
শ্রীরূপ শুনি প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বন পথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥
... ...
শীঘ্র আসি মোরে তাঁর দিবে সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিল ব্যবহার ॥"

চৈঃ চঃ মধ্যমখণ্ড।

"প্রথমে শ্রীরূপ গেল বিষয় ছাড়িয়া।"

ভক্তমাল গ্রন্থ।

সনাতন এখনও রাজকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার বিষয় বন্ধন উন্মোচিত হয় নাই। তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের অনল প্রধূমিত হইতেছিল, মন সদাই উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। সনাতন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজা আমাকে অনুগ্রহ করেন, এই রাজানুগ্রহই আমার বন্ধন। রাজা যদি কোনরূপে আমার প্রতি বিরক্ত হ'ন তাহা হইলে আমি এই যন্ত্রণাজাল হইতে অব্যাহতি পাই।

"এথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনেমন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন ॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয় ॥"

চৈঃ চঃ মধ্যমখণ্ড।

সনাতন মনে করিলেন, অসুস্থতার ভান করিয়া যদি রাজকার্য্যে অনুপস্থিত থাকি, তাহা হইলে রাজা বিরক্ত হইবেন, এবং রাজা বিরক্ত হইলেই আমার নিষ্কৃতি। সনাতন রাজদরবারে না গিয়া গৃহে রহিলেন এবং নির্জ্জনে পণ্ডিতগণের সঙ্গে শাস্ত্র অনুশীল করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ অবগত হইয়া রাজা চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া গিয়া বলিল, পীড়ার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহা শুনিয়া গৌড়েশ্বর স্বয়ং সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমাব্যতীত রাজকার্য্য অচল হইয়াছে, তোমার এক ভাই রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ফকির হইয়া গেল। তুমি কার্য্যে না গিয়া গৃহে বসিয়া রহিয়াছ। তোমার মনের কথা আমাকে খুলিয়া বল। এই সময় উড়িষ্যার রাজার সহিত হুসেন সাহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। পাৎসাহের ইচ্ছা সনাতন তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। সনাতন বলিলেন, আমার দ্বারা আর রাজকর্ম্ম হইয়া উঠিবে না, আপনি অন্য লোক নিযুক্ত করুন। সনাতনের বাক্যে রাজা মহাক্রুদ্ধ হইলেন এবং পলাইতে না পারে এই জন্য সনাতনকে কারাগারে বন্দী করিয়া যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্রধান রাজমন্ত্রী সনাতন বন্দীশালে অতিকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় শ্রীরূপের পত্র আসিয়া পৌঁছিল। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন আমরা দুই ভাই চৈতন্য চরণ দর্শনের জন্য চলিলাম, তুমি যেরূপে পার ছুটিয়া আইস।

"অস্বাস্থ্যের ছদ্মকরি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল নবাব রাজ দ্বারে ॥
লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনে স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥
... ...
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল ॥
আমার কিছু কার্য্যে সব তোমাকে লইয়াঁ।
... ...
মোর যত কার্য্য কাম সব হৈল নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সাবধান ॥

ক্রুদ্ধ হয়্যাঁ রাজা কহে আরবার।

... ...

এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্য নাশ॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা॥

... ...

তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন।"

চৈঃ চঃ মধ্যম খণ্ড।

"শ্রীসনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন।
বৈরাগ্যের পথে সদা রাখিল নয়ন॥

... ...

রাজাকহে তোমার মনের কথা কিবা।
কার্য্যে নাহি যাহ নাহি বুঝি কি করিবা॥
এক ভাই তোমার ফকির হৈয়া গেলা!
তুমিহ তাহাই বুঝি করিবা ভাবিলা॥
তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম।
আমা হইতে আর নাহি চলিবেক কর্ম্ম॥
তথ্য বুঝিয়া সনাতনে রাখে কারাগারে।

ভক্তমাল গ্রন্থ।

"বৃন্দাবন চলিয়া প্রভু আসিয়া কহিল॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঁই।
বৃন্দাবন চলিল শ্রীচৈতন্য গোসাঞি॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হইতে॥
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে।
তাহা দিয়া কর শাঘ্র আত্ম বিমোচনে॥
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন॥"

চৈঃ চঃ মধ্যমখণ্ড।

এদিকে গৌরচন্দ্র প্রয়াগতীর্থে উপনীত হইয়া বিন্দুমাধব দেবদর্শনে বহির্গত হইয়াছেন, শত শত লোক তাঁহার অনুগামী হইয়াছে। দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গৌরের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। প্রেমাবেশে হরিধ্বনি করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী প্রেমে বিগলিত হইয়া নাম সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছে। প্রেম ভক্তির মহাভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছে। প্রমত্ত ভক্তগণের নামকোলাহল গভীর হরিধ্বনি ও প্রেমোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড বন্যাতে যেন প্রয়াগ নগর ডুবিয়া যাইতেছে।

"কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেঁহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে॥"

চৈঃ চঃ মধ্যমখণ্ড।

এই সময়ে শ্রীরূপ ও অনুপম প্রয়াগে উপনীত হইলেন। কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত বিপুল জনস্রোতে তাঁহারা কোথায় ভাসিয়া গেলেন। তার পর দাক্ষিণাত্যবাসী এক বিপ্রগৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া চৈতন্যচন্দ্র নিভৃতে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তৃণগুচ্ছ দন্তে করিয়া দীনহীন অকিঞ্চন বেশে শ্রীরূপ ও বল্লভ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরসুন্দরের প্রেমরঞ্জিত রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিযা তাঁহারা প্রেমে পুলকিত হইয়া দুব হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

"বিপ্রগৃহে প্রভু আসি নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা॥
দুই গুচ্ছতৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হয়্যাঁ॥"

চৈঃ চঃ মধ্যমখণ্ড।

বিষয়পাশমুক্ত ব্যাকুলহৃদয় বৈরাগী শ্রীরূপকে দর্শন করিয়া চৈতন্যের মন প্রসন্ন হইল; আইস আইস বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং॥"

এই শ্লোক পাঠ করিয়া দুই ভাইকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

"প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দুঁহার॥

শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হইল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয় কূপ হইতে কাটিল দুই জন॥
... .
এত কৃপা পায়াঁ দোঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হইয়া স্তুতি করে বিনয় আচরি॥"

চৈঃ চঃ মধ্যম খণ্ড।

ক্রমশঃ।

বন্ধন ও মোক্ষ।

জগতের অনুপম রচনা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, যে সেই জগৎপিতা পরমেশ্বর তাঁহার সুবিশাল সৃষ্টিকে মুখ্যতঃ তিনটি প্রধান ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন জড়, পশু ও মনুষ্য। জড়-জগৎ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিকাল হইতে বিধিবদ্ধ নিয়মসমূহের একান্ত অধীন; পশু-জগৎ তাহাদের স্বস্ব সংস্কারের যার পর নাই বশবর্ত্তী; মনুষ্য—কিন্তু এই উভয়েরই অতীত; মনুষ্যের ইতর প্রাণীবৃন্দের সহিত যতটুকু সম্বন্ধ ততটুকুই সে সংস্কারের অধীন; কিন্তু তদ্ব্যতীত আর আর সমুদয়েরই জন্য মনুষ্য কোনরূপ অবহমানকালনিবদ্ধ নিয়মপ্রণালীর অধীন নহেন। সম্পূর্ণরূপে স্বীয় ইচ্ছার অধীন। যতই মনুষ্যতত্ত্ব আলোচনা করা যায়, ততই মনুষ্যসৃষ্টিতে ঈশ্বরের অনুপম জ্ঞান অতুলন রচনাচাতুরী দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়। বলিতে কি মনুষ্যসৃষ্টিতেই যেন ঈশ্বরের সৃষ্টিনৈপুণ্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মনুষ্যস্বভাবের বিচিত্রতার প্রসর এক কথায় বলিতে গেলে ঘোরতমসাচ্ছন্ন বিভীষিকাময় নরকের অতলস্পর্শগর্ভ হইতে পুণ্যজ্যোতিতে জোতিষ্মান অতি পবিত্র স্বর্গরাজ্যের উচ্চতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বলিতে হইবে। মনুষ্য সাধনাপ্রভাবে আপনাকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করিলে ঈশ্বরের পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বীয় জীবন সার্থক করিতে পারে, অথবা পাপমলিনতা আপনার উপরে সঞ্চিত করিয়া তাঁহার পদতল হইতে বহুদূরে গমন করিয়া অশান্তির রাজ্যে পাপবিকারে জীবন ক্ষেপ করিতে পারে। মনুষ্যের উন্নতি অধোগতির জন্য সে সম্পূর্ণরূপে দায়ী। মনুষ্যের এই দায়ীত্ব থাকাতেই সে ধর্ম্মরাজ্যের প্রজা; ধর্ম্মের বন্ধন, কর্ত্তব্যের বন্ধন সৃষ্ট অন্যান্য পদার্থের মধ্যে কেবল তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আপনার কক্ষপথে ঘূর্ণিত হইতেছে, সিংহ ব্যাঘ্র অন্যান্য পশু পক্ষী জীবিকা নির্ব্বাহার্থে ধরাপৃষ্ঠে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু তাহারা আপন আপন কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছুই অবগত নহে; কিন্তু মনুষ্য স্বাধীন হইয়াও কঠোর ধর্ম্মনিয়মের অধীন—সামান্য বলশক্তিবিশিষ্ট হইয়াও, শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম ধর্ম্মপথে পদচারণা করিতে বাধ্য।

সপ্তবিতস্তিপরিমিত নরদেহে কি বল নাই, তাহার অন্তরে কি শক্তিসামর্থ্য বিদ্যমান নাই, যাহার বলে বলী হইয়া সে ঈশ্বরের কঠোর নিয়মে আপনাকে নিয়মিত করিতে পারে, পাপ তাপের তীব্র আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে, রিপুকুলের প্রবল ঘূর্ণায় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়? ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টির ভূষণ করিয়াও কি তাহাকে দিব্যবলে বলীয়ান করিয়া দেন নাই, যাহাতে তাঁহার সুমহান লক্ষ্য সংসিদ্ধ হইতে পারে, তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের গৌরব সুরক্ষিত হইতে পারে? শমীতরুর ন্যায় সারবান পদার্থে আমারদের অন্তর্দ্দেশ

সুগঠিত করিয়া দিয়া তিনি কি আমারদের চক্ষুকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন নাই যে তাহার বলে সংসারসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিতে পারি? তিনি কি অমোঘ বাণে অক্ষয় তূণীরে আমাদিগকে অলঙ্কৃত রাখিয়া পাপ প্রলোভনের—পুণ্যের আকর্ষণের মধ্যে আমাদিগকে স্থাপিত করেন নাই যে সংসার সমরে অক্ষতশরীরে আমরা বিজয় লাভ করিতে পারি? তিনি ত আমারদের স্নেহময় পিতা করুণাময়ী মাতা, তিনি ত আমারদের চিরসঙ্গী, তিনি ত একমুহূর্ত্তের জন্য আমারদের প্রতি উদাসীন নহেন, তাঁহার সকরুণ স্নেহদৃষ্টি ত আমারদের উপরে দিনযামিনী নিপতিত রহিয়াছে; তিনি চান যে আমরা প্রতি পদনিক্ষেপে এই বিষম পরীক্ষাক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিতে থাকি।

কিন্তু আমরা এমনই দুর্ব্বল জীব, আমারদের মহৎ অধিকার বিষয়ে এমনই উদাসীন, যে আমরা তাঁহার দৈববলে বলীয়ান হইয়াও রসাতলের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি, তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছি, আপনার উপর দুঃখদারিদ্র ক্রমাগত আনয়ন করিতেছি। তাঁহার সুমধুর নাম ভুলিয়াও একবার উচ্চারণ করি না, পৃথিবীর মলিন সুখকে সর্ব্বস্ব জানিয়া জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিতেছি। আমারদের হৃদয় অজ্ঞানঅন্ধকারে আবৃত, ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশ আমারদের অন্তরে স্থান লাভ করিতে পারিতেছে না। তিনি যে আমারদের ইহকালের পিতা, পরকালের মাতা, চিরজীবনের চিরসঙ্গী তাহা আর আমরা অনুভব করিতে পারি না। পৃথিবীর সঙ্গে যে আমারদের সম্বন্ধ অচিরকাল স্থায়ী, তিনি যে আমারদের চিরসঙ্গী, তাহা আমারদের মোহকুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন অন্তরে বিভাসিত হয় না। তিনি যে আমারদের নিত্য সত্য বস্তু, পৃথিবীর মলিন সুখ শান্তি যে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় যার পর নাই অনিত্য তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এইরূপে আমারদের আত্মা অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুই শক্তির নিতান্ত অধীন হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা এই দুই শক্তির বন্ধনে কি চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিব, আমারদের আত্মাতে কি আর স্বর্গের বিমল জ্যোৎস্না নিপতিত হইবে না। আমারদের হৃদয়তন্ত্রীতে কি আর সুমধুর ব্রহ্মনাম অবিচলিত হইবে না। আমরা কি চিরকাল মুহ্যমান হইয়া শোক করিতে থাকিব। ঈশ্বরের রাজ্যে কেহ নিরাশ হইও না, আপনাকে পাপে তাপে মোহে প্রপীড়িত দেখিয়া ভগ্নোদ্যম হইও না। তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর, সরল হৃদয়ে প্রার্থনা কর, তিনি তোমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইবেন। পর্ব্বতসমান রাশি রাশি গরল ব্রহ্মনামে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। নিশ্চয় জানিও এমন কোন ভীষণ পাপ পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হয় না যাহা তাঁহার পবিত্র নামে অপসারিত হইয়া না যায়। তুমি যত কেন ঘোরতর পাপে আপনাকে কলঙ্কিত কর না, নিশ্চয় জানিও তোমার পাপ হইতে তাঁহার দয়ার পরিমাণ সহস্রগুণে অধিক।

জীব অজ্ঞানের যে শক্তিতে সংসারে আসক্তচিত্ত হইয়া স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিতে অসমর্থ হয় তাহার নাম আবরণ এবং যৎপ্রভাবে চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর যে জগৎমন্দিরে বর্ত্তমান নাই ইত্যাকার প্রলাপ বাক্য কহিতে থাকে তাহার নাম বিক্ষেপ। সুতরাং বিক্ষেপ অজ্ঞানের

চূড়ান্ত সীমা। ধর্ম্ম নাই ঈশ্বর নাই পরকাল নাই, আমি ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি, নিজের বলবুদ্ধির সাহায্যে অসামান্য সুখের সামগ্রীতে পরিবৃত রহিয়াছি, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি, এখানকার সুখই সর্ব্বস্ব বুঝিয়া এই সুখ লাভ করিবার জন্য দিন যামিনী পরিশ্রম করিতেছি। আমার চরমগতি পরম কল্যাণ বিস্মৃত হইতেছি ইহা অপেক্ষা অজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আর কি হইতে পারে, এই অজ্ঞান মনুষ্যের বন্ধন; মুক্তিলাভের এবং ঈশ্বরের দিকে গমন করিবার পক্ষে নিদারুণ প্রতিবন্ধক।

কিন্তু আমারদের এই ঘোরতর নরকের দ্বার হইতে উদ্ধার হইবার কি কোন উপায় নাই, মৃতপ্রায় অসাড় আত্মাকে সচেতন করিবার জন্য পরম পিতার নিকটে কি মৃতসঞ্জীবন ঔষধ নাই? আমরা কি চিরকাল তাঁহা হইতে দূরে থাকিব, ধর্ম্ম ঈশ্বরের স্বাদ গ্রহণ কি আমারদের দুর্ব্বল প্রযত্নে সংঘটিত হইবে না; ভয় নাই! সেই পরম মাতা আমাদিগকে প্রতিনিয়ত আহ্বান করিতেছেন, মাতার ন্যায় হৃদয়বন্ধুর ন্যায় সস্নেহে সাদরে সুমধুর বাক্যে বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত" বৎস তোমার ভয় নাই, তুমি উত্থান কর জাগ্রত হও আর কতকাল মোহে অভিভূত হইয়া থাকিবে, আর কতদিন আমাকে ভুলিয়া রহিবে, এই যে আমি তোমার সম্মুখে! উত্তম আচার্য্যের নিকট গমন কর—এবং ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অভ্যাস কর অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

চারিদিকে অমানিশার ঘোর অন্ধকার; ইহার মধ্যে বিদ্যুতপ্রকাশের ন্যায়—ঈশ্বরের আবির্ভাব ক্ষণকালের জন্য হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে, মনুষ্যহৃদয়ের লৌহ কবাট ঈষৎ প্রমুক্ত হইয়া যায়, এবং তাহার মধ্যদিয়া সেই প্রেমসূর্য্যের সুবিমল রশ্মি অন্তঃপ্রদেশের মোহজালের উপরে নিপতিত হইতে থাকে। মনুষ্য বিষয়সুখে বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবনে আত্মার ক্ষুধা নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের দিকে ঈশ্বরের দিকে পদনিক্ষেপ করিতে থাকে। তখন শাস্ত্রপাঠ বা আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণে তাহার ব্যাকুলতা আইসে। মনুষ্য আপনার হীন ও মলিন অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরপ্রতিপাদক জীবন্ত সত্য সকল আলোচনা করিয়া অথবা আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনার দীন-হীন-মলিন আত্মাতে শান্তিকল্যাণের শীতল বারি সিঞ্চন করিতে থাকেন।

মনুষ্য যে পর্য্যন্ত না মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় ঈশ্বরের উজ্জ্বলপ্রকাশ আপনার অন্তরে অনুভব করেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ পিতামাতা জানিয়া তাঁহাতে মনঃসমাধান করিতে সমর্থ হন, তত দিন শাস্ত্রপাঠ বা আচার্য্যের উপদেশশ্রবণই তাঁহার শ্রেয়। ইহাই মনুষ্যের পক্ষে মোক্ষলাভের প্রথম সোপান বলিয়া শাস্ত্রকারগণের উক্তি আছে। এ অবস্থা মনুষ্যের পক্ষে পরোক্ষ জ্ঞানের অবস্থা।

ধর্ম্মের এমনই বিচিত্র ভাব, ঈশ্বরের এমনই করুণা যে মনুষ্য তাঁহার পথের পথিক হইলে তিনি বিমল আত্মপ্রসাদ তাহার আত্মাতে প্রেরণ করিয়া, আনন্দের পর আনন্দ বিধান করিয়া ক্রমাগতই আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। ঈশ্বরের যে করুণা ঘোরতর নারকীর পাষাণ হৃদয়ের মৃতসঞ্জীবন ঔষধ, তাহাই আবার পুণ্যাত্মার পবিত্রতর লোকের—উন্নততর ধামের একমাত্র পথপ্রদর্শক সম্বল ও

ভরসা। ঘোর জলপ্লাবনের সময় প্রভূত জল রাশি যেমন ভাগীরথীর সঙ্কীর্ণ বন্ধন ভগ্ন করিয়া নগরগ্রামসমন্বিত সমুদয় বঙ্গের পৃষ্ঠদেশ আপ্লাবিত করিয়া দেয়, সেইরূপ ঈশ্বরের করুণাবারি হৃদয়দেশে নিপতিত হইতে হইতে যখনই আবার তাঁহার প্রসাদে অবিরল ধারে হৃদয়মধ্যে পতিত হইতে থাকে, তখন সমুদয় অন্তর্দ্দেশ তাঁহার প্রেমবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, পাপ তাপ সংসারবন্ধনের কারণ বিচ্ছিন্ন হয় এবং রিপুকুলের ভীষণ দুর্গ বিচূর্ণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু সে অবস্থা পরোক্ষজ্ঞান অপেক্ষা উন্নততর অবস্থা; সে অবস্থায় ঈশ্বরে প্রীতি অপরের মুখে তাঁহার মাহাত্ম শ্রবণে বা শুদ্ধ কেবল শাস্ত্র পাঠে পর্য্যবসিত হয় না। এ অবস্থা ঈশ্বরকে আত্মস্থ করিবার অবস্থা, তাঁহাকে আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ রূপে অনুভব করিবার অবস্থা; সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার মহান ইচ্ছার সহিত আমারদের ক্ষুদ্র ইচ্ছার লয় সাধনের অবস্থা। সাধন প্রভাবে তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জানিয়া,তাঁহাকে হৃদয়ে সর্ব্বদা সমানরূপে অনুভব করিবার অবস্থা। তিনি যে আমারদের, আমরা যে তাঁহার একমাত্র অধীন; তিনি যে আমারদের স্বামী; আমরা যে তাঁহার একমাত্র আদেশানুবর্ত্তী, তিনি যে আমার কর্ত্তা, আমি যে তাঁহার চিরানুগত, আমার ইচ্ছা যে কিছুই নহে, তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা যে সর্ব্বস্ব, তিনি যে আমারদের অন্তরেই রহিয়াছেন, আমারদের সত্তা যে তাঁহা হইতে অতিরিক্ত নহে, আমরা যে তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছি, তাঁহার সত্তাতে প্রতিষ্ঠাবান হইতেছি, তাঁহারই নিয়ন্তৃত্বে নিয়মিত হইতেছি এই সকল হৃদয়ঙ্গম করিবার অবস্থা। ইহাই শাস্ত্রকারগণের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান। মনুষ্য তখন অন্নময়াদি কোষের অনিত্যতা বুঝিতে থাকেন। সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে প্রতীতি করিতে থাকেন। এ অবস্থায়ও ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বিশেষ হিতজনক। শ্রবণ অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ বা গুরুমুখে ঈশ্বরের মহিমাপ্রতিপাদক উপদেশ শ্রবণ; মনন অর্থাৎ পরব্রহ্মবিষয়ক চিন্তন; নিদিধ্যাসন অর্থাৎ অন্তঃকরণের একাগ্রতাসাধন; এই সকল দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধ নিবারিত হইয়া যায় এবং অন্তর্দেশে ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশ মেঘবিনির্মুক্ত পূর্ণ শশধরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকে।

অপরোক্ষ জ্ঞান অন্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে মনুষ্য তাঁহাকে অন্তরতম প্রিয়তম সুহৃদ ও আপনার সর্ব্বস্ব বলিয়া বুঝিতে থাকেন। তখন তিনি বলিতে থাকেন

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

তিনি পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয়—আর আর সকল হইতে প্রিয়—তাঁহা অপেক্ষা অন্তরতম প্রিয়তম সুহৃদ আর কেহ নাই। তখন তিনি সংসারের অনিত্যতা স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে থাকেন, সংসারের ক্ষতিবৃদ্ধি আর তাঁহার হৃদয়কে আবিল করিতে পারে না। প্রিয় বিচ্ছেদ বা অপ্রিয় সংযোগ তাঁহার নিকট তুল্যরূপে প্রতিভাত হয়—কেন না তিনি সংসারের অতীত সার ধনে ধনী। ঈশ্বরকে পাইয়া তিনি শোকের সান্ত্বনা, রোগের ঔষধ, বিপদের কাণ্ডারী পান। ভয় বিপদের তীক্ষ্ণ বাণ তাঁহাকে আর কোন যাতনা দিতে পারে না; তিনি ঈশ্বরকে পাইয়া

শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, হৃদয়গ্রন্থি হইতে প্রমুক্ত হন, এ অবস্থা উন্নততর অবস্থা ও মনুষ্যের পক্ষে—শোকাপনোদন অবস্থা।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।

এইরূপে মনুষ্য পরোক্ষে জ্ঞান হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের অবস্থায়, অপরোক্ষ হইতে শোকাপনোদনের অবস্থায় উত্থিত হন কিন্তু এখনও আর এক উচ্চতর অবস্থা তাঁহার জন্য—ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা পরমেশ্বর এখনও ধ্রুবলোক তাঁহার জন্য নির্ম্মাণ করিয়া রাখিছেন যাহা তাঁহার পবিত্র সাধক পরিশেষে লাভ করিতে পারিবে। এখনও পারিজাত-কুসুম-খচিত স্বর্গীয় মালা তাহার জন্য গ্রথিত রাখিয়াছেন যাহা তাঁহার বিজয়ী সন্তান সংসার-সমরে জয়লাভ করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করত আপনাকে অলঙ্কৃত করিবে। তাঁহার জ্ঞানে যিনি জ্ঞানী তাঁহার অঙ্গুলির নির্দ্দেশ ক্রমে যিনি আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারই পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন, তাহার জন্য অক্ষয় স্বর্গীয় সুখ কি না তিনি সঞ্চিত করিয়া রাখেন। "সেই যে তাঁহার সাধক ভক্ত সন্তান তিনি বিষয়-সুখের ঐন্দ্রজালিকত্ব অনুভব করিয়া তাহা আর প্রার্থনা করেন না বরং পরিহাস করত তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। অশেষরূপ কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ যাহার সঞ্চয়ে নানা দুঃখ, অপহরণে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ তাহার অসারতা দেখিয়া হাস্য করিতে থাকেন। আশ্চর্য্য যন্ত্র সদৃশ চঞ্চলস্বভাব অস্থিমাংসশিরানির্ম্মিত শরীরবিশিষ্ট মাংসের পুত্তলিকা স্বরূপ স্ত্রীলোকের মোহিনী শক্তি তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হয়! ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যেমন বিষ দ্বারা আপন উদর পূর্ত্তি করে না তদ্রূপ তিনি বিষয়ের অনিত্যতা জানিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হন না বরং পরিত্যাগ করিতে বাসনা করেন। তিনি দুর্ব্বল, অধিকারীর বিরোধী হন না"। যাহাতে অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রকৃত তত্ত্ববোধে অধিকারী হয়—প্রসন্ন চিত্তে শান্তভাবে তাহারই চেষ্টা করিতে থাকেন। এ সময়ে আনন্দের স্রোত তাঁহার অন্তরে বহমান হইতে থাকে। এ পবিত্র আনন্দের সহিত আর কোন পার্থিব আনন্দের তুলনা হইতে পারে না। এই যে নিরতিশয় আনন্দের অবস্থা ইহাই মুক্তির অবস্থা ও মনুষ্যের শেষ অবস্থা; ইহাই পবিত্র পরমেশ্বর তাঁহার প্রকৃত সাধু ভক্ত সন্তানকে কৃপা করিয়া প্রদান করেন, এই নিরতিশয় যোগানন্দ প্রেমানন্দ আর হৃদয়ের ক্ষুদ্র বেলা ভূমির মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না। ভক্ত সাধক একেবারে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকেনঃ—

"আমি নিত্য আত্মাকে সাক্ষাৎ জানিতেছি - অতএব আমি ধন্য, ব্রহ্মানন্দ আমার সমক্ষে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, অতএব আমি ধন্য। সাংসারিক দুঃখ আর আমাকে স্পর্শ করে না অতএব আমি ধন্য; আমার অজ্ঞান অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিয়াছে অতএব আমি ধন্য! লোকে আমার কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই (তাঁহাকে পাওয়াতে আমার প্রাপ্তিরই পরিসমাপ্তি হইয়াছে) অতএব আমি ধন্য, প্রার্থনীয় বিষয় সকল এক্ষণে আমার সম্পন্ন হইয়াছে, অতএব আমি ধন্য। আমার এ প্রীতির উপমা আর কোন লোকে নাই, অতএব আমি ধন্য! আমাতে ধন্যবাদের আর পরিসীমা নাই। কি আশ্চর্য্য দৃঢ় পুণ্যফল আমার প্রীতি-

বৃক্ষে ফলিত হইয়াছে! আমার এ পুণ্য পরমাশ্চর্য্য, এই আশ্চর্য্য পুণ্যশক্তি হেতু আমিও পরমাশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য শাস্ত্র! কি আশ্চর্য্য গুরু! কি আশ্চর্য্য জ্ঞান! কি আশ্চর্য্য সুখ যাহা এইক্ষণে আমি লাভ করিতেছি”।

ধন্যোহং ধন্যোহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি।
" " ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টং।
" " দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষেঽদ্য।
" " স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি।
" " কর্ত্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।
" " প্রাপ্তব্যং সর্ব্বমদ্য সম্পন্নং।
" " তৃপ্তের্মে কোপমা ভবেল্লোকে।
" " ধন্যোধন্যঃ পুনঃ পুনঃ।
অহো পুণ্যমহোপুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ং।
অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তে রহো বয়মহো বয়ং।
অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ।
অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখং।*

কোন সম্ভ্রান্ত গৃহের স্ত্রীলোকের রচনা।

ব্যাকুলতা।

হে প্রভু তোমাকে আমি পাব বলে আশা করি!
খনি থেকে হিরা তুলে সাধ হয় গলে পরি।
তুমি কাছে থেকে বাজাও বাঁশী,
দূর ভেবে তাই শুন্‌তে আসি
চারি দিকে তাকিয়ে ভাসি নয়নেরি নীরেহে।
তোমাকে হে ভালবেসে
এবে, —তোমারি আশায় এসে
দাঁড়াইয়ে আছি এই ভব নদী তীরে হে—
অনাথের নাথ দয়াল হরি,
দেখা দিও দয়া করি
নহিলে এ প্রেম নীরে ডুবে বুঝি মরি হে;
তোমায়, চারি দিকে খুজি তাই
তবু দেখা নাহি পাই
কোথা আছ বলে দাও ও চরণ ধরিহে;
চরণ তরী লাগাও তীরে
তুলে লও হে হাতে ধরে—
নহিলে এ প্রেম নীরে ডুবে এ বার মরি হে,
ভাই বন্ধু কেবা কার,
তুমি সত্য, আপনার
আমি মিথ্যা তোমা ‘কোথা’ পাব।
বুঝি—অকুলের মাঝে ভেসে যাব।
কি জানি পাব কি হায়
প্রাণ ত বোঝে না তায়
তোমাকেই ভাবি দিবানিশি,—
না জানি পিপাসী প্রাণ কিসের প্রয়াসী।
তুমি ত আড়ালে থেকে
আমাকে হে ডেকে ডেকে
হয়ে গেলে সারা,—
কাছে থেকে কথা কও,
আড়ালে আড়ালে রও,
একি নাথ এ কেমন ধারা।
বিরল বিজন যথা
তোমারে ডাকিব তথা
দেখি তুমি আস কি না আস
কি ভাবে বা কথা কও
কি রূপে বা দেখা দাও
প্রথমেতে কি বলিয়া ভাষ।

আমি ত দেখিনি প্রভু তুমি হে কেমন
তবে মন তোমা লাগি
কেন হয় অনুরাগী
পুজিতে বাসনা শ্রীচরণ।
দেখা পেলে এই প্রাণ প্রেমে দিব বলিদান
হৃদয় চন্দন মাখি মানস কুসুমে
দিব সুখে তোমার চরণে।
মরি তাতে ক্ষতি নাই
তোমারে যেন হে পাই
মিলি যেন তোমারই সাথ।
একদিকে তুমি ডাক
মায়া বলে থাক থাক
আর দিকে ডাকিছে বিষাদ,—
মরণ সাধিছে প্রতিবাদ।
দেখা দাও এই বেলা,
কি জানি গো ভবখেলা
কবে সাঙ্গ হবে,
কি জানি গো প্রাণ পাখী কবে উড়ে যাবে।
চারিদিকে ফিরে চাই
কোথায় কেহই নাই
মরুভূমি মাঝে দাঁড়াইয়া
নিরাশায় ভাঙে ক্ষুদ্র হিয়া।

---

* কালনা সাম্বৎসরিক উৎসবে বিবৃত।

বিবিধ উপায় খুঁজি,
হাতে কিছু নাহি পুঁজি,
কি উপায়ে হব ভবপার ?
আমি হে উপায় হীন,
কাতরে চাহিছে দীন,
লও—লও—কোলে একবার।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

ইহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, একথা সত্য এবং জয়কিষণ পণ্ডিতও বলিলেন যে এইরূপ অবস্থা হইলে সৌভাগ্য। ইহাতে তথায় উপস্থিত একজন স্বার্থপরায়ণ পণ্ডিত যিনি সব ভাবকে বুঝিয়াও বুঝেন না এবং কথিত বিষয়ের ভাব গ্রহণ করিয়াও বুঝিলেন না, তিনি বলিলেন শূদ্র কথনই শ্রেষ্ঠ কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না।

তথন শিবনারায়ণ বলিলেন, তোমরা কাহাকে শূদ্র বল, শূদ্র বস্তুটা কি ? নিকৃষ্ট কার্য্য ও গুণের নাম শূদ্র,কিম্বা জীবের স্থূল শরীরের নাম শূদ্র অথবা জীবের সূক্ষ্ম শরীর স্বরূপের নাম শূদ্র। যদ্যপি জীবের সূক্ষ্ম শরীর স্বরূপের নাম শূদ্র বলা হয়, তাহা হইলে জীব একই ঈশ্বরের অংশ, সমান ভাবে সকল জীবই তুল্য। জীব যদি স্বরূপে শূদ্র হয়, তাহা হইলে সকল জীব শূদ্র। যদি জীবের স্থূল শরীরকে শূদ্র বলা হয় তাহা হইলে একই ধাতু হইতে হাড়, মাংস, রক্ত ইত্যাদি স্থূলশরীর নির্ম্মিত হওয়া প্রযুক্ত সকল জীবই শূদ্র। বস্তুতঃ জীবের স্বরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি সংজ্ঞা কথনই হইতে পারে না, ও হইবার সম্ভাবনাই নাই। কেবল অবস্থাভেদে গুণ ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে সামাজিক নিয়ম মতে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি সংজ্ঞা বলা হয় কিন্তু স্বরূপ পক্ষে ইহার কিছুই নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কার্য্য করেন এবং যে ব্যক্তিতে উত্তম গুণ বর্ত্তায় সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ ও যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট কার্য্য করে ও যাহাতে নিকৃষ্ট গুণ প্রকাশ পায় সেই শূদ্র সংজ্ঞা জানিও। এবং প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে হিন্দুসমাজ হইতে কোন ব্রাহ্মণ, মুসলমান কিম্বা খ্রিষ্টীয়ান হয় তথন তাহাকে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহই গ্রহণ করেন না তাহাকে অতি ঘৃণা করে ও তাহার গাত্রস্পর্শ করিতেও সকলে ইচ্ছা করেন না, বলে অমুক ব্যক্তি এথন খ্রিষ্টীয়ান অথবা মুসলমান হইয়াছে, উহার জাতি নাই। ইহা কেবল সেই ব্যক্তি যে আপনার সমাজজাত গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া অপরের সমাজ অনুযায়ী গুণ ও ক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছে তজ্জন্য গুণ ও ক্রিয়া ভেদে তাহাকে মুসলমান অথবা খ্রিষ্টীয়ান শব্দে বলা হইল। নতুবা সে ব্যক্তি যথন হিন্দু ধর্ম্মে ছিল তথন সে যাহা ছিল, মুসলমান অথবা খ্রিষ্টীয়ান ধর্ম্ম মধ্যে আসিয়া তাহাই আছে; উহার শারীরিক বা ইন্দ্রিয় ঘটিত কোন রূপান্তর হয় নাই। উহার স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাহা ছিল তাহাই আছে এবং উহার অবয়বেরও কোন বিষয়ে কিছুমাত্র বিভিন্নতা হয় নাই, পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এথনও সেইরূপ আছে। কেবল গুণ ও ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বর শরীর গঠন করিয়া যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কার্য্য হইবে ও যে গুণ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশ পাইবে নিয়ম করিয়াছেন, যেথানে বা যে সমাজেই যাউক না কেন তাহার তিল মাত্র ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরাধীন কার্য্যে কাহার কিছু মাত্র তারতম্য করিবার ক্ষমতা নাই। নেত্রের যে গুণ তাহা নেত্রে থাকিবে, কর্ণের যে গুণ তাহা কর্ণে থাকিবে, এবং হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণের যাহার যে গুণ তাহা অবশ্যই ঘটিবে এবং যে ব্যক্তি জীব শব্দ বাচ্য সে যেথানেই যাউক স্বরূপে যাহা আছে সে স্বরূপে তাহাই থাকিবে, স্বরূপে খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান হইবে না। অর্থাৎ তাহার কিছুমাত্র তারতম্য হইবে না, কেবল নাম পরিবর্ত্তন মাত্র হইবে—ইহা না বুঝিয়া লোকে নানা প্রকার মিথ্যা ভ্রমে পড়িয়া থাকে।

তৃতীয় প্রশ্ন।

তথন পূর্ব্বোক্ত মাড়ওয়ারি পুনরায় স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ ! আমাদের হিন্দু সমাজ হইতে যদি কেহ খ্রিষ্টীয়ান কিম্বা মুসলমান হয় এবং যদি পুনরায় তাহারা হিন্দু সমাজে আসিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে উহাদিগকে আমরা হিন্দু ধর্ম্মে লইতে পারি কি না ? তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন যে, হে শ্রোতাগণ, তোমরা গম্ভীর ও শান্তরূপে বিচার করিয়া দেথ যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে আপন উত্তম গুণ প্রদান করিয়া আপনার স্বরূপে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদে লয়েন। প্রমাণ—যেরূপ স্থূল পদার্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠবস্তু অগ্নি যত নিকৃষ্ট স্থূল পদার্থকে দগ্ধ করিয়া আপনার স্বরূপ করিয়া লয়েন অর্থাৎ চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়কে সমানরূপে ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপে এক করিয়া লয়েন এবং অগ্নি স্বয়ং শ্রেষ্ঠ পদে শুদ্ধরূপে থাকেন। এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় নদীর জল সমুদ্রে গিয়া পড়ে ও সমুদ্র সেই সমুদায় জল নিজের সহিত

মিশ্রিত করিয়া একই ভাবে পরিপূর্ণ থাকেন। এইরূপ যখন হিন্দুসমাজশ্রেষ্ঠ হিন্দুগণ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতেন ও করাইতেন, যখন হিন্দুর ন্যায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ গুণ অর্থাৎ তেজ, বল, বুদ্ধি, ইত্যাদি কোন সমাজে ছিল না তখন সকলকেই সমভাবে লইয়া চলিতেন। এক্ষণে তোমাদের, হিন্দুগণ নিজ সমাজ মধ্যে যদ্যপি কোন তেজীয়ান ও জ্ঞানবান অগ্নি ও সমুদ্রবৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকেন তাহা হইলে তিনি খ্রিষ্টীয়ান ও মুসলমান সমাজ হইতে কেহ হিন্দু সমাজে আসিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে ওঁকার অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম একবার অথবা দশবার শুনাইয়া তাহাকে অনায়াসে আপন ধর্ম্মে লইতে পারেন, তাহাতে কোন ভয় ও সংশয় নাই। এবং যদ্যপি তেজ ও বলহীন হন তাহা হইলে তাহাদের লইতে সাহস হইবে না এবং মনোমধ্যে ভয় গ্লানি উপস্থিত হইবে।

চতুর্থ প্রশ্ন।

পুনরায় সেই মাড়ওয়ারী ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ জয়কিষন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল যে, মহারাজ, ওঁকার সকলেই বলে; কিন্তু ওঁকার কি বস্তু, ওঁকারের স্বরূপ কি, এবং ওঁকার কোথায় থাকেন, এবং নিরাকার না সাকার? যদি নিরাকার হন তাহা হইলে অদৃশ্য, দেখা যাইবে না, মন বাণীর অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর; আর যদি সাকার হন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে। তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন, আমাকে কেন মিছা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সাক্ষাতে স্বয়ং মহাত্মা বসিয়া আছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে ঈশ্বরের নাম ওঁকার এবং অকার, উকার, মকার যুক্ত হইয়া ওঁকার হয়। তখন মাড়ওয়ারি বলিল, মহারাজ, যদি অকার, উকার, মকার এই তিন শব্দ ওঁকার হইতেছে তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপ ও আকার যুক্ত সাকার পদার্থ হইবে, নিরাকারে ত অকার উকার মকার হইতে পারে না—ইহা তো সৃষ্টি প্রকরণ হইল। নিরাকারে ত একই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ ভাবে আছেন কিন্তু সাকার হইলে, সাকার ব্রহ্মের নাম অ, উ, ম অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ ও বর্ণ আছে, শুক্ল রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই ত্রিগুণাত্মার নাম হইতে পারে। তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন যে, মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে সকল সংশয় নিবারণ হইবে। তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ, ঋষি, মুনি ও পণ্ডিতগণের যাহার অন্তর হইতে যেরূপ ভাব প্রকাশ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্য্যামি যেরূপে যাঁহাকে অন্তর হইতে দেখাইয়াছেন, তিনি সেইরূপে ওঁকারের শব্দার্থ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাদিগকে স্থূল করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছি ও বুঝাইয়া দিতেছি, তোমরা সূক্ষ্মভাবে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিও। নিরাকার পরব্রহ্মের ওঁকার নাম কল্পনা হয় নাই, যখন তিনি নিরাকার হইতে জগৎস্বরূপে বিস্তার হন, তখন সেই সাকাররূপ চরাচরকে লইয়া বিরাট সমষ্টি ঈশ্বরের শরীরকে, মুনি, ঋষি, মহাত্মা ইত্যাদি ভক্তগণ ওঁকার নামে কল্পিত করেন এবং এই ওঁকার নাম জপ করিলে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা হইয়া থাকে। এবং যখন নিরাকার হইতে সাকার হন, তখন অকার, উকার মকার, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিনগুণ উৎপন্ন হয়। এই তিন গুণ হইতে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে ও হইবে। রজোগুণ হইতে ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁহাকে ব্রহ্মা নাম বলিয়া উক্ত করা হয়। যখন সত্ত্বগুণ হইতে এই জগৎ চরাচরকে পালন করেন, তখন তাঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান প্রয়োগ করা হয়। এবং যখন তমোগুণে এই সৃষ্টিকে সংহার অর্থাৎ লয় করিয়া আপনার স্বরূপে স্থিতি করেন তখন তাঁহাকে বিশ্বনাথ কল্পনা করা হইয়াছে। এই তিনের নাম অকার, উকার ও মকার। প্রত্যক্ষ তেজ সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ দিবারাত্র প্রকাশমান আছেন। এবং সেই ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম অকার উকার মকার এই তিনভাগ হইতে সাত ভাগ হইয়া প্রত্যক্ষ সাকার স্বরূপে বিরাজমান আছেন। এই সাত ভাগের নাম কোন শাস্ত্রে সাত দ্রব্য বলে, কোন শাস্ত্রে সাত ধাতু বলে ও কোন শাস্ত্রে সাত বস্তু বলে এবং সেই সাতকে সাত ঋষিও বলে এবং জীবকে লইয়া অষ্টম, প্রকৃতিও বলে এবং গায়ত্রীর সপ্ত ব্যাহৃতীও বলে এবং তাহাকে সাবিত্রীও বলে অর্থাৎ এই ব্রহ্মেরই নাম যথা, ওঁ ভূঃ ওঁভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ইত্যাদি এবং ব্যাকরণে ইহাকে সাত বিভক্তি বলে। এই সাতের নাম প্রত্যক্ষ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ এবং জীবসংজ্ঞা লইয়া অষ্টম, প্রকৃতি শব্দ বলা হয়। এই সাত ভাগ ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম হইতে এই সকল চরাচর স্ত্রী ও পুরুষের স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের গঠন হইয়াছে। ওঁ ভূঃ যে পৃথিবী ওঁকার তাহা হইতে স্ত্রী ও পুরুষের হাড়মাংস গঠন হইয়াছে, ও জল ওঁকার হইতে রক্ত হইয়াছে, এবং অগ্নি ওঁকার হইতে অন্ন পরিপাক হইতেছে, ও বায়ু ওঁকার হইতে শ্বাস প্রশ্বাস সমষ্টি শরীরের মধ্যে চলিতেছে,

ও আকাশ ওঁকার হইতে স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি কর্ণ দ্বারে শব্দ শুনিতেছে, এবং ওঁঙ্কন শব্দে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ হইতে কণ্ঠ ভাগে সকলেই কথা বলিতেছেন, ও সূর্য্যনারায়ণ ওঁকার হইতে নেত্র দ্বারে সঙ্করূপ দৃষ্টি করিতেছেন এবং সেই জ্যোতিঃ দ্বারা সকল বেদ বেদান্ত বাইবেল, কোরান ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। এবং সেই জ্যোতির সঙ্গ করিয়া জীব কারণ পরব্রহ্মে স্থিতি করেন এবং সেই জ্যোতিঃ স্বরূপের সঙ্গ করিয়া ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হয়। ব্যাকরণে যে সপ্ত বিভক্তি আছে, তাহার মধ্যে প্রথমা বিভক্তিতে যে বিসর্গ (ঃ) আছে ইহার মানে এই যে নিরাকার হইতে যখন পরব্রহ্ম স্বাকার স্বরূপে বিস্তারিত হন তখন প্রথমা বিভক্তি বিসর্গ (ঃ) প্রকৃতি ও পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ বিসর্গ (ঃ) শব্দে কথিত হন এবং তিনিই চরাচরের নেত্র।

সমালোচনা।

বাসুদেব বিজয়। ইহা শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ন প্রণীত সংস্কৃত কাব্য, দ্বিতীয় সংস্করণ। এখন সংস্কৃত ভাষার তাদৃশ আদর নাই এবং লোকের রচনাশক্তিও দুর্ব্বল এজন্য নূতন কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম তর্করত্নের রচনাশক্তি এবং শ্লোকের প্রতি পংক্তি আমাদিগকে প্রাচীন কাল স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ভাষা সুমার্জ্জিত প্রাঞ্জল ও মধুর। এরূপ যমক রচনা অধুনা সম্ভবে না। স্থানে স্থানে বীরের উদ্দীপক বাক্যে দুর্ব্বলেরও শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। আমরা প্রদর্শনী পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। বুঝিলাম আধুনিক ভাব গুলিকে এরূপ প্রাচীন প্রণালীতে গ্রথিত করিতে এক তকরত্নই সমর্থ। ফলত ইহাতে প্রশংসা করিবার অনেক স্থল আছে। কিন্তু স্বল্পায়তন তত্ত্ববোধিনীর স্তম্ভে সঙ্কুলন হইবে না। আমরা অনুরোধ করি যাহারা সংস্কৃতজ্ঞ, কাব্যপাঠে যাঁহাদের কৌতূহল আছে তাঁহারা অন্তত একবার এই গ্রন্থখানি পাঠ করুন ইহাতে মোহিত হইবার অনেক স্থল পাইবেন। আমরা বহুকালের পর এরূপ একখানি সুরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ পাইয়া যার পর নাই প্রীত হইলাম। আশা করি তকরত্ন উৎসাহ পাইলে সংস্কৃত ভাষায় বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া পাঠকদিগকে তৃপ্ত করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর সারস্বত আশ্রমে বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী নিয়োগ।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা)
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়।
" শ্রীনাথ মিত্র।
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
" রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
" অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।
" আশুতোষ চৌধুরী।
" প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।
" সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" নিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ ও যন্ত্রাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

দ্বাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

৫৬৯ সংখ্যা

১৮১২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

দিন গেল।

আঁখি পালটিতে নিমেষ ধায়,
মুহূর্ত্ত পিছনে চলিছে রে।
দণ্ড দিয়া ফাকি বেগে পলায়,
প্রহর কেমন সরিছে রে॥
দেখিতে দেখিতে দিবস যায়,
আসিল রজনী ঘেরিয়া রে।
আহা কোথা দিয়া রাতি পোহায়।
দিবা নিশি গেল চলিয়া রে॥

জল সম চলে দিবস চয়,
পক্ষ মাস ঋতু হায়ন রে।
উলটিয়া গেলে বছর কয়,
ফুরাবে ফুরাবে জীবন রে॥
কে জানে এদিন মাস বছর,
হইবে কাহার চরম রে।
কর্‌হ সম্বল অমর নর!
হইবে সফল জনম রে॥

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ।

শ্রীচৈতন্য রূপ ও বল্লভকে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন এবং সনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপ বলিলেন, তিনি রাজদ্বারে বন্দীদশায় রহিয়াছেন, আপনি যদি উদ্ধার করেন, তবেই তিনি উদ্ধার হইবেন। চৈতন্য বলিলেন সনাতন কারাবাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, অচিরাৎ তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।

শ্রীরূপ ও অনুপম প্রয়াগেই রহিলেন। প্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া ভক্তগোষ্ঠীসহ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তৎকালে আম্বুলী গ্রামে বল্লভভট্ট নামা একজন জ্ঞানী ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। চৈতন্য রূপ ও অনুপমের সঙ্গে বল্লভভট্টের পরিচয় করিয়া দিলেন। তাঁহারা ভট্টাচার্য্যকে দূর হইতে প্রণাম করিলেন। ভট্টাচার্য্য আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলে "আমরা অস্পৃশ্য পামর আমাদিগকে স্পর্শ করিবেন না" এই বলিয়া রূপ ও অনুপম দূরে সরিয়া পড়িলেন। এই ব্যবহারে ভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইলেন; কিন্তু ইঁহাদের

দৈন্য বিনয় দেখিয়া চৈতন্য হর্ষে পুলকিত হইয়া ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, ভট্টাচার্য্য, তুমি একজন প্রবীণ কুলীন এবং বৈদিক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, তুমি ইহাদিগকে স্পর্শ করিও না, ইহারা অতি হীন জাতি। চৈতন্যের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ভট্ট বলিলেন, ইঁহাদের মুখে যখন নিরন্তর হরিনাম নৃত্য করিতেছে তখন ইহাঁরা যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"তবে ভট্ট মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁরে মিলাইল॥
দূর হইতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হঞা॥
ভট্ট মিলিবারে যায় দুঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে॥
ভট্টের বিস্ময় হইল প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ॥
'ইহা না স্পর্শিও ইঁহো জাতি অতিহীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥'
দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গি জানি॥
দোঁহার মুখে কৃষ্ণ নাম করিছে নর্ত্তন।
এদুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম।"

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড ১৯ অধ্যায়।

আম্বুলী গ্রামের পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রসন্নসলিলা যমুনা প্রবাহিতা। ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নিরন্তর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ এবং যমুনার সুচিক্কন শ্যামল বারিধারা সন্দর্শন করিয়া চৈতন্য প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। প্রেমোন্মত্ত নিমাইচন্দ্রের অদ্ভুত ভক্তিভাবের কথা শ্রবণ করিয়া দলে দলে দর্শকগণ আসিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আপনাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এখানে থাকিলে প্রেমভরে বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া কখন বা মধ্য যমুনাতে পড়িয়া যান, এই ভয়ে, ভট্ট, তাঁহাকে প্রয়াগে রাখিয়া আসিলেন। প্রয়াগে অবস্থান কালে চৈতন্য রূপ গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় ভাগবতসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রায় রামানন্দের নিকট যে সকল প্রেমভক্তির গূঢ় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে সে সমুদায় শিক্ষা দিলেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর স্বপ্রণীত সংস্কৃত "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটকে চৈতন্যের সহিত রূপ গোস্বামীর মিলন বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

"লোক ভিড় তরে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া।
রূপগোস্বাঞীকে শিক্ষা করান্ শক্তিসঞ্চারিয়া
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল॥
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ১৯ অধ্যায়।

রূপ গোস্বামীকে দশ দিন ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। গৌর বলিলেন, রূপ! তোমাকে সংক্ষেপে ভক্তি রসের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ভক্তিরসসিন্ধু পারাবারশূন্য অনন্ত গম্ভীর, তোমাকে তার বিন্দু মাত্র কহিতেছি। কেশাগ্র শতভাগ করিয়া পুনঃ শত ভাগ করিলে যাহা হয়, জীবের স্বরূপ তদনুরূপ সূক্ষ্ম। জলস্থলময় স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতে মনুষ্য অতি অল্প। মনুষ্যের মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর অধিকাংশ। বেদনিষ্ঠদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক মৌ-

থিক বেদনিষ্ঠ মাত্র। ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিয়া বেদনিষিদ্ধ পাপ কর্ম্মে তাহারা রত রহিয়াছে। ধর্ম্মাচারী লোকদিগের মধ্যে কর্ম্মনিষ্ঠ লোক অধিকতর, কোটি কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে একজন জ্ঞানী। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত,কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যে একজন হরিভক্ত সাধু অতি দুর্লভ। হরিভক্তেরা কামনাশূন্য এইজন্য শান্ত, ভক্তিতেই যথার্থ শান্তি। মুক্ত সিদ্ধ ও ফলকামীরা অশান্ত। ভাগবতে কথিত হইয়াছে,

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

হে মুনিশ্রেষ্ঠ শুকদেব! যে সকল ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কোটির মধ্যে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ প্রশান্তাত্মা অতি দুর্ল্লভ।

এই মত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥
প্রভু কহে "শুন রূপ! ভক্তি রসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার নাবার বর্ণন॥
পারাবার শূন্য গম্ভীর ভক্তিরস সিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারী॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক জল স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে॥
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলি অশান্ত॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ১৯ অধ্যায়।

হে শ্রীরূপ! গুরু এবং ভগবানের কৃপাতে ভাগ্যবান মানব ভক্তিলতাবীজ লাভ করেন। শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ জলে উক্ত বীজ সেচন করিলে তাহা হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করত সেই লতা গোলোক বৃন্দাবন ধামে হরিচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে, এবং তাহা হইতে প্রেমফল প্রসূত হয়। বৈষ্ণবাপরাধরূপ হস্তী যদি মস্তকোত্তোলন করে, তাহা হইলে ভক্তিলতা উৎপাটিত ও ছিন্ন হইয়া যায়। ভক্তিলতার সঙ্গে যদি ভোগবাসনা স্বর্গকামনা মুক্তিবাঞ্ছা লাভ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উপশাখা মিলিত হয়, তাহা হইলে সেকজল পাইয়া উপশাখাগণই বর্দ্ধিত হয়, মূলশাখা অর্থাৎ ভক্তিলতা আর বাড়িতে পায় না। এই জন্য প্রথমেই উপশাখা ছেদন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ হরিভক্তি লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ভুক্তি মুক্তি ও স্বর্গভোগ প্রভৃতি সমুদায় ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল হরিচরণাশ্রয় না করিলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সকল প্রকার সাধন ভজন বৃথা হইয়া যায়। এই ভক্তিলতা অবলম্বন করিয়া সাধক কল্পবৃক্ষ লাভ করেন এবং পরম সুখে সুপক্ক প্রেমফল রস আস্বাদন করেন। এই ভগবৎ প্রেমরসাস্বাদনই পরম ফল—পরম পুরুষার্থ। ইহার নিকট চারি পুরুষার্থ তৃণ তুল্য *। শুদ্ধ ভক্তি হইতে প্রেম উৎপন্ন

* সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

ভাগবত ৩য় স্কন্ধ।

সালোক্য অর্থাৎ আমার সহিত একলোকে বাস, সার্ষ্টি কি না আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি,সামীপ্য অর্থাৎ আমার নিকটে থাকা, সারূপ্য, আমার সমানরূপ পাওয়া এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য, আমার সহিত

হয়। শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ শ্রবণ কর। অন্য বাঞ্ছা, অন্যপূজা, শুষ্ক জ্ঞান কর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রভাবে সকল ইন্দ্রিয়ের আনুকূল্যে হরিপ্রেমরসানুশীলন করাই শুদ্ধ ভক্তি, ইহাকেই অহৈতুকী ভক্তি বলাযায়। পিশাচীতুল্যা ভোগবাসনা ও মুক্তিস্পৃহা হৃদয়ে অবস্থিতি করিলে বহু সাধনাতেও প্রেম উৎপন্ন হয় না। নারদ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে,

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত কি না অন্য বাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে পবিত্র ভাবে ইন্দ্রিয়াদির আনুকূল্যে ভগবদনুশীলন করার নামই ভক্তি। ভাগবতে লিখিত হইয়াছে,—

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥"

আমি সর্ব্বান্তর্য্যামী ও পুরুষোত্তম। আমার গুণ শ্রবণ মাত্র সাগরাভিগামি গঙ্গাসলিলের ন্যায় আমাতে অবিচ্ছিন্না ও ফলাভিসন্ধিশূন্যা এবং ভেদদর্শনবর্জ্জিতা মনের যে গতি তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাই অহেতুকী ও অব্যবহিত ভক্তি।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পান ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পর ব্যোম পায়।
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা।
উপারে বা ছিন্ডে তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হাতী যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তিবাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটি নাটি জীব হিংসন।
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাঁহা সেই কল্প বৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন॥
এইত পরম ফল, পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥
শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিরে লক্ষণ॥
অন্যবাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চ রাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ১৯ অধ্যায়।

ইক্ষুরস যেমন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া গুড় খণ্ডসার শর্করা মিছরি ও উত্তম মিছরি প্রস্তুত হয়, সেইরূপ সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হয়। রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলা যায়। প্রেমের ক্রমশঃ বৃদ্ধিতে স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমু-

অভিন্ন হওয়া এই পাঁচ প্রকার মুক্তি আমার ভক্তকে দিতে চাহিলেও আমার সেবা ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই গ্রহণ করেন না।

দায় ভক্তিরসের স্থায়ী ভাব, ইহার সহিত বিভাব অনুভাব অর্থাৎ উদ্দীপনা ও মনের পূর্ণ একাগ্রতা মিলিত হইলে ভক্তিরস অমৃত মধুর হইয়া থাকে। ভক্তের প্রকৃতি-ভেদে রতিভেদ পাঁচ প্রকার। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই পাঁচ প্রকার রতিভেদে হরিভক্তিরস পাঁচ প্রকার হয়। ভক্তিরস মধ্যে এই পাঁচটিই প্রধান। হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র ভয়ানক এবং বীভৎস এই সাতটি গৌণ রস। যে ব্যক্তি যে রসের ভক্ত তাহার হৃদয়ে সেই প্রধান রস স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি করে। সাধন ভজনে অগ্রসর হইলে আগন্তুক কারণ যোগে গৌণ রসেরও সঞ্চার হয়।

"সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম হয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি উত্তম মিছরি আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ী ভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥
সাত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর॥
ভক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্ত রতি দাস্য রতি সখ্য রতি আর॥
বাৎসল্য রতি মধুর রতি এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চ ভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণ ভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্ত মনে।
সপ্তগৌণ আগন্তুক পাই যে কারণে॥

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ১৯ অধ্যায়।

পুনশ্চ, ভক্তি দ্বিবিধ। ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা আর কেবলা। কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হীনা কেবল রাগময়ী। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে শান্ত দাস্য রস উদ্দীপিত হয়, কিন্তু বাৎসল্য সখ্য ও মাধুর্য্যরস সঙ্কুচিত হইয়া যায়।* কেবলা প্রেম ঐশ্বর্য্য দেখিলে আপ. সম্বন্ধ অঙ্গীকার করে না। ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হইয়া তাঁহাতে একাগ্র নিষ্ঠা হওয়াই শান্তরস। ভাগবতে ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন, আমাতে বুদ্ধির একান্ত নিষ্ঠাই শম।† ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি একমাত্র পরমেশ্বরকেই প্রার্থনা করেন। পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য বিষয়ে তাঁহার আসক্তি থাকে না। স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভকেও তিনি নরকের ন্যায় জ্ঞান করেন। শান্ত রসের দুই গুণ—পরমেশ্বরে একান্ত নিষ্ঠা ও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ। আকাশের গুণ শব্দ যেমন অন্যান্য সকল ভৌতিক বস্তু-তেই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ শান্তরসের গুণ দ্বয় সর্ব্বপ্রকার ভক্তের জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শান্তরসে ঈশ্বরের সত্তা মাত্রের জ্ঞান হয়, সুতরাং শান্তরসই ভক্তির পত্তনভূমি। গাঢ় প্রেমের মত্ততা শান্ত রসে হয় না। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সেবা সম্ভ্রম গৌরব ইহা দাস্য রস। সখ্য রসে বিশ্বাস, বাৎসল্য রসে মমতা, মধুর রস কান্তভাবে

* পরমেশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজগণ-রাজা সর্ব্বশক্তিমান মহান্ প্রভু, এই ভাব শান্ত দাস্য রসের প্রাণ। ইহা ভয় ও সম্ভ্রম মূলক, কিন্তু প্রেম মূলক নহে। বাৎসল্য সখ্য মধুর রসে এ প্রকার ভয় সম্ভ্রম প্রভুত্ব প্রভৃতি সঙ্কুচিত ভাব নাই। তাহা কেবল বিশুদ্ধ প্রীতিতে আত্ম সমর্পণের ব্যাপার; এই জন্যই বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহার নাম কেবলা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি সম্পর্ক শূন্য কেবল অনুরাগময়ী।

† "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখ সংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥"

ভাগবত—১১ স্কন্ধ।

আমাতে বুদ্ধির একান্ত নিষ্ঠার নাম শম, ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম, দুঃখ সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা, এবং জিহ্বা ও উপস্থ বশীকরণের নাম ধৃতি।

অসঙ্কোচ সেবা মমতাধিক্য আত্মসমর্পণ; এই সকল ভাব ক্রমান্বয়ে পরপর রসে অনুভূত হয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ভৌতিক গুণ সকল যেমন ক্রমান্বয়ে পরস্পর মিলনের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একাধারে ক্ষিতিতে মিলিত হইয়াছে, সেই প্রকার শান্তরসের গুণদ্বয় দাস্যরসে, দাস্যরসের গুণ সখ্যরসে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে ও বাৎসল্যের গুণ কান্তভাবে একাধারে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহা মাধুর্য্য রস নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মাধুর্য্য রসে সকল ভাবের সমাহার হওয়ায় ইহা আশ্চর্য্য এবং অমৃতাস্বাদযুক্ত। "হে শ্রীরূপ! ভক্তিরসের পথ মাত্র আমি প্রদর্শন করিলাম। ভক্তিরসসমুদ্রের অনন্ত বিস্তৃতি ও গাম্ভীর্য্য তুমি এখন আলোচনা কর।

"পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা, কেবলা ভেদ আর॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হীন।

... ...

ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥
শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুররসে সঙ্কোচন॥

... ...

কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥
শান্তরস স্বরূপ বুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীমুখ গাথা॥
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত, কৃষ্ণভক্ত একজানি॥
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণ ভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণ নিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সবভক্ত জনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন।
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বর জ্ঞান, সম্ভ্রম, গৌরব প্রচুর।
সেবাকরি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্য রসে হয় দুই গুণ॥
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যে সংভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়॥

... ...

বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্য রসের তিন গুণ চিন্॥

... ...

বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥

... ...

চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণভক্তরস গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানীগণে॥
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সমভাব সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্ দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড ১৯ অধ্যায়।

এই প্রকারে প্রেমভক্তি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রেমনিধি চৈতন্যচন্দ্রের ভাবসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, প্রেমময়

পরমেশ্বরের জ্বলন্ত প্রকাশ প্রাণে উপলব্ধি করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। প্রেম-রসে পরিপ্লাবিত হইয়া রূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং বলিলেন, রূপ! ভগবানের কৃপাই মূল, তাঁহার কৃপা হইলে সামান্য মূর্খেরাও ভক্তি সমুদ্র উত্তরণ করিতে পারে।

"ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হইল মন॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ১৯ অধ্যায।

শ্রীরূপকে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিয়া গৌরাঙ্গ বারাণসী গমন করিতে উদ্যত হইলে, রূপ বলিলেন, অনুমতি করেনত আমিও আপনার সঙ্গী হই। আপনার বিরহ আমি সহ্য করিতে পারিব না। গৌর বলিলেন, বৃন্দাবনের এত নিকটে যখন আসিয়াছ, তখন বৃন্দাবন ধাম দর্শনার্থ যাত্রা কর। তথা হইতে গৌড়দেশ হইয়া নীলাদ্রিতে আমার সহিত মিলিত হইও। চৈতন্যের আদেশে শ্রীরূপ ও বল্লভ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ।

বেহালা সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

আচার্য্য কুলাৎ বেদমধীত্য' যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়-মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সং প্রতিষ্ঠাপ্য অহিংসন্ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে।

ছান্দোগ্য শ্রুতি।

যথা বিধান গুরুর নিকট বেদাধ্যযন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দারগ্রহণ ও পরিচ্ছন্ন স্থানে বসবাস করিয়া নিজে অধ্যয়ন ও পুত্রাদিকে অধ্যাপনাদি দ্বারা ধর্ম্মপথে স্থাপন, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আত্মাতে প্রতিষ্ঠাপন ও অহিংসা ধর্ম্মের আচরণ করিয়া যিনি জীবন অবসান করেন তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুনরাবৃত্তি নাই, তাঁহার পুনরাবৃত্তি নাই।

মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি, আর কিরূপেই বা তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গল হইতে পারে এই শ্রুতিতে কএকটি সার কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। গার্হস্থ অপেক্ষা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের উপযোগি আশ্রম আর নাই এই জন্য এই শ্রুতিতে গার্হস্থ্যের বিধান আছে। ফলত গার্হস্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে আশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনাতে তাহার উপযোগি গুণের সমাবেশ চাই, নচেৎ আশ্রম ধর্ম্ম সম্যক প্রতিপালিত হইতে পারে না, এই জন্য এই শ্রুতিতে বেদাধ্যয়নের বিধি আছে। ব্যবহার কালে দেখা যায় গার্হস্থ্যে মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব এই দুএরই অনুকূল কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু মনুষ্যকে জ্ঞানে ও আচরণে বলীয়ান করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ ধর্ম্মে অধিকারী করা এই আশ্রমের প্রধান লক্ষ্য, ফলতঃ তৎসিদ্ধির জন্যই মাতার ন্যায় হিতকারিণী শ্রুতি জ্ঞানচর্চ্চার সহিত ব্রহ্মচর্য্য করিতে বলিয়াছেন। জ্ঞানবলে ভাবী গার্হস্থ্যের বিধি নিষেধের উপলব্ধি হয় আর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য তৎপ্রতিপালনে শক্তি সঞ্চার করিয়া দেয়। এই ব্রহ্মচর্য্য কেবল তেজোধাতুর নিরোধক নয় কিন্তু কাম ক্রোধাদি যে কএকটি বৃত্তি বলবতী হইয়া মনুষ্যকে পশুত্বে আনিয়া ফেলে ইহা তৎ সমুদায়েরই নিরোধক। ফলতঃ শরীরের পৃষ্ঠবংশ যেমন সর্ব্বশরীরকে সুদৃঢ় বন্ধনে রাখিয়াছে সেইরূপ এই ব্রহ্ম-

চর্য্যই ভাবী গার্হস্থ্যের প্রবল উৎপাতে মানুষকে অটল রাখে। পরে শ্রুতি সমাবর্ত্তনের পর বাসভূমির কথা বলিয়াছেন। ইহা পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হইলে কি ঐহিক কি পারত্রিক কোন কাজই হয় না। অতএব অশুচি ও দুর্গন্ধময় স্থানে বাস না করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। তৎপরে ইহাতে কৃতদার গৃহীর কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনুশীলন ব্যতীত বাল্যের অভ্যস্ত জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত ও বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না এবং তাহা পাত্রসাৎ না করিলে জনসমাজের কল্যাণ হয় না এই জন্য শ্রুতি গৃহীর সম্বন্ধে স্বাধ্যায়ের বিধান করিয়া পুত্রাদি পরম্পরায় জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রবাহ রক্ষা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলত যে গৃহী এইরূপ হিতকর ধর্ম্মনিয়মে আপনাকে নিয়মিত করেন, যেবাং ন মাতা, যাদের মাতা নাই, তিনিই মাতা, ন পিতা, পিতা নাই, তিনিই পিতা, ন বন্ধুঃ, বন্ধু নাই, তিনিই বন্ধু, নৈবান্নসিদ্ধিঃ, অন্ন নাই, তাঁহার হস্তেই অন্ন; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কি অতীত কি বর্ত্তমান সমস্ত জীবকে উদ্দেশে জলগণ্ডূষ না দিয়া যিনি জলস্পর্শ করেন না, স্পষ্ট কথায় যাঁহার স্বার্থ কেবল পরার্থেই পর্য্যবসিত বিশ্বপ্রেম সেইরূপ গৃহীরই বিরাট হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, শ্রুতি উপসংহারে সেই বিশ্বপ্রেমিকের পরমধর্ম্ম অহিংসা ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া আত্মজ্ঞ হইবার উপদেশ করিয়াছেন। কারণ অপ্রসারিত সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে আত্মজ্ঞান হইতেই পারে না।

আত্মজ্ঞানই যে মুখ্য ধর্ম্ম এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে তাহা স্পষ্টই বুঝাগেল। 'নহি সুবিজ্ঞেয়মনুরেষ ধর্ম্মঃ' এই আত্মতত্ত্ব সবিশেষ যত্ন ব্যতীত শ্রবণমাত্র সম্যকরূপে জানা যায় না কারণ ইহা অতি সূক্ষ্ম ধর্ম্ম। কঠ শ্রুতিও এই আত্মজ্ঞানকে একটী মুখ্য ও স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রকার ইহাকে ধর্ম্মাঙ্গ অর্থাৎ গৌণ বলিয়া কর্ম্মকেই মুখ্য পদবী দিয়াছেন। এ বিষয়ে মানবধর্ম্মশাস্ত্র, বক্তা মহর্ষি মনুর কিরূপ অভিপ্রায় এক্ষণে তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখা যায় ঋষিরা মনুর নিকট আসিয়া কহিলেন

'বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ।'

ভগবন্ আপনি বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের বিষয় বলুন। কিন্তু মনু প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর না দিয়া 'আসীদিদং তমোভূতং' অগ্রে সমস্তই অন্ধকার ছিল এই বাক্যে সৃষ্টিতত্ত্বের অবতারণা করিলেন। সুতরাং প্রত্যুত্তর প্রশ্নের বিপরীত হইল। এই স্থলে টীকাকার মীমাংসা করিলেন

নন্থ মুনীনাং ধর্ম্মবিষয়প্রশ্নে তত্রৈবোত্তরং দাতুমচিতং তৎকোঽয়মপ্রস্তুতঃ প্রলয়দশায়াং কারণলীনস্ত জগতঃ সৃষ্টিপ্রকরণাবতারঃ' ইত্যাদি।

এই সৃষ্টিতত্ত্বের অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। মনু ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নে অগ্রে ব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে প্রতিপাদন পূর্ব্বক প্রকৃত প্রত্যুত্তরই দিয়াছেন। কারণ 'আত্মজ্ঞানস্য ধর্ম্মরূপত্বাৎ' আত্মজ্ঞানই ধর্ম্ম। মনু সৃষ্টিতত্ত্বে আত্মজ্ঞানকে ধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া আর একস্থলে স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।'

এস্থলে বিদ্যাশব্দে আত্মজ্ঞান, এই দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণকীর্ত্তনকালে বিদ্যাশব্দবাচ্য আত্মজ্ঞান গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আত্মজ্ঞান একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম। যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাগ্রে তাহারই উল্লেখ সঙ্গত, এই জন্য ধর্ম্মপ্রবক্তা মনু ঋষিগণের প্রশ্নে

সর্ব্বাগ্রে আত্মজ্ঞানকেই পরম ধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া পশ্চাৎ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মকে ইহার অঙ্গরূপে স্থাপন করিয়াছেন। পরে গ্রন্থের উপসংহারে আত্মজ্ঞানই যে মুখ্য ধর্ম্ম, ইহা লাভ করিলে যে জন্ম সফল হয় ইহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিতেছেন;

'এতদ্ধি জন্মসাফল্যং' 'প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজোভবতি নান্যথা।'

এই আত্মজ্ঞান ব্যতীত কৃতার্থ হইবার উপায় নাই, ইহাতেই জন্মের সফলতা হয়।

এক্ষণে এই আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক কি এবং ইহা লাভ করিবার উপায়ই বা কি ইহা বিবৃত করা যাইতেছে। কোন মহাজন কহিয়াছেন

'একঃশত্রুর্নদ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ
অজ্ঞানতুল্যঃ পুরুষস্য রাজন্।
যেনাবিষ্টঃ কুরুতে কার্য্যতে চ
ঘোরাণি কর্ম্মাণি সুদারুণানি।'

লোকের অজ্ঞানই একমাত্র শত্রু, দ্বিতীয় কিছুই নাই, সে এই অজ্ঞানবলে ঘোর দারুণ কার্য্য সকল করে ও কারিত হয়। যে দুঃখ ক্লেশের জনক সেইই শত্রু। আমরা এই অজ্ঞানাবেশে সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া দুঃখ ক্লেশে অভিভূত হইতেছি এই জন্যই ইহা আমাদের শত্রু।

এক্ষণে এই শত্রু নাশ করা চাই। ভগবান শঙ্কর কোন এক প্রবন্ধ গ্রন্থের অবতারণায় গুরুমুখে শিষ্যকে কহিতেছেন, 'কস্ত্বমসি সৌম্য' হে সৌম্য তুমি কে? শিষ্য কহিলেন 'ব্রাহ্মণপুত্রোঽহংদো অন্বয়ঃ ইত্যাদি' আমি অমুকবংশীয় ব্রাহ্মণপুত্র। ইচ্ছা, এই জন্ম মৃত্যুরূপ গ্রাহসঙ্কুল সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হই। গুরু কহিলেন,

'ইহৈব সৌম্য মৃতস্য তে শরীরং বয়োভিরদ্যতে মৃত্তাবং চাপদ্যতে কথং সংসারসাগরাদুর্দ্ধর্তুমিচ্ছসি। নহি নদ্যা অপরে কূলে ভস্মীভূতো নদ্যাঃ পারং তরিষ্যতি।'

হে সৌম্য তুমি মৃত হইলে পক্ষিরা এইখানেই তোমার শরীরকে ভক্ষণ করে, মৃত্তিকা হইয়া যায়, অতএব তুমি এই শরীরে কিরূপে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবে। যে ব্যক্তি নদীর এক পারে ভস্মীভূত হয় সে কি নদীর পারে যাইতে পারে। তখন শিষ্য উত্তর করিলেন 'ভিন্নোঽহং শরীরাৎ' আমি শরীর হইতে ভিন্ন। শিষ্যের এই কথায় গুরু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সাধ্ব-বাদীঃ সম্যক্ পশ্যসি' তুমি সম্যক্‌দর্শী, ঠিক বলিয়াছ।

শিষ্যমুখে এই যাহা শ্রুত হওয়া গেল 'ভিন্নোহং শরীরাৎ' আমি শরীর হইতে স্বতন্ত্র এই টুকুই প্রকৃত তত্ত্ব। মনুষ্যের এই ইন্দ্রিয়াদি স্থূল সঙ্ঘাতে অর্থাৎ শরীরে আত্মবুদ্ধি আছে। কিন্তু ইহা অজ্ঞানকৃত ভ্রান্তি। শুক্তিকায় যেরূপ রজতভ্রান্তি, মরীচিকায় যেমন জলভ্রান্তি ইহাও তদ্রূপ একটী ভ্রান্তি। কিন্তু শুক্তির স্বরূপটি বুঝিলে যেমন রজতভ্রান্তি যায়, মরীচিকার স্বরূপটী বুঝিলে যেমন জলভ্রান্তি যায়; সেইরূপ আত্মস্বরূপটি বুঝিলে এই স্থূল সঙ্ঘাতে আত্মভ্রম অপনীত হয়। সুতরাং পাওয়া গেল জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক। যে যাহার প্রতিকূল সেই তাহার নাশক। আলোক অন্ধকারের প্রতিকূল এই জন্য আলোক অন্ধকারের নাশক। সেইরূপ জ্ঞান অজ্ঞানের প্রতিকূল এই জন্য জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক। এই প্রতিকূলতা কি? না, একটীর স্বভাব প্রকাশ আর একটীর স্বভাব অপ্রকাশ। প্রকাশ-স্বভাব জ্ঞান অপ্রকাশ-স্বভাব অজ্ঞানকে নাশ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানকে ধর্ম্মাঙ্গ অর্থাৎ অমুখ্য বলিয়া কর্ম্মকে প্রধান্য দেন তাঁহারা তত্ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অন্ধকার হইতে নিবিড়তর অন্ধকারে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। ফলত অজ্ঞান নাশের জন্য কর্ম্ম

কোনওরূপে উপযোগি হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না তদ্বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের যুক্তি এইরূপ। তাঁহারা বলেন কর্ম্ম জড় বা অপ্রকাশ-স্বভাব। সুতরাং অজ্ঞানের সহিত তাহার কোন বিরোধিতা নাই। অজ্ঞানও অপ্রকাশ কর্ম্মও অপ্রকাশ। সুতরাং কর্ম্ম অজ্ঞান নাশে অসমর্থ। আরও বলেন, অজ্ঞান হেতু দেহেন্দ্রিয়াদিতে'অয়মাত্মা'এই আত্মা এইরূপ একটী ধারণা আছে। কিন্তু আত্মা এই দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত বস্তু। দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম তাঁহাতে কিছু মাত্র নাই। আত্মা শুদ্ধ চিন্মাত্র। দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখাই আত্মার সম্বন্ধে সম্যক দর্শন। আমি কর্ত্তা, এই ক্রিয়াসাধ্য ফল আমার হইবে ইত্যাদি ধারণা অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি জ্ঞান মনেরই হইয়া থাকে। মন সর্ব্বেন্দ্রিয়সাধারণ বা স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়। যতক্ষণ আত্মাতে মনের ব্যবহার আরোপিত হয় তাবৎ তিনি কর্ত্তা ভোক্তারূপে ভাসমান হন। আত্মার সম্বন্ধে সম্যক দর্শন হইলে অর্থাৎ মনাদি হইতে তাঁহাকে ব্যতিরিক্ত করিয়া দেখিলে আর তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বাদি থাকে না। এখন বুঝিয়া দেখ, কর্ম্ম কর্ত্তৃসাধ্য, কর্ম্মজন্য ফলও ভোক্তৃভোগ্য, কিন্তু সম্যক দর্শনে—সম্যক জ্ঞানে আত্মাতে যখন কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব কিছুই থাকে না তখন ফলপ্রদ নয় বলিয়াই আত্মজ্ঞানে কর্ম্মের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই।

জৈমিনীর কর্ম্মবাদ অধ্যাত্মরাজ্যে যে ঘোরতর অন্ধকার আনয়ন করিয়াছিল ভগবান শঙ্কর দীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া তাহা দূর করিয়াছেন। কিন্তু লোকের স্বভাব কেবল প্রাণের তৃপ্তি চায়। কর্ম্মকাণ্ডের পুষ্পিত ফলশ্রুতি সেই ভাবকে আরও সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। স্বর্গকামনা পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিয়াছে। কিন্তু বেদ কর্ম্মের বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষে এই বলিতেছেন,

'পরীক্ষ্য লোকান কর্ম্মচিতান ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন'

ব্রাহ্মণ কর্ম্মার্জিত লোক সকলকে পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ তৎসমুদায় যে অনিত্য ক্ষয়শীল ইহা বুঝিয়া কর্ম্মত্যাগী হইবেন। কৃত যাগযজ্ঞাদি দ্বারা অকৃত অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয় না। ধর্ম্মস্থাপক মহর্ষি মনুও কহিয়াছেন, 'ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যোজুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ।' সমস্ত বৈদিক ক্রিয়া কি হোম কি যাগ স্বরূপত কি ফলত সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব

'যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান।'

যথোক্ত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান শমদমাদি সাধন ও বেদাভ্যাসে যত্নবান হইবেন।

মনুর সিদ্ধান্তে জ্ঞানও কর্ম্মের সমন্বয়বাদ আসিয়া পড়িল। তিনি জ্ঞানের সহিত শমদমাদি কর্ম্মের সমন্বয় করিলেন। কিন্তু এরূপ সমন্বয় দোষাবহ নহে। যে জন্য দোষাবহ হইতে পারে না তাহা ব্যক্ত হইতেছে। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম ব্রাহ্মণত্বাদি জাত্যভিমানী পুরুষ কর্ত্তৃক সম্পাদ্য। যাঁহার উপনয়নাদি সংস্কার না হইয়াছে কর্ম্মে তাঁহার অধিকার নাই। কিন্তু আত্মজ্ঞান নিরভিমান-পুরুষ-নিষ্ঠ। জাতি ও উপনয়নাদি সংস্কার শরীরেরই হয় কিন্তু আত্মা এই শরীরের সীমাবহির্ভূত।

'ততো ভিন্নং জাত্যন্বয়সংস্কারঃ শরীরং'

আত্মাতে জাতি নাই, বর্ণ নাই, কোন রূপ সংস্কারও নাই। সুতরাং যিনি জাত্যাদির অভিমানী আত্মজ্ঞান তাঁহার বহুদূরে।

'নির্ব্বিকারাত্মবুদ্ধিশ্চ বিদ্যেতীহ প্রকীর্ত্তিতা।'

যাহাতে জাত্যাদি বিকার সম্পর্ক নাই সেইরূপ আত্মার জ্ঞানই প্রকৃত আত্মজ্ঞান। কর্ম্মে অভিমান ও জ্ঞানে তাহার অভাব এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সংযোগ থাকাতে মুক্তিপথে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় কখন হয় না। কিন্তু মনুর নির্দ্দেশ মতে জ্ঞানের সহিত শমদমাদি সাধনরূপ কর্ম্মের সমন্বয় হইলে কোনই দোষ অর্শিবে না। কারণ এই কর্ম্মের সহিত জাতিবর্ণ সংস্কারের সম্বন্ধ থাকা সম্ভাবিত নহে। যাহার মুক্তি ইচ্ছা হইবে সেই ব্যক্তিই শমদমাদি কর্ম্ম সাধন যোগে জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতে পারিবে। এই জন্য 'অন্তরাপিতু তদ্দৃষ্টেঃ' এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর কহিয়াছেন

'অনাশ্রমিত্বেনান্তরালে বর্ত্তমানোঽপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে'

আশ্রমাচার কর্ম্মাদি না থাকিলেও জ্ঞানে অধিকার আছে। কেন না 'তদ্দৃষ্টেঃ' রৈক্ক বাচক্লবী প্রভৃতি অনাশ্রমীরও ব্রহ্মজ্ঞান দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলত সাভিমান কর্ম্ম না করিলেও একমাত্র শমদমাদি সাধনে জ্ঞান লাভ হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞানের সহিত এরূপ কর্ম্মের বিরোধ হয় না।

কর্ম্মী বলেন কর্ম্মের লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি। এই চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান হয় না। সুতরাং কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান হয় না। কিন্তু এই চিত্তশুদ্ধি বস্তুটি কি? পাপের মালিন্য থাকিলেই মন অশুদ্ধ থাকে আর পাপ দূর হইলেই মন শুদ্ধ হয়। শাস্ত্রকারেরাও কহিয়াছেন,

'দুরিতক্ষয়এব কর্ম্মানুষ্ঠানস্য পরং প্রয়োজনং'

পাপ নাশ করাই কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। তাই যদি হয় তবে মনু কর্ম্মত্যাগ করিয়া শমদমাদি সাধনের যে বিধি দিয়াছেন তদ্দ্বারা সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে। পাপাচরণে মনের সঙ্কল্প ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার দুইই চাই। মন অগ্রে অবৈধ সঙ্কল্প করে পরে তদ্বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের অবৈধ চেষ্টা হয়। মন ও ইন্দ্রিয়ের এই অবৈধ ব্যাপারেই যখন পাপ তখন সেই মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযমে বা বৈধ পথে চালনেই পাপের পথ প্রতিরোধ হইবে। ফলত এইরূপে পাপনাশ করাই চিত্তশুদ্ধি। এই চিত্তশুদ্ধি যদি ইন্দ্রিয়নিরোধে সিদ্ধ হয় তবে বিধি মন্ত্র ও তন্ত্র-প্রয়োগ-সাধ্য আয়াসকর কর্ম্মের প্রয়োজন কি। অনেকেই বলেন কর্ম্ম জড়-স্বভাবকে ধর্ম্মে আনিবার একটা প্রলোভন। তাঁহারা কহেন যেমন পিতা লড্ডুকের লোভ দেখাইয়া পুত্রকে নিম্বপান করাইয়া থাকেন ইহাও তদ্রূপ। নিম্বপানে লড্ডুক লাভই যে উদ্দেশ্য তাহা নহে কিন্তু আরোগ্যই উদ্দেশ্য। সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ড বেদ এটা ওটা সেটা এইরূপ নানা রূপ মিথ্যা ফলে প্রলোভিত করিয়া জড়স্বভাবকে ধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন। অতএব লড্ডুকদৃষ্টান্তে যখন ইহা তুচ্ছ প্রলোভন মাত্রে পর্য্যবসিত হইল, এক মাত্র ইন্দ্রিয়সংযমেই যখন পাপনাশ ও তন্নিবন্ধন চিত্তশুদ্ধি হয় তখন জ্ঞানকাণ্ড যাহাকে মুক্তির প্রতিকূল অর্থাৎ বন্ধনের কারণ বলিয়া সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন তখন সেই কর্ম্মপাশকে ইচ্ছা করিয়া কেন গলে বন্ধন কর।

এক্ষণে শাস্ত্রপ্রমাণে নির্ণীত হইল গৃহীর আত্মদর্শনেই পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। দেহেন্দ্রিয়াদি অজ্ঞান অসত্য জড়বাধা আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, মোহের একটা প্রবল অন্ধকার তাঁহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে। সেই মোহ নিরা-

সের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের * সহিত জ্ঞান আবশ্যক। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই ব্রহ্মচর্য্যেরই অন্তর্গত। আবার এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আহার-শুদ্ধিকে অপেক্ষা করে। সুতরাং রজ ও তমোগুণের উত্তেজক মধু মাংসাদি নিষিদ্ধ দ্রব্য সর্ব্বথা পরিহার্য্য। এরূপ আহারে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দেয়। এই আহার-শুদ্ধিই বল, ইন্দ্রিয়নিগ্রহই বল, আত্মজ্ঞানের উপযোগি সমস্ত অঙ্গই ব্রহ্মচর্য্যের এক একটী অঙ্গ। সুতরাং জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মচর্য্যের বলই প্রধান বল। যাঁহারা এইটুকু বিস্মৃত হইয়া আত্মদর্শনের প্রয়াস পান অনন্ত কোটি কালও তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া দিতে পারে না। অতএব যদি আত্মদর্শন করিতে চাও,যদি আত্মার মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা কোটি-সূর্য্য-প্রকাশ আত্মার প্রাণকে দেখিতে চাও তবে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর যষ্টি আশ্রয় করিয়া ঋষিপ্রদর্শিত পথে অল্পে অল্পে পদচালনা কর। এই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় নিতান্ত দুর্গম। ইহাতে বিঘ্ন অনেক, বাধা অনেক, প্রতিপদেই পদস্খলন সম্ভাবনা। অতএব সাবধান। মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া আছে। জীবন কাল অতি সংক্ষেপ। চক্ষের দুইখানি কপাট না পড়িতে যদি আত্মদর্শন করিতে পার তবে মৃত্যুর বিভীষিকা তোমার তুচ্ছ বোধ হইবে। তুমি শোক হইতে উত্তীর্ণ হইবে, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইবে এবং যাহা হইতে পুনরাবৃত্তি নাই সেই অনন্ত দিব্যধামে নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

* বর্ত্তমানে কি রূপ ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক পূর্ব্বে এই বেহালা সাম্বৎসরিক উৎসবের একটী উপদেশে তাহা বিবৃত করা গিয়াছে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্ম-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রম অতি পবিত্র রমণীয় স্থান। সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ, নির্ম্মল জল, বিহঙ্গ-কূজিত নানা রূপ বৃক্ষরাজি, উন্মুক্ত নীলাকাশ ও শষ্পাচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তর এই আশ্রমকে রমণীয় শোভায় শোভিত করিয়াছে। সংসারতাপে উত্তপ্ত ঈশ্বর-পিপাসু সাধকেরা এই আশ্রমে আগমন করিয়া নির্জ্জনে পরমাত্মার শ্রবণ মনন ও জ্ঞানচর্চ্চা ধর্ম্মপ্রসঙ্গাদি করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মার্থী অতিথিগণের কি শারীরিক কি আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার সুবিধার জন্য পূজ্যপাদ মহর্ষি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া আশ্রমের সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখানে বাহিরের কোন কোলাহল নাই, নির্জ্জনে শান্তমনে পরমেশ্বরের আরাধনার সমুদায় অনুকূল ভাব এখানে বর্ত্তমান। এত দিন এই আশ্রমে ব্রহ্মোপাসনার জন্য পৃথক মন্দির না থাকায় প্রাসাদেই উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইত। মহর্ষি, সাধকদিগের এই অসুবিধার কথা জ্ঞাত হইয়া শান্তিনিকেতনে লৌহময় সুপ্রশস্ত ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ ট্রষ্টী মহোদয়দিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত ২২ শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়। অনন্ত নীলাকাশের নিম্নে আশ্রম প্রাঙ্গণে উপাসনার জন্য সকলে একত্র হইয়াছিলেন। সুরুল, রায়পুর, বোলপুর

প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী ভদ্রপল্লী হইতে ৬০। ৭০ জন নানাশ্রেণীর বিশিষ্ট ভদ্রলোক আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তি-ভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করেন; এবং অতিশ্রদ্ধেয় সুকবি ও সুগায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুরাগভরে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। উপাসনাশেষে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য এবং স্বদেশবাসী জনগণের ধর্ম্মোন্নতির জন্য পরম ভক্তিভাজন মহর্ষির প্রাণগত যত্ন ও ভূরিপরিমাণ অর্থ ব্যয় ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই, "যদিও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় স্থান ব্রহ্মসত্তাতে পরিপূর্ণ এবং আমাদের হৃদয়ই যথার্থতঃ ব্রহ্মের মন্দির, কিন্তু বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া সামাজিক ভাবে ভগবদারাধনার জন্য ব্রহ্ম-মন্দিরের প্রয়োজন। আমরা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দি-রের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। পরমে-শ্বর আমাদের শুভ সংকল্পের সহায় হউন। তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া আমরা আজ যে বীজ প্রোথিত করিলাম, তাঁহার প্রসাদে কালক্রমে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইবে। এই মন্দিরে কেবল একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইবে। পরমেশ্বর করুন সমগ্র ভারতভূমি সমগ্র বঙ্গদেশ প্রতিপল্লীতে পল্লীতে এইরূপ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক, কল্পিত দেবদেবীপূজার পরিবর্ত্তে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মের নাম ধ্বনিত হউক।"

অনন্তর ভিত্তিমূলে যে খোদিত তাম্র-ফলক প্রোথিত করা হয়, সত্যেন্দ্র বাবু সর্ব্বসমক্ষে তাহা পাঠ করিলেন। তাম্র-ফলকে এই কয়েকটি কথা দেবনাগর অক্ষরে খোদিত আছে।

"ওঁতৎসৎ। ঠক্কুরবংশাবতংসেন পর-মর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণা ধর্ম্মোপ চয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যব্দ। অগ্রহায়ণ ২২ রবিবাসর।" পরে সকলে মন্দিরের ভিত্তি মূলে গমন করিলে তাম্রফলক, পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা এবং উক্ত ২২শে অগ্রহা-য়ণের Statesman পত্রিকা, এই অগ্রহায়ণ মাসের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" একটি আধারে আবদ্ধ করিয়া মন্দিরের ঈশান কোণে প্রোথিত করা হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত দ্রব্যগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া স্বহস্তে কর্ণিক দ্বারা ভিত্তি প্রস্তর গাঁথিয়া দিলেন। সর্ব্ব-শেষে সত্যেন্দ্র বাবু পরমেশ্বরের নিকট এই শুভকার্য্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া কার্য্য শেষ করিলেন।

সৃষ্টিকার্য্যে সৃষ্টিকর্ত্তার কৌশল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মুখে এইরূপ উক্তি আছে "মদীয় মহিমানন্তু পরব্রহ্মেতি শব্দিতং" অর্থাৎ ঈশ্বরের অপার মহিমার যে কণিকামাত্র ক্ষুদ্র মানব এই দ্যুলোকে ও ভূলোকে কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারে সেই মহিমাকণার জ্ঞানই তাহার ঈশ্বরজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা—তাহাই ঈশ্বর জ্ঞানের শেষ সীমা। ঈশ্বরের মহিমাকেই পরব্রহ্ম শব্দে কথিত হইয়া থাকে। পরন্তু এই মহিমার কত দূরই বা আমরা জা-

নিতে পারি? তাহার কোটি কোটি অংশের একাংশও নহে। "জ্যোতিঃ যাঁর গগনে গগনে," হিন্দু শাস্ত্রকারেরা তাঁহার একটী নাম "একপাৎ"* নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার বিভূতির একপাদ অথবা সূক্ষ্ম অংশ মাত্র এই পরিদৃশ্যমান জগতে বিরাজমান, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সে বিভূতি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে অথবা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাহা ধারণ করিতে পারে না কিন্তু তিনি নিজে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এই অপরিসীম বিভূতি বা মহিমারও অতীত। "অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্"। যিনি "নেতি নেতি", ইহা নহে ইহা নহে, এইরূপ অপাবর্ত্তন দ্বারা ও সৃষ্টিকার্য্যের আলোচনা দ্বারা আমাদিগের নিকট প্রতীয়মান হয়েন তাঁহার সম্বন্ধে এই জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান বলিতে হইবে। তিনি কিংস্বরূপ তাহা সম্যক্ কে বলিতে পারে? কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ রূপে হৃদয়ে প্রতিভাত হয়েন কি না এ বিষয় বিচার করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। অতএব এক্ষণে ঈশ্বরের মহিমার বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। বৃক্ষাদির বীজ বিস্তারের কেমন সুন্দর ব্যবস্থা। ঐ বীজগুলি বায়ু সহকারে দূর দূরান্তরে পরিচালিত হয়। সমুদ্র ব্যবধান সত্ত্বেও উহারা এক মহাদ্বীপ হইতে অপর মহাদ্বীপে আনীত হইয়া থাকে। অনেকানেক বীজ কার্পাসবৎ পদার্থ দ্বারা আবৃত হওয়াতে উহাদের বায়ু যোগে গমনাগমনের সুবিধা হয়। কতকগুলি বীজ অভীষ্ট স্থানে গিয়া সংলগ্ন হইবে এ নিমিত্ত উহাদের গাত্রে আকর্ষণীবৎ পদার্থ সংশ্লিষ্ট আছে। কতকগুলিতে নির্যাস থাকে, উহা দ্বারা স্থান বিশেষে আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। পরন্তু পক্ষী ও মধুমক্ষিকা ভ্রমর প্রভৃতি পতঙ্গেরা ফল মধু ভক্ষণ ও আহরণ জন্য বৃক্ষের ফল ও পুষ্পে বসিলে সেই পুষ্পের রজ তাহাদিগের গাত্রে সংস্পৃষ্ট হয়, যখন তাহারা বৃক্ষান্তরে গমন করে তখন ঐ রজ শেষোক্ত বৃক্ষের অবয়ব বিশেষে পতিত হইয়া তাহার ফল ও পুষ্পের উদ্ভাবন করে। অনেক বৃক্ষ অন্য বৃক্ষের সাহায্য না লইয়াই স্বীয় স্বীয় ফলোৎপাদন করে পরন্তু কতকগুলি সুবর্ণ সুন্দর পুষ্প যথা গোলাপ প্রভৃতি অপর বৃক্ষের রজোযোগ দ্বারা দিন দিন নূতন নূতন কান্তি ও কমনীয়তা ধারণ করে। ইহাতে কতই সুষমার বৃদ্ধি হয়।

২। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিরা অনুকরণ দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। এ বিষয়টী আশ্চর্য্য ও কৌতূহলজনক। কতকগুলি উদ্ভিদ ও প্রাণী পক্ষী ও কীটাদির খাদ্য হইলেও ঐ পক্ষী ও কীটাদির অভক্ষ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকার ধারণ করে সুতরাং তৎখাদক জীব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রক্ষা পায়। যে সকল পতঙ্গ দংশন বা হুল ফুটাইতে অক্ষম তাহারা বোলতা বা মধুমক্ষিকার আকার অনুকরণ করে; নির্বিষ সর্প কখন কখন সবিষ সর্পের বেশ ধারণ করে। কোন কোন প্রজাপতি ভয়ানক ভুজঙ্গের ফণা বিস্তারের অনুকরণ করিয়া এরূপ ভাবে বৃক্ষের পত্র মধ্যে বসিয়া থাকে যে তদ্দৃষ্টে তাহার সন্ধানকারী পক্ষীরা দূরে পলায়ন করে। কোনটা যে বৃক্ষের পত্র তাহার বর্ণের অনুরূপ সেই বৃক্ষের পত্রাবৃত হইয়া এ রূপ ভাবে অবস্থিতি করে যে তাহাকে লক্ষ্য করা দুষ্কর। ইংলণ্ড দেশে একজাতীয় পক্ষী শিকারী না

* প্রপঞ্চ লক্ষণ একপাদো বিভূত্যং শব্দপোঽস্যেতি একপাৎ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত অর্থ।

হইয়া ও কোন শিকারী পক্ষীর অনেকটা সদৃশ এজন্য সে অন্য শিকারী পক্ষীর আক্রমণ হইতে নিস্তার পায়। এস্থলে অনুকরণটী স্বভাবসিদ্ধ কিন্তু অধিকাংশ স্থলে উদ্ভিদ ও প্রাণীরা এইরূপ অনুকরণ দ্বারা আশ্চর্য্য রূপে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

পশু পক্ষ্যাদির বর্ণ তাহাদিগের পরস্পর পরিচয় ও স্ব স্ব বংশ রক্ষার উপায় হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুং পক্ষীর পতত্রে বিশেষ বিশেষ বর্ণগত চিহ্ন থাকে, তাহাতে উহারা আপন আপন পর্য্যায় ও জাতি চিনিয়া লয়। এই বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া পুংপক্ষী স্ত্রীপক্ষীকে ও পক্ষিশাবকেরা স্বীয় জনক জননীদিগকে চিনিতে পারে। এইরূপ পরস্পর পরিচয়ের সুযোগ থাকাতে তাহাদিগের জাতি ও পর্য্যায় ও শ্রেণী অব্যাহত রহিয়াছে।

৩। পক্ষী প্রজাপতি ও কীটেরা যে স্থানে থাকিয়া আপনাদিগের জীবনোপায় সংগ্রহ করে প্রায় সেই স্থানের বর্ণবিশিষ্ট হয়। বিশ্বপিতার কি কৌশল! হিমকটিবন্ধ প্রদেশের অনেকানেক পক্ষীরা সচরাচর শ্বেতবর্ণ। ঐ বর্ণ জন্য তাহারা সহজে তুষার মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আক্রমণকারী পক্ষী হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। আবার দেখ ঐ প্রদেশে এক প্রকার শটিত-মাংস-ভোজী বলবান্ পক্ষী আছে তাহা কৃষ্ণবর্ণ যেহেতু অন্য পক্ষী হইতে তাহার ভয়ের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু জীবিত পক্ষী উহার ভক্ষ্য হইলে পক্ষীরা উহার বর্ণ দৃষ্টে পলায়ন করিত সুতরাং তাহার আহারের ব্যাঘাত হইত কিন্তু সে মৃত শরীর ভোজন করে সুতরাং ঐ বর্ণ দ্বারা তাহার কিছুই অসুবিধা ঘটে না। এতদ্দেশে টিয়া প্রভৃতি টৌকন জাতীয় পক্ষীরা তাহাদিগের বিহারস্থান ঘন হরিত বর্ণ বৃক্ষ পত্র মধ্যে বসিলে হঠাৎ পরিলক্ষিত হয় না। কৃকলাসেরা যে বৃক্ষে বিচরণ করে তাহার পত্রের অনুরূপ বর্ণ ধারণ করে ইহা প্রসিদ্ধই আছে।* উষর ভূমিতে পক্ষীরাও ঐরূপ উষর ভূমিবৎ বর্ণবিশিষ্ট হইয়া সহজে লুক্কায়িত থাকে। ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ স্বীয় শরীর গোপন জন্য সুদীর্ঘ তৃণ বা ইক্ষুরাজী বা নিবিড় বেতস কুঞ্জে এরূপ ভাবে আশ্রয় লয়, যে সহসা তাহারা নয়নপথানুবর্ত্তী হয় না। অনেক পক্ষীর ডিম্বের বর্ণ উহার চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষ পত্রাদির বর্ণের এরূপ সদৃশ যে উহা সহজে অনিষ্টকারী জন্তুরা দেখিতে পায় না। কীট বিশেষে যে বৃক্ষ পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে উহা প্রায় সেই পত্রের অনুরূপ বর্ণবিশিষ্ট হয়।

পক্ষীদিগের অনেক ব্যাপারে অনেক আশ্চর্য্য কৌশল দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ পক্ষী বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে আপনাপন কুলায় এরূপে নির্ম্মাণ করে যে তাহাতে উহাদিগের শাবকদিগের যত দূর সম্ভব নিরাপদে রক্ষা হয়। পরন্তু অণ্ড

---

* কৃকলাসেরা যে বৃক্ষে থাকে তাহার পত্রের বর্ণসদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া অলক্ষ্যভাবে স্বীয় ভক্ষ্য কীটাদি ধারণ করিতে পারে, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে ইহাতে জগদীশ্বরের পক্ষপাতিতা প্রকাশ পায়—তিনি আপনার সৃষ্ট এক জীবকে অন্য জীব কর্ত্তৃক এরূপ উপায়ে কেন নিহত করেন। অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তি অনন্ত মঙ্গলালয় পরমেশ্বর কেন সিংহ ব্যাঘ্রাদিকে ভীষণ নখর দংষ্ট্রাদি দিলেন যদ্দ্বারা তাহারা অনায়াসে ছাগ মেষাদিকে হনন করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতে পারে, কেন

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাং।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবোজীবস্য জীবনং॥

(ভাগবৎ ১।১৩।৪২)

তাহা তিনিই বলিতে পারেন। যিনি ঝটিকা বজ্র প্রভৃতি আপাত অনিষ্টকর ঘটনা হইতে স্বীয় সৃষ্টির মঙ্গল সংসাধন করেন, তাঁহার গম্ভীর মঙ্গল ভাবের তত্ত্ব আমরা কি বুঝিব?

প্রস্ফোটন সময়ে যে পক্ষিটীর বর্ণ চাকচিক্যহীন সুতরাং কুলায়ে বসিলে হঠাৎ লক্ষিত হইবে না সেইটীই ডিম্বে বসিয়া তাহা প্রস্ফুটিত করে। অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীপক্ষীর বর্ণ গাত্র-চিহ্নাদি পুংপক্ষী হইতে অনুজ্জ্বল ও সৌন্দর্য্যহীন ও পুংপক্ষীর গাত্র উজ্জ্বল ও শোভাযুক্ত। সুতরাং স্ত্রীপক্ষী অণ্ডে থাকে ও পুংপক্ষী বাহিরে থাকিয়া শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া শাবকদিগকে রক্ষা করে। কিন্তু যখন স্ত্রীপক্ষীর বর্ণ শোভাযুক্ত ও পুংপক্ষী তদ্বিপরীত হয়, তখন পুংপক্ষীই অণ্ডে বসে ও স্ত্রীপক্ষী কুলায় পরিরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

উদ্ভিদ ও পক্ষী প্রভৃতির অনুকরণ আত্মগোপনাদি প্রক্রিয়ার কথা যাহা বলা হইল তাহারা কি আপনারা বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবন করিয়া ঐ সকল উপায়ের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মরক্ষা সাধন করে? কখনই নহে। অনন্ত মঙ্গলময় বিশ্ব পিতা পরমেশ্বর তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি সেতু স্বরূপ হইয়া আপন সৃষ্টিকে বিধরণ করিতেছেন।*

পাঁচ ফুলের সাজি।

(২য় সংখ্যা)

১। W. S. Landor,—

"Every man does what he hopes and believes will be most pleasing to his God, and God, in His wisdom and mercy will not punish gratitude in its error."

—প্রত্যেক মনুষ্য, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা তাহার ঈশ্বরের নিকট প্রিয় বলিয়া আশা এবং বিশ্বাস করে, তাহাই করিয়া থাকে; এবং জ্ঞান ও করুণাবশতঃ, ভ্রমের জন্য ঈশ্বর কৃতজ্ঞতাকে (কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে) শাস্তি দিবেন না।

"Is it not in philosophy as in love? the more we have of it, and the less we talk about it, the better."

—প্রেম সম্বন্ধে যেরূপ, জ্ঞান সম্বন্ধে কি সেরূপ নহে? উহা আমাদের যত অধিক থাকে, এবং আমরা যত অল্প উহার বিষয় কথা বলি ততই ভাল।

২। Goethe,—

"Sinless! to the chief of sinners
Access Thou deniest never;
And Earth's moment of repentence.
Hath its heavenly fruit for ever."

—হে অনঘ! পাপীর অধমকেও তোমার নিকটে আসিতে দিতে তুমি অস্বীকার কর না; এবং পৃথিবীর এক মুহূর্ত্তের অনুতাপের স্বর্গীয় ফল নিত্যকালের জন্য।

"Love, whose perfect type is woman,
The divine and human blending,
Love for ever and for ever
Wins us onward still accending."

—প্রেম, যাহার পূর্ণ আদর্শ রমণী, দেব এবং মানব প্রকৃতিকে যুক্ত করিয়া, চিরদিনই আমাদিগকে উন্নতির পথে উচ্চ হইতে আরও উচ্চে লইয়া যায়।

৩। মহর্ষি বাল্মীকি,

"সংত্যজ্য হৃদ্‌গুহেশানং দেবমন্যং প্রয়ান্তি যে।
তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্তহস্তস্থকৌস্তভাঃ॥"

—সেই হৃদয় গুহাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা অন্য দেবতাকে অর্চ্চনা করে, তাহারা হস্তাস্থিত কৌস্তভ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য রত্ন পাইবার বাঞ্ছা করে।

"সর্ব্বাশা কিল সংত্যজ্য ফলমেতদবাপ্যতে।
যেনাশাবিশবল্লীনাং মূলমালা বিলূয়তে॥"

—যে ব্যক্তি আশারূপ বিশবল্লীর মূল ছেদ করে, সে সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ফল (ব্রহ্মানন্দ) ভোগ করিয়া থাকে।

---

* এই প্রস্তাবের বিষয়গুলি Progress নামক ইংরাজি পত্র হইতে সংকলিত।

"অবিবেকাদ্বৃপাহৃত্য চেতঃ স্বৈর্যত্ননিশ্চয়ৈঃ।
বলাৎকারেণ সংযোজ্যং শাস্ত্রসৎপুরুষক্রমৈঃ॥"

অবিবেক হইতে মনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বকীয় ইষ্টবস্তু (ব্রহ্ম-প্রাপ্তি) নিশ্চয় করিয়া, বলপূর্ব্বক উহাকে সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রসংসর্গে সংযোজিত করা কর্ত্তব্য।

৪। Thomas a Kempis,—

"Every one naturally desires to know; but what is the worth of knowledge without the fear of God?"

—প্রত্যেকেই স্বভাবতঃ জানিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভয়-শূন্য জ্ঞানের মূল্য কি?

"A multitude of words do not satisfy the soul; but a good life gives comfort to the mind, and a pure conscience affords great trust in God."

—অনেক কথাতে আত্মাকে শান্তি দিতে পারে না; কিন্তু সাধু জীবন মনকে সুখ প্রদান করে, এবং নির্ম্মল বিবেক ঈশ্বরে মহৎ নির্ভর প্রদান করে।

"We are all frail; but as to thee, do not think any one more frail than thyself."

আমরা সকলেই দুর্ব্বল, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কখনও ভাবিও না যে অন্যে তোমাপেক্ষা দুর্ব্বলতর।

"This is the highest wisdom and most profiteble lesson, truly to know and to despise ourselves."

আপনাকে সত্যরূপে জানা এবং (পাপের জন্য) ঘৃণা করা, ইহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ শিক্ষা।

ক্রমশঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপে ওঁকার প্রণব ব্রহ্মকে সমুদায় বিভক্তি অর্থাৎ শব্দার্থ ভাবে বুঝিয়া লইতে হয়—স্ত্রী পুরুষ সকলেই ওঁকার স্বরূপ। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই ওঁকার জপিবার অধিকার আছে তাহাতে কোন সংশয় করা কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যক্ষ ওঁকারকেই, দেবীমাতা, শক্তি স্বরূপা বলিয়া আবাহন করা হয়, যথা—ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ইত্যাদি মন্ত্র। ওঁকার মন্ত্রই, দেবী স্বরূপ এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই ওঁকার দেবা স্বরূপ। অর্থাৎ সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ।

তখন মাড়ওয়ারী বলিলেন, মহাশয়, আপনি ওঁকার প্রণবের কথায় যে বলিলেন, ওঁকার সাত ভাগ হইয়া চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের শরীর গঠন করিয়াছে, সে কি রূপ আমি বুঝিতে পারিলাম না। ইহা পৃথক পৃথক হইয়া সাতটা হইয়াছে, না একই ব্যক্তি আছেন? এবং কি রূপে তাঁহাকে ধ্যান ধারণা করিব। তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, মন একাগ্রচিত্তে গম্ভীরভাবে শ্রবণ কর। তিনি সাতটা নহেন, একই পুরুষ বিরাজমান আছেন কিন্তু বহির্মুখে পৃথক পৃথক বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার শরীরের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক রূপে বোধ হইতেছে লোকে পৃথক পৃথক ধাতু ও দ্রব্য বলে। নেত্রে দেখিতেছ, কর্ণে শুনিতেছ, নাসিকায় দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ লইতেছ, মুখ দ্বারা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাইতেছ কিন্তু দেখিতে পাইতেছ না, এইরূপে বর্হির্মুখে একই শরীর পৃথক পৃথক ভাবে দেখা যাইতেছে ও পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়েরও পৃথক পৃথক গুণ ঘটিতেছে এবং বোধ হইতেছে। কিন্তু এই শরীরের বোধকর্ত্তা তুমি, একই পুরুষ বিরাজমান আছ এবং সকল ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা অন্তর হইতে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছ। এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর তোমারই এবং তুমিই এই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির স্বামী। এইরূপ এই আকাশের মধ্যে পৃথক পৃথক যে সাতটা বোধ হইতেছে, যেমন পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, ও সূর্য্যনারায়ণ—ইহা বর্হিমুখে এই সাত প্রকার বোধ হইতেছে, কিন্তু এই জগৎ চরাচরকে লইয়া বিরাট স্বরূপ অন্তরে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ একই পুরুষ একই ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার এক এক অঙ্গ দ্বারা এক এক কর্ম্ম করিতেছেন ও করাইতেছেন ও এক এক গুণ এক এক অঙ্গের দ্বারা গ্রহণ করিতেছেন। যেমন তুমি তোমার সমস্ত শরীরের মধ্যে চেতন, এবং তোমার ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে কোন সুখ বা দুঃখ হইলে তুমি বোধ করিতে পার, এবং মনের কোন প্রকার বিকৃতি ঘটিলে মনের ভাব বুঝিতে পার অথবা অঙ্গের কোন স্থানে পিপীলিকা কামড়াইলে বা অন্যরূপ বেদনা হইলে তাহা তুমি বোধ করিতে পার—

যেরূপ তুমি তোমার আপনার ক্ষুদ্র শরীরের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং অন্তরের ও বাহিরের ভাব বুঝিতে পার—সেইরূপ সমষ্টি জগৎ চরাচর রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিরাট শরীরের অন্তর হইতে অন্তর্য্যামী সূর্য্যনারায়ণ বুঝেন ও সকল জীবের অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া বুঝাইয়া দেন। তুমি যেমন তোমার স্থূল শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, চরাচর বিরাট সমষ্টি শরীরের মধ্যে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ তেজোময় সেইরূপ। তোমরা সেই জ্যোতিঃস্বরূপকে একমাত্র জগৎপিতা ও জগৎমাতা এবং জগৎগুরু জ্ঞানে প্রতিদিন তাঁহার সম্মুখে প্রাতে ও সায়ংকালে আন্তরিক নম্রভাবে পূর্ণরূপে নমস্কার প্রণাম করিবে এবং সর্ব্বদা ওঁকার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিয়া তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন ও তোমাদের অন্তর হইতে জ্ঞান প্রদান করিয়া আপনার জ্যোতিঃস্বরূপে অভেদ করিয়া লইবেন। এবং তুমি নিগুর্ণ নিরাকার পরব্রহ্মে স্থিতি করিয়া সদা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে। কোন সুবোধ পুত্র কন্যা তাহার পিতা মাতার নেত্রের সম্মুখে করযোড়ে নম্রভাবে প্রণাম করিলে তাঁহারা দেখিয়া অন্তরে বুঝেন যে আমার ছেলে আমাকে প্রণাম করিতেছে এবং তাহাতে তাঁহারা যেমন অন্তরে আনন্দিত হইয়া সন্তানকে স্নেহ করেন এবং যাহাতে সন্তান সুখে থাকে তাহারি চেষ্টা করেন সেইরূপ চরাচর রাজা ও প্রজা ইত্যাদি তাঁহার পুত্র ও কন্যা, এবং বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদের পিতা ও মাতা শব্দে জানিবে। তাঁহার জ্যোতিঃ নেত্রের সম্মুখে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নমস্কার ও প্রণাম করিলে তিনি তোমাদের অন্তরের সকল ভাব বুঝিতে পারিবেন, এবং অন্তর হইতে তোমাদিগকে সৎ বুদ্ধি প্রদান করিয়া যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার উনি তাহাই করিবেন। এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতা ভাবিয়া অন্তরে ভক্তিভাবে নমস্কার ও প্রণাম করিবে. ও সকল বিষয়ে সন্তুষ্টভাবে থাকিবে। এই সকল শ্রবণ করিয়া তৎকালে মাড়ওয়ারী ও তৎস্থানস্থিত ব্যক্তিগণ অতিশয় প্রসন্নমনা হইয়া শিবনারায়ণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে মহারাজ আমরা কৃতার্থ হইলাম।

পঞ্চম প্রশ্ন।

সেই মাড়ওয়ারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, বেদ শ্রুতি ও শাস্ত্র পুরাণাদিতে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব এরূপ বিভেদের স্থলে, আমরা রাজা, প্রজা, ও পণ্ডিতগণ, কোন্ মতকে স্থির বলিয়া গ্রহণ করিব? কোনো মতকেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন যে, হে শ্রোতাগণ তোমরা বস্তুব বিচার কর, তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত ভ্রম নিবারণ হইবে। তোমরা বিচার করিয়া দেখ যে এই আকাশের মধ্যে কোন্ বস্তুই বা সত্য, এবং কোন্ বস্তুই বা অসত্য আছে। এইরূপ সৎ অসতের বিচার করিয়া সত্যেতে নিষ্ঠা রাখ অর্থাৎ সৎস্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি নিরাকার ও সাকার স্বরূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন তাঁহাতে নিষ্ঠা থাকিলে কোন ভ্রমই থাকে না। নানা প্রকারে লক্ষ মত প্রকাশ করুক না কেন তাহাতে তোমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কি? তোমরা গম্ভীর ও শান্ত স্বরূপে বিচার করিয়া দেখ যে, পরব্রহ্ম তিনি যাহা তাহাই আছেন অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভাবে নিরাকার ও সাকার রূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। লক্ষ মতই থাকুক না কেন কেহ তিল মাত্র কমবেশি করিতে পারিবেন না, তিনি যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন। দেখ, কত প্রকারে কত মত এই পৃথিবীর উপর প্রকাশ হইতেছে ও লয় হইয়া যাইতেছে। কোন মতে কি একটি তৃণ ঘাস মাত্রও উৎপন্ন করিয়া গিয়াছেন না করিতে পারিবেন? এ পর্য্যন্ত কেহ কখন করিতে পারেন নাই ও পারিবেনও না; অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্ম একই ভাবে চলিয়া আসিতেছেন। দেখ নিরাকার ব্রহ্ম যেমন তেমনি আছেন, এবং সাকার ব্রহ্ম যেমন তেমনি জ্যোতিঃরূপে বিরাট স্বরূপে প্রত্যক্ষ প্রকাশিত আছেন। যথা সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপে, আকাশ বায়ু স্বরূপে, অগ্নি জল স্বরূপে ও তোমরা চরাচর ইত্যাদি যেমন তেমনিই এই আকাশের মধ্যে প্রকাশমান আছ। ইহার মধ্যে তিল মাত্র কেহ কমাইতে ও বাড়াইতে পারেন নাই ও পারিবেন না। ঋষি, মুনি, পির, পায়গম্বর যিশুখৃষ্ট ইত্যাদি অবতারগণ এবং পণ্ডিত, সাধু, রাজা, প্রজা, হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ, ও অপর অপর মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কেহই তিলমাত্র প্রভেদ করিতে পারেন নাই অর্থাৎ নিরাকারকে সাকারও করিতে পারেন নাই ও সাকারকেও নিরাকার করিতে পারেন নাই, এবং পারিবেনও না। মুখে এবং শাস্ত্রে যিনি যত মতই প্রকাশ করুন না কেন, এককে দুই করিবার কাহারও সাধ্য নাই, এবং দুইকেও এক করিবার সাধ্য

নাই। অতএব রাজা প্রজা ইত্যাদি ব্যক্তিগণের বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত স্বরূপে সৎ বস্তুতে নিষ্ঠা রাখিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সকল দুঃখ মোচন হইবে। অর্থাৎ সৎবস্তু যিনি পূর্ণ, যিনি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার ও সাকার রূপে পরিপূর্ণ আছেন কেবল মাত্র তাঁহাকে ধারণ করিলে সমস্ত ভ্রম ও সংশয় নিবারণ হয়। অতএব ব্যক্তিগণের নানা মতে যাওয়া উচিত নহে। ভাবিয়া বুঝিতে গেলে সকল মতই এক, কারণ প্রত্যক্ষ স্থূল ভাবে দেখ যখন সকল মতের ব্যক্তি, একই পৃথিবী আধারে রহিয়াছেন এবং একই জল দ্বারা সকলেই কার্য্য করিতেছেন এবং একই অগ্নি দ্বারা সকল মতের ব্যক্তিরই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে এবং একই বায়ুদ্বারা সকলেরই নাসিকা-দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে এবং একই আকাশ দ্বারা সকলেই কর্ণদ্বারে শব্দ শুনিতেছেন এবং একই সূর্য্য-নারায়ণ প্রকাশ হইলে সকল মতের লোকেরাই নেত্রদ্বারে দেখিয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তখন ঈশ্বর, গড্, আল্লা, খোদা, পরমেশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কি নানা মতে নানা প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হাজারটা আছেন। তোমরা কেন অনর্থক মিছা ভ্রমে পতিত হইতেছ? আপন আপন অহংকার, মান, আপমান, জয়, পরাজয় ইত্যাদি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তস্বরূপে বিচার পূর্ব্বক সত্যকে ধারণ কর তাহা হইলে সকল মতের ভ্রম মিটিয়া যাইবে। তাহাতে সেই স্থানের শ্রোতা ব্যক্তিগণ বলিলেন যে মহারাজ আপনি ইহা যথার্থ বলিয়াছেন আমাদের ইহা সত্য বোধে ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এবং অন্তর্যামী গুরু যদি কৃপা করেন তবেই ধারণা ও নিষ্ঠা হয়।

ষষ্ঠ প্রশ্ন।

ঐ মাড়ওয়ারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান ভাল কি মন্দ? কেহ কেহ বলেন যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান অতি আবশ্যক এবং কেহ কেহ বলেন যে ইহা-দিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বিদ্যা শিক্ষা দিলে স্ত্রীলোকদিগের স্পর্দ্ধা হয় এবং কুপ্রবৃত্তি জন্মায়। তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ, তোমরা শান্তস্বরূপে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখ বিদ্যাভ্যাসে যে স্ত্রীলোকদিগের স্পর্দ্ধা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মায় ইহা বলা ভুল। যদ্যপি স্ত্রীলোক-দিগের বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা স্পর্দ্ধা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মায় তাহা হইলে বিদ্যাভ্যাসে পুরুষদিগেরও অহংকার এবং কুপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে। তাহা হইলে পুরুষদিগকেও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ যে পুরুষদিগের মধ্যেও কত কুপ্রবৃত্তির লোক আছে তাহার সীমা নাই। অতএব তাহা বিদ্যা শিক্ষার দোষ নহে, সে কেবল তাহাদের স্বভাব-জনিত দোষেই ঘটিয়া থাকে। স্ত্রী হউক অথবা পুরুষ হউক বিদ্যা শিক্ষা করুক অথবা নাই করুক তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণের দ্বারা ঐ সকল দোষ ঘটিয়া থাকে। বরং বিদ্যাভ্যাসে জ্ঞান লাভের দ্বারা হিতাহিত বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মায়। তদ্দ্বারা গম্ভীরতা, শান্তি ও ধৈর্য্য গুণ প্রকাশ পায় এবং ক্রমে ক্রমে কুপ্রবৃত্তি সকল বিলুপ্ত হয়। এই হেতু স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া রাজা প্রজা-দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ স্ত্রীলোক যদ্যপি বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহা হইলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কার্য্যই বুঝিয়া উত্তম রূপে নিষ্পন্ন করিতে পারেন এবং পুত্র কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার পক্ষেও সুবিধা হয়। স্বামী যদি কোন কারণ বশতঃ বিদেশ গমন করেন কিম্বা রোগগ্রস্ত হন অথবা অন্ধ ও বধীর ও উদাসীন কিম্বা বিনষ্ট হন তাহা হইলে সেই বিদ্যা শক্তি দ্বারা কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বা-হার্থে বাণিজ্য, ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শিশু সন্তান-দিগের সহিত জীবন যাপন করিতে পারেন। আর যদি স্ত্রীগণ বিদ্যা শিক্ষা না করেন তাহা হইলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন না এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ পতি হীন হইলে আপনার ও শিশু সন্তান-দিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। অতঃপর অন্য উপায় অবলম্বন দ্বারা অর্থাৎ দাসীবৃত্তি নতুবা ভিক্ষা দ্বারা কিম্বা মূর্খতা হেতু ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন। এবং নিজ সন্তানগণের পক্ষে ও পারমার্থিক সাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের সর্ব্ব প্রকারেই বিঘ্ন হইয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণ বশতঃ রাজা, প্রজা ইত্যাদি পাঠকগণের পুত্র ও কন্যা-দিগকে বিচার পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করান অবশ্য কর্ত্তব্য ইহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই এবং ইহাতে কোন সংশয়ও করিবেন না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যাইতেছে যে ইংরাজ স্ত্রীগণ বিধবা হইলে বিদ্যাবলে নানা প্রকার উপায় ও কৌশলে এবং শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া উত্তমরূপে আপন আপন শিশু সন্তানদিগকে লইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এবং তোমরা যদি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা না করাও তাহা হইলে কোন স্থানে চাকুরি করিতে গেলে

তাহাদের মূর্খতা হেতু বেতন অল্প হইবে, তাহাতে তাহারা কি প্রকারে শিশু সন্তানদিগকে লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে? এই সমস্ত শুনিয়া সকলে বলিলেন, হাঁ মহারাজ ইহা আমাদের করা অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু যদি সকলে একমত হইয়া বুঝিয়া করে তাহা হইলেই অতি উত্তম হয় এবং জগতেরও বড়ই মঙ্গল হয়। কেননা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়।

সপ্তম প্রশ্ন।

পুনরায় উপরোক্ত পণ্ডিত শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহারাজ, পুত্র কন্যাদিগের বাল্যাবস্থায় বিবাহ দেওয়া উচিত, না, উহাদিগের পরিপক্ক যুবাবস্থায় বিবাহ দেওয়া উচিত? শিবনারায়ণ বলিলেন যে হে শ্রোতাগণ, বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত স্বরূপে দেখ যে যেরূপ ঈশ্বরের স্বভাব ও নিয়ম চরাচরে বর্ত্তমান আছে সেইরূপে তাঁহার আজ্ঞা পালন করা উচিত। যেরূপ আম্র কাঁচা অবস্থায় পাড়িলে ঈশ্বরের নিয়মের অন্যথাচরণ করা হয়। সেই কাঁচা আম্র অম্ল হয় এবং তাহা ভক্ষণে শারীরিক পীড়া জন্মায়। সেই কাঁচা আম্রের বীজে কোন বৃক্ষ হয় না আর যদিও হয় তাহা হইলে ভাল পুষ্ট হয় না। এবং উহাতে সুন্দর আশানুরূপ ফল ধরে না। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়মানুসারে আম্রকে পক্কাবস্থায় পাড়িয়া ভক্ষণ করিলে উহা সুমধুর ও তৃপ্তিজনক হয়। এবং উহার বীজে উত্তম বৃক্ষ হয় ও তাহাতে আশানুযায়ী সুন্দর ফল জন্মায়। আর তাহা হইলে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করা হয়। সেইরূপ যদ্যপি পুত্র কন্যাদিগের বাল্যাবস্থায় বিবাহ হয় এবং সন্তান সন্ততি জন্মায় তাহা হইলে সেই সন্তান রুগ্ন, বলহীন, বুদ্ধিহীন, তেজহীন ও অল্পায়ু হয়। আর যদ্যপি বিচার পূর্ব্বক উহাদিগের ঈশ্বরের নিয়মানুসারে পরিপক্ক অবস্থায় অর্থাৎ যুবাবস্থার প্রারম্ভে বিবাহ হয় তাহা হইলে তাহাদিগের যে সকল সন্তান সন্ততি হয় তাহারা তেজ, বল, বুদ্ধি মেধা শক্তি সম্পন্ন হয় এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকে—কোন প্রকারে রুগ্ন হয় না। এবং এইরূপ হইলেই ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয়। অতএব পাঁচ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত উহাদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যা, সৎকার্য্য ইত্যাদি সৎশিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ দিলে উহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। বাল্যাবস্থায় সন্তান সন্ততিদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া এবং উহাদিগকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতাতে ভক্তি নিষ্ঠা করিয়া দেওয়া এবং মাতা পিতা এবং গুরু জনকে সম্মান এবং সৎব্যক্তির আজ্ঞাপালন প্রভৃতি সৎশিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—যাহাতে ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক উভয় কার্য্য বুঝিয়া আনন্দরূপে কাল যাপন করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া সকলের উচিত এবং অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই সকল উপদেশ পূর্ণ সারগর্ভ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তৎস্থানস্থিত শ্রোতাগণ কহিলেন, হে মহারাজ, যাহা আপনি আজ্ঞা করিলেন ইহা সত্য বাক্য, আমাদিগের সকলের বিচার পূর্ব্বক ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

---

৫৭০ সংখ্যা। ১৮১২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

একষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ।

সনাতন গোস্বামী।

প্রধান রাজমন্ত্রী ঈশ্বরপ্রেমিক সনাতন গোস্বামী গৌড় রাজধানীতে বন্দীদশায় অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। এই অবস্থায় তিনি শ্রীরূপের পত্র পাইলেন। পত্র পাইয়া চৈতন্যচন্দ্রের দর্শনলালসায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কারাধ্যক্ষকে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, মিঁয়া সাহেব! কেতাব কোরাণ শাস্ত্র সকলি তুমি জান। আমি এত দিন তোমার যে কিছু উপকার করিয়াছি, তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ তুমি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত কর। আমি তোমাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিতেছি। ইহাতে তোমার পুণ্যসঞ্চয় ও অর্থলাভ দুইই সিদ্ধ হইবে। আমাকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিলে ভগবান তোমার সকল বিপদ দূর করিবেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে বলিও বহির্দেশে গিয়া সনাতন গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে। তোমার কোন ভয় নাই, আমি এদেশ পরিত্যাগ করিয়া দরবেশ

হইয়া চলিয়া যাইব। সনাতনের অনুনয় বাক্যে কারাধ্যক্ষ যবন সম্মত না হওয়াতে সাত হাজার মুদ্রা দিয়া সনাতন গোপনে কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাত্রি-যোগে ভাগীরথী পার হইয়া, ঈশান নামক ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্যের উদ্দেশে ছুটিতে লাগিলেন। গ্রাম নগরের প্রকাশ্য রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য বন-পথে ফল মূল জল মাত্র দ্বারা কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া অতি ক্লেশে পাতরা পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই পর্ব্বতে একজন দস্যু ভৌমিক (ভুঁঞা) কুটুম্বপরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিত। পথিক লোকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া প্রাণ বিনাশ করাই তাহার ব্যবসায়। সনাতন উক্ত ভুঁঞার নিকট উপস্থিত হইয়া, পর্ব্বত পার করিয়া দিতে অনু-রোধ করিলেন। ঈশান ভৃত্যের নিকট স্বর্ণমুদ্রা আছে জানিতে পারিয়া, অতি সমাদরে ভুঁঞা তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-শালী রাজমন্ত্রী সনাতন, অপরিচিত ভৌ-মিকের এবম্বিধ সমাদরের তাৎপর্য্য হৃদয়-ঙ্গম করিয়া চিন্তিত হইলেন এবং ঈশানকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, এই কালযম কেন সঙ্গে আনিয়াছ? অতঃপর ঈশানের নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ভুঁঞাকে অর্পণ করিলেন। ভুঁঞা বলিল, তুমি অতি সুবুদ্ধি, এই মোহরের জন্য আজ রাত্রে আমি তোমাকে হত্যা করিতাম। যাহা হউক, ভাল হইল, আমি পাপ হইতে অব্যাহতি পাইলাম। আমি মোহর গ্রহণ করিব না, ধর্ম্মার্থে তোমাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব। সনাতন বলিলেন, তুমি যদি ইহা গ্রহণ না কর, তাহা হইলে, অপর কোন দস্যু ইহার জন্য আমার প্রাণ নাশ করিবে। অতঃপর, ভুঁঞার সাহায্যে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর আ-সিয়া ঈশানকে বিদায় করিয়া দিলেন। সনাতন ছিন্নকন্থা করোয়া মাত্র সঙ্গে লইয়া একাকী নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে অতি দীন হীন বেশে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে হাজী-পুর গ্রামের এক উদ্যানে সন্ধ্যাকালে উপ-স্থিত হইয়া সেইখানে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপিপাসু দীনাত্মা সনাতন প্রেমে পুলকিত হইয়া নিস্তব্ধ গভীর রজ-নীতে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগি-লেন। সনাতনের ভগিনীপতি রাজকর্ম্মচারী শ্রীকান্ত, ঘোটকের মূল্যস্বরূপ বহু অর্থ লইয়া পাতসার নিকটে যাইতেছিলেন; এই উদ্যান মধ্যে তিনিও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রাত্রিকালে পরিচিত কণ্ঠ-স্বর শুনিতে পাইয়া, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সনাতনের নিকটে উপনীত হইলেন। সনাতনের ছিন্নকন্থা মলিন বসন ধুলিধূস-রিত অনাহারক্লিষ্ট ক্ষীণ অঙ্গ অবলোকন করিয়া শ্রীকান্তের চক্ষে জল আসিল। হায়! সনাতন, তোমার একি দশা! তো-মার রাজ্য সম্পদ কোথায়? সুখের শরীরে এত ক্লেশ কিরূপে তুমি সহ্য করিবে? তুমি এই কঠোর বৈরাগ্য পরিত্যাগ কর, গৃহে বসিয়া শ্রীহরির আরাধনা কর, তোমার এই দীনবেশ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। শ্রীকান্তের করুণ স্নেহবাক্য শ্রবণ করিয়া সনাতন বলিলেন, ভাই, আমাকে আর একথা বলিও না, আমার ভাগ্যে যাহা হয় হইবে, তুমি গৃহে গমন কর। সনাতনের উৎকট বৈরাগ্যের অবস্থা চিন্তা করিয়া শ্রীকান্ত আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। কেবল শীত নিবারণের জন্য একখানি শাল দিলেন। সনাতন হাস্য করিয়া তাহা দূরে পরিত্যাগ করি-

লেন। শ্রীকান্ত পুনর্ব্বার একখানি বনাত আনিয়া দিলেন। মূল্যবান জানিয়া সনাতন তাহাও গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে শ্রীকান্তের অনুরোধে একখানি ভোট কম্বল শীতনিবারণের জন্য লইয়া সনাতন গোস্বামী একাকী গৌরচন্দ্রের উদ্দেশে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

"তবে ভুঁঞা গোঁসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল।
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল॥
পার হঞা গোঁসাঞি তবে পুছিল ঈশানে।
জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে॥
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ।
গোঁসাঞি কহে মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ॥
তারে বিদায় দিয়া গোঁসাঞি চলিলা একেলা।
হাতে করোয়া ছেঁড়া কন্থা নির্ভয় হইলা॥
চলি চলি গোঁসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত নাম।
গোঁসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার সনে।
ঘোড়ামূল্য লঞা পাঠায় পাতসার স্থানে॥
টুঙ্গির উপরে বসি সেই গোঁসাঞিকে দেখিল।
রাত্রে একজন সঙ্গে গোঁসাঞি পাশ আইল॥
দুই জন মিলি তথায় ইষ্ট গোষ্ঠি কৈল।
বন্ধন মোক্ষণ কথা গোঁসাঞি কহিল॥
তিঁহো কহে দিন দুই রহ এইস্থানে।
ভদ্রবেশ কর ছাড় মলিন বসনে॥
গোঁসাঞি কহে একক্ষণ ইঁহা না রহিব।
গঙ্গাপার করি দেহ এখনি চলিব॥
যত্ন করি তিঁহো এক ভোট কম্বল দিল।
গঙ্গাপার করি দিল গোঁসাঞি চলিল॥"

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড ২০ অধ্যায়।

" ... ...
শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া গোসাঞি চলিল একলা।
চলিতে চলিতে হাজীপুর গ্রামে গিয়া।
রাত্রে এক বাগিচাতে রহিল পড়িয়া॥
তার ভগ্নিপতি ঘোড়া খরিদ কারণ।
আসিয়াছে সেই বাগানেতে বাসস্থান॥
হাওয়া খানা টুঙ্গির উপরে বসিয়াছে।
নিকটে গোঁসাঞি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফুকারিছে॥
স্বর শুনি মনে কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া।
নামিয়া আপনি তথা গেলেন চলিয়া॥
দেখে গিয়া বসি রাজমন্ত্রী সনাতন।
চমৎকার হৈল মুখে না সরে বচন॥
হাহাকার করিয়া অঙ্গুলি নাকে ধরি।
কহয়ে খেদোক্তি করি চক্ষে বহে বারি॥
আহা একি দশা হেন রাজ্য পদ ছাড়ি।
মলিন বসন কেন ভূমে গড়াগড়ি॥
এহেন সুখের দেহে এতেক সুক্লেশ।
কেমনে সহিবে এ দুঃখের নাহি শেষ॥
বৈরাগ্য না কর গৃহে বসি কৃষ্ণ ভজ।
আইস আইস গৃহে মলিন বস্ত্র ত্যজ॥
সনাতন কহে ভাই ও কথা না কহ।
মোর ভাগ্যে যাহা আছে তুমি ঘরে যাহ॥
উৎকট বুঝিয়া তেঁহো পুনঃ না কহিল।
শীত নিবারণ হেতু গাত্রে শাল দিল॥
গোসাঞি হাসিয়া তাহা দূরে তেয়াগিল।
তাহা দেখি পুনঃ এক বনাত আনি দিল॥
উত্তম জানিয়া সাধু তাহা নাহি নিল।
তবে তেঁহো মনে কিছু বিচার করিল॥
বুঝিয়া আশয় এক ভোট যে কম্বল।
আনিয়া দিলেন তবে চক্ষে বহে জল॥
তাহাই লইয়া অঙ্গে উঠিল গোঁসাঞি।
চলিল পশ্চিম দিগে সঙ্গে কেহ নাই॥"

ভক্তমাল গ্রন্থ দ্বিতীয় মালা।

শ্রীকান্ত-দত্ত ভোট কম্বল গায়ে দিয়া বৈরাগী সনাতন ভাগীরথী অতিক্রম করত অতি কষ্টে বারাণসী ধামে উপনীত হইলেন। ব্যাকুল হৃদয়ে কোথায় চৈতন্য কোথায় চৈতন্য বলিয়া উন্মাদের ন্যায়

যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পূর্ণ-চন্দ্রোদয়ে সাগরবারি যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করে, প্রেমাবতার গৌরচন্দ্রের প্রেমের আকর্ষণে সনাতনের ভাবসিন্ধু সেইরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। গণ্ডস্থল ভাসাইয়া গলদশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। আপনার পাপ দুর্ব্বলতা বিষয়ভোগ আর গৌরচন্দ্রের প্রেমবিহ্বল স্বর্গীয় ভাব চিন্তা করিয়া সনাতনের আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হইয়াছে। বৃথা এতদিন বিষয়মদে উন্মত্ত হইয়া কেবল প্রবৃত্তির সেবা করিলাম, আপনার প্রকৃত কল্যাণ চিন্তা করিলাম না, এই মর্ম্মভেদী অনুশোচনার যন্ত্রণাতে বিদ্ধ হইয়া অতি দীন হীন কাতরভাবে বিলাপ করিতেছেন,আর গৌরের অনুসন্ধানে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। চৈতন্যচন্দ্র চন্দ্র-শেখর আচার্য্যের গৃহে উপবিষ্ট আছেন শুনিয়া সনাতন চন্দ্রশেখরের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন। আমি নীচ অতি অধম, ভিতরে যাইতে আমার অধিকার নাই, এই মনে করিয়া সনাতন ভিতরে প্রবেশ করিলেন না। শিষ্যবৎসল প্রেমার্দ্রচিত্ত নিমাইচন্দ্র সনাতনের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, দ্বারে এক জন বৈষ্ণব আসিয়াছে লইয়া আইস। চন্দ্রশেখর সনাতনকে দেখিয়া গিয়া বলিলেন, দ্বারে বৈষ্ণব কোথায়? একজন দরবেশ রহিয়াছে। চৈতন্য বলিলেন, তাহাকেই লইয়া আইস। সনাতন আনন্দমনে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। সনাতনকে দেখিয়া চৈতন্য প্রেমোন্মত্ত চিত্তে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন।

“ ... ...
শুনি আনন্দিত হইল প্রভু আগমনে॥
চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাঁহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুরে কহিল।
কেহ হয় করি প্রভু তাঁহারে পুছিল॥
তিঁহো কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে।
তাঁরে আন প্রভু বাক্যে কহিল আসি তাঁরে॥

... ...

শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।”

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড ২০ অধ্যায়।

“শ্রীচৈতন্য চরণ লক্ষ্য যে করিয়া।
উত্তরিল সাধূত্তম কাশীপুরে গিয়া॥
শ্রীচৈতন্য বলিয়া ফুকারে বারে বার।
গদগদ ভাবে বহে গলদশ্রু ধার॥
যারে তারে জিজ্ঞাসে চাই গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কেহ দেখিয়াছো কোথা গুণের সাগর॥
উন্মত্তের প্রায় সাধু খুঁজিয়া বেড়ায়।
চন্দ্রশেখরের ঘরে জানিল নিশ্চয়॥
দ্বারে যাইয়া সাধু ভাবে ভিতরে যাবার।
নীচ অধম আমি যে নাহি অধিকার॥
এত ভাবি বাহির দুয়ারে বসিয়াছে।

... ...

দূর হইতে কহে প্রভু কোন নিজ জনে।
দেখত বাহিরে কেহ বৈষ্ণব ওখানে॥
বসিয়া থাকয়ে যদি বোলাইয়া আন।
তেঁহো দেখি আসিয়া প্রভুরে কহে পুনঃ॥
বৈষ্ণব না হয় এক কাঙ্গাল আছয়।
প্রভু কহে বোলাইয়া আন কেহ হয়॥
যতন করিয়া তবে ডাকিয়া আনিল।
প্রভু দরশনে সাধু আনন্দে ভাসিল॥”

ভক্তমাল গ্রন্থ—দ্বিতীয় মালা।

সনাতন গোস্বামী অশ্রুসিক্ত গদগদ-বচনে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া চৈতন্যের নিকটে আত্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

"দুই গুচ্ছা দুই করে, এক গুচ্ছা দন্তে ধরে,
পড়িল গৌরাঙ্গ রাজা পায়।
দুনয়নে শতধারা, যেন রাজদণ্ডী পারা,
অপরাধী আপনা মানায়॥
তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি,
সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি।
কদর্য্য বিষয় ভোগ, কামাদি ষড়র্গ রোগ,
তাহে ভ্রমি সুখ বুদ্ধি করি॥
নীচ সঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ ব্যবহারে মতি,
নীচ কর্ম্মে সদাই উল্লাস।
এ হেন দুর্ল্লভ জন্ম, পাইয়া কি কৈনু কর্ম্ম,
কেবল হইল উপহাস॥
শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু,
করুণা কটাক্ষ মোরে কর।
ও রাঙ্গাচরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সারগতি,
এ অধম জনারে বিচার॥
সনাতনের আর্ত্তনাদ, শুনিয়া দৈন্য বিষাদ,
ছল ছল প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন করিতে চায়, সনাতন পাছে ধায়,
কহে মোরে না কর স্পর্শন॥
তোমা স্পর্শ যোগ্য প্রভু,মুঞি ছার নহে কভু,
ঘৃণাস্পদ মোর এই দেহ।
পাপময় সুকদর্য্য, সাধুর সভায় ত্যজ্য,
মোরে স্পর্শ প্রভু না করহ॥"

ভক্তমাল গ্রন্থ—দ্বিতীয় মালা।

গৌরচন্দ্র প্রেমে বিগলিত হইয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুস্পর্শে সনাতনের ভাবসিন্ধু আবার উথলিয়া উঠিল। চৈতন্য সনাতনকে নানাপ্রকার প্রবোধ বচনে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। দুইটি প্রচণ্ড বেগবতী স্রোতস্বতী একত্র মিলিত হইলে যেমন তটাভিঘাতি-তরঙ্গলহরী উত্থিত হয়, ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য ও সনাতনের মিলনও তদ্রূপ। উভয়কে সন্দর্শন করিয়া উভয়ের প্রাণ প্রেমরসে অভিষিঞ্চিত হইয়াছে। তাঁহাদের হৃদয়-সিন্ধুতে ভাবের শত সহস্র তরঙ্গ আঘাত করিতেছে, এবং তাহা উদ্বেলিত হইয়া প্রেমাশ্রু রূপে গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া অজস্র নিঃসৃত হইতেছে। চন্দ্রশেখর আচার্য্য তাঁহাদের ভক্তিরসরঞ্জিত প্রেম-বিস্ফারিত মুখশ্রী দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। গৌরসুন্দর সনাতনের হস্ত-ধারণ করিয়া তাঁহাকে পিঁড়ার উপরে উপবেশন করাইলেন, এবং প্রেমভরে অঙ্গে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। সনাতন বলিলেন, প্রভু, আমাকে কেন স্পর্শ করিতেছেন? আমি অতি অধম নারকী। সনাতনের দৈন্য বিলাপ অনুশোচনা অবলোকন করিয়া চৈতন্য বলিলেন, তুমি দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। হে সনাতন! পতিতপাবন শ্রীহরির দয়া অপরিসীম। তিনি তোমাকে মহারৌরব হইতে উদ্ধার করিলেন। তুমি এত দিন বিষয়-কূপে নিমগ্ন ছিলে, কৃপাময় শ্রীহরি তোমাকে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। তুমি যথার্থ ভক্তোত্তম সাধু, ভক্তিবলে তুমি ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিতে পার। আমি আপনাকে পবিত্র করিবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতেছি। তুমি পরম ভাগবৎ এবং পরমতীর্থ। ভাগবতে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাত্মা বিদুরকে বলিয়াছেন,

"ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥"*

ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্তগণ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তীর্থভ্রমণে আপনাদের কোন স্বার্থ নাই, কিন্তু মলিনজনসম্পর্কে তীর্থ অপবিত্র হইলে আপনাদের হৃদয়স্থিত গদাধারী হরি কর্ত্তৃক পবিত্র হইয়া তাহা পুনর্ব্বার তীর্থ হয়। সনাতন বলিলেন, আমি

* শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্দ ১৩শ অধ্যায়, অষ্টম শ্লোক।

শ্রীহরিকে জানি না, আপনার অনুগ্রহই আমার উদ্ধারের হেতু।

"প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর সম্বরণ,
তোমার দৈন্যে ফাটে মোর বুক।
কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভালমন্দ না গণয়,
হইল যে তোমায় উন্মুখ॥
কৃষ্ণকৃপা তোমাপরি, যতেক কহিতে নারি,
উদ্ধারিলা বিষয়কূপ হইতে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভক্তি মতি অহ,
তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে॥"

ভক্তমাল গ্রন্থ—দ্বিতীয় মালা।

... ...

"তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হইলা॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইল সনাতন।
মোরে না ছুঁইও কহে গদগদ বচন॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥
তবে প্রভু তাঁর হাতে ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা॥
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
তিঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ॥
এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিত পাবন॥
মহা রৌরব হৈতে তোমার করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥
সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥"

চৈঃ চঃ মধ্য খণ্ড ২০ অধ্যায়।

কিরূপে বিষয়বন্ধন উন্মোচিত হইল চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন আদ্যোপান্ত বলিলেন। চৈতন্যের আদেশে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সনাতনের মিলন হইল। মিশ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। চৈতন্য বলিলেন, ইহাঁর ফকিরের বেশ দূর করিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া ক্ষৌর করাও। * অতঃপর ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া সনাতন গঙ্গাস্নান করিলে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে নূতন একখানি বস্ত্র দিলেন। নূতন বস্ত্র দেখিয়া বৈরাগী সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন না। দীনভাবে বলিলেন, যদি বস্ত্র দিতে অভিলাষ হয়, একখানি পুরাতন বস্ত্র দিন। এইরূপে বারাণসী তীর্থে ভক্তগোষ্ঠি সঙ্গে সনাতন পরিচয় লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন। সেখানে দাক্ষিণাত্যবাসী এক দ্বিজ বাস করিতেন। তিনি বলিলেন, সনাতন, তুমি যত দিন কাশীতে থাকিবে, আমার বাটীতে তোমার নিমন্ত্রণ থাকিল। সনাতন বলিলেন, আমি মাধুকরী করিব, ব্রাহ্মণের গৃহে স্থূল ভিক্ষা গ্রহণ করিব না। সনাতনের বৈরাগ্য দেখিয়া চৈতন্য অপার আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু সনাতনের গাত্রে ভোট কম্বল রহিয়াছে, বহুমূল্য ভোট কম্বল বৈরাগ্যের পক্ষে অবৈধ; এজন্য চৈতন্য বারম্বার কম্বলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সনাতন শ্রীচৈতন্যের মনের ভাব অবগত হইয়া ভোট কম্বল ত্যাগের পন্থা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, একজন বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব গঙ্গাতীরে একখানি কাঁথা শুকাইতে দিয়াছে। সনাতন উক্ত বৈষ্ণবকে কম্বল দিয়া তাহার কাঁথাখানি চাহিয়া লইলেন। সনাতনের গাত্রে কন্থা দেখিয়া চৈতন্য

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রূপ সনাতন মুসলমান রাজার দাসত্ব করাতে কিয়ৎ পরিমাণে মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। দাড়ি গোঁপ রাখা তখন এদেশে হিন্দুদের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল না। এই জন্য চন্দ্রশেখর আচার্য্য বহির্দ্বারে প্রথমে সনাতনকে দেখিয়া হিন্দু সন্ন্যাসী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই; দরবেশ ফকির মনে করিয়া ছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ভোট কম্বল কোথায় গেল? সনাতন সকল কথা নিবেদন করিলেন। চৈতন্য বলিলেন, সৎবৈদ্যে কখন রোগের শেষ রাখেন না। যে শ্রীহরি অপার কৃপাগুণে তোমার বিষয়রোগ দূর করিলেন, তিনি আর রোগের শেষ কেন রাখিবেন? তুমি তিন মুদ্রার ভোট কম্বল গায়ে দিয়া মাধুকরী করিবে, তাহা বৈরাগীর পক্ষে অধর্ম্ম এবং উপহাসজনক। হে সনাতন! দেহ গেহ পুত্র দারা বিষয় ভোগ প্রভৃতি সকল আশা পরিত্যাগ না করিলে হরিধন লাভ হয় না।

"সনাতনের হাতে ধরি, বসাইলা গৌরহরি,
আগমন শুভবার্ত্তা পুছে।
ভোট কম্বল গায়, প্রভুরে নাহিক ভায়,
বিষয়ের শেষ কিছু আছে॥
অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটখান আগে চায়,
সনাতন তৎক্ষণে বুঝিলা।
ক্ষণেক বিলম্বে উঠে, গিয়া জাহ্নবীর তটে,
মনে কিছু যুকতি করিলা॥
ভোট কম্বলখানি, এক যে বৈষ্ণব জানি,
তারে দিয়া তার কন্থাখানি।
পরিবর্ত্ত করি নিল, তেঁহ তাহে তুষ্ট হৈল,
গোসাঞি লইল শ্লাঘ্য মানি॥
সেইকান্থা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে গিয়া,
দণ্ডবৎ করিয়া পড়িল।
প্রভু বলে তাহা দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
আলিঙ্গন উঠিয়া করিল॥
প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতন ধন,
অনেক যে দুঃখেতে মিলয়।
দেহ গেহ পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর,
সর্ব্ব আশা যদি তেয়াগয়॥"

ভক্তমাল গ্রন্থ দ্বিতীয় মালা।

"সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা নিব॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বারেবার॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া কান্থা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে
তারে কহে আরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কান্থা দেহ মোরে॥
সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক হঞা।
বহুমূল্য ভোট কেন দিবে কান্থা লঞা॥
তিঁহ কহে হাস্য নহে কহি সত্যবাণি।
ভোট লহ তুমি মোরে দেহ কান্থা খানি॥
এত বলি কাঁথা লইল ভোট তারে দিয়া।
গোঁসাইর ঠাঁই আইলা কাঁথা গলায় দিয়া॥
প্রভু কহে তোমার ভোট কোথা গেল।
প্রভু পদে সবকথা গোঁসাঞি কহিল॥
প্রভু কহে উহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয় রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ
রোগ খণ্ডি সৎবৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরি গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস॥
গোঁসাঞি কহে যে খণ্ডিল কুবিষয় রোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয় ভোগ॥"

চৈঃ চঃ মধ্য খণ্ড ২০ অধ্যায়।

সনাতনের কঠোর বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তি দর্শন করিয়া চৈতন্যের মন প্রসন্ন হইল। সনাতন ব্যাকুলহৃদয়ে বিনীত হইয়া চৈতন্য চরণে নিবেদন করিলেন, প্রভু, আমি নীচ জাতি নীচসঙ্গী অধম ও পতিত। বিষয়-মদে উন্মত্ত হইয়া বৃথা কাল ক্ষেপণ করিয়াছি, আপনার যথার্থ হিতাহিত কিছুই জানি না। যদি কৃপা করিয়া বিষয়কূপ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, এখন আমার কর্ত্তব্য কি তাহা উপদেশ করুন। আমি কে? আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি

ভৌতিক এই তাপত্রয় কেন আমাকে জীর্ণ করিতেছে? কি করিলে আমার মঙ্গল হয়? সাধ্যবস্তু এবং সাধনতত্ত্বই বা কি? কৃপা করিয়া এই সকল গূঢ়তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন।

"তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয় কূপে পড়ি গোঁয়াইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
কৃপাকরি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপাকরি সবতত্ত্ব কহত আপনি॥"

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড ২০ অধ্যায়।

ক্রমশঃ।

পাঁচ ফুলের সাজি।

(৩য় সংখ্যা)

১। George Eliot,—

"We have all our secret sins; and if we knew ourselves, we should not judge each other harshly."

—আমাদের সকলেরই গুপ্ত পাপ আছে, এবং আমরা নিজেকে জানিলে কখনই পরস্পরের বিষয় নির্দ্দয় ভাবে বিচার করি না।

২। J. G. Whittier,—

"Reviving Hope and Faith they show
The soul its living powers,
And how beneath the winter's snow
Lie germs of summer flowers!
The night is mother of the day,
The winter of the spring,
And ever upon old Decay
The greenest mosses cling.

Behind the cloud the starlight lurks,
Through shower the sunbeams fall,
For God, who loveth all His works,
Has left his Hope with all!"

—সঞ্জীবনী আশা এবং বিশ্বাস, আত্মাকে তাহার জীবন্ত শক্তি সমূহ, এবং শীত ঋতুর তুষারের নিম্নে কিরূপে গ্রীষ্মকালের কুসুম সমূহের অঙ্কুর সকল থাকে, তাহাই প্রদর্শন করে! নিশা দিবার জননী, শীত ঋতু বসন্তের, এবং চিরদিনই পুরাতন বিনাশের (বিনষ্ট বস্তুর) উপর হরিত্তম সেওলাগুলি লাগিয়া থাকে। মেঘের পশ্চাতে তারকা-জ্যোতি লুক্কায়িত থাকে, বৃষ্টি-বারির মধ্য হইতে সূর্য্য-কিরণ ক্ষরিত হয়, কারণ ঈশ্বর তাঁহার যাবৎ সৃষ্ট বস্তুকে ভালবাসেন, এবং সকলের মধ্যেই তাঁহার "আশা" রাখিয়াছেন।

৩। ভগবদ্গীতা,—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"

—হে পার্থ! যাঁহারা (মৎ) ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া সমস্ত কার্য্য (আমাতে) ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক অনন্যসাধারণ ভক্তিযোগে (আমাকে) ঈশ্বরকে ধ্যান ও উপাসনা করেন, এই মৃত্যুভয়যুক্ত সংসারসাগর হইতে (আমি) ঈশ্বর অচিরেই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

৪। Tennyson,—

"Speak to Him thou for He hears, and Spirit with Spirit can meet—
Closer is He than breathing, and nearer than hands and feet."

—তাঁহাকে (কথা) বল, কারণ তিনি শ্রবণ করেন, এবং আত্মা আত্মার সহিত মিলিতে পারে—তিনি শ্বাস প্রশ্বাস হইতেও সন্নিধে রহিয়াছেন, এবং হস্ত পদ অপেক্ষাও নিকটতর।

৫। David,—

"The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.

Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me: thy rod and thy staff they comfort me."

প্রভু (পরমেশ্বর) আমার মেষপালক (রক্ষক), আমার অভাব হইবে না।

তিনি আমাকে হরিৎবর্ণ ক্ষেত্রেতে শায়িত করেন; তিনি আমাকে শান্ত সলিলের পার্শ্বে লইয়া যান।

তিনি আমার আত্মাকে সঞ্জীবিত করেন; তাঁহার নামের জন্য তিনি আমাকে ধর্ম্মের পথে লইয়া যান।

এমন কি যদিও আমি মৃত্যুছায়ার উপত্যকায় মধ্য দিয়া বিচরণ করি, আমি কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করিব না; কারণ তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ; তোমার দণ্ড এবং তোমার যষ্টি আমাকে শান্তি প্রদান করে।

ক্রমশঃ।

বিশ্বাস।

"বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

বিশ্বাস কি? জননী যখন শিশুকে শূন্যে ছুড়িয়া দিয়া দুই হস্তে তাহাকে ধারণ করেন, তৎকালে শিশু শূন্যে নিরবলম্ব ভাবে থাকিয়াও আঘাতপ্রাপ্ত বেলোয়ারের ঝাড়ের ন্যায় আনন্দে হাস্য করে। তাহার হাসির মূলে যে ভাব নিহিত থাকে, তাহাই বিশ্বাস।

বিশ্বাস দুই প্রকার, প্রকৃত এবং অপ্রকৃত। যিনি জনশ্রুতিতে প্রত্যয় করেন, ও "পরের মুখে ঝাল্ খান," এবং যিনি কল্পনা বা কেবল যুক্তিমীমাংসারচিত তন্তুগৃহকে মহদাশ্রয় জ্ঞান করেন, এই উভয়েরই বিশ্বাস অপ্রকৃত। মনের, এবং হৃদয় বা জীবনের বিশ্বাসের মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রকৃত সরল বিশ্বাসী অবিশ্বাস করিতেই অসমর্থ।

বিশ্বাস ভূমি। ধর্ম্ম-জীবন প্রাসাদ। পত্তন-ভূমি না থাকিলে প্রাসাদ যেমন অলীক, তেমনি বিশ্বাসহীন ধর্ম্মজীবন আকাশকুসুমবৎ কল্পনার বস্তু।

বিশ্বাস ধর্ম্মের প্রাণ। বিশ্বাসহীন ধর্ম্ম চেতনাহীন শবতুল্য।

বিশ্বাস ধর্ম্মের মেরুদণ্ড। উহা ব্যতীত ধর্ম্ম টিকিতে পারে না, দাঁড়াইতে পারে না।

বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহা পর্ব্বতশিখরস্থ হর্ম্ম্যের ন্যায়। বিশ্বাস-বিবর্জ্জিত ধর্ম্ম চোরাবালীর উপর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ন্যায়, ক্ষুদ্রতম তৃণবীজ নড়াইতে অক্ষম, সামান্য বায়ুর আঘাতে পড়িয়া যায়।

বিশ্বাস ধর্ম্মজীবনরূপ ব্যঞ্জনের লবণ। উহা জীবনের প্রত্যেক অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবনকে সুস্বাদু ও সুমধুর করে।

বিশ্বাস ধর্ম্মের শোণিত। বিশ্বাসই আত্মার বল বীর্য্য। উহা প্রাণের মধ্যে থাকিয়া আত্মাকে সতেজ করে।

বিশ্বাস ধর্ম্মের প্রথম অক্ষর। বিশ্বাসই ধর্ম্মের শেষাক্ষর।

বিশ্বাসরাজ্যে মৃত্যু নাই, ভয় নাই। বিশ্বাস এই মৃত্যুরাজ্যে অমৃতের উৎস, সংসারলবণসমুদ্রে প্রাণদ নির্ম্মল বারি।

বিশ্বাস জীবন-সমুদ্রে ধ্রুবতারা, পরীক্ষাক্ষেত্রে অভেদ্য কবচ, জীবন-সংগ্রামে শেমসনের কেশ।

পাপের তুফানে আত্মা যখন প্লাবিত হয়, তখন বিশ্বাস নোয়ার তরীরূপে আত্মাকে উদ্ধার করে।

বিশ্বাসই ধর্ম্মের পথ। উহাই পাথেয়। বিশ্বাসই সরল ও সহজ পথ,এবং ভবার্ণবের ভেলা।

বিশ্বাস প্রত্যক্ষ দর্শন, নয়নে নয়নে

মিলন, অসংশয়রূপে "তুমি আমাতে, আমি তোমাতে" এই ভাব।

দিব্য জ্ঞান বিশ্বাসের জনক। ভক্তি তাহার সখী। শান্তি বিশ্বাসের দুহিতা। এবং মুক্তি তাহার পরিচারিকা।

বিশ্বাস স্পর্শমণি। উহার স্পর্শে মলিন জীবন উজ্জ্বল এবং সুবর্ণাভ হইয়া উঠে।

সংশয়বিহীন জ্ঞান, অচল ধৈর্য্য, গভীর সন্তোষ, প্রকৃত বিনয়, অতুল আনন্দ, অপ্রতিহত উন্নতি এবং অমানুষ সহিষ্ণুতা এই গুলি বিশ্বাস-বৃক্ষের ফল।

বিশ্বাস আলাউদ্দিনের দীপ। উহার সাহায্যে এক রজনীর মধ্যে মহৎ এবং অত্যাশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়।

বিশ্বাস সুবর্ণের "জীয়ান্ কাঠি"। উহার স্পর্শমাত্রেই মনুষ্য নবজীবন লাভ করে,মৃত অস্থির মধ্যে জীবন সঞ্চারিত হয়, "Creates a soul under the ribs of Death."

বিশ্বাস স্বর্গের চাবি। এই "Open sesame" অতি সহজে ভগবানের "খাশ্ দর্বারের" দ্বার উদ্ঘাটিত করে।

বিশ্বাস-সাধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন। উহা ধর্ম্মজীবনের পরিণতাবস্থা ও চরম সীমা। সাধক ধর্ম্মজীবনের গুহানিহিত গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহু দূর।" ধ্রুব প্রহ্লাদের অল্পকালের মধ্যেই সিদ্ধিলাভের গূঢ় রহস্যের মীমাংসা বিশ্বাস-শাস্ত্রে পাঠ করা যায়। ধর্ম্মশৈলের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার উহাই সুগম পথ, "Royal road."

বিশ্বাস সিদ্ধির ঝুলি। উহার মধ্য হইতে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।

বিশ্বাস মুক্তি লাভের বীজ-মন্ত্র। সাধুতা স্বয়ম্বরা হইয়া বিশ্বাসকে পতিত্বে বরণ করে।

রোগের অমোঘাস্ত্র বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত তৈলসমূহের মলাযুক্ত "কাট্ও" যেমন সুফল প্রদান করে, তেমনি বিশ্বাস অন্ধ ও জ্ঞানহীন, অতএব মলিন হইলেও, মানব আত্মার অশেষ প্রকার ব্যাধির পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ।

জ্ঞানহীন অন্ধ বিশ্বাস স্বর্গের দিকে উঠিতে উঠিতে "হাওয়াইয়ের" ন্যায়, যেন, অর্দ্ধ পথ হইতে অধোমুখ হয়। ক্ষীণ-বিশ্বাসীও সহজেই উল্কার ন্যায় উচ্চ দেশ হইতে ধরণীর ধূলির উপর পতিত হয়। কিন্তু গ্রহতারকা নিষ্প্রভ হইতে পারে, সূর্য্যমণ্ডল কক্ষ্যচ্যুত হইতে পারে, তথাপি যথার্থ বিশ্বাসে যাঁহার আত্মা প্রতিষ্ঠিত, তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে পারেন না।

গণিত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিশ্বাসের নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়। অংশ সমগ্র ভাগ অপেক্ষা গুরুতর এবং মহত্তর হয়। সমগ্র পৃথিবী সমবেত হইলেও একজন লুথারের সমকক্ষ হইতে পারে না।

বিশ্বাসী দেখেন যে আত্মা-বিন্দুর মধ্যে অনন্ত নিহিত রহিয়াছেন। বিশ্বাসী বলেন "One is the all, and the all is naught."

আধ্যাত্মিক জগতে সংসার ও তাহার ছায়া অবিশ্বাস, আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যবর্ত্তী হইয়া "ব্রহ্মগ্রহণ" ঘটায়। বিশ্বাসীর জীবনে সর্ব্বগ্রাস হইতে পায় না, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী আংশিক গ্রহণ হয়। বিশ্বাস-যোগী স্খলিতপদ হইলেও, অচিরে অনুতাপ-যষ্টি অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয়েন।

মহীরাবণ যেমন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করিবামাত্র রিপুদলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত হয়।

বিশ্বাস-অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরমা-

ত্মাকে নিকটতর, উজ্জ্বলতররূপে দর্শন করা যায়। বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, বিশ্বাস ব্যতীত কিছুতেই সেই ধ্রুবতারাকে তেমন স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

বিশ্বাস-তাড়িতের সাহায্যে এক দণ্ডেরও জন্য যদি আত্মার অবিশ্বাসরূপ বাতব্যাধিকে তাড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে, আর আত্মার কোন ভয় থাকে না, শীঘ্র বা বিলম্বে আত্মা সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিবেই করিবে।

স্ব-াব-পক্ক ফল যেমন অধিকতর সুমধুর, তেমনি সহজ, অহেতুক বিশ্বাস চেষ্টালব্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা জীবনকে অধিকতর সুস্বাদু করে। প্রকৃতির নির্ঝর হইতে যে জীবন-স্রোত স্যন্দিত হয়, তাহার বারি যেমন মনুষ্যপ্রযত্নকৃতকূপবারি অপেক্ষা অধিকতর শান্তিপ্রদ ও বলদায়ক সেইরূপ সহজ বিশ্বাস, সাধনা-প্রসূত বিশ্বাস অপেক্ষা অধিকতর শান্তিপ্রদ ও বলদায়ক।

বিশ্বাস-অসি যতই জীবন-সমরে ব্যবহৃত হয়, ততই উহা সুতীক্ষ্ণ ও সমুজ্জ্বল হয়।

বিশ্বাস সম্মুখ-যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়া ভীত হয় না।

মহাকবি মিল্টন কহিয়াছেন, "'বিশ্বাসীকে' আক্রমণ করিলেও, আঘাত করা যায় না; অন্যায়রূপে হঠাৎ স্তম্ভিত করা যায়, কিন্তু উহার স্বাধীনতা হরণ করা যায় না; বস্তুতঃ অমঙ্গলকারী যদ্দ্বারা 'বিশ্বাসীর' বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিবার অভিলাষ করে, তাহাই শুভ-পরীক্ষাতে বিশেষ গৌরবের কারণ হয়—যদি ইহা নস্যাৎ হয়, তবে ঐ ঊর্দ্ধস্থ নভোমণ্ডল কিছুই নহে, এবং পৃথিবীর ভিত্তি শস্যদণ্ডের উপর স্থাপিত।"

সূর্য্যোদয় হইলে নক্ষত্রদল যেমন আকাশগর্ভে জ্যোতির স্রোতে ডুবিয়া যায়, তেমনি প্রকৃত বিশ্বাসোদয় হইলে জ্ঞানের রশ্মি কোথায় লুকাইয়া যায়।

দুর্ব্বলকে রোগ, এবং ভীরুকে ভয় যেমন চাপিয়া ধরে, অবিশ্বাসীকে পাপ তেমনি চাপিয়া ধরে; সে "কম্বল" পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিলেও "কম্বল" তাহাকে পরিত্যাগ করে না। সংসারভুজঙ্গ অবিশ্বাসীর আত্মাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া থাকে, সুযোগ পাইলেই তাহাকে উদরসাৎ করে।

শীতপ্রধান দেশে প্রাণ-সংহারক তুষার যেমন প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া যায়, তেমনি বিশ্বাসের প্রখর কিরণের নিকট পাপ অধিক কাল স্থিতি করিতে পারে না।

বিশ্বাস ধর্ম্মজীবনের অতুল সহায়। সামান্য সাংসারিক বিষয়েও উহা ভুবনবিজয়ী। যে ব্যবসায়ী সমাজের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারেন, তিনিই ব্যবসার উদ্দেশ্য সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দররূপে সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন। এই বিশ্বাস-রূপ মূলধন বাণিজ্য-ব্যবসায়েতে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, এবং ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, উহা বাণিজ্যে সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্র।

জ্ঞান আত্মাকে কেবল পথ প্রদর্শন করে, গতি-শক্তি প্রদান করিতে পারে না। বিশ্বাস পথও দেখাইয়া দেয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিবারও শক্তি প্রদান করে। মানব আত্মা জীবন-সমুদ্রে পথভ্রান্ত হইলে, বিশ্বাস-চুম্বক উত্তর পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

বিশ্বাসবর্ত্ম দুর্গম হইলেও সরল। "দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" এই পথে তাড়কা-ভয় আছে সত্য, কিন্তু অচল

সরল বিশ্বাসের অভেদ্য কবচে আত্মা বর্ম্মিত রহিলে, এই দুর্গম পথও সুগম ও সহজ হইয়া উঠে। বহুশাস্ত্রানুশীলন কর, বা বহুজ্ঞান-পটে আত্মাকে বিভূষিত কর, সামান্য পরীক্ষা-বায়ু উত্থিত হইবামাত্র কোথায় তাহা উড়িয়া যাইবে। পরীক্ষা ও প্রতিকূল রিপুবায়ুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইলে বিশ্বাসের আয়স অঙ্গত্রাণে আত্মাকে আচ্ছাদিত করিতে হইবে।

বিশ্বাসের পথে চলিতে চলিতে অবিশ্বাসের নদী হঠাৎ উপস্থিত হইলে, আশা-তরণী অবলম্বনপূর্ব্বক কৃপাপবনের সাহায্যে উহা উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

সময়ে সময়ে আত্মা-বিহঙ্গ স্বর্গের দিকে যাত্রাকালে প্রবল মোহঝটিকার আঘাতে ছিন্নপক্ষ হইয়া অধোদেশস্থ সংসারক্ষেত্রে নিপতিত হয়। তৎপরে ঘনজাল অপসারিত হইলে, ঝটিকা উপশমিত হইলে, অন্তর্দ্দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইলে, পুনরায় সে আশাপূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বাসের বলে অমৃতধামের দিকে উঠিতে সক্ষম হয়। এই সময়ে আশা ও বিবেকরূপ দুইটী পক্ষ হারাইলে আর সে উঠিতে পারে না।

বাষ্পত্রয়ের সংযোগে যেমন প্রাণবায়ুর উৎপত্তি হয়, তেমনি জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি উপকরণত্রয়ের মিলনে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে, উহাদের সকলেরই কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণ উপকরণ আছে।

প্রথমতঃ তোমার সহিত পরিচয়,অর্থাৎ তোমার বিষয় জ্ঞান তৎপরে তোমার চরিত্রের শোভনাংশ দৃষ্টিগোচর হইলে প্রেম, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বাসের অঙ্কুর জন্মে। তাহার পর তোমার মাহাত্ম্যজ্ঞানপ্রসূত ভক্তি। অবশেষে, ঘনীভূত বিশ্বাস। প্রথম হইতেই দেখা যায় যে, আত্মার গর্ভে জ্ঞানের সঞ্চার হওয়ার সময় হইতেই শুক্লপক্ষের শশাঙ্কের ন্যায় বিশ্বাস ক্রমশই বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করিতে থাকে, যতদিন না, আত্মা পূর্ণগর্ভা হইয়া সংশয় ও কলঙ্কবিহীন দিব্য বিশ্বাস প্রসব করে।

ডুবুরী যেমন সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়াও জীবিত থাকে, বিশ্বাসী তেমনি সংসারের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াও আত্মাকে সুস্থ ও জীবন্ত রাখিতে পারেন। বিশ্বাসী সংসারের অন্তরে থাকেন। কিন্তু সংসার তাঁহার অন্তরে থাকে না। তিনি সংসার হইতে অন্তরে থাকেন। তাঁহার মুখ ব্রহ্মের দিকে। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ সংসারের দিকে। তাঁহার সম্মুখে অমৃতধাম, পশ্চাতে সংসার-প্রবাস। তাঁহার আত্মা সংসারের উপরে নভোমণ্ডলস্থ তারকার ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে, "Like a star dwells apart."

এক বিন্দু বীজের মধ্যে যেমন প্রকাণ্ড পাদপ নিহিত থাকে, তেমনি বিশ্বাসকণার মধ্যে মহৎ ধর্ম্মজীবন লুক্কায়িত থাকে।

মেঘ যেমন শিশির-বর্ষণ দ্বারা তরুরাজি, পুষ্পলতাগণকে প্রফুল্ল এবং পরিপুষ্ট করে, বিশ্বাস তেমনি আশা-শিশির-দানে শুষ্ক ও ম্রিয়মাণ আত্মা-প্রসূনকে প্রফুল্ল এবং মঞ্জরিত করে। বিশ্বাসীর আত্মা প্রাতঃসমীরে দোদুল্যমান শিশির-স্নাত পুষ্পের ন্যায় উৎফুল্ল এবং রমণীয়।

সংসারের "আওতা" বিশ্বাস-তরুকে স্ফূর্ত্তি পাইতে দেয় না। সংসারের উত্তপ্ত প্রচণ্ড "লু" বহিলে বিশ্বাসের কোমল অঙ্কুর ও পল্লব ঝল্‌সিয়া যায়।

মোহের ক্ষীণ পবন বহিবামাত্র অবিশ্বাসীর আত্মা-গৃহ টলিয়া পড়ে, চর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু প্রলয়-ঝড় উঠিলেও

বিশ্বাসী কক্ষচ্যুত হয়েন না, তাঁহার মস্তক রাখিবার স্থান অটুট্ রহিয়া যায়, তাঁহার মস্তকের একটী কেশও নষ্ট হয় না। যখনি মানব আত্মা বিশ্বাসরূপ কক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়, তখনি তাহার পক্ষে প্রলয় উপস্থিত হয়।

বিশ্বাসী কল্পনা বা বাক্যরচিত তন্তু-গৃহের ছায়াতে আশ্রয় লইয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করেন না। তিনি অনন্ত-প্রেমরূপিণী জননীর স্নেহ-ক্রোড়ে শায়িত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিপদাপদকে উপহাস করেন। কিন্তু অবিশ্বাসী এবং অল্পবিশ্বাসী সামান্য ঘটনাবায়ু দ্বারা শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়েন।

বিশ্বাসীর নামরূপ ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মুখে স্বয়ং স্বয়ম্ভুও পরাস্ত। বিশ্বাসের আগ্নেয় শক্তির আবর্ত্তের মধ্যে পড়িলে জগৎও দগ্ধ হইয়া যাইবে। বিশ্বাসীর সম্মুখে এরূপ হিমালয় উপস্থিত হইতে পারে না,যাহাকে বিশ্বাসের বজ্র-প্রতিজ্ঞা ভেদপূর্ব্বক অতি-ক্রম করিতে অসমর্থ। স্বয়ং বজ্রীরও সিং-হাসন বিশ্বাসীর ভয়ে কম্পিত হয়।

বিশ্বাসীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ধনঞ্জয়ের শঙ্খ-নাদের ন্যায় অমিত্রবর্গকে ভীত ও সংজ্ঞা-শূন্য করে। মহাত্মা লুথারের প্রত্যেক বাক্য জর্ম্মাণীদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অশনি-নির্ঘোষে সমর-ভেরীর ন্যায় নিনাদিত হইয়া বিপক্ষদলের হৃৎকম্প উৎপাদন করিত। তাঁহার সেই ভীম গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি দেশ বিদেশে শ্রুত হইয়া পোপ-পদানত সমগ্র ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়কে ভয়দ্বেষে পরিপূর্ণ করিত। Richter রিক্টার্ লুথারের বিষয় বলিয়া-ছেন যে, "His words were half-battles." অর্থাৎ, লুথারের কথাগুলি অর্দ্ধ-যুদ্ধের তুল্য ছিল।

বিশ্বাসীর মস্তক কখনও ভয়াবনত হয় না। কেবল বিনয়ই তাঁহার উচ্চ মস্ত-ককে নম্র করিয়া থাকে। তাঁহার চরণ জগতের মস্তকে। তাঁহার মস্তক জগতের চরণে। তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মধ্বজিত্বের লেশ মাত্র থাকিতে পারে না।

একটী ইংরাজি প্রবচন আছে যে, মহামান্যা সাম্রাজ্ঞী বিক্টোরীয়ার সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হয় না। সেইরূপ, বিশ্বাসীর অন্তরাজ্যে জ্ঞানারুণ চিরবিরা-জিত। বরং অনসূয়ার ন্যায় বিশ্বাসীর প্রয়োজন হইলে, সূর্য্যও উদিত হইতে পারিবে না।

অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়ই বিশ্বা-সীর সাম্রাজ্য। সমুদ্রের তরঙ্গ সিংহাসন-স্থিত সম্রাটের আদেশকে অবজ্ঞা করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসীর অনুজ্ঞা অগ্রাহ্য করে এমন কাহার সাধ্য ?

বিশ্বাসী মৃত্যুভয়কে উপহাস করেন। আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গীভূত। তাঁহার চক্ষে মৃত্যু জন্মেরই নামান্তর ও অবস্থান্তর, এবং উচ্চতর নব-জীবন প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। সমগ্রা পৃথি-বীর উপর তাঁহার সিংহাসন। তিনি এক-চ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তী। কাহার সাধ্য যে তাঁ-হার বিশ্বাসরূপ যজ্ঞাশ্বের গতিরোধ করে ? বিশ্বাসী দরিদ্র ছিন্নকন্থাধারী ছিন্নবাসা হইলেও রাজগণের সেব্য এবং পূজ্য। স্বয়ং ভক্তাধীন হরি বিশ্বাসীর জয়পতাকা ধারণ করেন। বিশ্বাসী নেল্‌শনের ন্যায় বলিতে পারেন "ভয়! ভয় কি? তা-হাকে ত আমি কখনও দেখি নাই।"

ইন্দ্রিয়গণ বিশ্বাসকুশল সারথীর হস্তে সংযত ও নীরব। মনোরাজ্যের ভাবরূপ প্রজাকুল স্বভাবতই বিশ্বাসের অধীনতা স্বীকার করে।

যিনি বিশ্বাস-নঙ্গরে আরোহণ করিয়াছেন, তিনিই এই সংসারসাগরের ভীষণ তরঙ্গরাশির মধ্যে স্থির এবং নিরাপদ। বিশ্বাসভেলা ব্যতীত পারে যাওয়া যায় না।

বিশ্বাসীর হৃদয়বীণা তারার নিখাদে বাঁধা। অবিশ্বাসী তাহা শ্রবণ করিতে পায় না। সে উহা বুঝিতে বা তত উচ্চে স্বর তুলিতেও পারে না।

বিশ্বাসী, অবিশ্বাসীর ন্যায়, অন্ধকারের মধ্যে প্রস্তর নিক্ষেপ করেন না। তাঁহার লক্ষ্য স্থির এবং স্পষ্ট। তুমি আমি লক্ষ্য বিঁধিবার সময় "চক্ষু" ব্যতীত অন্য বস্তুও দেখিতে পাই কিন্তু বিশ্বাসীর নিকট একমাত্র অদ্বিতীয় লক্ষ্যই দৃষ্টিগোচর হয়।

বৈয়াকরণেরা জগতের মধ্যে অসংখ্য "কর্ত্তা" দেখিয়া থাকেন। কিন্তু বিশ্বাসীর চক্ষে এক ব্যতীত দ্বিতীয় কর্ত্তা কেহই নাই। বিশ্বাসী বিশুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে এক অদ্বিতীয় আদি কারণকেই সর্ব্ববিষয়ের বীজকারণরূপে দেখিতে পান।

তুমি আমি সুরভি পুষ্পের জয়মালা কণ্ঠে ঢুলাইয়া যে সুখাস্বাদনে বঞ্চিত, বিশ্বাসী চিরনির্যাতন সহ্য করিয়া, মস্তকে কণ্টকের মুকুট পরিধান করিয়াও তাহার সহস্রগুণ সুখ সম্ভোগ করেন। অমরাবতীর প্রাসাদমালাকে উপহাস করে এরূপ রত্নখচিত তাজমহলে আরামশয্যাতে শায়িত হইয়া ধনকুবের যে সুখমরীচিকার জন্য বৃথা লালায়িত, বিশ্বাসী তাঁহার সখার "ছাঁচাতে" দণ্ডায়মান হইয়া সেই সুখ ও বিশ্রাম অনায়াসে লাভ করেন।

যাঁহার আত্মা বিশ্বাস-তরুর শিখরে আশ্রয় লইয়াছে, নীচতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

বিশ্বাসীর রাজ্য ভবিষ্যতের দেশে, মৃত্যু-সীমার অন্য পার্শ্বে। শান্তির ক্রোড়ে শায়িত হইয়া তিনি উজ্জ্বল বিশ্বাস-নয়নে অনন্ত ধনরত্ন পর্য্যবেক্ষণ করেন। আর অবিশ্বাসী সংসারের ধূলির জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটাছুটি করিয়া মরিয়া থাকে।

দার্শনিকের ন্যায় বিশ্বাসীর দর্শন দর্শনের অগ্রেই আরম্ভ হয় না। তাঁহার দর্শনে ভাষা, কল্পনা, কিম্বা ন্যায়ের কোনই প্রয়োজন নাই। তাঁহার দর্শন "চখো চখি," নয়নে নয়নে মিলন। দার্শনিকের দর্শন পশ্চাৎ হইতে নাসিকা নির্দ্দেশ করে। বিশ্বাসীর দর্শন সহজেই উহা প্রদর্শন করে। প্রথমটীর সিদ্ধান্ত অনিশ্চিত। দ্বিতীয়টীর মীমাংসা নিশ্চিত, অসংশয়, দ্বিধাশূন্য। দার্শনিকের নয়নপথ ব্যাপিকা রেখা দ্বারা আবদ্ধ। বিশ্বাসীর দৃষ্টি অন্তকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

তমসাচ্ছন্ন আকাশে নক্ষত্রগণ যেমন শোভা পায়, মোহাচ্ছন্ন মানবসমাজে বিশ্বাসী তেমনি শোভা পান। চন্দ্রমণ্ডল যেমন চতুর্দ্দিকস্থ মেঘমালাকে কিরণধারাতে স্নাত করে, বিশ্বাসী তেমনি আপনার নিজ সমাজকে জীবনের জ্যোতিতে উজ্জ্বল করেন।

বিশ্বাসীই ব্রহ্ম নাম লইবার অধিকারী। অবিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করা মহা পাতক। বরং অবিশ্বাসের সহিত নামোচ্চারণ কালে রসনাকে সংযত করিলে পুণ্যসঞ্চার হয়।

মহাকবি মিল্টন বর্ণিত স্বর্গদেবতাগণের শারীরিক ক্ষত জন্মিবামাত্র যেমন আরোগ্য লাভ করিবে, তেমনি বিশ্বাসীর যতই ক্ষতি কর না, তদ্দণ্ডেই উহার পূরণ হইবে।

চক্ষুহীনের পক্ষে এই বিচিত্রকৌশলময় জগৎ, অগণ্যনক্ষত্রখচিত অনন্ত আ-

কাশ, পুষ্পলতাবিভূষিত মরকত-শ্যামল ধরণী, দিব্য মানব মুখমণ্ডলের আনন্দ-জ্যোৎস্না, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ এবং উত্তাল-তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের ভীম সৌন্দর্য্য যেমন "অসৎ," তেমনি বিশ্বাস-নয়ন-বিহীন লোকের পক্ষে চিদাকাশের অপূর্ব্ব সত্য-সূর্য্যের অতুল জ্যোতি, এবং আধ্যাত্মিক জগতের অনন্ত রহস্য সকলি মিথ্যা।

ধর্ম্মবীর অগষ্টাইন্‌কে কোন এক পৌত্তলিক বলিয়াছিল, "এই সব দেখ আমার ঠাকুর! তোমার ঠাকুর কই, দেখাইতে পার?" মহাত্মা উত্তর করিয়াছিলেন, "আমি যে দেখাইতে পারি না তাহা নহে, তবে তোমার সে চক্ষু কই যে দেখিবে?" বস্তুতঃ প্রকৃত বিশ্বাসের অভাবে,হয় আমরা পরমাত্মাকে অসৎ বলি, না হয় অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায়, তাঁহাকে খণ্ডাকারে দর্শন করিয়া, তিনি যে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দস্বরূপ তাহা বুঝিতে পারি না। সুসজ্জিত, সহস্র-বর্ত্তিকাদ্বারা উদ্ভাষিত দেবরাজবাঞ্ছিত রাজপ্রাসাদ ও অন্ধকারময় ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর অন্ধের নিকট সমতুল্য।

বক্রদৃষ্টি ব্যক্তি যেমন সরল পথকে অসরল জ্ঞান করে, প্রত্যক্ষ বিষয়ও প্রকৃত রূপে দেখিতে পায় না, অবিশ্বাসীর চক্ষুও তেমনি। যাহা বিশ্বাসীর নয়নে সরল ও প্রত্যক্ষ তাহা অবিশ্বাসীর নিকট অসরল ও অপ্রত্যক্ষ,এবং যাহা অসরল তাহাই সরল। অবিশ্বাসীর নিকট যে দেশ গভীর অন্ধ-কারাচ্ছন্ন, বিশ্বাসীর নিকট তাহা দিব্যা-লোকময়।

প্রতি পদে পদে অবিশ্বাসী ভয়ে জড়-সড়, ও রজ্জুকে সর্প জ্ঞান করিয়া ভীতি কর্ত্তৃক অভিভূত হয়েন। বিশ্বাসী কাল-সর্পকেও ভয় না করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে স্থির লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হয়েন।

বিশ্বাস ভীরু কোমলপ্রাণ নারীর হৃদয়ে সিংহের তেজ আনিয়া দেয়, ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বাহুতে মত্ত মাতঙ্গের বল সঞ্চার করিয়া দেয়।

কেবল শয়নাগারে, ও শান্তির সময়েই বিশ্বাসীর বীরত্ব প্রকাশিত হয় না। বিপদ্‌-কালে, অশান্তির সময়েই বিশ্বাসের প্রকৃত বলবীর্য্য পরীক্ষিত হয়। এমন অগ্নি-পরীক্ষা নাই যাহাতে বিশ্বাসী পশ্চাৎপদ। যুদ্ধ সময়ে, বিপদ্‌কালে তিনিই অগ্রণী।

অবিশ্বাসী সভয়ে বলিতেছে "লুথার! কদাচ এমন কার্য্য করিও না, প্রাণ হারাইবে।" "তথায় যাইও না। সেখানে ডিউক্ জর্জ্ আছে, যাইও না।" বিশ্বাসী নির্ভীকচিত্তে উত্তর করিতেছেন, "না, আমি যাইবই যাইব। তথায় ছাদোপরি যতগুলি ইষ্টক আছে, তাহার তিনগুণ শয়তান্ থাকিলেও যাইব।" "ক্রমাগত নয় দিবস ডিউক জর্জ বর্ষিত হইলেও আমি যাইব।" অবিশ্বাস কম্পিত-ওষ্ঠে ধর্ম্মবীরকে বলিতেছে, "এরূপ কার্য্য করিও না; তুমি নিশ্চয় প্রাণ হারাইবে।" বীরদর্পে দশ সহস্র প্রতি-পক্ষের সম্মুখে অচল বিশ্বাস-ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রনির্ঘোষে "এই পার্কার এই স্থানে উপস্থিত। কে তাহাকে নাশ করিবে কর" বলিয়া বিশ্বাসী বক্ষ পাতিয়া দিলেন। তাঁহার বজ্ররবে ধরণী কম্পিত হইল, সকলের প্রাণ দমিয়া গেল। পার্কারের একটী কেশও নষ্ট হইল না।

বিশ্বাসী বলেন, "প্রভু আমার পালক; আমার অভাব হইবে না। বস্তুতঃ যদিও আমি মৃত্যু-ছায়ার উপত্যকার মধ্যে দিয়া চলিয়া যাই, তথাচ আমি কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিব না; কারণ তুমি আমার

সঙ্গে রহিয়াছ; তোমারি যষ্টি এবং তোমারি দণ্ড আমাকে সুখ এবং শান্তি প্রদান করে।”

স্তন্যজীবী শিশু যেমন সামান্য কাষ্ঠখণ্ড তুলিতে অক্ষম, সে যেমন বৃহৎ ‘মাজ্’ তুলিতে পারে না, তেমনি যাহার বিশ্বাস সামান্য বিষয়ে চঞ্চল, বিশেষ পরীক্ষা স্থলে তাহার ভঙ্গপ্রবণ বিশ্বাস চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবেই যাইবে।

আঘাৎমাত্রে মৃন্ময় পাত্রের ন্যায় অবিশ্বাসী বিনষ্ট হয়। কিন্তু আহত হইলেও, ধাতুপাত্রের ন্যায়, বিশ্বাসীর আত্মা হইতে উপহাসসূচক মধুর হাস্যধ্বনি উত্থিত হয়। বিশ্বাস এমনই বস্তু যে, তাহার এক কণামাত্র থাকিলেই বিশ্বাসী পর্ব্বতাকার বাধা বিঘ্ন অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারেন।

যিনি বিশ্বাসের অগ্নিময় পরীক্ষা উত্তীর্ণ ও বিগতক্লেদ হইয়া তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর এবং উজ্জ্বল জীবন লাভ করিয়া বিশ্বাস-রত্নে ভূষিত হইয়াছেন, তিনি মানব হইলেও দেবগণের সভাতে উপবেশন করিবার উপযুক্ত।

বিশ্বাসীর আত্মা রত্নাকর সদৃশ। প্রার্থনাযোগে প্রাণ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইবামাত্র, তিনি যথাভিলষিত ধন রত্ন লাভ করেন।

সংসার-সাগরে বিশ্বাসীর জীবন সমুদ্রতীরস্থ আলোক-গৃহের জ্যোতিঃস্বরূপ বিপথগামী জীবনতরীগুলিকে অকূল জলধিতে সুপথ প্রদর্শন করে।

তরুলতার এক একটী পল্লব ঝরিয়া যেমন মূলদেশের মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা করে, তেমনি বিশ্বাসমূল জীবনতরুর এক একটী দিবস চলিয়া যাইলে,তাহার স্মৃতি আত্মাকে অধিকতর উর্ব্বরা করে। জীবনবৃক্ষ এই স্মৃতিরূপ সার লাভ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতেজ ও বর্দ্ধনশীল হইতে থাকে।

ধর্ম্মজীবনের শৈশব কালে মানব আত্মা বিশ্বাসের “দোল্‌নার” উপর শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পায় না, কত ভীষণ শব্দ ও স্বপ্ন শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়।

ফাল্গুনের শান্তসলিলা জাহ্নবীর সুনির্ম্মল স্রোতে অবগাহনকালে সম্মুখ হইতে হঠাৎ যেমন শিশুমার উদিত হয়, সেইরূপ বিশ্বাস-জীবনের শৈশবাবস্থাতে জীবনস্রোত নীরবে, ও প্রশান্ত, সুন্দর এবং নির্ব্বিঘ্ন ভাবে বহিতে বহিতে, সময়ে সময়ে আমাদের অসতর্কতা প্রযুক্ত অজ্ঞাতসারে হঠাৎ সংশয় ও অবিশ্বাস উদিত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কতা আসিয়া প্রাণকে নীরস করে, এবং অজ্ঞান আসিয়া বিবেককে তিমিরাচ্ছন্ন করে। জীবনের এই অংশকে বৃদ্ধ কবি হোমার বর্ণিত একিলিসের উরুসন্ধিস্থ দুর্ব্বল ছিদ্র বলা যাইতে পারে। মহাধর্ম্মবীরও জীবনের এইরূপ স্থলে প্রলোভন কর্ত্তৃক সাংঘাতিকরূপে বিদ্ধ হইতে পারেন। এই সময়েই আশা এবং ঈশ্বরের পূর্ব্ব কৃপার স্মৃতি দুর্ব্বলজানু, বিচলিতচিত্ত মানবকে দণ্ডায়মান হইবার সামর্থ্য প্রদান করে। শাণিতক্ষুরধারসদৃশ দুর্গম ধর্ম্মপথে বিচরণ কালে অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি পূর্ব্বক চলিলে এই প্রসারিতমুখ শিশুমারের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অতীত জীবনের স্মৃতি ভবিষ্যতের অন্ধকাররাশির মধ্যে আশাশুকের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় যে, ক্ষণকাল ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থিরভাবে রহিলে দুঃখবিভাবরী চলিয়া যাইবে এবং সুখপ্রভাতের কিরণচ্ছটা অবিশ্বাসতিমিররাশি বিদূরিত করিবে।

সন্ধ্যার প্রারম্ভে চন্দ্রাভাবে ক্ষুদ্র ক্ষীণ-জ্যোতি সান্ধ্য তারকাকে যেরূপ বৃহৎ ও সুন্দর দেখায়, সেইরূপ সংশয়বিহীন বিশ্বাসোদয়ের পূর্ব্বে সামান্য সংশয়মিশ্র বিশ্বাসই প্রচুর বোধ হয়। শৈশবকালে অনেকের বোধ হয় "আমার হস্তাক্ষর ত মন্দ নয়!" কিন্তু কিছুকাল পরে তাহা দেখিলে বোধ হয়, "কি জঘন্য লেখা!" সেইরূপ বিশ্বাসের শৈশবাবস্থাতে সামান্য পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু যতই আত্মা উন্নত হয়, এবং ধর্ম্মযৌবন লাভ করিতে থাকে, ততই আমরা স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারি যে, আমাদিগের বিশ্বাস সম্বন্ধীয় পূর্ব্বসংস্কার ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল, এবং এখন আমরা এক বিন্দুও প্রকৃত জীবন্ত বিশ্বাস লাভ করিতে সমর্থ হই নাই।

অবিশ্বাস-বিকার উপস্থিত হইলে আত্মা "হা হতোস্মি" করিয়া বেড়ায় ও হৃতবৎসা গাভীর ন্যায় অন্য কোন বিষয়েই শান্তি লাভ না করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। বিকার উপশমিত না হইলে, দগ্ধ জীবন শীতল হয় না, আহারে বিহারে কোন বিষয়েই আত্মা আনন্দ লাভ করে না। মৃতসঞ্জীবন বিশ্বাস ব্যতীত প্রাণ জুড়ায় না, কিছুতেই মানবাত্মাকে স্থির, বা সুস্থ করিতে, অথবা চেতনা দিতে পারে না।

সংসারসেবা অপেক্ষা বিশ্বাসীর পক্ষে মহা কলুষ আর নাই। তিনি "ব্যভিচারিণী দুনিয়ার" ন্যায় সংসারাসক্ত নহেন। আপনার প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের শরণাগত হওয়া তাঁহার নয়নে ব্যভিচার, স্বামীর প্রতি অন্যায়াচরণ।

যখন বিভাবরী চলিয়া যায়, পূর্ব্ব গগনে শুকতারা হাসিতে থাকে, যখন সূর্য্যরশ্মি অল্পে অল্পে তিমিরাচ্ছন্ন মেঘজাল ভেদ করত গিরি গুহা, বন উপবন, নগর প্রান্তরকে জাগাইয়া তুলে, যখন পুষ্পকুল শিশির-বিন্দুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া প্রভাতসমীরে উল্লাসে হেলিতে দুলিতে থাকে, এবং প্রকৃতিময় এক অপূর্ব্ব সুধাময় তান উঠে, সেই সময়ে যেমন বিহঙ্গসমাজ ঘন বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়া সূর্য্যালোকের পূর্ব্বরাগ নিরীক্ষণ করিয়া, আপনাপন কুলায়ে জাগিয়া আনন্দে গাহিয়া উঠে; সেইরূপ মানব আত্মা যখন ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকে, পাপ-তমোরাশি যখন তাহার দিব্য মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এবং অজ্ঞানজাল তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেই সময়ে পাপমেঘের মধ্য দিয়া, অজ্ঞান-জাল ভেদ পূর্ব্বক, নয়ন হইতে অন্ধকারের আবরণ অপসারিত করিয়া, বিশ্বাস-সূর্য্যের পূর্ব্বালোক প্রাণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মাবিহঙ্গের চক্ষে লাগিবামাত্র, মনুষ্যের ঘুমন্ত আত্মা ব্রহ্মনাম গাহিয়া জাগিয়া উঠে, গিরি গুহা, বন উপবন, নগর প্রান্তর সেই অমিয়মাখা অজস্র সঙ্গীতধারাতে পরিপূরিত হয়।

বিশ্বাসীর চক্ষে একমাত্র পরমাত্মাই আত্মা-বৃক্ষের মূলস্বরূপ। আত্মা পরমাত্মার ছায়া, মানুষ ডাকিলেই মঙ্গলময় আইসেন, এবং চাহিলেই ভিক্ষা দেন।

ঈশ্বর এমনই দয়াল এবং প্রেমময় যে তিনি আমাদিগকে সমস্ত জগৎ উপহার দিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তিনি আপনাকে পর্য্যন্ত আমাদিগকে দান করিয়া থাকেন। আমাদের সেবার জন্য কেবল জগৎকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট নহেন, তিনি স্বয়ং আমাদের সেবায় যত্নশীল। তিনি যেরূপ আমাদের সেবা করিয়া থাকেন, সেরূপ বল কে তাঁহার সেবা করিতে পারে?

বিশ্বাসীর ঈশ্বর কল্পনার পুত্তলিকা অথবা বৈদিক বা পৌরাণিক কালের দেবতা নহেন। তিনি এই স্থানেই, এই-ক্ষণেই রহিয়াছেন—তিনি সর্ব্বত্র চির-বর্ত্তমান। তিনি দেশ কালের অতীত। তাঁহার ঈশ্বর ভূভার হরণের জন্য ভূতকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বা ভবিষ্যতে হই-বেন ভাবিয়া তিনি সুখী হইতে পারেন না। তাঁহার হৃদয়-ভার-হরণের জন্য ভগ-বান সর্ব্বদা তাঁহার প্রাণে অবতীর্ণ। ভূত বা ভবিষ্যতের দেবতা তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে না। তাঁহার পিপাসা এরূপ নহে যে, পূর্ব্বকালে হিমালয়ে শীতল নির্ম্মল বারির উৎস ছিল, বা ভবিষ্যতে থাকিবে ভাবি-লেই তাহা নিবৃত্ত হইবে। তিনি এই দণ্ডে সর্ব্বত্র অবতীর্ণ শান্তিদাতার হস্ত হইতে অমৃতবারি লাভ করিয়া প্রাণ ভরিয়া তৃপ্তিসুধা পান করিতে চাহেন।

তাঁহার উপাসনা তীর্থে, গুহায়, মন্দিরে, অথবা কোন স্থানে বা কালে নির্দ্দিষ্ট নহে। বিশ্বাসীর পবিত্র শরীরই তাঁহার ভজনালয়। পুষ্পের সুরভি নিশ্বাসের ন্যায় তাঁহার আত্মাগুহা হইতে অহর্নিশ উপাসনার সুবাস উত্থিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিশ্বাসীর পক্ষে তাঁহার আত্মাই প্রকৃত ব্রহ্মমন্দির। ব্রহ্মই আত্মার গৃহ। আত্মাই ব্রহ্মের গৃহ।

বিশ্বাসীর নিকট তিনিই একমাত্র অদ্বি-তীয় শরণ্য, বরেণ্য এবং উপাস্য। তিনিই একমাত্র সখা সুহৃদ, সহায় সম্বল, আত্মীয় বন্ধু, ও জগদ্‌গুরু। তিনিই একমাত্র পাতা, পরিত্রাতা, আদ্যন্তরহিত জগৎপ্রসবিতা। বিশ্বাসী তাঁহার নিকট যাহা চাহেন, তাহাই পাইয়া থাকেন।

‘তিনি নাই নহে’ ইহাই বিশ্বাসের প্রারম্ভ। এই অঙ্কুর হইতে বিশ্বাস-বৃক্ষের উৎপত্তি। এই বৃক্ষ যতই বৃদ্ধি এবং স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকে, ততই পল্লবোদগ-মের ন্যায় এক একটী ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত হইতে থাকে।

ধর্ম্মজীবনের এই বিশ্বাসমূল যতই শুষ্ক হইতে থাকিবে, ততই ধর্ম্মজীবন নীরস নির্জ্জীব, এবং বুদ্ধিতেজোহীন হইতে থাকিবে। উহা বিনষ্ট হইলেই ধর্ম্মজীবনের শেষ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল।

আমরা সামান্য রিপুর তাড়নায় ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়ি, সামান্য বিপদে আপ-নাকে অসহায় গতিহীন, বিবেচনা করি; কিন্তু বহু ঝড় ও বর্ষার মধ্যেও বিশ্বাসী হিমালয়ের ন্যায় স্থির, অচল এবং প্রশান্ত ভাবে থাকেন। তিনি নিত্য আশাপূর্ণ এবং অবিচলিতচিত্ত। মুক্তি বিশ্বাসীর করতল-ন্যস্ত। যিনি প্রাণের প্রাণ ও আত্মার প্রাণ-বায়ু তিনিই তাঁহার মুক্তিদাতা। যিনি জগতের আশ্রয়, যাঁহার ইচ্ছাতে অগণ্য রবিতারকা শূন্যে দোদুল্যমান রহিয়াছে, যিনি পদদলিত ক্ষুদ্র কীটের সেবার জন্য অশেষ প্রকার আয়োজন, এবং মেঘ, বায়ু, সূর্য্যাদি সকলকে নিয়োজিত করিয়াছেন, তিনি কি জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের জন্য কোনরূপ মঙ্গল বিধান করেন নাই, বা করিবেন না? যিনি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে অগণ্য বিধান করিতেছেন, তিনি কি মানব আত্মার বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন? যিনি তরুলতাগণকে নিত্য নূতন সাজে সজ্জিত করিতেছেন, পুরাতন জীর্ণবাস ঝরাইয়া দিয়া, মরকত-শ্যামল নব বসন পরাইয়া দিতেছেন, তিনি কি মলিন, অসহায় আত্মাকে পবিত্রতার শুভ্র বসন পরাইয়া দিবেন না? বিশ্বাসীর ঈশ্বর রোগীকে স্বাস্থ্য, অন্ধকে চক্ষু, বধিরকে শ্রবণ, খঞ্জকে চলিবার শক্তি, এবং পাপীকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

যাহাদের অন্তরিন্দ্রিয়গণ বিকল হইয়া গিয়াছে,যাহারা ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিতে অক্ষম, যাহারা সত্যপথ দেখিতে পায় না, যাহারা ধর্ম্মপথে ইচ্ছাসত্ত্বেও চলিতে অপারগ ও প্রতি পদে পদে পড়িয়া যায়, তিনিই তাহাদিগের চক্ষু, কর্ণ, যষ্টি এবং বল। তিনিই অনাথ জনের পিতামাতা, বন্ধুহীনের বন্ধু,এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তিনি দয়াময়, প্রেমময়, সর্ব্বশক্তিমান। যাহাদের জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, ধন জন, বল যোগ্যতা সুখ সম্পদ কিছুই নাই, যাহারা চিরদিন অহঙ্কারী সংসারের ভ্রুকুটী ও পদাঘাতের বস্তু, যাহারা দুঃখ দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে এবং কোথাও মস্তক রক্ষা করিবার স্থান পায় না, তাহারা অনন্যোপায় হইয়া সভয়ে, সকাতরে জননীর শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে দুঃখসন্তপ্ত আত্মা জুড়াইতে চাহিলে কি তিনি অভয়দান না করিয়া তাহাদিগকে পদাঘাত করিয়া অনন্ত হতাশসাগরে নিক্ষেপ করিবেন ? ক্ষুধিত, পিপাসিত, বাক্‌স্ফূর্ত্তিরহিত, দুর্ব্বলতাভিভূত, বিপথগামী সন্তান অবশেষে গলদশ্রুলোচনে বিশ্বপালনী অন্নপূর্ণার সদাব্রতের দ্বারে উপস্থিত হইলে, কোন্ প্রাণে তিনি তাহাকে তাঁহার দ্বার হইতে অনাহারে দূর করিয়া দিবেন ? ব্রহ্মের ন্যায় কে আর বল এমন অতিথিসৎকার করিতে পারে ? এমন কোন্ কাল, স্থান বা অবস্থা আছে, যাহাতে বিশ্বাসী তাঁহার অভয় ক্রোড়ে স্থান লাভ না করেন ?

বিশ্বাসী ক্ষণকালের জন্যও হৃদয়ে অবিশ্বাসকে স্থান দিতে পারেন না। এক দিন প্রিয়তমের আগমনের বিলম্ব হইলেই, তিনি সংশয়-রূপ ভুজঙ্গকে হৃদয়ে বাস করিতে দেন না। তাঁহার প্রেম সংসারের দুই দিনের হাসি খুসি নহে। তিনি প্রিয়জনের প্রতি সন্দিগ্ধ হইতেই পারেন না। যিনি চিরদিন ভুবনেশ্বর হইয়াও, নিজের অতুল্য, অনুপম, এবং অদ্বিতীয় পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া, চীরবাস পথের কাঙ্গালের দুঃখবিপদের সময় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়কুটীরে বসিয়া স্বয়ং বিষাদাশ্রু মুছাইয়া দিয়াছেন, যিনি চিরকাল রোগশোকের সময় জননীর ন্যায় প্রেমহস্ত বুলাইয়া রোগের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া দিয়াছেন, এবং যিনি পরম বন্ধু হইয়া, মানাপমান সহ্য করিয়াও, সম্পদে বিপদে, চিরদিন সমভাবে আমাদের জন্য মঙ্গল বিধান করিতেছেন, বিশ্বাসী কোন্ প্রাণে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করিবেন ?

যিনি শিশুর জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধ এবং মাতৃহৃদয়ে স্নেহনীর সঞ্চারিত করিয়াছেন, যিনি কুক্কুটীকে বিপদকালে তাহার সাবকগুলিকে পক্ষছায়া দ্বারা রক্ষা করিতে শিখাইয়াছেন, তিনি কি অমঙ্গলের সময় আমাদিগকে তাঁহার কৃপাছায়াতে আশ্রয় দিবেন না, এবং আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন ? এইরূপ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর বিশ্বাসীর জীবনগ্রন্থে অন্বেষণ কর।

বৃক্ষলতার একটী শুষ্ক পত্র ঝরিলে, তাহার স্থানে দশটী মনোহর হরিৎ পল্লব জন্মিয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যেক পল্লবে, এবং প্রকৃতিময় সৃষ্টিকর্ত্তার স্বহস্তলিখিত সুসমাচার বিশ্বাসীরই নয়নগোচর হইয়া থাকে। জগৎ তাঁহার নিকট এক অনন্ত আশা-শাস্ত্র। তিনি অদৃষ্ট ও অন্ধকার পথেও বিশ্বাসের সাহায্যে চলিয়া থাকেন।

বিশ্বাসী ব্রহ্মে বিশ্বাস করেন, সুতরাং তাঁহার স্বরূপসমূহে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সত্য, প্রেম এবং পবিত্রতার জয়

হইবেই হইবে, বিশ্বাসী ইহা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ-রূপে জানেন।

বিশ্বাসী ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করেন, তাঁহার উদ্দেশে নহে।

বিশ্বাসীর বাক্য এত অধিক বলের সহিত প্রাণের দ্বারে আঘাত করে, যে আমরা তাঁহার নিকট আত্মার দ্বার কদাচই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না। নিরক্ষর ব্যক্তির প্রাণের মধ্য হইতে এমনই বাণী-স্রোত প্রবাহিত হয় যে, সেরূপ বাগ্মিতা পূর্ব্বে আর পৃথিবীতে কখনও শ্রুত হয় নাই।

চুম্বক যে প্রকার লৌহধূলীকে আকর্ষণ করে, ইহাঁদের বাক্য, সেই প্রকার, মানব আত্মাকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করে। তাড়িতপূর্ণ শরীর যেমন বিরুদ্ধ প্রকৃতিসম্পন্ন অন্য শরীরকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া স্পর্শমাত্রেই তাহাতে নিজ তাড়িত সংক্রামিত করিয়া দেয়, সেইরূপ বিশ্বাসী হৃদয়গ্রাহী বাগ্মিতা দ্বারা বিশ্বাসহীন আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস সঞ্চারিত করিয়া দেন। আমরা অনর্গল ভাষার সমুদায় শব্দভাণ্ডার ব্যয় করিলেও, একটী কথাও মানবসমাজের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না, এবং লঘু বাষ্পের ন্যায় কোথায় বায়ুতে মিশাইয়া যায়; কিন্তু এক একটী নির্জীব শব্দ বিশ্বাসীর প্রাণ হইতে নির্গত হইয়া, কামান্ মুখ নিঃসৃত তেজপূর্ণ গোলকের ন্যায় অরাতিবিনাশমন্ত্র জপিতে জপিতে অধর্ম্ম এবং কুসংস্কারের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন মহাজনগণ ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণস্থল।

যদি অনুসন্ধান করা যায় যে, অবিশ্বাসী কে, তবে দেখা যায় যে, এক অর্থে, কেহই অবিশ্বাসী নহেন, কারণ সকলেই ব্রহ্মে বা ব্রহ্মের স্বরূপে বিশ্বাস করেন।

নভোমণ্ডলে প্রকাশিত মনোহর তারকাক্ষর লিখিত বেদ অধ্যয়ন করিলে নাস্তিকও আপনার মূর্খতা এবং অহঙ্কার ভুলিয়া যায়। মানব চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, এবং শ্রবণ থাকিতেও বধির। এই চেতন ও অচেতন জগতের অতীব বিচিত্র প্রকৃতি এবং কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়াও মানব নাস্তিক হইতে সাহসী হয়! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্?

দ্যুলোকে সূর্য্য গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে সমস্ত দিবস বিচরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের নাম প্রচার এবং মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, মনুষ্যের অবিশ্বাস দর্শনে লজ্জারক্তিম বদনে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেহে, পশ্চিম-সাগরতলে মুখ লুকাইবার জন্য তদভিমুখে ধাবিত হয়েন। বিদায়কালে তাঁহার নিকট এই দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া সন্ধ্যাও, যেন, ম্লান ও বিবর্ণ মুখে আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাবিতে থাকে। আবার আশা-শশী উদিত হইলেই পুনরায় প্রকৃতি হাসিতে থাকে।

যাঁহার কৃপাতে দুর্দ্দান্ত সল ধর্ম্ম-প্রাণ পল হইয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে রত্নাকর, জগাই মাধাই নরকের কীট হইয়াও অক্ষয় পদ লাভ করিয়াছিলেন, অনুক্ষণ যাঁহার করুণাতে আমরা জীবনধারণ ও সর্ব্বসুখসম্ভোগ করিতেছি, তাঁহারই কৃপামঞ্চে আরোহণ করিয়া, বিশ্বাস-ধনুর সাহায্যে আমরা নিশ্চয়ই হৃদয়ারণ্যের রিপু, অবিশ্বাস ও প্রোলোভনাদি হিংস্র পশুগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবই হইব।

"হে প্রভু! আমরা তোমাতে বিশ্বাস করি। তুমি আমাদের অবিশ্বাস দূর কর।"

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শিবনারায়ণ পুনরায় বলিলেন, স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্ববিষয়ে গুণ পুরুষ অপেক্ষা দুই গুণ। তোমরা প্রত্যক্ষ দেখ যদি বাল্যকাল হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাদের এমন গুণ আছে যে, পুরুষের যে বিদ্যা আট বৎসরে লাভ হয়, স্ত্রী তাহা চারি বৎসরে উপার্জ্জন করিবে। এবং উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য উপাসনা ও ব্রহ্ম-বিদ্যা ইত্যাদি পুরুষদের যদি আট বৎসরে হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিলে চারি বৎসরের মধ্যে হইবে। লোকের স্ত্রীলোকগণের শিক্ষা না দিবার কারণ এই যে, যদ্যপি উহাদের উত্তম ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে নির্ভয় হইয়া পুরুষদিগের বিনা অনুমতিতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিবে—এবং স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া সেবা ইত্যাদি পুরুষের আজ্ঞাধীন কোন কার্য্য করিবে না—পুরুষ মহাত্মাগণ কেবল মাত্র স্বার্থ ও হিংসার কারণে স্ত্রীদিগকে এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ কার্য্যে প্রবৃত্ত করান না। কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ নিয়ম নহে। তিনি সকলের প্রতি শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতে অধিকার দিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলে সকলেই উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে সকলেরই শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতে স্বাধীনতা থাকা কর্ত্তব্য।

ইহার পর সভাভঙ্গ হইলে উপস্থিত একজন মহাজন বলিলেন, তোমরা আজ আমায় পরম মহাত্মা সাধু পুরুষ দর্শন করাইলে। আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ তোমাদের অনুগ্রহে এইরূপ সাধু দর্শন করিলাম। আজ আমার বাটীতে মহাত্মার সেবা হইবে। এই বলিয়া শিবনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া সেই মহাজন বাটী আসিলেন। শিবনারায়ণ রাত্রে সেইস্থানে বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকালে গোদাবরী তীর্থাভিমুখে যাইলেন। সেখানে শুনিলেন সাঙ্গ বেদাধ্যায়ী অদূরে এক জ্ঞানবান পণ্ডিতের বাস। তিনি শান্তমূর্ত্তি ও সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে উত্তম রূপে সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপ অনেক স্থানে গল্প শুনিতে পাইয়া শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিলেন যে এই পণ্ডিত হয়ত ভেকধারি সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে সেবা করিয়া থাকে। কেন না যিনি যথার্থ পরমহংস এবং সন্ন্যাসীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার আত্মা ও পরমাত্মার এক স্বরূপ বোধ হইয়াছে তিনি ত কোন ভেকের চিহ্ন ধারণ অথবা লোককে জানাইবার জন্য অন্য কোন প্রপঞ্চ করিবেন না। যেরূপ ব্রহ্মের কোন অবস্থা বা লক্ষণ নাই যে সেই লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মকে চেনা যাইবে সেইরূপ যথার্থ অবস্থাপন্ন পরমহংস সন্ন্যাসী মহাত্মাকে কোন লক্ষণ বিশেষে চেনা যায় না। তবে সেই বেদাধ্যায়ী পণ্ডিত কিরূপে চিনিয়া যথার্থ সন্ন্যাসী পরমহংসকে আদর অথবা সেবা করেন? এইরূপ ভাবিয়া শিবনারায়ণ পণ্ডিতের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন যে সেখানে একটি শিবালয় আছে। সেই শিবালয়ের মধ্যে কেহ কেহ শিবের পূজা করিতেছেন, কএকজন নিত্য নিয়ম করিতেছেন এবং কেহ কেহ বাহিরে পাঠ করিতেছেন। শিবনারায়ণের গায়ে ধূলা মাটি লাগিয়াছিল এবং একখানি মাত্র ছেঁড়া চাদর পরিধানে ছিল আর চুলও একটু বড় বড় ছিল। তাহাতে তাঁহাকে দেখিতে ঠিক পাগলের মত বোধ হইত। পণ্ডিত সেই অবস্থাপন্ন শিবনারায়ণকে দেখিয়া রাগে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কে, কোথায় হইতে আসিয়াছিস, এখানে কি জন্য আসিলি, তুই কি জাত? শিবনারায়ণ বলিলেন যে আমি আদমী, আমি মনুষ্য, যেই তুমি মনুষ্য সেই আমি মনুষ্য। ইহাতে পণ্ডিত রাগ করিয়া বলিলেন যে, বেটা আমি ত তোকে মনুষ্য দেখিতেছি কিন্তু তুই কি জাতি? শিবনারায়ণ বলিলেন যে আমি বড়ই নিকৃষ্ট এবং ভ্রষ্ট জাতি, আমার জাতির মতন নিকৃষ্ট জাতি আর নাই, আমি সকল জাতি অপেক্ষা নীচ। পণ্ডিতগণ এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন যে, বেটা তুই নীচজাতি হইয়া আমাদের শিবালয়ের নিকট কেন আসিলি? আমার এই ঠাকুর এবং সকল স্থান তোর আসার দরুন অশুদ্ধ হইয়া গেল। বেটা এখান হইতে দূর হ'। শিবনারায়ণ বলিলেন, আদিতে যে বস্তু অশুদ্ধ হইবে সেই বস্তু শেষেও অশুদ্ধ থাকিবে এবং যে বস্তু আদিতে শুদ্ধ থাকিবে সে অন্তেও শুদ্ধ থাকিবে—কোন মতে অশুদ্ধ হইবেক না। যদ্যপি আমার আসার দরুণ আপনি, আপনার মন্দির, ঠাকুর এবং মন্দিরের নিকটস্থ স্থান—সকলই অশুদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনার নিকট গোময় আছে উহার দ্বারা আপনি আপনার মন্দির এবং মন্দিরের নিকটস্থ স্থান—সকল শুদ্ধ করিয়া লউন। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। পণ্ডিত বলিলেন, বেটা আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। যা বেটা এখান হইতে দূর হ'।

শিবনারায়ণ সেখান হইতে গোদাবরীর নিকটস্থ ক্ষুদ্র এক নদীর তীরে আসিলেন। এবং পণ্ডিতগণ শিব-

নারায়ণ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই স্থান উত্তম রূপ গোময়-জল দিয়া পবিত্র করিয়া লইলেন। ঐ নদীর তীরে একজন জয়পুরী মহাত্মার চেলা ধুনী জ্বালিয়া বসিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাকে চিনিতেন এবং তিনিও শিবনারায়ণকে চিনিতেন। রাস্তায় দুই চারি দিবস তিনি শিবনারায়ণকে সেবা করিয়াছিলেন।

শিবনারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি দুই চারি ঘণ্টার জন্য আপনার সং আমাকে দাও; জগতে সত্যকে মানে না, প্রীতিপূর্ব্বক প্রপঞ্চকে মানে। শিবনারায়ণ তাঁহার নিকট হইতে গেরুয়াবস্ত্রের কৌপিন চাহিয়া লইলেন ও নাপিতের নিকট খেউরি হইলেন। এবং স্নান করিয়া উত্তমরূপে গাত্রে সাদা বিভূতি মাখিয়া লইলেন ও কপালে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিলেন। চার পাঁচটী রুদ্রাক্ষমালা হস্তে এবং গলায় পরিয়া হাতে একটী উত্তম কমণ্ডলু ও পায়ে এক যোড়া খড়ম দিয়া সংসাজিয়া সেই পণ্ডিতের বাটীতে শিবালয়ের উপরে উঠিলেন। এবং শিবোহহং শিবোহহং করিতে করিতে মন্দিরের মধ্যে গেলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ওঁ নম নারায়ণায় নমঃ বলিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন। এবং সত্বর আসন আনিয়া ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক জোড়হস্তে আবাহন করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন ও বলিলেন যে, এমন মহাত্মা আমার বাটীতে পদধূলী দিলেন, ধন্য আমার অদৃষ্ট। পরে পণ্ডিতগণ হাত যোড় করিয়া শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কৃপানিধান! আপনি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন? আপনার আহারের বিষয়ে কি নিয়ম আছে এবং কি আহার করিবেন—অনুগ্রহ করিয়া বলুন আমরা সেইরূপ আহার প্রস্তুত করিব। শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং আমার আহারের বিষয় এই রূপ নিয়ম আছে যে বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক যে পুত্র বা কন্যার বিবাহ হয় নাই সেই পুত্র বা কন্যা ডানি হাতে কূপের মধ্য হইতে জল তুলিয়া আনিয়া ঐ জল দিয়া গোশালায় ঘৃতপক্ব অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিলে আমি সেই অন্ন দিন রাত্রের মধ্যে একবার আহার করিয়া থাকি। যদি বামহস্ত লাগে বা পাক করিতে করিতে পাচক উদ্গার করে তাহা হইলে ঐ অন্ন আমার আহার করা হইবে না। যদ্যপি এইরূপ প্রণালীতে অন্ন প্রস্তুত হয় তাহা হইলে অন্ন আহার করিতে পারি নতুবা আমি আহার করি না। কেবল মাত্র জল পান করিয়া থাকি। ইহাতে পণ্ডিত বলিলেন, আপনি সন্ন্যাসী মহাত্মা জগতের গুরু, আপনার মত কেহই এমন কঠিন আচার এবং নিয়ম ধারণ করিতে পারে না। আমরা আপনার আহারের ব্যবস্থা করিতেছি আপনি একটু বিশ্রাম করুন। পণ্ডিতগণ বালক বালিকাদিগকে ডাকিয়া ঐরূপ কঠিন নিয়মে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলায় তাহারা অন্ন প্রস্তুত করিতে স্বীকার করিল না। তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন যে, তবে আমাদের গার্হস্থ ধর্ম্ম পালন হইল না। ইহাতে একজন বালক বলিল, এক হস্তে জল অতি কষ্টে আনিতে পারি এবং ময়দাও এক হস্তে আনিতে পারি কিন্তু পুরী কেমন করিয়া প্রস্তুত করিব? এবং অপর এক বালক স্বীকার করিল, আমি যেমন করিয়া হউক পুরী প্রস্তুত করিয়া দিব কিন্তু আমায় এক টাকার মিষ্টান্ন খাইতে দিতে হইবে। পণ্ডিত তাহাই স্বীকার করিলেন।

পরে যখন পণ্ডিতগণ শিবনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া আহার করিতে বসিলে তিনি বলিলেন, আহারের বস্তু অশুদ্ধ হইয়াছে, পাচক বালক পাক করিবার সময় উদ্গার করিয়াছিল। যাহা হউক আমি মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইব। পণ্ডিতগণ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং ঐ বালককে বলিলেন যে, তুমি উদ্গার করিয়াছিলে? বালক বলিল, না। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, হে বালক, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি সত্য কথা বল। মিথ্যা বলিও না, পাপ হইবেক। আমি পুরী শুদ্ধ করিয়া খাইব। তোমার কোন চিন্তা নাই। শিবনারায়ণের কথা শুনিয়া ঐ বালক বলিল, হাঁ মহারাজ, আমি দুইবার উদ্গার করিয়াছিলাম। শিবনারায়ণ তখন মন্ত্র পড়িয়া অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম মনে মনে লইয়া আহার করিয়া লইলেন।

পণ্ডিতগণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে এমন মহাত্মা আমরা কখন দেখি নাই। বাড়ীর মধ্যের ঘরে বালক পাক করিতে করিতে বালক উদ্গার করিয়াছিল উনি বাহির হইতে কি প্রকারে জানিলেন? মহাত্মা অন্তর্যামী না হইলে কেমন করিয়া জানিবেন? ইনি নিশ্চয়ই অন্তর্যামী। পরে শিবনারায়ণ এবং পণ্ডিতগণ বাহিরে আসিয়া বসিলেন। তখন শিবনারায়ণ পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা পণ্ডিত লোক শাস্ত্র বেদ পড়িয়াছেন—শাস্ত্র বেদ পড়িবার ফল কি? এবং পণ্ডিত কাহাকে বলে এবং সন্ন্যাসী পরমহংস কি বস্তুর নাম? নিরাকারকে না সাকারকে পরমহংস সন্ন্যাসী বলে কিম্বা হাড় মাংস মল-মূত্র ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে বলে অথবা খড়ম রুদ্রাক্ষমালা এবং বিভূতি তিলক ইত্যাদিকে বলে? কি বস্তু পরমহংস সন্ন্যাসী? ভাবিয়া তোমরা এই প্রশ্নেরউত্তর দাও।

তাহাতে একজন পণ্ডিত বলিলেন, মহারাজ শাস্ত্র বেদ পড়িবার ফল এই যে সত্যকে সত্য বোধ করা অসত্যকে অসত্য বোধ করা সত্যেতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখা অসত্যতে চিত্তের আসক্তি না করা, সকলেতে সমদৃষ্টি ও জগতের হিত করা, পরোপকারে সর্ব্বদা রত থাকা, ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য উভয় বুঝিয়া যে কার্য্য করিলে ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য করা এবং যে কার্য্য করিলে পরমার্থ সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য করিয়া পরমার্থ্য সিদ্ধ করা—এই সকল ভাব যাহা' হয় তিনি পণ্ডিত এবং বেদ শাস্ত্র পড়িবার এই সার মর্ম্ম। এবং পরমহংস সন্ন্যাসীর ভাব অর্থ এই যে

দেহন্যাসোহি সন্ন্যাসঃ নৈব কাষায়বাসসা।
নাহং দেহোহমাত্মেতি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণম্।

অর্থাৎ দেহত্যাগেরই নাম সন্ন্যাস গেরুয়াদি কষায় বস্ত্র পরিধানের নাম সন্ন্যাস নহে। দেহ ত্যাগের অর্থ এই যে আমি দেহ নহি আমি সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা স্বরূপ অর্থাৎ দেহাভিমানি পুরুষ সন্ন্যাসী নহেন। যিনি আত্মদর্শী তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী। কিন্তু হাড় মাস সন্ন্যাসী নহে, এবং বিভূতি, খড়ম ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান করাকে সন্ন্যাসী বলে না। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পণ্ডিত, যখন তুমি এই সকল কথা বলিতেছ যে পণ্ডিত সন্ন্যাসির এই লক্ষণ এবং বেদ শাস্ত্র পড়িবার এই ফল—তবে কল্য প্রাতঃকালে একজন মহাত্মা ছেঁড়া চাদর গায়ে দিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন তাহাকে ঘৃণা করিয়া গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলে কেন? এবং আমি এখন রুদ্রাক্ষের মালা এবং বিভূতি গায়ে মাখিয়া আসিলাম তাহাতে আমাকে আদর করিলে কেন? পণ্ডিত বলিলেন যে আপনি হলেন মহাত্মা আর সে বেটা ভ্রষ্ট লোক। শিবনারায়ণ বলিলেন, সে যে ভ্রষ্ট লোক তাহা আপনি তাহার কি লক্ষণের দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন? পণ্ডিত বলিলেন, সে আপন মুখে বলিয়াছিল যে আমি ভ্রষ্ট লোক। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, যে যাহা বলিবে তাহাই কি তুমি বিশ্বাস করিবে তবে এক ব্যক্তি যদি বলে যে আমি ছোট ভ্রষ্ট লোক তবে কি তুমি তাহাকে ছোট ভ্রষ্ট লোক জ্ঞান করিবে এবং যদি বলে আমি বড় শ্রেষ্ঠ লোক অর্থাৎ আমি পরমেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা হইলে কি তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিবে? তবে তোমার বেদ শাস্ত্র পড়িবার ও পণ্ডিতির ফল কি? আমিই তখন তোমাকে বলিয়াছিলাম যে আমি নিকৃষ্ট ও ভ্রষ্ট জাতি এবং এখন আমি সেই সং ছাড়িয়া অন্য সং সাজিয়া আপনাকে বলিলাম যে আমি শিবোহং সচ্চিদানন্দ আমি সন্ন্যাসী। তখন আপনি আমাকে সেই মলিন অবস্থা দেখিয়া ঘৃণা করিয়া গালি দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলেন আর এখনও আমি সেই ব্যক্তি, কিন্তু এখন আমাকে আমার এই সং সাজার জন্য ইষ্ট গুরু মানিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ধিক্ পণ্ডিতের এমন বুদ্ধিতে। এইরূপ যদি ঈশ্বর কোন মলিন বেশ ধরিয়া তোমাদের কাছে আসেন তাহা হইলে তাঁহাকে তোমরা হতাদর ও ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দাও এবং যদি কোন উত্তম সংয়ের সাজ দেখ তাহা হইলে তখন তাহাকে আদর কর। এই কথা শুনিয়া তখন পণ্ডিত শিবনারায়ণকে হাত জোড়িয়া বলিলেন, ইহা ঠিক, মহারাজ! আমরা বিদ্যার অহংকারে মত্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া থাকি। পরব্রহ্মের মহিমা বুঝা বড়ই কঠিন। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। শিবনারায়ণ বলিলেন, পরব্রহ্মের নিকট ক্ষমা চাহিও এবং কে কাহাকে ক্ষমা করে বিচার করিয়া গম্ভীরভাবে থাক।

সেইখান হইতে শিবনারায়ণ নদীর ঘাটে যাইয়া জয়পুরী মহাত্মার চেলাকে সংসাজিবার দ্রব্য ফিরাইয়া দিলেন। এবং আপনার কেবল মাত্র জীর্ণ চাদরখানি লইয়া সেইখান হইতে অপর এক গ্রামে চলিলেন। পথে দেখিলেন মাঠের মধ্যে রাস্তার ধারে চারিজন ঠগ সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে এক জন দশবার হাত পরিমাণ জটা ইতর পশুর চুল লইয়া বেলের আটা দিয়া প্রস্তুত করিয়া আপন মাথায় ঋষির মত করিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে। সেই জটা সে জলে ভিজাইয়া রাখে। তাহাতে জল সর্ব্বদা থাকে এবং নিংড়াইলে পড়ে—যেরূপ তুলাতে তৈল থাকে। অপর তিন জন তাহাকে শিব বলিয়া অপর লোকের নিকট পরিচয় দেয় এবং বলে যে আমরা তিন জন সর্ব্বদা ইহাঁর চরণ সেবা করি। ইনি স্বয়ং শিবজী কৈলাসে থাকেন কেবল সৃষ্টির কল্যাণের জন্যে জগত দেখিতে আসিয়াছেন। সেই সময় দুইজন গৃহস্থ পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের একজন কার্য্যবিশেষ বশতঃ মাঠে বসিতে গিয়াছিল এবং অপর একজন সেইখানেই ছিল। তাহাকে ঐ তিন জন ঠগ সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল যে তোমার কপাল ভাল তাই তুমি আমাদিগের দর্শন করিতে পাইয়াছ। আমাদের তোমার উপরে অত্যন্ত দয়া হইয়াছে এই জন্য তোমাকে বলিতেছি যে তুমি একটী কাজ কর। যে জটা

ধারি মহাত্মা শিবজী বসিয়া থাকেন তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর এবং হাত যোড় করিয়া বল যে, হে পরমেশ্বর আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমায় মুক্ত করুন। এবং আমাকে রাজভোগের দ্রব্য সকল দিন। তিনি যখন তোমাকে জটা হইতে একবিন্দু গঙ্গা জল দিবেন সেই সময় হইতে সকল ফল প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সেই গৃহস্থ ঠগ সন্ন্যাসীর কথা অনুসারে কার্য্য করিল। এবং জটাধারী তখনই তাহাকে জটা নিংড়াইয়া গঙ্গাজল দিলেন ও বলিলেন, এই যে গঙ্গাজল তোমাকে দিলাম ইহা হইতে সকল ফল প্রাপ্ত হইবে। ধন্য তোমার ভাগ্য যে আমি স্বয়ং তোমাকে দর্শন দিলাম। কিন্তু তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে এই তিন জন ব্যক্তি যাহারা তোমাকে বলিয়া আমার দর্শন করাইয়া দিয়াছেন উহারা যাহা তোমাকে বলিবে তুমি তাহাই শুনিও। তাহা হইলে তোমার ভাল হইবে। সেই তিন জন ঠগ সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন উঠিয়া গৃহস্থ ব্যক্তিকে ডাকিয়া তফাতে লইয়া গিয়া বলিতে লাগিল যে, দেখ তোমাকে আমি স্বয়ং শিব দর্শন করাইলাম কিন্তু যদি তোমার নিকট কোন টাকা পয়সা থাকে তাহা হইলে তুমি তোমার ভালর জন্য ঐ টাকা পয়সা সমস্তই শিবের পায়ে ফেলিয়া দাও—সেই টাকা পয়সায় সিদ্ধি গাঁজা দুগ্ধ মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া উহাঁর ভোগ চড়াইব। সেই গৃহস্থ ব্যক্তি বলিল, মহাশয় আমার নিকট এমন বেশী কিছু নাই কেবল বার টাকা এবং চারি আনা পয়সা মাত্র আছে। ঐ ঠগ সন্ন্যাসী উত্তর করিল, যাহা আছে তাহাই ভক্তিপূর্ব্বক চড়াইয়া দাও। অবোধ গৃহস্থ ব্যক্তি না বুঝিয়া চারি আনা পয়সা আপনার নিকটে রাখিয়া ঠগ সন্ন্যাসী সাধুর পায়ে বার টাকা চড়াইয়া দিল। এবং জটাধারী শিব তাঁহার পীট চাপড়াইয়া বলিয়া দিলেন যে যাও তোমার কৈলাস প্রাপ্তি হইবেক। এই কথা বলিয়া তাহারা চারিজন ময়দান হইতে যাইতে লাগিলেন। অপর যে গৃহস্থ ব্যক্তি ময়দানে ছিল সে সেই সময় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে একবার ঐ রূপ ঠগ সন্ন্যাসীর নিকট ঠকিয়াছিল, তাহাতে সন্ন্যাসীদিগকে ঐ স্থান হইতে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার সন্দেহ জন্মিল। যে ব্যক্তি বারটাকা সন্ন্যাসীদিগকে দিয়াছিল তাহার নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, সর্ব্বনাশ করিয়াছ, উহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে, উহারা ঠগ। যিনি শিব তিনি টাকা লইবেন কেন, তাঁহার টাকার কি প্রয়োজন? এখন কেমন করিয়া তোমার বার টাকা বাহির করিব? যাহা হউক যদি গ্রামের মধ্যে যায় তাহা হইলে কোন উপায়ে টাকা বাহির করিতে পারা যাইতে পারে। যদি থানা থাকে তবেই ভাল। সেইখান হইতে ঐ দুইজন গৃহস্থ ব্যক্তি সত্বর আসিয়া ঐ ঠগ সন্ন্যাসীর নিকটে প্রণিপাত করিল এবং হাত জোড় করিয়া বলিল যে, হে কৃপানিধান আপনাকে আমি সেবা করিতে পারিলাম না কারণ আমি পাপী। কিন্তু যদি অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রামের মধ্যে যান তাহা হইলে আমি উত্তমরূপে আপনার সেবা করিব এবং যথাশক্তি বিদায় দিব। আমি অন্যত্র গিয়াছিলাম এই হেতু আমি আপনার সেবা করিতে পারিলাম না।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

উদাসীন পথিকের মনের কথা। মীর মহতাব আলি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নীলকরের অত্যাচার, পল্লীগ্রামের প্রজার দুরবস্থা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার এই উপন্যাসটী রচনা করিয়াছেন। তিনি সহজ প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে পটু তবে হিন্দী গ্রাম্য প্রভৃতি শব্দের সংমিশ্রণ আছে। গল্পটী পড়িতে আমোদ ও উৎসাহ জন্মে।

চিরস্মরণীয় মহাত্মা হেয়ার সাহেব। ডাক্তার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত।

বঙ্গদেশের পরম বন্ধু ও হিতৈষী হেয়ার সাহেবের এই ক্ষুদ্র জীবনী পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। মহানুভব হেয়ার সাহেব যে রূপ যত্ন উদ্যোগ ও অধ্যবসায় সহকারে হিন্দু ও মেডিকেল কলেজ সংস্থাপনে বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে সহায়তা করেন, অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অকাতরে বিদ্যা দান করেন, এতদ্দেশীয় জনগণকে আন্তরিক ভাল বাসিয়া প্রাণপণে তাহাদিগের মঙ্গল সাধন করেন, গ্রন্থকার তৎসমুদায় সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। জীবনীর ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। হেয়ার সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত যাহাতে চিরদিন আমাদের অন্তঃকরণে জাজ্বল্যমান থাকে এই উদ্দেশে গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হউক। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে তাঁহার এই জীবনীটী পরিরক্ষিত হউক।

---

৫৭১ সংখ্যা। ১৮১২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

একষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ শুক্রবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

প্রাতঃকাল।

যথা সময়ে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধেয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত বেদি গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন বেদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোল্লিখিত বিষয়টী পাঠ করিলেন।

যে জাতির অতীতটী উজ্জ্বল, যার নিজের ধর্ম্ম আছে, নিজের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ, নিজের সভ্যতা, নিজের রাজনীতি ও সমাজনীতি আছে, নতশিরে অতিভক্তির সহিত যে জাতির মহাপুরুষদিগের নাম উচ্চারিত হয়, যে জাতির পরম্পরাগত সদাচার পৃথিবীর সমস্ত মানব শিক্ষা করিতে পারে, যদি কালবশাৎ চন্দ্র সূর্য্যও লুপ্ত হয় তথাচ যে জাতির পূর্ণ গৌরব কখনও লুপ্ত হইবে না, অতি সৌভাগ্যের কথা আমরা সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। সেই জাতির বিশুদ্ধ শোণিত আমাদের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হইতেছে। আমরা বহুকাল অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ, আমাদের বলবীর্য্য গিয়াছে, উৎসাহ ও অধ্যবসায় গিয়াছে, অলৌকিক প্রতিভা গিয়াছে, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার যা কিছু উপকরণ সমস্তই গিয়াছে, এক্ষণে কেবল অতীতের পবিত্র স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে। একে তো আমাদের এই অবস্থা ইহার উপর আবার চতুর্দ্দিকে ঘোরতর বিপ্লব। বর্ত্তমানে ধর্ম্মবিপ্লব সমাজবিপ্লব দামোদরের বন্যার ন্যায় খরস্রোতে চলিয়াছে। কেহ ইচ্ছায় কেহ বা অনিচ্ছায় সেই স্রোতে ভাসিতেছে। কত পুরাতনের স্থান কত নূতন আসিয়া অধিকার করিতেছে। সর্ব্বত্র হুলস্থূল ব্যাপার! এই সময়ে—এই সর্ব্ব সংহারক সময়ে প্রত্যেকেরই বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

হা! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় বর্ত্তমানে আমাদের সামাজিক অবস্থা বহুকাল রোগভোগের পর যেন শারীরিক আসন্ন মৃত্যুর অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এ দিকে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-শক্তি ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বিদায় লইয়াছে, হস্ত পদ যার পুর

নাই ক্ষীণ দুর্ব্বল ও অসাড়, সর্ব্বশরীর কঙ্কালাবশিষ্ট হিমকরকাবৎ শীতস্পর্শ এবং মৃত্যুগন্ধে লিপ্ত, অল্পমাত্র চেতনা আছে কিন্তু বাক্য নাই, অন্তর্গূঢ় গভীর আবেগ এক একবার হৃদয় স্ফীত করিয়া তুলিতেছে এবং চক্ষু দিয়া বাষ্পাকারে বাহির হইতেছে, নাড়ী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, কখন অনুভূত কখন বা অননুভূত এবং শরীরব্যাপী ক্ষীণ প্রকৃতি চির-পরিচিত পলায়নোন্মুখ প্রাণকে রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, তার উপর আবার শিরায় শিরায় সঙ্কোচনের দুর্বিষহ যন্ত্রণা এবং সাজ্ঞাতিক শ্লেষ্মার কণ্ঠনলী অবরোধ চেষ্টা। প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারিবে বিপ্লবের বিষম উৎপাত আমাদের মুমূর্ষু সমাজদেহে বাস্তবিকই এই রূপ দশা আনিয়াছে। কিন্তু প্রাণান্তিক রোগে বৈদ্যেরা ভগ্নহৃদয়ে একপ্রকার মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রেও সেই প্রকার মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রথম হৃদয়যোগ। মনে কর যখন পূর্ব্বজ্ঞানের কোন একটা ভাণ্ডার নাই সেই সময় মনুষ্য অচিন্ত্যরচনা বিশ্বকে দেখিয়া অন্তস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাসে যে সকল ফুল ফুটাইয়া গিয়াছে যুগ যুগান্তের কত রাষ্ট্রবিপ্লবের পরও সেই পুষ্পের সেই কান্তি সেই গন্ধ যেন নূতন রহিয়াছে। তদ্দারা আকৃষ্ট হইয়া তোমরা তাঁহাদের সেই গভীর উচ্ছ্বাসে নিজের উচ্ছ্বাস মিশাইয়া দেও এবং সেই প্রগাঢ় আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাও——ইহা হৃদয়যোগ।

দ্বিতীয় ইতিহাসযোগ। মনে কর সেই আদিকালের দুরন্ত শীত বাতাতপের মধ্যে প্রচণ্ড হিংস্র জন্তুতে পরিবৃত হইয়া লোকে নিরলঙ্কার সরল কথায় যে সকল সত্য ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে আজ এই জ্ঞান বিজ্ঞানের তীব্র আলোকে প্রকৃতির সকল প্রকার কঠোরতা হইতে সুরক্ষিত নির্বিঘ্ন সময়ে সেই সমস্ত সত্যই আপনাদের উপজীব্য করিয়া লও। ইহা স্মরণাতীত অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সুঁন্দর ও গাঢ় যোগ—ইহাই ইতিহাসযোগ।

তৃতীয় সমাজযোগ। অনেকের সংস্কার বর্ত্তমান মনুষ্যের সমষ্টিই মনুষ্য সমাজ। কিন্তু ইহা ঠিক্ নয়। মনুষ্যের নানারূপ চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে যে একটা ভাব বা প্রকৃতি রূঢ়মূল হয় তাহার সহিত যে মনুষ্যসমষ্টি তাহাই প্রকৃত মনুষ্য সমাজ। সমাজের এই প্রাণটিকে ছাড়িয়া কোন সমাজই প্রকৃত সমাজ হইতে পারে না। বল দেখি মনুষ্য বলিতে আমরা কি বুঝি? আমরা কি একটী মুখ-চক্ষু-নাসিকা-বিশিস্ট জীবমাত্রকে মনুষ্য বুঝি? না তাহার সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ দয়া প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে মনুষ্য বলিয়া বুঝি? যদি তাই মনুষ্য হয় তবে মনুষ্য সমাজের পক্ষে এই মূল নিয়মের ব্যভিচার কেন। নানা রূপ চিন্তার ঘাত প্রতিঘাত-সমুত্থিত ভাবের বা প্রকৃতির সহিত যে মনুষ্যসমষ্টি প্রকৃত পক্ষে তাহাই মনুষ্যসমাজ। এখন দেখা উচিত, এই যে চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতজ প্রকৃতি ইহার মূল কি বর্ত্তমানে বদ্ধ না অতীতের গভীরে প্রসারিত? অবশ্য ইহা সকলেই জানেন যে বর্ত্তমানে আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই পূর্ব্বপরম্পরাগত জ্ঞান। আমরা সেই গুলিকে কেবল ব্যবহারে আনি মাত্র। সামাজিক ভাব বা প্রকৃতিই বল এই সূত্রে তাহা দাঁড়াইয়া যায়। সুতরাং যখন মনুষ্য সমাজ বলিতে মনুষ্য সমষ্টির সহিত সেই সামাজিক প্রকৃতি লক্ষিত হয় তখন ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে

বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের মূল সেই আদি-কালের মনুষ্য সমাজ। সেই স্থান হইতে চিন্তার তরঙ্গ অনিরুদ্ধ স্রোতে বর্ত্তমানে আসিয়া মিলিতেছে। এখন বুঝ মনুষ্য সমাজের গভীরতা ও প্রসার কত দূর। ইহা একটী অপার অতলস্পর্শ সমুদ্র। কিন্তু সমুদ্রের কতকগুলি জলীয় পরমাণু মাত্রকে যেমন সমুদ্র বলা যায় না প্রত্যুত সমুদ্রের দিগন্তস্পর্শী বিশাল বক্ষে সমস্ত জলীয় পরমাণুর ঘাত-প্রতিঘাতে যে আকারটী দাঁড়ায় তাহাই সমুদ্র, মনুষ্য সমাজও তদ্রূপ। অতীতের সুদূর সম্প্রসারণ ইহার পূর্ব্বতীর এবং বর্ত্তমান ইহার উত্তর তীর। কালের এই প্রকাণ্ড বক্ষে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া যে বিস্তীর্ণ আকার দাঁড় করাইয়াছে মনুষ্য সমাজ বুঝিতে তাহাই বুঝাইবে। বল দেখি মূল সত্যকে ছাড়িলে সৃষ্টির অর্থ বুঝা যায় কি? সমাজও একটা প্রকাণ্ড সৃষ্টি, সুতরাং অতীতের মনুষ্যসমাজকে ছাড়িলে বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজকে কিরূপে বুঝিবে। তোমরা এই অতীতের সহিত বর্ত্তমান সমাজের যোগ রক্ষা কর—ইহাই সমাজযোগ।

এক্ষণে সমাজের বর্ত্তমান এই আসন্ন দশায় প্রকৃত সৎ বৈদ্যের ন্যায় এই তিন প্রকার মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা কর, কালে নিশ্চয় সুফল পাইবে। আবার এই মুমূর্ষু সমাজের কঙ্কালাবশিষ্ট দেহে নাড়ী আসিবে, শৈত্যের পরিবর্ত্তে উত্তাপ আসিবে এবং শিরায় ও ধমনীতে নূতন রক্ত সঞ্চারিত হইয়া নূতন বলে ও নূতন স্ফূর্ত্তিতে তাহা হৃষ্ট পুষ্ট করিয়া তুলিবে। ফলতঃ আমাদের অতীতের জ্ঞান, অতীতের ভাব ও অতীতের সমাজ যার পর নাই শ্লাঘার বস্তু। যার অতীত উজ্জ্বল তার মনে স্বভাবতই তাহা রক্ষা করিবার জন্য যত্ন ও অনুরাগ হয়। এই ত আজ এই স্থানে বহুসংখ্য জ্ঞানবান লোকের সমাগম হইয়াছে কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে কেহ সাহস করিয়া বলুন দেখি আমি জাতীয় জ্ঞান, জাতীয় ভাব ও জাতীয় সমাজ চাহি না। যদি না চাও তখন বলিব তোমার হৃদয়ে মমতা নাই, তুমি অসম্পূর্ণ মনুষ্য। ফলতঃ প্রকৃত সত্যের জন্যই আমরা আমাদের অতীতের এত আদর ও গৌরব করি। এই আদি ব্রাহ্মসমাজ বিশ্বজনীন ব্যাপক সত্যের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রাচীন ভারতে ঋষিরা বহুসাধনায় কি ধর্ম্ম কি সমাজ উভয়ত্র এমন বহুতর রত্ন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন যে কোন কালেই তাহার প্রভা মলিন হইবার নহে। কালের হস্ত তাহার নিকট পরাস্ত। বিপ্লবের এই ঘোর বিকারের অবস্থায় এক এই আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই সমস্ত রত্নের—সেই সমস্ত সত্যের যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসিতেছেন। এই তুমুল সমাজদ্রোহের সময় এই আদি ব্রাহ্মসমাজই দুর্দ্ধর্ষ বীরের ন্যায় স্থির পদে দণ্ডায়মান। ইহার লক্ষ্য অতীতের জ্ঞান ও ভাবে অটল থাকিয়া অতীতের সমাজে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন। ইহা আবহমান কাল সেই মহাব্রত নির্ব্বিঘ্নে বহন করিয়া আসিতেছে এবং আশা করি ভাবী জীবনেও তাহা করিবে। কিন্তু এই ভারতেরই অতীত ইতিহাস আলোচনা কর দেখিবে ইহার আদি যুগের বস্তু মধ্য যুগে সম্যক্ নাই। কাল ও অবস্থার প্রভাবে তৎসমুদায়ের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনকে ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখা যায় যেন তাহা মূল প্রকৃতিকে ছাড়িয়া হয় নাই। একটা বৃক্ষের শাখা কাটিলে

যেমন অপর এক শাখা তাহার স্থানে উত্থিত হইয়া গুণে ও সৌন্দর্য্যে স্থাণুরই অনুরূপ হইয়া থাকে ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তনও সেইরূপ। দেশাবচ্ছিন্ন ভাবের সহিত কোন অংশেই তাহার বৈসাদৃশ্য ঘটে নাই। এই আদি ব্রাহ্মসমাজ যদিও অতীতের পক্ষপাতী কিন্তু সময় যদি কোনও পরিবর্ত্তন চান তবে তাহা প্রাচীন রীতিক্রমে দেশাবচ্ছিন্ন ভাবের সহিত সর্ব্বাঙ্গীণ সাদৃশ্য রক্ষা করিয়াই সাধিত হয়। ফলত অতীতের প্রতি অনুরাগ আছে বলিয়াই এদেশীয় লোকের ইহার উপর এত শ্রদ্ধা এত ভক্তি। যদি এই পুণ্য-ভূমি ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা কোনও স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয় তবে তাহা এই আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারাই হইবে। কারণ আদি সমাজভুক্ত ব্রাহ্মেরা জাতিতে হিন্দু এবং ধর্ম্মে হিন্দু।

অনন্তর আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইরূপে উদ্বোধন করিলেন।

পরম মঙ্গলালয় বিশ্ববিধাতার অজস্র প্রসাদ-বারি গোমুখী-নিঃসৃত পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর ন্যায় আদিম কাল হইতে ক্রমশ স্ফীত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া নবনব কল্যাণময় পুণ্য-তীর্থের মধ্য দিয়া অপ্রতি-হত বেগে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। অদ্যকার এই ভগবদ্ভক্ত সাধুসজ্জন-গণের সমাগম সেইরূপ একটি সুবিমল পুণ্যতীর্থ! এই পুণ্য তীর্থে আজি আমরা আনন্দ সলিলে অবগাহন করিবার জন্য প্রভাত পরিস্ফুট হইতে না হইতেই সকল ভ্রাতায় মিলিয়া সমাগত হইয়াছি। যাঁ-হারা সংসারারণ্যের বিভীষিকায় ভয়ে আকুল তাঁহারা আজ বিঘ্ন-বিনাশন পরম প্রভুর অভয়-পদের আশ্রয়ে সমাগত হই-য়াছেন; যাঁহারা পাপতাপে ব্যথিত তাঁ-হারা পতিত-পাবন ভক্তবৎসল পরম-পিতার শান্তি-সদনে সমাগত হইয়াছেন; যাঁহারা শোক-মোহে বিহ্বল তাঁহারা পরম প্রেমাস্পদ সুহৃদের প্রসারিত ক্রোড়ে আসিয়া নিপতিত হইয়াছেন; যাঁহারা সুখ সম্পদে দিবারাত্র পরিবৃত তাঁহারা বিষয়-সুখের মর্ত্ত্যভূমি হইতে ব্রহ্মানন্দের স্বর্গ ভূমিতে সমাগত হইয়াছেন; চতুর্দ্দিক হ-ইতে আজ অমৃত নিকেতনের যাত্রীরা মহানগরীর এই এক স্থানে কেবল নহে কিন্তু স্থানে স্থানে কোথাও বা বিচিত্র শোভাময় উৎসব ক্ষেত্রে, কোথাও বা পল্লব-শোভিত সুরম্য কুটীরে, কোথাও বা প্রসারিত রাজমার্গের সন্নিধান-বর্ত্তী বৃহৎ ব্রহ্মমন্দিরে মধুলোভী মধুকর রাজির ন্যায় দলে দলে সমাগত হইয়াছেন। সেই সব সজ্জন-মণ্ডলীর মধ্য হইতে কেমন আজ ভক্ত হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া, ভক্ত-শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া অন্তরীক্ষ প্রক-ম্পিত করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ধ্বনি নভোমণ্ডলে উত্থিত হইতেছে—কেমন আজ আমাদের আনন্দের দিন। সম্বৎসর পরে আমাদের পরমারাধ্য পরম-দেবতা পরব্রহ্মের পূজার দিন আমাদের নয়ন-সমক্ষে আবির্ভূত—আজ আমাদের কত না আনন্দ! তাই আমরা আজ প্রত্যূষে উঠিয়া সেই দেবাধিদেবের চরণে সমর্পণ করিবার জন্য প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতার পুষ্প অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া হৃদয় ভরিয়া আনয়ন করিয়াছি; এই সুন্দর শুভ মুহূর্ত্তে আইস আমরা আমাদের সেই দীন হৃদয়ের প্রযত্ন-সঞ্চিত পূজার সামগ্রী তাঁহার চরণে অনাবৃত করিয়া দিই এবং তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া অনন্ত জীব-

নের পরমোৎকৃষ্ট পাথেয় সম্বল উপার্জ্জন করি—সেই দেব-স্পৃহনীয় অক্ষয় ধন উপার্জ্জন করি

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

যাঁহাকে লাভ করিলে আর কোনো লাভই তাহা হইতে অধিক মনে হয় না এবং যাঁহাতে স্থিত হইলে গুরু দুঃখও মনকে বিচলিত করিতে পারে না।

পরে সাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদি হইতে এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

আনন্দ পথের যাত্রী ব্রহ্মানন্দ-রস-পানেচ্ছু হইয়া অদ্য আমরা যে এই উৎসব-ক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছি, ইহা কি আমাদের অল্প সৌভাগ্যের বিষয়। কে এই ব্রহ্মানন্দ পান করিবার অধিকারী? জ্ঞান ও পুণ্যের দ্বারা যিনি নির্ম্মল হইয়া পরাৎপর পরমেশ্বরের কৃপা উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই এই অধিকার। তিনিই ব্রহ্মরস-সাগরে নিমগ্ন হইয়া অহরহ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। যিনি এইরূপ ব্রহ্মানন্দ-রস প্রচুররূপে পান করেন মৃত্যু আর তাঁহাকে ব্যথা দিতে পারে না। সংসারে মৃত্যুরই একাধিপত্য। যে দিকে দেখি মৃত্যুরই হস্ত সে দিকে দেখিতে পাই। এই মৃত্যুর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া যদি আমরা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে না পারিতাম তবে আর আমাদের দুর্গতির পরিসীমা থাকিত না। সত্যং শিবং সুন্দরং ব্রহ্ম। মর্ত্যজীবের প্রতি প্রেরিত তাঁহার করুণা, ব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দ কেমন ক্রমাভিব্যক্তির দ্বারা পদে পদে অগ্রসর হইয়া এখন আমাদিগকে শান্তি মঙ্গলে সুশোভিত করিতেছেন তাহা ভাবিলে কৃতজ্ঞতা আর হৃদয়ে ধরে না, ঈশ্বরের অযাচিত করুণা স্মরণ হইয়া মন প্রাণ বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। মনুষ্য-সমাজ যে সময়ে কেবল বিষয়-সুখেই মোহিত হইয়া, প্রাণ মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তখন ধর্ম্মের সুশীতল স্নিগ্ধ-ছায়া মনুষ্যের পরিতপ্ত হৃদয়কে অতৃপ্তি অশান্তির প্রচণ্ড রৌদ্র হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। এই ক্ষুদ্র ক্ষণ-ভঙ্গুর বিষয়-সুখ পাশব-প্রকৃতি মনেরই বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারে; আত্মার গভীর আকর্ষণের বিষয়, ইহকাল ও পরকালের উপজীবিকা, অনন্তকালের গতি ও আশ্রয় অমৃতানন্দকে আনিয়া দিতে পারে না। বিষয়-বুদ্ধি যখন মনুষ্যকে অধিকার করিয়া থাকে তখন এই ক্ষুদ্র বিষয়-সুখই তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে হয় এবং মৃত্যু তাহার জন্য সেখানে প্রচ্ছন্ন থাকে। যখন মনুষ্য-সমাজের এইরূপ অবস্থা, প্রকৃতিলব্ধ সুখই যখন তাহার একমাত্র আশ্রয়, তখন সেই বিষয়-সুখে প্রচ্ছন্ন মৃত্যুকে দেখিতে পাইয়া মনুষ্য হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। প্রাতঃ সূর্য্যের কোমল রশ্মি যেমন বিষয়ের প্রতি মনুষ্যের চক্ষুকে আকর্ষণ করিল, ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্ম-বুদ্ধি সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার নশ্বরতা প্রদর্শন করিল। সেই বৈদিক কালের গোতম নামক ঋষি উষার আলোকে জাগ্রৎ হইয়া মৃত্যুভয়ে বলিয়া উঠিলেন—

"পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরাণী শম্নীব কৃত্নুর্বিজ আমিনানা মর্ত্তস্য দেবী জরয়ন্ত্যায়ুঃ।"

ঋগ্বেদ মঃ ১ সূঃ ৯২।

ব্যাধপত্নী যেমন উড্ডীয়মান বিহঙ্গমাদির পক্ষছেদন করত তাহাদিগের জীবনকে হ্রাস করে, সেইরূপ প্রতিপ্রভাতে আবির্ভূতা নিত্য একরূপধারিণী উষা জীবন্ত মনুষ্যদিগের জীবনকে একটু একটু করিয়া প্রতি-

দিন হরণ করিয়া লইয়া যায়। আবার সন্ধ্যার সূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেলে সেই সায়ংকালের তিমির-মিশ্রিত অস্ফুট আলোকেও কেহ কেহ জীবন অবসানের অঙ্ক নিরীক্ষণ করিলেন। দিবাগমে মৃত্যুভয়, দিবাবসানে মৃত্যুভয় দেখিয়া মনুষ্য-হৃদয় অবসাদে ডুবিয়া গেল এবং কি উপায় দ্বারা এই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, তাহার চিন্তায় ঋষিরা প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিকে জীবন্ত দেবতা জ্ঞানে তখন তাঁহারা স্তুতি করিতেন, সেই সকল দেবতাদিগের মধ্যে বরুণ শ্রেষ্ঠ দেবতা। কুলপতি বশিষ্ঠ সেই বরুণের নিকটে কাঁদিয়া এই প্রার্থনা করিলেন—

"কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ম্। প্রতন্মে বোচোদূলভ স্বধা বোবত্বানেনা নমসা তুর ইযাম্॥"

ঋগ্বেদ ৫ অষ্টক ৬ অঃ ৮ বঃ।

হে তেজস্বী অদম্য বরুণ দেবতা, বল, আমি তোমার নিকটে কি এত বড় পাপ করিয়াছি যে, তোমার স্তোতা ও সখা যে আমি, আমাকে তুমি হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছ; তুমি যদি আমাকে তাহা বল, তাহা হইলে তোমার নিকটে নমস্কারের দ্বারা শীঘ্রই আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। প্রার্থনার দ্বারা মন বিশুদ্ধ হইল, তখন তাঁহারা ধর্ম্ম-বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে ইহলোককে অতিক্রম করিয়া পরকালে লোকান্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় এবং অনুভব করিলেন যে লোকান্তর লাভের হেতু যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। প্রচণ্ডবীর্য্য শ্বেত অশ্বের গাত্রে যদি একটিও কৃষ্ণ রোম থাকে তবে তাহাও বাছিয়া ফেলিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিয়া ও তাহার দ্বারা দিগ্বিজয় করিয়া সেই অশ্বকে যজ্ঞে বলি দিলে তাহার রক্ত যজমানকে স্বর্গে বহন করে। প্রাতঃসবনে অগ্নিহোত্র করিলে সূর্য্যরশ্মি যজমানকে প্রার্থিত লোকে লইয়া যায় এবং সেই অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সকল লোক-দ্বারে উপস্থিত থাকিয়া "আইস, আইস, এই তোমার পুণ্যজিত লোক, এখানে তুমি সুখে অবস্থান কর" ইত্যাদি প্রিয় বাক্য দ্বারা যজমানকে আগ্‌বাড়াইয়া গ্রহণ করে। অতএব এই আশা ও আনন্দে তখনকার ঋষি-সমাজ আন্দোলিত হইয়া পড়িল। সোম নিষ্পীড়নের মন্ত্র, মুষল উদূখলের শব্দ এবং সাম গান আকাশকে নিনাদিত করিতে লাগিল।

"লোক দ্বারমপাবাঋু ২৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং রা ৩৩৩১ হু ৩ হুং ১ আ ২১১ জা ৩ গো ৩ আ ১২৪৫ ইতি।"

ছান্দোগ্যউঃ।

লোক-দ্বার খুলিয়া দাও, হে অগ্নে, আমরা মৃত্যুর অতীত রাজ্য লাভের জন্য সেখানে তোমাকে দর্শন করিব। যেখানে সেখানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান, যেখানে সেখানে যজ্ঞের কথা। আচার্য্যেরা শিষ্যকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, "হে সত্যকাম, কবিগণ মন্ত্রের মধ্যে এই যে যজ্ঞরূপ কর্ম্মকে লাভ করিয়াছেন, ইহাই সত্য। তোমরা নিয়ত এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, মৃত্যুর অতীত স্বকৃত লোকে যাইবার জন্য তোমাদের ইহাই পন্থা।" এমন কি মৃত্যু হইতে মনুষ্যকে এই যজ্ঞ ত্রাণ করে বলিয়া যে কালে লোকে এই যজ্ঞ বহু অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই কালেরই নাম ত্রেতা। যজ্ঞোৎসবে মত্ত মনুষ্যদিগকে কিন্তু এই সকল বিচিত্র অনুষ্ঠান মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পা-

রিল না। ইহাতেও ছিদ্র বাহির হইয়া পড়িল এবং সেই ছিদ্র দ্বার দিয়া পুনরায় মৃত্যু আসিয়া কর্ম্মানুরাগী লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিল। ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে,

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।"

ছান্দোগ্যউঃ।

কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত লোকে কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত বাস করিয়া পুনরায় কর্ম্মীরা উত্থানের পথ দিয়া মর্ত্যলোকে প্রত্যাগমন করেন। যজ্ঞের বিরুদ্ধে এরূপ কথাও উঠিল যে,

"এতচ্ছ্রেয়ো যে হভিনন্দন্তি মূঢা জরা মৃত্যুন্তে পুনরেবাপিযন্তি।"

যে অজ্ঞান ব্যক্তিরা এই কর্ম্মকে এবং তাহার ফলকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাহারা পুনঃপুনঃ জরা ও মৃত্যুতে পতিত হয়। ইহ জীবনে মৃত্যুভয়, কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত স্বর্গভোগেরও অবসান আছে, অতএব কোথায় যাই, কি করি, এই চিন্তায় ঋষিরা সংসার পরিত্যাগ করিলেন। অরণ্যে যাইয়া তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সূর্য্যের অন্তর্যামী পুরুষের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে,

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং তত্ত্বং পূষণ্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।"

হে সূর্য্য, তোমার জ্যোতির মধ্যে সত্যের মুখ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমি যে সত্যধর্ম্মা—সত্য ধর্ম্ম প্রাপ্তির অভিলাষী আমার জন্য তুমি সেই সত্যের দ্বার খুলিয়া দাও এবং তাহা যে কি তাহা আমি দেখি। ব্যাকুল আত্মার উদ্ধারের জন্য দয়াময় পরমেশ্বর সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। মুক্তির জন্য প্রার্থী সেই ব্যাকুল ঋষিদিগের উদ্ধারের জন্য তিনি তাঁহাদিগের আত্মাতে দিব্য জ্ঞান দিলেন এবং সেই দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে তাঁহারা যাহা দেখিলেন তাহা শ্বেতাশ্বতর ঋষি বলিয়াছেন—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।"

ধ্যানযোগের দ্বারা সেই ঋষিরা পরমেশ্বরের স্বগুণের সহিত নিগূঢ়া আত্মশক্তিকে দেখিলেন। কালাত্মযুক্ত জগতের যত কারণ আছে সেই নিখিল কারণেতে সেই এক দেবতা অধিষ্ঠান করিতেছেন। আর তিনি

"দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।

মুণ্ডকশ্রুতিঃ।

দিব্য এবং অমূর্ত্ত পুরুষ। তিনি প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে আত্মাতে এবং বাহিরে এই আকাশে ও সকল বস্তুর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তিনি জন্মরহিত, প্রাণবায়ু রহিত এবং সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক-মন-রহিত। তিনি শুভ্র এবং নাম রূপে অভিব্যক্ত এই স্থূল বিষয় হইতে অন্য এবং সকলের শ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। তাঁহাকে যিনি জ্ঞান-চক্ষে আপনার আত্মাতে দর্শন করেন ও পবিত্র হৃদয়ে প্রেম ভক্তির দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন, তিনিই এই সংসার-ক্লেশ হইতে আপনাকে মুক্ত ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন। এই মুক্তিদাতা জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর জ্যোতির্ম্ময় ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইলেও তাঁহাতে সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে। তিনি বাক্য ও প্রাণের প্রতিষ্ঠা, তিনিই অমৃত, তিনিই সত্য। সত্যের আচরণ দ্বারা, তপের দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা এবং ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা

ইহাঁকে লাভ করা যায়॥ যাঁহারা পাপ-মুক্ত যতি, তাঁহারাই শরীরের অন্তরে আত্মাতে সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যদেবতাকে দেখিতে পান। এই সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মই সকলকে জয় প্রদান করেন। এই মর্ত্ত্য বিষয়ভোগে কখন জয় লাভ হয় না। অমরত্বে যাইবার যে পথ, তাহা সত্যের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা বিতত রহিয়াছে—ইহাকেই ব্রহ্ম-পথ বলে। ব্রহ্ম-কৃপাবলে মুক্তি লাভে নিঃসন্দেহ হইয়া ঋষিরা ব্রহ্মোৎসব করিতে লাগিলেন। এই ব্রহ্মোৎসবকে যোগোৎসবও বলা যাইতে পারে। কারণ ইহা তাঁহারা নির্জ্জনে একাকী সম্পন্ন করিতেন—ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যান দ্বারা হৃদয়ের অন্তস্তলে ঋষিদিগের যে প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস উঠিত তাহা তাঁহারা হৃদয়েই গূঢ় রূপে সম্ভোগ করিতেন। সেই উচ্ছ্বাসের কণামাত্র মুখশ্রী দিয়া ব্রহ্মবর্চ্চস্ নামে বাহির হইত। যে পর্ব্বত গুহায় থাকিয়া তাঁহারা এই উৎসব ভোগ করিতেন সে গুহা দীপ্তিধারণ করিত, যে অরণ্যে থাকিয়া তাঁহারা এই উৎসব ভোগ করিতেন সে অরণ্য ফুল ফলে অবনত হইয়া গম্ভীর শ্রী ধারণ করিত। এবং যে প্রান্তরে বসিয়া ইহা ভোগ করিতেন সে প্রান্তর রসোল্লাসে হাস্য করিতে থাকিত।

এই যে অমৃত লাভ ও ব্রহ্মানন্দ উপভোগের কথা বলা হইল, ইহা উপনিষৎ প্রতিপাদিত সনাতন সত্য। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সনাতন সত্য লাভ ও সম্ভোগের জন্য এবং জীবনের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য গৃহদ্বার উন্মুক্ত ছিল না। এমন যে উৎকৃষ্ট সংসারাশ্রম, যাহা হৃদয়-কুসুম-সৌরভ পুত্র কন্যা জায়া, মূর্ত্তিমান প্রেমানুরাগ স্বরূপ ভ্রাতা ভগিনী বন্ধু, জাগ্রৎ শ্রদ্ধা ভক্তির আস্পদ পূজনীয় পিতা মাতা আচার্য্য এবং কল্যাণবিধাতৃ অতিথি অভ্যাগত জনের বসতিস্থল; যেখানে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, প্রজাকাম পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছা সাধনের জন্য পবিত্র উদ্বাহবন্ধনে স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিত হয়, যেখানে পরলোকগত জনের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শনের জন্য শান্তিকর শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান হয় এবং যেখানে শরীর ধারণের জন্য কৃষি বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, সেই কল্যাণ ক্ষেত্র গৃহে সকলে সমবেত হইয়া সেই মুক্তিদাতা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবার বিধি প্রচলিত ছিল না। যে ব্রহ্মোপাসনায় কণ্টকময় অরণ্যও পুলকিত হয় সেই ব্রহ্মোপাসনা গৃহে হইলে সে গৃহ কত অধিক শ্রীসম্পন্ন হয় তাহা ভাবিয়া দেখ। কিন্তু সত্যং শিবং সুন্দরং পরাৎপর ব্রহ্মের অপার করুণা ও আশ্চর্য্য মহিমা। তিনি উপযুক্ত সময় দেখিলেই উন্নতির পথ খুলিয়া দেন। পূর্ব্বকার ঋষিরা বনে গিয়া অমৃত লাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যান অনুশীলন করিতেন। ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ব্বে অরণ্যেই আবদ্ধ ছিল, এখন তাহা পরিবারের মধ্যে প্রচারের জন্য তিনি আর এক শান্ত সমাহিতচিত্ত ঋষিকে প্রেরণ করিলেন। সেই বৃদ্ধ ঋষি এখনো জীবিত আদর্শে মনুষ্য-আত্মার গতি নির্ণয় করিতেছেন। তিনিই পরিবারে ব্রহ্মোপাসনার বিধি প্রচার করিয়াছেন। অরণ্য হইতে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকে গৃহে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন; একাধারে বিষয়-সুখ ও ব্রহ্মানন্দ উপভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, জ্ঞানী অজ্ঞান, সাধু অসাধু এবং গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলের সমান কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই মহর্ষিই আমার পরম পূজ্যপাদ গুরু শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

ঠাকুর। ইনি গৃহাশ্রমীর শুভানুধ্যান ও কল্যাণ সাধন করিয়া নিজে সকল প্রকার শুভাশুভ কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যা-শ্রমীর ন্যায় আশ্রমেই এবং আত্মাতে পর-মাত্মার পরমানন্দরূপ দর্শন করত অশরীরীর ন্যায় শরীরেই অবস্থান ও তাঁহার প্রের-য়িতার শেষ আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি নিজের আত্মার ও এই মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য কি কঠোর শ্রম ও সাধন করিয়াছেন তাহা যিনি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও তাঁহার জীবন চরিত্র মনোযো-গের সহিত পাঠ করিবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে এই মহাত্মার নিকট মানব সমাজ কি গভীর ঋণে আবদ্ধ। যখন বেদ উপনিষ-দের গভীর ব্রহ্মতত্ত্ব ও তৎসাধন মনুষ্য-সমাজে বহুল প্রচার হইবে সেই ভবিষ্যৎ কালের লোকেরাই বুঝিতে পারিবেন যে এই মহাত্মার ঋণ পৃথিবীর শেষ দিনেও পরিশোধ হইবে না। ঈশ্বরের কৃপাই এই মহাপুরুষের হস্ত দিয়া মানব-সমাজে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে এবং সেই কৃপাই অদ্য আমাদের এই মাঘোৎসবের উপভোগ্য ব্রহ্মানন্দ। এই আনন্দ উপ-ভোগের দিনে, হে সমাগত সাধু ভক্তগণ, হে ব্রহ্মের উপাসকগণ, আইস, যে এক-মেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম এখনি আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দ বিতরণ করিতেছেন তাঁহার জয় ঘোষণা করি। তাঁহার নাম সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক। এই জয়ের দিনে, আনন্দের দিনে আনন্দ মনে সকলে বলি—

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রাত্রিকাল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়টী পাঠ কারলেন।

অদ্য সেই আনন্দের দিন উপস্থিত যে দিনে মঙ্গলময় পরম পিতা পরম মাতা এবং পরম সুহৃদের আশীর্ব্বাদময় হস্ত আমাদের দেশের মস্তকের উপরে দেদীপ্য-মান দেখিতে পাওয়া যায়। কেমন আ-শ্চর্য্যরূপে মহাত্মা রামমোহন রায় চতু-র্দ্দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলগত অপৌত্তলিক ভাব সর্ব্ব-সমক্ষে অনাবৃত করিলেন; তাহার পরে কেমন আশ্চর্য্য রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্ষেত্র-কর্ষণ এবং বীজ-বপন আরব্ধ হইল; তাহার পরে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সেই বীজ অঙ্কুরিত শাখায়িত এবং পল্লবিত হইল; এ সমস্ত অভাবনীয় অচিন্তনীয় অদ্ভুত ব্যাপার যদি একবার আদ্যোপান্ত স্থিরচিত্তে পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া দেখা যায়, তবে কাহারো নিকটে ইহা গোপন থাকিতে পারে না যে, করুণাময় বিশ্ববিধাতার প্রেমদৃষ্টি নিরন্তর আমাদের উপরে স্থিরভাবে নিপতিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল অব্দে—সমস্ত পৃথিবীর যখন চক্ষু ফুটিবার উপক্রম হই-তেছে সেই মোহ-রজনীর প্রাতরুন্মীলনের নব-মুহূর্ত্তে—পৃথিবীস্থ কোনো দেশই পূর্ব্ব-বৎ অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতে পারে না; একা কি কেবল আমাদের এই ভারতভূমি মোহ-অন্ধকারে আবৃত থাকিবে? ইহা হইতেই পারে না! ঈশ্বরের প্রেম দৃষ্টির এক ইঙ্গিতে মহাত্মা রামমোহন

রায় আবির্ভূত হইয়া কুঠার হস্তে করিয়া চতুর্দ্দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিলেন; পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি ক্ষেত্র কর্ষণ করিলেন এবং সেই কষ্ট-কর্ষিত ক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া তাহা হইতে ফল-পুষ্প-ছায়া-প্রদ কল্যাণ-পাদপ অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলেন; তাহার পরে তাঁহার প্রবলপরাক্রম শিষ্য মহাত্মা কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ দেশবিদেশে তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করিলেন; তাহার পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি উদ্যম-শালী ভ্রাতৃগণ নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে তাহার নবীন দল-রাজি উদ্ভাবিত করিয়া তুলিলেন; এবং এক্ষণে তাহাকে পুষ্পিত ও ফলাবনত করিবার জন্য সকল দিক্ হইতে সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতারা সমবেত হইয়া সাধ্যানুসারে তাহাতে প্রযত্ন-বারি সেচন করিতেছেন। ইহা অতীব সত্য যে, "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" শ্রেয়ের অনেক বিঘ্ন কিন্তু ঈশ্বর উপরে আছেন—তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন—তিনি আমাদের নিকট হইতে নিকটে আছেন—তিনি আমাদের অন্তর হইতে অন্তরে আছেন; তাঁহার অপ্রতিহত মঙ্গল আশীর্ব্বাদ আমাদের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর অভয়-ঘোষণা করিতেছে তাহা কি আমরা শুনিতেছি না! অতএব ভয় নাই! এই মহোৎসবের মধ্য হইতে দশ সহস্র হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতার উৎস তাঁহার প্রতি উৎসারিত হউক্! সত্যের জয়-ধ্বনি, শুভ কার্য্যের মঙ্গল-ধ্বনি, আনন্দের গীতধ্বনি একতানে গগন-তল বিকম্পিত করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে অমৃত শান্তিবারি বর্ষণ করুক্! আমাদের মধ্যে থাকিয়া যিনি আমাদের নেতা, আমাদের নিকটে থাকিয়া যিনি আমাদের অভয়দাতা, আমাদের অন্তরে থাকিয়া যিনি আমাদের কাণ্ডারী, তিনিই আজ আমাদের এই উৎসবের অধিদেবতা—আজ আমাদের আনন্দের সীমা কি!

আজিকের এই শুভ দিনের আনন্দ-কোলাহলে ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের শাখা-বিস্তার যতদূর হইবার তাহা হইয়াছে, এখন তাহার ফল ফলিবার সময় উপস্থিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল-গ্রন্থে পরব্রহ্মের প্রতিপাদক প্রাচীন ঋষি-বাক্য-সকল বেদবেদান্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে; স্মৃতি-পুরাণতন্ত্র হইতে সার সার ধর্ম্মোপদেশ সংকলিত হইয়া অধ্যায়-পরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়াছে; ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে সেই-সকল প্রাচীন ঋষিবাক্য আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী করিয়া হৃদয়-স্পর্শী জীবন্ত অমৃত বাক্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে অপৌত্তলিক ক্রিয়াকাণ্ডের শাস্ত্রানুমোদিত বৈধ প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং আমাদের দেশের প্রচলিত অনুষ্ঠান পদ্ধতির সহিত তাহার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, পৌত্তলিকতা পরিবর্জ্জিত হইলেই দুয়ের মধ্যে তিল-মাত্রও প্রভেদ থাকে না। এক কথায় আমাদের এই প্রিয়তম ভারত-ভূমিতে নির্ব্বাণ-দশা-প্রাপ্ত ব্রহ্মাগ্নি উদ্দীপিত করিতে হইলে, তাহার জন্য যত কিছু আয়োজনের প্রয়োজন সমস্তই আমাদের চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে; আমাদের যখন যাহা চাই তাহা আমরা হাত বাড়াইলেই পাইতে পারি; এখন আমাদের আর ভাবনার বিষয় কিছুই নাই—কেবল যত্ন-পূর্ব্বক অনুষ্ঠানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবারই অপেক্ষা। ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পথে নির্ভয়ে পদ-নিক্ষেপ করা—ইহাই এখন

আমাদের মুখ্য প্রয়োজন। ইহাতে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই আমাদের মধ্য হইতে বিবাদ-কলহ দূরীভূত হইয়া গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃতময় ফল গৃহে গৃহে ফলিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের কর্ত্তব্য এই যে, দলাদলিতে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত অভীষ্ট-কার্য্যের সাধনে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হ'ন, সে অভীষ্ট-কার্য্য এক কথায় জ্ঞাপন করিতে হইলে তাহা আর কিছু নয়—ব্রহ্মোপাসনা।

বিগত উৎসবে আমি এইখানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি সর্ব্বাঙ্গীণ আদর্শ সর্ব্ব-সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়াছিলাম; তাহার চুম্বক তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম্ম তিনকে একতানে মিলিত করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের আশ্রয়ে নির্ভর করিয়া যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সর্ব্বাঙ্গীণ ব্রাহ্মধর্ম্ম। আজি আমি সেই উৎসব-ক্ষেত্রে—সেই সমস্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে সেইরূপ নবোৎসাহে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের তুইটি চিরাভিলষিত ফল সর্ব্ব-সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিব—মঙ্গলদাতা বিশ্ববিধাতা আমাদের সকলের অন্তঃকরণে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করুন্।

ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি ফল সেই অতীন্দ্রিয় নিভৃত স্থানে ফলিত হয়, যেখানে আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ; এবং আর-একটি ফল সেই প্রকাশ্য বহিঃপ্রাঙ্গণে ফলিত হয়, যেখানে আত্মার সহিত জগতের সম্বন্ধ। প্রথম ফলটি পরব্রহ্মে প্রীতি এবং দ্বিতীয় ফলটি তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন;—তুইই ব্রহ্মোপাসনা।

আদিম কালে ইন্দ্র বায়ু অগ্নি প্রভৃতি পরিমিত দেবতাগণকে মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার মানসে ঋষিরা হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন। ক্রমে সে-সকল প্রভূত ক্রিয়াকর্ম্মের অসারতার প্রতি জ্ঞানবান্ ঋষিদিগের চক্ষু ফুটিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাঁহারা নানা পরিমিত দেবতার নানা শক্তির অভ্যন্তরে একেরই মহতী শক্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঋক্‌বেদে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে,

"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ"

এক সৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে ব্রাহ্মণেরা অনেক প্রকারে বলিয়া থাকেন; তাঁহারা কখনো তাঁহাকে বলেন—অগ্নি, কখনো বলেন—যম, কখনো বলেন—মাতরিশ্বা। মনু তাঁহার গ্রন্থের উপসংহার-ভাগে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন; যথা—"প্রশাসিতারং সর্ব্বস্য পুরুষং পরং" "পরম পুরুষ সকলের শাসনকর্ত্তা" এই কথা বলিয়া তদুত্তরে তিনি বলিতেছেন

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণং অপরে ব্রহ্ম শাশ্বতং"

ইহাঁকে কেহ বলেন অগ্নি, কেহ বলেন—মনু প্রজাপতি, কেহ বলেন—প্রাণ; কেহ বলেন—শাশ্বত ব্রহ্ম।" কিয়ৎকাল পরে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জ্ঞানোন্নত ঋষিরা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরব্রহ্মের শাসনাধীন প্রাকৃতিক শক্তি রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন; যথা,—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ,'

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে ইন্দ্র এবং বায়ু এবং মৃত্যু প্রধাবিত হইতেছে। তাহার পরে তাঁহারা সমস্ত জগতের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্যের অভ্যন্তরে একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া

গায়ত্রী ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহার পরে যে পরমপুরুষ সূর্য্যের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান তিনিই আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান

"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ"

সেই এই পরমাত্মা যিনি আত্মাতে, এবং ঐ যিনি সূর্য্যে, তিনি একই" পুনশ্চ

"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং"

তিনি দূর হইতেও বহুদূরে এবং তিনি এইখানে অতি নিকটে আর যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা তাঁহাকে হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে অবলোকন করেন" এইরূপে তাঁহারা অন্তরে বাহিরে একই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন এবং

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা"

অন্তরতর এই যে পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং আর আর সমস্ত বস্তু হইতে প্রিয়, এইরূপ তাঁহাকে প্রিয়তমরূপে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন তাঁহাদের মন্তব্য কথা ছিল এই যে, "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে! এইরূপে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা জ্ঞানোন্নত ঋষিদিগের মন হইতে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের অনুসন্ধান তাহার স্থলাভিষিক্ত হইল। কিন্তু হইলে হয় কি—চিরাভ্যস্ত সংস্কার যাহা পুরুষানুক্রমে জনসমাজে প্রচলিত, তাহা ছাড়াইয়া ওঠা জন-সাধারণের পক্ষে অতীব সুদুষ্কর। ভারত-ভূমির জন-সাধারণ পূর্ব্ববৎ হোম যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানেই বৃথা আয়ুঃক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া জ্ঞানোন্নত ঋষিরা জন-সমাজের প্রতি বিরক্ত হইয়া অরণ্যে গিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ব্রহ্মধ্যানে জীবন সমর্পণ করিতে লাগিলেন। তখনকার জনসমাজে হোম যাগ যজ্ঞ বই আর কথা ছিল না—বিবাহাদি যে কোনো মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত সকলেরই সঙ্গে ঐ সমস্ত বাহ্য আড়ম্বর ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত ছিল। জ্ঞানবান্ ঋষিরা দেখিলেন যে, সমাজে থাকিতে গেলে ঐ সকল মিথ্যা আড়ম্বর এবং মিথ্যা দেবার্চ্চনার হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া অতীব সুকঠিন; অথচ—তাঁহাদের অন্তঃকরণের নব-প্রস্ফুটিত জ্ঞানালোক একমাত্র অদ্বিতীয় পরম সত্য ব্যতিরেকে আর কিছুতেই তৃপ্তি মানিতে পারিল না; তাই তাঁহাদের অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—চাহি না জনসমাজ—চাহি না জাতি কুল—চাহি না স্ত্রী পুত্র—চাহি না কিছুই—সংসারের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া অরণ্যে যাই; সেইখানে গিয়া নিরাপদে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মানন্দ রসপান করিয়া আত্মার গভীর পিপাসা নিবৃত্তি করিব এবং পরিণামে মিথ্যার বিস্তৃত কুহকজাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সংসারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে উপনীত হইব! এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা জন-সমাজ জাতিকুল নাম ধাম সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অভীষ্ট কার্য্যে তৎপর হইলেন; এবং এইরূপ তপঃসাধনের প্রভাবে তাঁহাদের অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সকল জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিরা পুনঃ পুনঃ এইরূপ খেদোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে,

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম, এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুন্তে পুনরেবাপিয়ন্তি।"

এই যে সকল যাগযজ্ঞরূপী ক্রিয়া

কলাপ যাহাতে অষ্টাদশ-প্রকার অকিঞ্চিৎকর কর্ম্ম অন্তর্ভূত, এই সমস্তকে যাঁহারা শ্রেয়-বোধে অভিনন্দন করেন, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা জরা মৃত্যুর বশতাপন্ন হ'ন।" ইহা সত্ত্বেও লোকালয়ে হোম যাগ যজ্ঞাদি প্রভৃত ক্রিয়া-কাণ্ড যেমন চলিতেছিল সেই-রূপই চলিতে লাগিল—এবং অদ্যাপি তাহা জনসমাজে বিবাহাদি সকল শুভকার্য্যেরই সঙ্গের সঙ্গী; ব্রহ্মজ্ঞান লোকালয়ের বহির্ভাগে অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইল। কিন্তু যাহাই হউক্, অতি পুরাতন কাল হইতে ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের দেশের গিরিগুহা অরণ্যের গভীর প্রদেশে প্রাণপণ যত্নে পরিপালিত হইয়া আসিতেছে। সেই পুরাতন ঋষিতপস্বীদিগের জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষ পরব্রহ্মের উপাসনা অরণ্য হইতে ফিরাইয়া আনিয়া নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, প্রতিষ্ঠিত করিয়া—ভারত-ভূমির ভাগ্যে কখন যাহা ঘটে নাই এইরূপ একটি মহত্তম কল্যাণ সাধন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের দুইটি চিরাভিলষিত ফল এবং তাহার প্রথমটি পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি। বর্ত্তমান জনসমাজে বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রীতি ফলিত করিয়া তোলাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম সংকল্প। সাধারণতঃ সকল দেশেরই শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানী ব্যক্তিরা এবং বিশেষতঃ আমাদের দেশের প্রাচীন আরণ্যক ঋষিরা এই কথাটি ভূয়োভূয় লোকের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা পাইয়া আসিতেছেন যে, আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি ভক্তি সমর্পণ করাই মনুষ্যের প্রধান পুরুষার্থ; আর তাঁহাদের এই কথাটি শুদ্ধ কেবল জন-শ্রুতি মাত্র নহে—কথার কথা মাত্র নহে; উহা যে কেমন সত্য—সকলেই তাহা পরীক্ষা-দ্বারা স্ব স্ব অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে পারেন। ঈশ্বরের মূর্ত্তি-কল্পনা কেবল কল্পনা-মাত্র কিন্তু জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই কল্পনার অতীত অথচ শুদ্ধ-চিত্ত সাধকের নির্ম্মল-জ্ঞানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীয়মান। বেদে আছে "জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" জ্ঞানের প্রসন্নতায় যখন বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয় তখন সাধক ধ্যানযুক্ত হইয়া সেই নিরবয়ব পরব্রহ্মকে দর্শন করেন; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধক অন্তঃকরণকে নিষ্পাপ এবং পরিশুদ্ধ করিলেই পরমাত্মাকে ধ্রুব সত্যরূপে সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারেন। জ্ঞানবান্ মনুষ্যকে এ কথা শিখাইয়া দিতে হয় না যে, তাঁহার অন্তরে জ্ঞান জাগিতেছে; অতএব আপন অন্তরস্থিত সাক্ষাৎ জ্ঞান মনুষ্যের প্রত্যয়-ভাজন না হইবার কোনো কারণ নাই। সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানে আপনা-হইতেই প্রকাশ পায় যে, সকল কারণের অভ্যন্তরে একমাত্র মূল কারণ, সকল আধারের অভ্যন্তরে একমাত্র মূলাধার, সকল আত্মার অভ্যন্তরে একমাত্র অদ্বিতীয় অন্তরাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। এই জন্য এ কথা বুঝিতে কাহারো ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না যে, কোনো পরিমিত বস্তুই পরিমিত বস্তুর মূল কারণ হইতে পারে না—বীজ বৃক্ষের মূল কারণ হইতে পারে না; কোনো পরিমিত বস্তুই পরিমিত বস্তুর মূলাধার হইতে পারে না—পৃথিবী বৃক্ষের মূলাধার হইতে পারে না; কোনো পরিমিত বস্তুতেই আত্মার তৃপ্তি হইতে পারে না; সসাগরা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যেও নহে—

ইন্দ্রের অমরাবতীতেও নহে; কেবল যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—যিনি আত্মার অন্তরাত্মা তাঁহাতেই আত্মার চিরস্থায়ী আনন্দ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ট এবং নিগূঢ় প্রেম-সম্বন্ধ যে,যদি জিজ্ঞাসা কর "জীবাত্মা কাহাকে চায়" তবে তাহার এক উত্তর এই যে, পরমাত্মাকে। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, পরমাত্মা কি উদ্দেশে জগৎ সৃষ্টি করিলেন তবে তাহার এক উত্তর এই যে, জীবাত্মার উন্নতির উদ্দেশে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, গাভীরা রোমন্থন করিয়াই সন্তুষ্ট; পক্ষীরা নীড় নির্ম্মাণ করিয়াই সন্তুষ্ট; মধুমক্ষিকা মধু চয়ন করিয়াই সন্তুষ্ট কিন্তু মনুষ্যের আত্মা সেরূপ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে না; অতীব উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারে না—বৃহদায়তন অট্টালিকায় বাস করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারে না, প্রভূত ধন রত্ন সঞ্চয় করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারে না। মনুষ্যের সম্মুখ দিয়া দৃশ্যের পর দৃশ্য স্রোতের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে—যাহা যাইতেছে তাহা আর ফিরিতেছে না; তাহার মধ্যে এক বস্তুকে ছাড়িয়া আর এক বস্তুকে ধরা, দ্বিতীয় বস্তুকে ছাড়িয়া তৃতীয় বস্তুকে ধরা, এরূপ করিয়া রাশি রাশি পরিমিত বস্তুর মধ্যে যুগযুগান্তর কাল ঘুরিয়া বেড়াইলেও মনুষ্যের আত্মা শান্তি ও তৃপ্তির দিকে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না; চলাচল সমস্তের মধ্যে ধ্রুব সত্য পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে চাওয়াই মনুষ্যের একমাত্র শান্তি-সোপান। পরমাত্মাকে চাওয়া সৃষ্টির আর কুত্রাপি সম্ভবে না—কেবল জীবাত্মাতেই সম্ভবে এবং তাহারই জন্য জীবাত্মা সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। আর এক দিকে দেখা যায় যে, জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার জন্য ব্যাকুল, পরমাত্মা তেমনি জীবাত্মাকে প্রেমদান করিবার জন্য এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন;—শরীরের উপাদান-স্বরূপে পঞ্চভূত সৃজন করিয়াছেন, প্রাণের উপজীবিকা-স্বরূপে প্রাণ-পূর্ণ উদ্ভিদ্ রাজ্য সৃজন করিয়াছেন, মনের প্রতিকৃতি-স্বরূপে পশু পক্ষী সৃজন করিয়াছেন; প্রথমের উপরে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, দ্বিতীয়ের উপরে তৃতীয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সকলের উপরে চিরোন্নতি-শীল জীবাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য্য অকথিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ পরমাশ্চর্য্য যেখানে সোপানের ব্যবস্থা সেখানে উপবেশন-শালা আরো কি না জানি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! জ্ঞানই জীবাত্মার উপবেশন-শালা এবং নিষ্কাম পবিত্র প্রেমই জীবাত্মার অন্তঃপুর-নিকেতন। সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞানের ন্যায় উৎকৃষ্ট পবিত্র সামগ্রী আর নাই—

> "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" ইতি
> ভগবদ্গীতা।

এবং জ্ঞানের মধ্যে ঈশ্বরপ্রীতির ন্যায় উৎকৃষ্ট পবিত্র সামগ্রী আর নাই। জীবাত্মা উপরি-উক্ত ঐ সকল সোপান দিয়া জ্ঞান-মন্দিরে অধিরূঢ় হইয়া প্রেমের নিভৃত অন্তঃপুরে পরমাত্মার সহিত ভূমানন্দ উপভোগ করিবে এবং সেই আনন্দামৃতে পরিপুষ্ট হইয়া উন্নতি হইতে উন্নতিতে পদার্পণ করিবে—ইহাই সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য। জীবাত্মা যতক্ষণ না পরমাত্মাকে দেখিতে পায়, ততক্ষণই তাহার মোহ, ততক্ষণই তাহার শোক, পরমাত্মাকে দেখিতে পাইলে জীবাত্মার সকল মোহের তিরোধান হয়—সকল শোকের অব-

সান হয়। প্রাচীন ঋষিরা তাই বলিয়াছেন

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ"।

দুই সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার মধ্যে একটি স্বাদগ্রহণ পূর্ব্বক ফল ভোজন করিতেছেন—আর একটি নিরসন থাকিয়া কেবল মাত্র দর্শন করিতেছেন। জীবাত্মা শরীরে নিমগ্ন থাকিয়া দীনভাবে মুহ্যমান হইয়া নিরন্তর শোক করিতেছেন; যখন সর্ব্বসেব্য পরমাত্মাকে এবং তাঁহার মহিমাকে দর্শন করেন, তখন তিনি শোক হইতে মুক্ত হ'ন। পূর্ব্বতন আরণ্যক ঋষিদিগের প্রদর্শিত এইরূপ পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করিয়া আবার কি আমরা কল্পনার পথে ফিরিয়া যাইব? কল্পনার অলীক প্রলোভনে মুগ্ধ হইব? কল্পনার অকিঞ্চিৎকর বিভীষিকায় ভয়ে কম্পমান হইব? তাহা কখনই হইতে পারে না! ভারত-ভূমির নামে যাঁহাদের হৃদয় উথলিয়া উঠে এবং দুই চক্ষু দিয়া বাষ্পধারা বিগলিত হয়, তাঁহাদের জানা উচিত যে, বেদ-শাস্ত্র সমস্ত ভারত-ভূমির সর্ব্বত্র শিরোধার্য্য, অথচ তাহাতে শুধু যে কেবল ব্রহ্মোপাসনার বিধি আছে তাহা নহে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর উপাসনার নিষেধ আছে; যথা—

"আত্মৈবেদং নিত্যদোপাসনং স্যাৎ নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসীত ধীরঃ"

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পরমাত্মারই উপাসনা করিবেক আর কোনো কিছুরই উপাসনা করিবেক না। ব্রহ্মোপাসনা শুধু যে কেবল বেদের বিধান এমন নহে—স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র সমস্তই একবাক্যে তাহার পোষকতা করিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত এরূপ রূঢ় বাক্যে পৌত্তলিকদিগকে ভৎর্সনা করিয়াছেন যে, তাহা শুনিলে অনেকে হয় তো ইষ্ট দেবতার নামোচ্চারণ করিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবেন, যথা,

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।"

কফ পিত্ত বায়ুময় শরীরে যে ব্যক্তির আত্মবোধ, স্ত্রী পুত্রাদিতে যে ব্যক্তির আপনত্ব বোধ, আর জ্ঞানিজন সমাগমে নহে কিন্তু জলে যাহার তীর্থবোধ সে ব্যক্তি গো-গর্দ্দভ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে এবং তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের শিরোভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে,

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন এবং যে কোনো কর্ম্ম করেন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। মনু কি বলিয়াছেন তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শাশ্বত পরমপুরুষ পরব্রহ্মই সাধকদিগের প্রকৃত উপাস্য দেবতা—ইন্দ্রাদি দেবতারা তাঁহারই বিভিন্ন-শক্তি-জ্ঞাপক নাম মাত্র। স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রোক্ত এ সমস্ত জ্ঞানের কথা বেদেরই প্রতিধ্বনি; বেদে কোথাও আছে "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" "পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক" কোথাও বা আছে "নেদং যদিদমুপাসতে" লোকের দেখাদেখি কোনো পরিমিত বস্তুর উপাসনা করিবেক না। এতকালের পরেও এখনো কি আমাদের দেশ ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় বেদবাক্যের প্রতি বধির হইয়া নিদ্রা যাইতে পারে? চতুর্দিক হইতে

আমাদের চক্ষে জ্ঞানালোক বর্ষিত হইতেছে আজিও কি আমাদের চক্ষু ফুটিবে না? সত্য কি এতই নিস্তেজ এবং নির্বীর্য্য! মিথ্যা কি এতই প্রবল পরাক্রম বিশ্বাধিপতি? কখনই না! "সত্যমেব জয়তে নানৃতং"। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, ব্রহ্মোপাসনাতে আমাদের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়, প্রীতি ভক্তি চরিতার্থ হয়, আত্মার অভ্যন্তরে মুক্তির পথ উন্মুক্ত এবং প্রসারিত হইয়া যায়, আমাদের দেশের প্রাচীন আরণ্যক ঋষিদিগের তাহাই মুখ্য মন্তব্য এবং বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীর তাহাই সর্ব্বপ্রকারে উপযোগী।

ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মোপাসনা যখন এইরূপ পরমোৎকৃষ্ট মহত্তম কল্যাণের মূল, তখন তাহার সহিত গার্হস্থ্য এবং সামাজিক অনুষ্ঠান একতানে সম্মিলিত হইলে তাহা আরো কত না মঙ্গলের আকর হইয়া উঠে। মনু বলিয়াছেন যে,

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ।"

অজ্ঞলোক অপেক্ষা গ্রন্থাধ্যায়ী ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থাধ্যায়ী ব্যক্তি অপেক্ষা ধারণাশীল ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ, ধারণাশীল ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা (অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞান-অনুসারে কার্য্য করেন এরূপ ব্যক্তিরা) শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানে শুধু পারমার্থিক সত্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষান্ত থাকা ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য নহে—জ্ঞানের সত্যকে সাংসারিক সমস্ত মঙ্গল কার্য্যে প্রয়োগ করা চাই তবেই ধর্ম্ম অব্যাহত রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে নচেৎ সত্য-হানি ধর্ম্মহানি এবং ব্রতভঙ্গ অনিবার্য্য। ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিতে হইলে, সত্যনিষ্ঠ সাধককে সত্যের অনুরোধে এবং ধর্ম্মের অনুরোধে প্রচলিত লোকাচারের কোনো না কোনো অংশ পরিত্যাগ করিতেই হয়; তাহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু ব্রাহ্মেরা কি পরিত্যাগ করিয়াছেন? মূর্ত্তপদার্থের উপাসনা যাহা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে ভূয়োভূয় নিন্দিত হইয়াছে, পরিত্যাগ করিবার মধ্যে তাহাই তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন—শাস্ত্র-বিগর্হিত জ্ঞানবিগর্হিত পথই পরিত্যাগ করিয়াছেন! তাঁহারা কি অবলম্বন করিয়াছেন? ব্রহ্মোপাসনা যাহা সকল শাস্ত্রে ভূয়োভূয় প্রশংসিত হইয়াছে সেই সর্ব্ববাদি-সম্মত পথই অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ইহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

ব্রাহ্মধর্ম্মোক্ত ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতি সমস্ত শাস্ত্রের মথিত সারাংশ; এই জন্য তাহার মধ্যে এমন একটিও কথা নাই যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় সমস্বরে যোগ দিতে না পারে। কি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" কি "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ" কি "নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়" কি গায়ত্রীধ্যান কি "অসতো মা সদ্গময়" কি "যএকোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" সমস্তই আত্মার গভীরতম প্রদেশকে স্পর্শ করে এবং এইরূপ বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা আত্মার শান্তির পক্ষে যেমন উপযোগী—পাপতাপের যেমন মহৌষধ—এমন আর কিছুই নহে।

একদিকে যেমন ব্রহ্মোপাসনা আর এক দিকে তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান; একটি ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তরঙ্গ আর একটি বহিরঙ্গ; দুইই জ্ঞানের অনুমোদিত হৃদয়ের অনুমোদিত এবং শাস্ত্রের অনুমোদিত—এই কারণে দুইই বর্ত্তমান জন-সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপযোগী।

সামাজিক শুভকার্য্য যত প্রকার আছে তাহার মধ্যে বিবাহই সর্ব্বপ্রধান; এই জন্য বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিকে পৌত্তলিকতা-দোষ হইতে মুক্ত করা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি প্রাণগত সংকল্প; কাজেই ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের অনুষ্ঠানে হোম দ্বারা পরিমিত দেবতাগণের তুষ্টিসাধন কোনোক্রমেই শোভা পাইতে পারে না; তাই তাহার মধ্য হইতে কুশণ্ডিকা সমূলে পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। কুশণ্ডিকা কেবল হোমের অগ্নি-সংস্কার, তা ভিন্ন তাহা স্বতঃ কিছুই নহে; যেখানে হোমের কোনো সংশ্রব নাই সেখানে কুশণ্ডিকা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। যদি শাস্ত্র শিরোধার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনো শাস্ত্র অনুসারেই হোম বিবাহের এরূপ-কোনো অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে যে, তাহা না করিলেই নয়। আশ্বলায়নীয় গৃহ্য সূত্রের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ কণ্ডিকার ৬ষ্ঠ সূত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, "একে আচার্য্যাঃ কামপ্যাহুতিং নেচ্ছন্তি" একদল আচার্য্যেরা কোনো প্রকার হোমই অনুমোদন করেন না। পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা হোম-যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির মধ্যস্থলে অষ্টপ্রহর বাস করিতেন কাজেই তাহা যে কি পদার্থ তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতেন, কেননা তাঁহারা ভুক্তভোগী; এমত স্থলে—যাগ-যজ্ঞ-সম্বন্ধে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে যেরূপ হৃদয়-ভেদী আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবাসীদিগের তাহা অতীব মনোযোগের সহিত শোনা উচিত; ঐ সকল বৃথা কার্য্যের প্রতি তাঁহারা যে, কিরূপ আন্তরিক বিরক্ত ছিলেন, তাহার একটি নমুনা আমি ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যথা,

যে-সকল মূঢ় ব্যক্তিরা অকিঞ্চিৎকর অষ্টাদশ কর্ম্ম-সম্বলিত নশ্বর এবং অস্থায়ী যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে শ্রেয়-বোধে অভিনন্দন করেন তাঁহারা জরামৃত্যুর বশতাপন্ন হ'ন। ব্রাহ্মেরা কুশণ্ডিকা এবং হোম পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রানুসারে যদি তাঁহাদিগকে দোষী হইতে হয় তবে বিবাহের অনুষ্ঠানে "কেচিৎ আচার্য্যাঃ" কোনো কোনো আচার্য্য যাঁহারা "কামপ্যাহুতিং নেচ্ছন্তি" কোনো প্রকার হোমই অনুমোদন করিতেন না" তাঁহারা আচার্য্যপদবী হইতে কেননা বহিষ্কৃত হইলেন? ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কুশণ্ডিকা এবং হোম বিবাহের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে সম্প্রদান এবং পাণিগ্রহণ এই দুইটিই বিবাহের মুখ্য অঙ্গ এবং সপ্তপদীগমন পাণিগ্রহণের চরম পর্য্যাপ্তি-স্বরূপ। শুধু কেবল হিন্দুজাতির শাস্ত্র অনুসারে নহে প্রত্যুত পৃথিবী শুদ্ধ সমস্ত আর্য্যজাতির শাস্ত্র অনুসারেই—কন্যার দান এবং গ্রহণ এই দুইটি কার্য্য রীতিমত সমাধা হইলে বিবাহ-সিদ্ধির পক্ষে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। শাস্ত্র-অনুসারে এবং প্রচলিত প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অপরাপর জাতির মধ্যে হোমাদির তো কোনো প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইতে পারে না; তা ভিন্ন ঘটস্থাপন শিলাস্থাপনাদি পৌত্তলিক ব্যাপার যাহা বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে প্রচলিত তাহা কোনো স্মৃতি-শাস্ত্রেই লেখে না—তাহা নিতান্তই অধুনাতন কালের নূতন সৃষ্টি। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মন্তব্য কথা এই যে, যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, যে-কুলের যেরূপ কৌ-

• প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম, এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুন্তে পুনরেবাপিয়ন্তি।

লিক প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক্, তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই; কেবল সেই-সকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা সমূলে উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা অধিরূঢ় হউক, তাহা হইলেই ব্রহ্মোপাসক ভক্তজনগণের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-ব্রত অব্যাহত থাকিবে। ব্রাহ্মদিগের বিবাহের অভ্যন্তরে এই যেমন দেখা গেল তেমনি আর আর সমস্ত শুভানুষ্ঠানের অভ্যন্তরে পরিমিত দেবার্চ্চনার পরিবর্ত্তে এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করাই ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান পদ্ধতির মুখ্য সংকল্প; যেহেতু ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে যে, গৃহস্থ ব্যক্তি যে-কোনো কর্ম্ম করিবেন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, তাহা ছদ্মবেশী স্বার্থপরতা। ঈশ্বর-ভ্রষ্ট বিষয়ী ব্যক্তিদিগের অন্তরস্থিত রিপু সকলই তাঁহাদের অন্তরতম বন্ধু এবং তাঁহাদের বহিঃস্থিত অন্ধশক্তিই তাঁহাদের জাগ্রত বিশ্বাধিপতি; তাহা ব্যতীত তাঁহাদের কাহারো ঈশ্বর অর্থ, কাহারো ঈশ্বর মান মর্য্যাদা খ্যাতি প্রতিপত্তি, কাহারো ঈশ্বর আপনি এবং আপনার পরিবার। মঙ্গলময় করুণাময় সর্ব্বারাধ্য পরম-দেবতা এবং অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া মায়াবী অন্ধশক্তি এবং স্বার্থ-রাক্ষসের অধীনে মনুষ্য-সমাজ কতদিন টেঁকিয়া থাকিতে পারে? তাই আমাদের দেশের এক্ষণে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু তেমনিই ঈশ্বরের অপরাজিত করুণা! আমাদের এই দীন হীন বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিনব আবির্ভাব তাঁহার অপার করুণার একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন। সেই করুণাময় বিশ্ববিধাতার উপাসনা হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত, পশ্চিম-সাগর-কূল হইতে পূর্ব্ব সাগর-কূল পর্য্যন্ত, গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারত-ভূমির সৌভাগ্য-সূর্য্য প্রত্যানয়ন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নিরাশ্রয় দরিদ্র-কুটীর বঙ্গভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; এমন ব্রাহ্মধর্ম্মকে—পরমপিতার এমন স্বর্গীয় করুণামৃত প্রসাদকে—আমাদের দেশের এমন হিতৈষী পরম বন্ধুকে—আর কি আমরা তিলমাত্রও নয়নের অন্তর করিতে পারি? আমাদের দেশের যখন অন্তরে অন্ধকার বাহিরে অন্ধকার, এই ঘোর দুঃসময়ে, পরমপিতা পরমাত্মার চরণ-চ্ছায়া ভিন্ন আর কোথায় গিয়া আমরা শান্তি পাইব? আজিকের এই শুভ অবসরে আইস আমরা সমস্ত দুঃখতাপ বিস্মৃত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণের আশ্রয় গ্রহণ করি—তিনি আমাদিগকে সংসারারণ্যের সমস্ত বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ করিয়া যথাকালে তাঁহার অমৃত নিকেতনে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন—নিঃসংশয়! কেননা তাহারই জন্য তিনি এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপ উদ্বোধন করিলেন।

যে শুভদিনে শুভক্ষণে নিদ্রিত ভারতের পতিত-সন্তানগণকে প্রবোধিত করিবার জন্য সত্যের ভেরী বঙ্গে প্রথম নিনাদিত হয়, যে দিন অচেতন ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্য মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পবিত্র পূজার্চ্চনার বিশুদ্ধ পদ্ধতি এদেশে আবার পরিগৃহীত হয়—যে দিন ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের নৈশ গগন আলোকিত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের

বিমল জ্যোৎস্না ধর্ম্মজগতে প্রথম উদ্ভাসিত হয়—যে দিন হইতে সত্যের বণ্যা—প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া সকল প্রকার ভ্রান্তি ও কুসংস্কারকে আলোড়িত করিয়া তোলে—যে দিন হইতে ধর্ম্মজগতে যুগান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে—আমরা সেই মাঘের একাদশ দিবসে সকল কল্যাণের আকর—প্রেমের সাগর—সত্যের অনন্ত প্রস্রবণ পরমেশ্বরের পূজার্চ্চনার জন্য শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার বিমল উপচার লইয়া আগমন করিয়াছি। ঈশ্বরের করুণা ত আজীবনকাল আমাদিগকে রোগ শোক বিপত্তি বিষাদ পাপ তাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে—আমরা ত তাঁহার করুণানীরে নিত্যকাল সঞ্চরণ করিতেছি; কিন্তু আজিকার দিবসে তাঁহার মঙ্গলভাব পিতৃবাৎসল্য বিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল বলিয়া, আমাদের মস্তক আজ সহজেই তাঁহার পদতলে কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাঁহাকে না পাইলে আমাদিগের আন্তরিক ব্যাকুলতার কিছুতেই পরিসমাপ্তি হইতেছে না। সেই জন্য আজ আমরা ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহ সৌহার্দ্দে সকলে সম্মিলিত হইয়া প্রাণের পিপাসা শান্তি করিবার জন্য এই উৎসবক্ষেত্রে সকলে সমাগত হইয়াছি। আমরা মর্ত্ত্যের ধূলিকণা হইলেও সেই বিশ্বজননী উৎসব-দ্বার আজ আমাদের জন্য প্রমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বিষয়-চিন্তা বিষয়-কোলাহল হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত কর, শান্ত দান্ত সমাহিত হইয়া তাঁহার অজেয়—অশব্দ বাণী শ্রবণ কর। তিনি বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উত্থান কর, মোহনিদ্রা পরিহার করিয়া আমার নিকট আগমন কর, এই যে আমি তোমার সম্মুখে"। এমন যে স্নেহময় পিতা—করুণাময়ী মাতা—যিনি আমাদের সকল অবস্থার চিরসঙ্গী তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে জাগ্রত জীবন্তরূপে অনুভব করিয়া কাতর প্রাণে বিমল হৃদয়ে আইস আমরা তাঁহার পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হই—হৃদয়থালভার ভক্তিপুষ্পহার তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থক্য সম্পাদন করি।

অনন্তর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

পুরাকালে মঙ্গলার্থী যেরূপ বর্ষে বর্ষে স্বীয় জন্মতিথিতে মঙ্গলাচরণ করিয়া বর্ষগ্রন্থি বন্ধন করিত, সেইরূপ ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্মতিথিস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথিতে পরমাত্মার উপাসনা করিয়া মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মা কামনায় প্রীতিসূত্রে পরমেশ্বরের সহিত সম্যক্ যোগগ্রন্থি বন্ধন করিবে—ইহাই মাঘোৎসবের চরম উদ্দেশ্য। গত বৎসরের পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, সৃষ্টিকর্ত্তার চরণে সমর্পণ করিয়া, ফলের আশা ও অফলের আশঙ্কা শূন্য হইয়া তাঁহারই ইচ্ছা সফল হউক এই কামনায় নিশ্চিন্ত চিত্তে পরমাত্মায় প্রীতি স্থাপনে আমাদের যত্ন বৃদ্ধি হয় অখিলবিধাতা তাহারই বিধান করুন। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগের অন্তরে যখন দেখান যে তাঁহাতে প্রীতি না থাকিলে আমাদের কি দুর্দ্দশা হয়, কি অকিঞ্চিৎকর অসার বস্তুতে আমাদের প্রীতি আবদ্ধ থাকে—তখনই কেবল আমাদের প্রীতি তাঁহার অভিমুখী হয়, নতুবা আমাদের কি এমন শক্তি আছে যে আমরা তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করিতে পারি। তিনিই কৃপা করিয়া জগতে ও ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছেন।

তাঁহারই কৃপায় তাঁহার প্রিয় ভক্তবৃন্দ দ্বারা বাক্যরূপ আধারে সেই সত্য স্বরূপ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম জগতে আবির্ভূত হয় যাহাকে ধারণ করিয়া জীব কৃতার্থতা লাভ করে—তাহার জগতে আর প্রাপ্তব্য থাকে না।

ঈশ্বরবিষয়ে সংশয়াত্মাদিগের দুর্বুদ্ধি-শৃঙ্খলের কাঠিন্য পরিবর্দ্ধক জগতে যে ভীষণ ধর্ম্ম-বিবাদ সদর্পে পরিভ্রমণ করে তাহাকে নিবারণ করিবার যে আশ্চর্য্য শক্তি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে নিহিত আছে তাহা তাঁহারই প্রসাদাৎ। ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই শান্তস্বরূপ শান্ত ভাবে চিন্তা করিবার যথার্থ সময় অদ্যকার এই শুভ উৎসব-রাত্রি। সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই সত্য, জগদ্ব্যাপী ও জগদতীত পর-ব্রহ্মের স্বরূপ। যে জগতের আমরা অন্তর্ভূত—তাহা পরব্রহ্মেরই শক্তি। তিনি শক্তির শক্তি, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা। সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরু-পদ্রব, শান্তিস্বরূপ, একরস,—তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে সকল প্রকার অমঙ্গল বিবাদ বিসম্বাদ অন্তর্হিত হয়। জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ সেই ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সংসারের যাবতীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

"একভানু অযুত কিরণে উজলে যেমতি সকল ভুবন;
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম, জননী হৃদয়ে করে বসতি।"

সেই প্রকার মনুষ্যরূপ যে আধারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সেই আধারের স্বভাব-বৈচিত্র্য হেতু এই একই সত্য ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতিভাত হইতেছে। পরব্রহ্ম এইটি যাহার হৃদয়ে মুদ্রিত করেন তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। ব্রহ্ম যেরূপ নিরুপদ্রব, ব্রাহ্মের হৃদয়ও সেইরূপ নিরুপদ্রব। যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম, তিনি জানেন যে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমে-শ্বরের স্বরূপ মন ও বাক্যের অতীত, যেহেতু তাঁর নাম নাই, রূপ নাই এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন গুণই নাই। আমরা উপাসকবৃন্দ এই জানি যে তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বি-ভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং," আমরা জানি যে তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, আমরা জানি যে তিনি অখিলপিতা ও বিশ্বজননী—তাঁহারই অভয় আশ্রয় প্রার্থনায় তাঁহারই উপাসনা করি। তাঁহার রচিত এই চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত জগতের স্বরূপ অর্থাৎ জগৎ কি বস্তু ও জগতের পরিমাণ কি—ইহাই যখন নির্দ্ধারিত করিতে মনুষ্যের বুদ্ধি পরাজিত হয়, তখন যাঁহাকে এই অসীম অচিন্ত্য জগতের কর্ত্তা ও নির্ব্বাহ-কর্ত্তা বলিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার স্বরূপ কে নির্ণয় করিতে পারে। তবে তিনিই যে আমাদের মাতা; পিতা, বন্ধু, ও অন্তর-তম বস্তু তাহা তাঁহারই প্রসাদে আমরা বুঝিতে পারি।

এ বিষয়ে বিচারতঃ কেহই বিরোধী নাই। সর্ব্ব ধর্ম্মের লোকই যে ভাবেই হউক জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তার উপর বিশ্বাস করে। তাঁহার স্বরূপ সা-কার কি নিরাকার—এইরূপ বিষয় লইয়াই কেবল বিবাদ। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপে যখন পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ-জ্ঞান জন্মে তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের শুভ্র জ্যোতিতে সমুদায় বিবাদ ও অমঙ্গল বিলুপ্ত হইয়া যায়।

যখন এইরূপই হইল তখন ব্রাহ্মের সম্বন্ধে বিবাদ কোথায়? যদি কাহারো ব্যবহার বা উপাসনা কোন অংশে সত্যের সরলতার হানি করে বা বাহ্য আড়ম্বরে সত্যের জ্যোতিকে হীনপ্রভ করে তাহা হইলে ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য কি? তাহাতে কি

ব্রাহ্মধর্ম্মের নিরুপদ্রবতা ক্ষুণ্ণ হয়? কখনই না। আমরা যদ্যপি যথার্থ ব্রাহ্ম হই তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে অজ্ঞান-প্রসূত ভ্রমের একমাত্র জ্ঞানই নিবারক, যেমন আলোকের দ্বারাই অন্ধকার নিবারিত হয়; অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার যায় না——ইহা সর্ব্ব অবস্থায় ব্রাহ্মদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অপরের ভ্রম বা অসম্পূর্ণতায় বিবাদের স্থল না খুঁজিয়া চরমে উপাসনায় সাম্য আছে—এই বুঝিয়া সেই অপরকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করিয়া আত্মীয় করা উচিৎ। তাহা হইলে সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সেই সাধু উদ্দেশ্যকে আশীর্ব্বাদ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা না বুঝিয়া যখনই আমরা বিবাদ করি তখনই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে দূর হইয়া পড়ি, তখনই আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট ও ইষ্টচ্যুত হইয়া পড়ি। অতএব সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বজনের সহিত আত্মীয়ভাব রক্ষা করিয়া ব্যবহার ও পরমার্থ সাধন করাই আমাদের শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে মনুষ্যের আধিপত্য জগত হইতে আপনিই সরিয়া দাঁড়াইয়া সকলের হৃদয়ে পরমাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে ও জীব কৃতার্থ হইয়া তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয় এই প্রার্থনা করিলেন।

হে জ্যোতির জ্যোতি; আনন্দের প্রস্রবণ; তুমি আমার স্পর্শমণি, আঁধার ঘরের আলো; আজ প্রার্থনার পূর্ব্বেই তুমি কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছ। ইহাতে আমাদের প্রতি তোমার কি অনুপম স্নেহই প্রকাশ পাইতেছে।

নাথ! তোমার যে প্রকার করুণা, তাহার সমান কৃতজ্ঞতা—তাহার উপযুক্ত পূজা আমরা কোথায় পাইব? তথাপি লোকে জ্যোতির আধার সূর্য্যকে যে প্রকার ক্ষুদ্র প্রদীপ দিয়াও আরতি করে, আমরাও তেমনি আমাদের যাহা কিছু পূজোপহার আছে, আজ উৎসবের দিনে, তোমার চরণে উৎসর্গ করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ কর।

চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যে প্রকার তরঙ্গরূপ বাহুবিস্তার করে, আজ তোমাকে জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে উদিত দেখিয়া হৃদয় সেই প্রকার যেন সহস্র হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তোমার চরণে প্রীতিকুসুম উপহার দিতেছে, তুমি কৃপা করিয়া গ্রহণ কর—আমরা চরিতার্থ হই। নাথ! আজ যেমন আত্মায় আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে ব্রহ্মানন্দে আপ্লাবিত করিতেছ, এমনি চিরদিনই করিও। পরীক্ষায় জানিতেছি, এ আনন্দের তুলনা নাই। এ আনন্দ ভিন্ন প্রার্থনাও আর তোমার নিকট কিছুই নাই। এ আনন্দ লাভে যাহা কিছু বাধা বিঘ্ন তুমি তাহা দূর করিয়া দাও। এই উৎসব ক্ষেত্রে আত্মায় আবির্ভূত হইয়া তুমি বলিতেছ, আমি আধ্যাত্মিক কর্ণে শুনিতেছি "সংযত হও—পবিত্র হও—আমি যাহা দান করি বিধান করি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ কর" হে পরমেশ্বর, আমরা যেন তোমার এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে পারি। তাহা হইলেই আমাদের ব্রহ্মানন্দ স্থায়ী হইবে। হে জগৎগুরু! তুমি আমাদিগকে আত্মসংযম শিক্ষা দাও। তুমি এমন ব্রহ্মাস্ত্র দাও যাহার বলে পাপরূপ কালসর্পকে দগ্ধ করিতে পারি। তোমার বলেই আমাদের বল—তোমার বলেই আমাদের বীর্য্য—তোমার কৃপাই আমার

সর্ব্বস্ব! কৃপানাথ! তোমার প্রেমমুখ আমাকে এমন করিয়া দেখাও, যাহার প্রভাবে সংসারের কোন আকর্ষণ আমাকে ব্রহ্মানন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে না পারে। হে অখিল-বিধরণ! তুমি আমাকে স্বর্গীয় ধৈর্য্যরূপ অক্ষয় বর্ম্মে আচ্ছাদিত কর যাহাতে শোক তাপ—নিষ্ঠুরতা নির্যাতন ও বিঘ্ন বিপত্তির আঘাতে অবিচলিত ও অক্ষত থাকিতে পারি। তুমি আমাকে সুখে দুঃখে অটল রাখ। হে শান্তস্বরূপ, তুমি শান্তিরূপে আমার হৃদয়ে বিরাজ কর। তোমার স্পর্শ-সুখই আমার শান্তি; সে সুখে আমায় বঞ্চিত করিও না। আমি যেন নির্ভয়ে তোমাতে অবস্থিতি করিতে পারি। যেন তোমার সহিত যোগ-যুক্ত হইতে পারি। এই যোগপ্রভাবে জীবন থাকিতে থাকিতে যেন অমৃতভবনের আনন্দ ইহলোকেই আস্বাদন করিতে পারি। পরে যখন জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করিব, সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যখন প্রিয়জন ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, তখন, হে অভয়-দাতা, তুমি কৃপা করিয়া জ্যোতির্ম্ময় রূপে আমাকে দেখা দিও। হে পরমাত্মন্, যেন "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" বলিতে বলিতে আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। মরণান্তে তুমি আমাকে তোমার সেই শান্তি নিকেতনে স্থান দিও যেখানে রোগ শোক—পাপ তাপ বিবাদ বিসম্বাদ বিরহ-বিচ্ছেদ কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই। যেখানে যোগানন্দের উৎস—প্রেমানন্দের উৎস নিয়তই উৎসারিত হইতেছে। কৃপানাথ! দুঃখীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

থাক নাথ থাক মোর সাথে অনুক্ষণ।
পাপ তাপ রোগ শোকে মর্ত্ত্যলোকে তুমিই শরণ।
তব কৃপা অনুভবে, সুখ দ্বিগুণিত ভবে
দুখ মাঝে সুখদাতা করিয়ে স্মরণ।
থাক নাথ থাক মোর সাথে অনুক্ষণ।
অন্তরে বাহিরে অরি, রহে ঘিরি অরণ্য ভীষণ।
বিপদের কশাঘাত, দেখি তাহে তব হাত।
অকাতরে সহিব এ ভব নির্যাতন।
কেন নাথ কেন হল তব অদর্শন।
পাপের কালিমা মাখা, দেয় দেখা ঘন আবরণ।
উজ্জ্বল প্রকাশ প্রভু, দেখেও দেখি না কভু,
শুনেও শুনি না তব মধুর বচন।
থাক নাথ থাক মোর সাথে অনুক্ষণ।
দুর্ব্বল কাতর অতি, নাহি গতি বিনা দরশন।
অনুতাপ অশ্রুজলে, নিভাও হে পাপানলে,
ক্ষতহৃদে শান্তি সুধা কর বরিষণ।
থাক নাথ থাক মোর সাথে অনুক্ষণ।

দান প্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু ও বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার পাঠক মাত্রেরই সমাদরের সামগ্রী বিশ্বকোষ নামক বাঙ্গালা অভিধানখানি আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে প্রদান করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের প্রথমাবধি ৩৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। অভিধানে যাবতীয় সংস্কৃত বাঙ্গালা শব্দের অর্থ ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়, তথা আরব্য পারস্য হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ, তাহাদের অর্থ, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত, বৈদিক ও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতির প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের বিবরণ, বেদ পুরাণ তন্ত্র ব্যাকরণ অলঙ্কার জ্যোতিষ রসায়ণ ভূতত্ত্ব প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের ও নানা বিষয়ের সারাংশ সন্নিবেশিত থাকিবে। সম্পাদক যেরূপ প্রতিজ্ঞা ও সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা সম্যক্ রক্ষা ও সিদ্ধি বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন, কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। প্রত্যেক শব্দ সম্বন্ধে আবশ্যক স্থূল স্থূল কথা বিশদ প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দররূপে লিখিত হইতেছে। একাধারে এতগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংগ্রহ জন্য আপাতত এই অভিধানখানি বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলিতে হইবে।
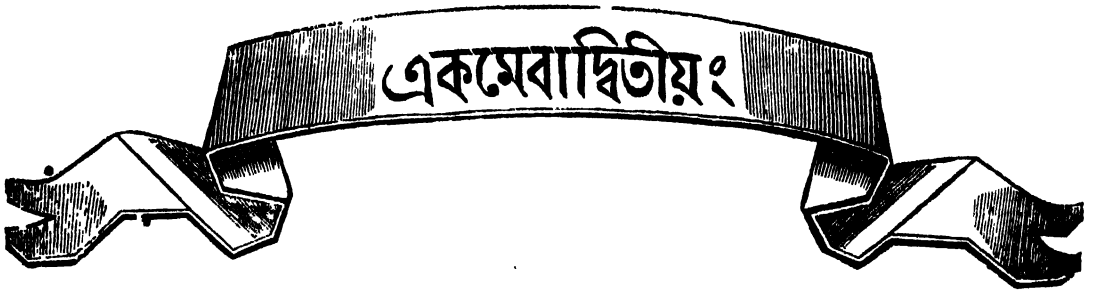
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

দ্বাদশ কল্প।

চতুর্থ ভাগ।

১৮১২ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৭। কলিগতাব্দ ৪৯৯১। ৩ চৈত্র।

মূল্য ৪ চারি টাকা মাত্র।

বৈশাখ ৫৬১ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ৫৬২ সংখ্যা

আষাঢ় ৫৬৩ সংখ্যা

শ্রাবণ ৫৬৪ সংখ্যা

ভাদ্র ৫৬৫ সংখ্যা

আশ্বিন ৫৬৬ সংখ্যা

কার্ত্তিক ৫৬৭ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ৫৬৮ সংখ্যা

পৌষ ৫৬৯ সংখ্যা

মাঘ ৫৭০ সংখ্যা

ফাল্গুন ৫৭১ সংখ্যা

চৈত্র ৫৭২ সংখ্যা

অকারাদি বর্ণক্রমে দ্বাদশ কল্পের চতুর্থ ভাগের সূচীপত্র

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্দ্ধমান সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১৮ই ফাল্গুন বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্ন লিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করেন।

হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার ও বিপ্লব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। যাহাতে লোকে সেই আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের পবিত্র সহবাসে আনন্দ উপলব্ধি করেন; যাহাতে রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন, এই সকলের উপায় করা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেবলমাত্র পরব্রহ্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা নহে, কিন্তু যাহাতে দেশে দেশে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়, এবিষয়ে ও চেষ্টা করা ব্রাহ্মসমাজের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয় উত্তমরূপে দেখিতে গেলে তিনটী বিষয় বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক দেখা আবশ্যক। সেই তিনটী বিষয় এই—(১) ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? (২) ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানই বা কি? এবং (৩) ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান প্রচার করিবার নিমিত্ত কিরূপ উপায় গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম দেখা যাউক যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? ব্রহ্মোপাসক যিনি তিনিই ব্রাহ্ম এবং সেই ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রহ্মকে যিনি পবিত্র স্বরূপ, মঙ্গলালয়, সত্যের আলয়-ভূমি, প্রেমের আকর প্রভৃতি রূপে বুঝিয়া সকল কর্ম্মে তাঁহারই সান্নিধ্য উপলব্ধি করেন; যিনি প্রত্যেক কর্ম্মে তাঁহাকেই সাক্ষী স্বরূপে জ্ঞাত থাকেন, তিনিই ব্রাহ্ম এবং সেই ব্রাহ্মদিগের যাহা সাধারণ ধর্ম্ম, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মদিগের সাধারণ ধর্ম্ম, নিরাকার অখণ্ডনীয় পরব্রহ্মের উপাসনা এবং এই উপাসনা কি প্রকার? না,

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। আমার বোধ হয় যে, যে কোন ব্যক্তি এই মতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন, তিনিই ব্রাহ্ম; কোন প্রকৃত ব্রাহ্মেরই এরূপ অধিকার নাই যে, তিনি উক্ত সাধু ব্যক্তিকে অব্রাহ্ম বলিতে পারেন। আমার অত্যন্ত

বিশ্বাস যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজই উক্তপ্রকার সাধুগণকে আত্মীয় বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।

যদি ব্রহ্মের উপাসক মাত্রেই ব্রাহ্ম হইতে পারিলেন, তবে যে কোন কোন হিন্দু বলেন যে "আমরা হিন্দু, উহাঁরা ব্রাহ্ম" বা কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন যে "আমরা হিন্দু নহি"—এই হিন্দু ব্রাহ্মে পার্থক্য আসিল কি প্রকারে? হিন্দু ধর্ম্মে কি নিরাকার অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনার কথা নাই? হিন্দুধর্ম্মে কি অপৌত্তলিক উপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।

"কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা"

(স্মার্ত্তধৃত শাতাতপ বচন)

কাষ্ঠ লোষ্ট্রেতে ঈশ্বরবোধ মূর্খেরা করে; পরমাত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানীরা করেন। যুক্ত অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির ইষ্টদেব যে আত্মাতেই আছেন; জ্ঞানী ব্যক্তির যে পরমাত্মাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দূরে গমন করিতে হয় না, আত্মার অভ্যন্তরে দেখিলেই হইতে পারে—এরূপ বিশুদ্ধ সুন্দর কথা হিন্দু শাস্ত্র অপেক্ষা আর কোন্ শাস্ত্রে অধিকতর পাওয়া যাইতে পারে? পূর্ব্বোক্ত কথা যে হিন্দুশাস্ত্রে আছে, সেই হিন্দুশাস্ত্রেই বলিতেছে—

"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারাও মনুষ্য অনায়াসে রাজা হইতে পারে। কি সুন্দর রূপে পৌত্তলিকতার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! আবার সেই হিন্দু শাস্ত্রেই অতি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে—

"সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলং"।

অষ্টাবক্র সংহিতা।

সাকারকে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরাকার পরব্রহ্মকে অচল সত্য জ্ঞান কর। ইহা অপেক্ষা নিরাকারবাদিত্বের প্রশংসা আর কত স্পষ্ট হইতে পারে? যে শ্রীমদ্ভাগবত হিন্দুজাতির পরম পূজনীয়, সেই শ্রীমদ্ভাগবতে কি বলিয়াছেন?

"মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥"

যে সমস্ত মূঢ় মনুষ্য মৃত্তিকা প্রস্তর তথা সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত বিগ্রহে ঈশ্বরজ্ঞান করে, তাহারা ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। পরম শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যদি শ্রীমদ্ভাগবতকে সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য হয়; যদি সংহিতাগুলিকে হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া গণ্য করিতে হয়; যদি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যাস প্রভৃতি মুনিঋষিগণকে হৃদয়ের প্রীতি অর্পণ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে কোন্ জ্ঞানী হিন্দু নিরাকার অখণ্ডনীয় ব্রহ্মের পূজা না করিবেন? এই ব্রহ্মজ্ঞানই হিন্দুধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয় এবং ইহাই হিন্দুধর্ম্মের গৌরব। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বলিতেছে যে, যে যত বড় জ্ঞানী হউন না কেন, তাঁহাকে মনুষ্যপূজা করিতেই হইবে।* ইহার মতে কোন ব্যক্তি, সহস্র ধার্ম্মিক হইলেও, স্বয়ং যিশু খৃষ্টের ইষ্টদেবতা ঈশ্বরকে আরাধনা করিলেও, যিশু খৃষ্টকে প্রেরিত পুত্ররূপে বিশ্বাস না করিলেই, তিনি অনন্তকালের

* He that believeth on the Son hath everlasting life; and he that believeth not the Son, shall not see life; but the wrath of God abideth on him." (St. John III, 36.)

যে ব্যক্তি যিশু খৃষ্টে বিশ্বাস করিবে, তাঁহারই অনন্ত জীবন এবং যে ব্যক্তি যিশু খৃষ্টে বিশ্বাস করিবে না, সে জীবনের আলোক দেখিতে পাইবে না, প্রত্যুত ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নি তাহার উপরে নিপতিত আছে।

জন্য নরকবাসী হইবেন! এক কথায় খৃষ্টব্যতিরেকে খৃষ্টীয় ধৰ্ম্ম থাকিতে পারে না। সেইরূপ মহম্মদ, কোরাণ প্রভৃতিকে পশ্চাতে রাখিলে মহম্মদীয় ধৰ্ম্মও তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের ইহাই গৌরব, হিন্দুজাতির ইহাই সৌভাগ্য যে, অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মে বস্তু-বিশেষের অর্চ্চনা শ্রেষ্ঠরূপে উক্ত না হইয়া ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠরূপে উক্ত হইয়াছে। সনাতন হিন্দুধৰ্ম্ম যখন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে থাকেন যে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, তখন কোন্ দেশীয়, কোন্ জাতীয় ধৰ্ম্মপরায়ণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি কোন্ কালে শান্তি লাভ করিতে না পারেন? অধিক আর কি কহিব—স্বয়ং বেদ. ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর উপাসনা নিষেধ করিয়াছেন।

"আত্মৈবেদং নিত্যাদোপাসনং স্যাৎ নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসীত ধীরঃ।"

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পরমাত্মারই উপাসনা করিবেক, আর কোন কিছুরই উপাসনা করিবেক না। এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিগণ অরণ্যবাসী থাকিয়া, বহু কৃচ্ছ্র সাধনে শত শত বৎসরের ধ্যানের বলে লাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মদিগকে অহিন্দু এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে কোন এক অহিন্দু বিজাতীয় ধৰ্ম্ম ভাবিয়া ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন, আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, হিন্দুধৰ্ম্মও ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ কোথায়, কোন্ বিশেষ বিষয়ে উক্ত দুই ধর্ম্মের পার্থক্য, তাহা তাঁহারা চক্ষু খুলিয়া স্পষ্টরূপে দেখেন নাই—তাঁহারা কেবল অন্ধবিশ্বাসের বশবৰ্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা যদি একটুকু অনুধাবন পূর্ব্বক দেখেন; তাঁহারা যদি পরবুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া একটুকুও আত্মবুদ্ধির পরিচালনা করেন, তবেই দেখিতে পাইবেন যে, প্রকৃত যাহা হিন্দুধৰ্ম্ম, তাহাই সনাতন ধৰ্ম্ম—তাহাই ব্রাহ্মধৰ্ম্ম; কেবল পরিচ্ছদ বিভিন্ন। পূর্ব্বকালে যখন সনাতন ধৰ্ম্ম অরণ্যে মুনিঋষিগণের সহিত বাস করিতেন, তখন তিনি মুনিঋষিগণের বল্কলের ন্যায় আরণ্যক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন; আবার যখন সেই সনাতন ধৰ্ম্ম অরণ্য হইতে সংসারে আনীত হইলেন, তখন তিনি আরণ্যক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। এই সাংসারিক বেশধারী সনাতন হিন্দুধৰ্ম্মই ব্রাহ্মধৰ্ম্ম। ইহাও নূতন নহে; মহর্ষি মনু প্রভৃতি এই আরণ্যক ধৰ্ম্মকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥
বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা।
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্ব্বৃত্তিমক্ষয়াং॥
জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা॥

মনুসংহিতা।

কতিপয় যজ্ঞীয় শাস্ত্রবেত্তা গৃহস্থ এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের বাহ্যাড়ম্বর না করিয়া স্বীয় বুদ্ধীন্দ্রিয়েতেই জ্ঞানাদির সংযমন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ব্রহ্মবেত্তা কতিপয় গৃহস্থ বাক্যে ও প্রাণবায়ুতেই যজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ হয় জানিয়া সর্ব্বদাই অধ্যাপন, ঈশ্বরের মহিমা গানাদি বাক্যে প্রাণ ও ধ্যান ধারণাদি প্রাণে বাক্য হোম করেন। অপর কতিপয় ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা উপনিষদ রূপ জ্ঞান-চক্ষু সহকারে দেখিতে

পান যে জ্ঞানই এই সকল যজ্ঞের মূল কারণ।

এতক্ষণে প্রতিপন্ন করা হইল যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম; তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর হিন্দদিগের সেরূপ মমত্ব নাই কেন? কারণ অবশ্যই আছে। একটী কারণ আপাততঃ দেখিতে পাই—যাহা অনেকেই গুরুতর বলিয়া ধরিতে পারেন—তাহা এই যে আমরা বেদকে মানি কি না। পূর্ব্বতন ঋষিগণ বেদকে যেরূপ ভাবে যেরূপ চক্ষে দেখিতেন, আমরাও তাহা অপেক্ষা কিছু কম বা কিছু বেশী চক্ষে দেখিতে পারি না। কেহ যেন না ভাবেন যে ঋষিগণ ব্রহ্মবিদ্যাকে বেদ অপেক্ষা নিম্ন আসন প্রদান করিয়াছিলেন। মুণ্ডক ঋষি বলিতেছেন যে "অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো হথর্ব্ববেদঃ"—ঋগ্বেদ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যজুর্ব্বেদ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সামবেদ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, অথর্ব্ববেদ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা—চতুর্ব্বেদই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা; তবে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কি? না, "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানা যায়। ইহাইত ঋষিজনোচিত বাক্য। যখন ব্রহ্মবিদ্যাই লাভ করিলাম; যখন কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিলাম, তখন আমার আর কিসের আবশ্যক? তখন আমার বেদে আবশ্যক নাই; সংহিতায় আবশ্যক নাই—অন্য কিছুতেই আবশ্যক নাই; আবশ্যক কেবল যেখানে ব্রহ্মবিদ্যা—যেখানে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান লাভ করিব। পুণ্যকথা ভগবদ্গীতা ও বলিতেছেন যে—

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥"

চতুর্দ্দিক জলপ্লাবিত হইলে পর কূপ প্রভৃতিতে যেরূপ কোনই প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ জ্ঞানী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদেও কোন প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মবিদ্যাই আমাদের আদরের ধন। এই ব্রহ্মবিদ্যা যে সকল ঋষি আমাদের পৈতৃক সম্পত্তিরূপে রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যদি আপনাদিগকে সেই আর্য্য ঋষিদিগের বংশোৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি, আমরা যদি আপনাদিগের মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি; আমরা যদি আপনাদিগের মোহান্ধতা ও মূর্খতা জ্ঞাপন করিতে না চাই, তবে এরূপ রত্ন পাইয়া তাহা দূরে পরিত্যাগ করা আমাদিগের কি কর্ত্তব্য?

এখন দেখিলাম ব্রাহ্মধর্ম্ম ও প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে বেদ সম্বন্ধে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নাই। এরূপ গুরুতর স্থলেও যদি উভয়ের একতা রহিল, তবে হিন্দুগণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আত্মীয়তা প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ কেন? কোন কোন উদারচেতা হিন্দু বলেন যে ধর্ম্মে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই কিন্তু অনুষ্ঠানের বিভিন্নতাই এই বিচ্ছেদের কারণ। দেখা যাউক যে একথার মূল কতদূর সঙ্গত। সাধারণ্যে হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত, আমরাও প্রায় তাহার সকলগুলিই গ্রহণ করিয়াছি। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রধানতম অনুষ্ঠান বিবাহ হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় দিক্ হইতে দেখা যাউক্, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান কি?

সাধারণ চলিত হিন্দুবিবাহ কি? না, অগ্নি সাক্ষী করিয়া পাণি গ্রহণাদি ব্যাপারই হিন্দুবিবাহ। হিন্দুজাতি ধর্ম্মের মর্য্যাদা উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন; এই

জন্য তাঁহাদিগের সকল কর্ম্মেই ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিবাহ কর্ম্মের ও প্রত্যেক অংশেই ধর্ম্মভাব বিদ্যমান আছে—প্রত্যেক অংশেই প্রথমে প্রণব উচ্চারণের দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা পরব্রহ্মকে স্মরণ করিতে হয়; এবং ইহাতেই কি বুঝা যাইতেছে না যে পূর্ব্বকালে নিরাকার চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে সাক্ষী রাখিলেই বিবাহ সিদ্ধ হইত? কিন্তু ক্রমে যখন হিন্দুগণ কর্ম্মকাণ্ডের প্রাবল্যে পরব্রহ্ম হইতে দূরে যাইতে লাগিল, ততই অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতা আসিয়া যুটিতে লাগিল—ততই ঈশ্বরের স্থান, তাঁহারই গুণের কল্পিত মূর্ত্তি আসিয়া অধিকার করিতে লাগিল। পরে হিন্দুজাতি ঈশ্বর হইতে এত দূরে গমন করিল, যে, আর প্রস্তরাদি জড়বস্তুকেও ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না—যে জড়পূজা আমাদিগের শাস্ত্রে শতবার নিষিদ্ধ হইয়াছে। আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্রে আছে "একে আচার্য্যা কামপ্যাহুতিং নেচ্ছন্তি।" কোন কোন আচার্য্যেরা বিবাহে কোন প্রকার আহুতি ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ বিবাহকালে অগ্নিসাক্ষী রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কেন? কারণ বিবাহকালে হোমের ফল মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন মাত্র, যথা উদ্বাহতত্ত্বে—

> "মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞস্তাসাং প্রজাপতেঃ। প্রযুজ্যতে বিবাহেযু ইত্যাদি মনুবচনং। স্বস্ত্যয়নং কুশলেন কালাতিবাহহেতুকং। .. ... যশ্চ প্রজাপতিদৈবতো বৈবাহিকো হোমস্তৎ সর্ব্বং মঙ্গলার্থং। অভিমতার্থসিদ্ধির্ম্মঙ্গলং তদর্থমবৈধব্যার্থমিতি যাবৎ।"

ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রজাপতি দৈবত বৈবাহিক হোম করিলে অবৈধব্য অর্থ সিদ্ধ হয়। এই মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা—তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা দ্বারা সিদ্ধ করেন। যেমন হরিদ্রা ম্রক্ষণ, উলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্য প্রভৃতি বিবাহে মঙ্গলজনক, সেইরূপ হোমও যদি বিবাহ সম্পাদক না হইয়া মঙ্গলজনক মাত্র হইল তখন ইহা না করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হইবার কোনই বিষয় নাই। পূর্ব্বকালের আচার্য্যগণ যদি বিবাহে অগ্নিস্থাপন না করিয়া দোষের ভাগী না হইলেন তবে, ইদানীন্তন কালে ব্রহ্মোপাসক হিন্দুগণ তাঁহাদিগের বিবাহপদ্ধতি হইতে হোম উঠাইয়া দিয়া কি-এমন কুকার্য্য করিয়াছেন? পৌত্তলিক হিন্দুগণ যে অগ্নিশক্তিকে বিবাহের সাক্ষী রাখেন, অপৌত্তলিক হিন্দুগণ ঠিক্ সেই স্থানে সেই অগ্নিশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরব্রহ্মকে স্থাপন করেন—ইহা দোষের বিষয়, না, বঙ্গদেশে প্রথম অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান হইয়াছে বলিয়া বঙ্গদেশের এবং সমুদয় ভারতের গৌরবের বিষয়?

ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে কেবল বিবাহ কর্ম্মে নহে, জাতকর্ম্ম হইতে শ্রাদ্ধ অবধি সকল অনুষ্ঠানেই পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া প্রকৃত হিন্দুভাব রক্ষিত হইয়াছে।

এখন দেখিলাম যে অনুষ্ঠান বিষয়েও হিন্দুব্রাহ্মের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব আসিতে পারে না। তবে এবিদ্বেষ আসিল কোথা হতে? যদি পরস্পরের ধর্ম্মে বিভিন্নতা নাই, যদি পরস্পরের অনুষ্ঠানে বিভিন্নতা নাই, তবে এরূপ বিষম মনোমালিন্য আসিল কোথা হতে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনটী বিষয়ের বিশেষরূপ আলোচনা করিলে এবিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে—(১) ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? (২) ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান কি এবং (৩) প্রচারের কিরূপ উপায় গৃহীত হইয়াছে। যখন দেখিলাম যে ব্রাহ্মধর্ম্ম

ও অপৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম একই; ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান ও অপৌত্তলিক হিন্দু অনুষ্ঠান একই, তখন বোধ হয় যে প্রচারেই বিরোধের কারণ বর্ত্তমান।

এইবারে তবে দেখা যাউক যে প্রচারের জন্য কিরূপ উপায় হইতে পারে এবং কিরূপ উপায় গৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার দুই প্রকার উপায়ে হইতে পারে (১) সংস্কার (২) বিপ্লব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে কোন সংস্কার করিতে গেলেই বিপ্লবের ধুয়া দেখা দেয়, তাহা সুপ্রসিদ্ধ ফরাশি বিপ্লবের পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যখন কোন একটী জাতি, সমাজ বা ধর্ম্মসম্প্রদায় কোন প্রবল বলের দ্বারা প্রপীড়িত হইতে হইতে আর সহ্য করিতে না পারে, তখনই বিপ্লবাগ্নির ধূমশিখা আবির্ভূত হয় এবং এই বিপ্লবই পীড়িত জাতির নিগূঢ় বলের পরিচায়ক। রাজার অত্যাচারে নিষ্পেষিত ফরাশি প্রজাগণ বিপ্লব বাধাইয়া দিল। বাহাদুর খাঁর অত্যাচারে নানকপন্থীগণ ধর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিল। পৌত্তলিকতার আনুষঙ্গিক ভয়াবহ অত্যাচারে হিন্দুজাতির আত্মা নিপীড়িত হওয়াতে শুভক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ মধুর শান্তি বার্ত্তা বহন করিয়া নয়নের সম্মুখে আবির্ভূত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যদিও সাময়িক ভাবের বিপ্লবের ফল বটে, কিন্তু পুরাকালীন হিন্দুধর্ম্মের সংস্ক্রিয়া মাত্র। এবং এই জন্য ইহার প্রচার কার্য্য বিপ্লবের উপরে বদ্ধভিত্তি না করিয়া সংস্কারের উপরে করা কর্ত্তব্য। হিন্দুজাতির বন্ধন এমনি কঠোরকোমল যে তাহাদিগের মধ্যে বিপ্লবের ভয়াবহ অনিষ্ট সকল আসিতে পারিবে না, কিন্তু সংস্কারের কার্য্য সকল সহজেই নিষ্পন্ন হইয়া যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বিপ্লব আনয়নেরই বা কি ফল? ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা প্রার্থনা করেন তাহা হিন্দুধর্ম্মে আছে—জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশ এই যে "প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম অনুধাবন পূর্ব্বক দেখ যদি তাহাতে কিছু মালিন্য ঘটিয়া থাকে, তবে তাহাই দূর কর—দেখিবে যে, যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। বিপ্লবের ফল নাশ এবং তাহাই সহজ কিন্তু সংস্কারের ফল জীবনদান এবং তাহাই কঠিন। যেমন কোন একটী বাটীর কতক অংশ অব্যবহার্য্য হইলে তাহারই সংশোধন আবশ্যক, এবং সেই অব্যবহার্য্য অংশ ও এমনরূপে সংশোধন করা উচিত নহে, যাহাতে সেই সংশোধনের চোটে সমস্তবাটী অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইলে, সেই ক্ষতস্থানেই অস্ত্রাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, অন্য স্থানে নহে এবং সেই ক্ষতস্থানেও এরূপ ভাবে অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত শরীর নাশের সম্ভাবনা না আসিয়া পড়ে। হিন্দুধর্ম্মের সেইরূপ সংস্কার আবশ্যক; প্রকৃত হিন্দ ধর্ম্মের উপর যে মালিন্যস্তর পড়িয়াছে, তাহাই অপসারণ করা ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য; হিন্দু আচার ব্যবহারে হিন্দু অনুষ্ঠানে যে সকল পৌত্তলিকতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল পৌত্তলিকতা দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অপৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠিত করেন কিন্তু এই সংস্কার ক্রিয়াও এরূপ সাবধানে করিতে হইবে যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে, হিন্দু অনুষ্ঠানের অন্তরে আঘাত না পড়ে—তাহা হইলে গৃহবিচ্ছেদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। ব্রাহ্মদিগের প্রচার, অনুষ্ঠান প্রভৃতি যদি এরূপ ভাবে হয় যে হিন্দুরা তাহা অহিন্দু ভাবিতে পারে,

তাহা হইলে কি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার সহজ হইবে? ব্রাহ্মেরা যেন না ভাবেন যে বিপ্লব বাধাইয়া হিন্দুসমাজ উদ্ধার করিবেন। তাঁহারা যদি হিন্দুজাতির ও হিন্দু-ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে হিন্দুধর্ম্মের বিপ্লবে নাশের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত হিন্দুধর্ম্ম বৈপ্লবিক ভাবের মধ্যগত সারভাগ গ্রহণ করিয়া বিপ্লবকারীগণকে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ—বৌদ্ধধর্ম্মের সার অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সাঙ্গ বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। "হিন্দুধর্ম্ম হাতীর মত। ইহার গাত্র মশার ন্যায় অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আক্রমণ করে, কিন্তু একবার গাঝাড়া দিলেই কে কোথায় উড়িয়া যায়।'

ইতিপূর্ব্বে আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানের বিষয় বলিবার সময় সংস্কারের দৃষ্টান্ত দিয়াছি; এইবারে বিপ্লব সম্বন্ধে আরও দুএকটী কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব্বে কলিকাতা রাজধানীতে আদি-ব্রাহ্মসমাজই একমাত্র ব্রাহ্মসমাজ ছিল। পরে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় অনেক অত্যুৎসাহী অত্যুদ্যমী ব্রাহ্ম কর্ত্তব্যবোধে আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন সমাজ স্থাপনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ দেশেতে যতই স্থাপনা হয়, ততই মঙ্গল; কিন্তু কেবল ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হইলেই হইল না—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হওয়া আবশ্যক। এই তদানীন্তন মতভেদের একটী কারণ জাতিভেদ। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই বস্তুতঃ জাতিভেদ স্বীকার করে না—প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মও তাহা করে না। "ঋগ্বেদে জাতিভেদের উল্লেখ নাই। মহাভারতে আছে

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥

এই ব্রহ্মময় জগতে বর্ণের বিশেষ নাই। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্য সকল কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

মনু বলেন—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈবচ॥

শূদ্র ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানের বিষয়েও এই প্রকার জানিবে।

মহাভরতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত আজগর পর্ব্বাধ্যায়ে আছে—

সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতিঃ॥
শূদ্রেতু যত্তবেল্লক্ষ্যং দ্বিজেতচ্চ ন বিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো নচ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈবং ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংস্য, তপস্যা, দয়া এই সকল গুণ যাঁহাতে দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হয়েন। শূদ্রেতে যে সকল লক্ষণ, ব্রাহ্মণে সে সকল বিদ্যমান নাই। লোকে শূদ্র হইলেই শূদ্র হয় না, ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ হয় না। হে সর্প! যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত হয়েন। হে সর্প! যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ বিদ্যমান না থাকে তিনি শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশিতব্য।

এখন দেখা গেল যে জাতিভেদ বলিয়া একটা বাস্তবিক কোন পদার্থ হিন্দুরা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু এখন কার্য্যতঃ জাতিভেদ হিন্দুজাতির মজ্জায় মজ্জায়

প্রবেশ করিয়াছে। কেবল হিন্দুজাতির মধ্যে কেন—সকল জাতির মধ্যেই জাতি-ভেদ আছে; তবে হিন্দুদিগের জাতিভেদ শুদ্ধাচার নিকৃষ্টাচার, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, গুণ অগুণের উপর নির্ভর করে; অন্যান্য জাতির জাতিভেদ অর্থ ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। হিন্দুজাতির ব্রহ্মজ্ঞানী শুদ্ধ-চারীদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই, তাহার প্রমাণ পরমহংস, ব্রহ্মচারী; ইহাঁদিগের জাতির অনুসন্ধান কে কবে লইতে গিয়াছে—কিন্তু ইহাঁরা তো সমস্ত হিন্দুজাতির পূজনীয়? এই সকল বিষয় লইয়া একটা বৃথা সমাজ-বিপ্লব বাধান কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা জাতিভেদ তুলিয়া দেওয়া একটী প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, ঈশ্বর আমাদি-গের পিতা, আমরা তাঁহার সন্তান এই কারণে যদি সকলের একজাতি হওয়া আবশ্যক হয়, তবে সেই এক কারণেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাষাও এক হওয়া উচিত না হয় কেন? আফ্রিকার সাহারাবাসীগণ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দারুণ উত্তাপ সহ্য করে এবং লাপ্‌লাণ্ডবাসীগণ সুমেরু বৃত্তের দারুণ শীতভোগ করে। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আমরা এক পিতার সন্তান এবং সন্তানগণের বাসস্থানের এরূপ প্রভেদ আছে বলিয়া, কি, সেই পিতার নিকট সকল সন্তানের বাসস্থান এক ঋতুবিশিষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য?—বাতুলতাই এরূপ প্রার্থনা করিতে পারে। ভাষা বিভিন্ন হইলেও যদি কোন ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হইতে পারেন; যদি তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে পারেন—যদি তিনি ভাই বলিয়া আলিঙ্গিত হইতে পারেন, তবে জাতি বিভিন্ন হইলেও কোন ব্যক্তি কেন না ব্রহ্মোপাসক হইতে পারিবেন—কেননা তাঁহাকেও ভাই বলিয়া আলিঙ্গন প্রদান করিব? অন্তরে সকলকে প্রীতি কর—সকলকে ভাই বলিয়া ডাক; কিন্তু বহিশ্চিহ্ন লইয়া এত মারামারির আবশ্যক কি? জগতের সকল ভাষার একীকরণ যেরূপ ভাষা-বিজ্ঞানের উপর অর্পিত আছে, সেইরূপ জগতের সকল জাতির একীকরণ সমাজ বিজ্ঞানের উপর অর্পিত হউক। ভাষাভেদ উঠান যেরূপ ব্রাহ্মদিগের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, জাতিভেদ উঠানও সেই-রূপ কোন প্রকারেই প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত করিতে পারা যায় না। ব্রাহ্ম-দিগের প্রথম কর্ত্তব্য ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ প্রচার করা। ব্রাহ্মদিগের প্রথম কর্ত্তব্য পৌত্ত-লিকতা দূর করা; সমাজ সংস্কার করা প্রথম কর্ত্তব্য নহে। তবে অবশ্য স্বীকার করি যে ব্রহ্মকে মূল করিয়া আনুষঙ্গিক সকল কর্ম্মেই হস্তক্ষেপ করিতে হইবে—কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে এই সকল আনুসঙ্গিক ব্যাপার দেশ কালপাত্র বুঝিয়া করিতে হইবে; এই সকল Secondary Duties লইয়া সমাজবিপ্লব বাধান—ধর্ম্মপ্রচারের পথে ব্যাঘাত আনয়ন করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে। পূজ্যপাদ মহর্ষি ব্রাহ্মদিগের কোন প্রতিনিধি সমাজে বলিয়াছিলেন—"যদি যশের জন্য লক্ষ্য হয়, ঐতিহাসিক নামের জন্য লক্ষ্য হয়; পাছে অন্য কেহ কুসংস্কার অরণ্যে প্রথম অস্ত্র নিক্ষেপ করে, এই জন্য যদি ব্যস্ত হইয়া সমাজকে বিপ্লব করিতে যাও, তবে বিপরীত ফল দর্শিবে; কুসংস্কার উন্মূলন বিষয়ে সময় সংকোচ করিতে গিয়া সময়ের ব্যবধান আরও অ-ধিক হইবে।"

যাঁহারা একটী বিপ্লব সমাজ মধ্যে আন-য়ন করিলেন; তাঁহাদিগকে সেই একটী

বিপ্লবের খাতিরে আর একটী বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান আনিতে হইল—তাহা আদালতী বিবাহ (Civil marriage) এই আদালতী বিবাহকে আদি ব্রাহ্মসমাজ নিরীশ্বর বিবাহ বলিয়া মনে করেন। যদি কেহ বলেন যে registration এর সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই হইল—আমি বলি তাহা নহে। বিবাহ মনুষ্য জীবনের একটী ধর্ম্মসঙ্গত প্রধান ঘটনা। ইহাতে ধর্ম্মের প্রাধান্য আবশ্যক; কিন্তু Civil marriage এ ধর্ম্মের প্রাধান্য—ঈশ্বরের রাজত্ব থাকা অসম্ভব। পৌত্তলিক হিন্দু বিবাহে যেমন অগ্নি—ঈশ্বরের কল্পিত মূর্ত্তি সাক্ষী থাকে সেই রূপ অপৌত্তলিক হিন্দু বিবাহে সাক্ষী স্বয়ং প্রজাপতি। কিন্তু যিনি আদালতী বিবাহ করিবেন, তিনি কি বলিবেন? তিনি কি বলিবেন না যে, তাঁহার বিবাহ গুটি দুই লোকের সম্মুখে registered হইলেই সিদ্ধ হইল—তাহাতে ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখা হউক বা না হউক; ইহাতে ঈশ্বরকে আইনের পশ্চাতে রাখা ব্যতীত আর কি করা হইতেছে? ভারতের সৌভাগ্য যে নিতান্ত নিরীশ্বর বিবাহ অতি অল্প লোকেই করিয়াছেন। ভাবিতে শরীর অবসন্ন হইয়া যায়, হৃদয় মৃতপ্রায় হয়, আত্মা শুষ্ক ও মলিন হইয়া আসে, যে, যে ভারতভূমি একদা কেবলমাত্র ধর্ম্মের জন্য জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন, এবং এখনও অনেক পরিমাণে রহিয়াছেন, সেই ভারতভূমিতে আজ ঈশ্বরের নামগন্ধশূন্য নিতান্ত নিরীশ্বর বিবাহ হইতে পারে! ইহাই হিন্দুধর্ম্মে বিপ্লব আনয়নের চরম ফল! বৈপ্লবিক সংস্কার করিতে গিয়া গরল উৎপন্ন হইল! যে হিন্দুজাতির প্রতি কর্ম্ম ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত, সেই হিন্দুজাতি কি প্রকারে সহজে নিরীশ্বর বিবাহকে অবলম্বন করিবে? সংস্কার বিষয়ে সময়ের সংকোচ করিতে গিয়া কি সময়ের ব্যবধান অধিকতর হইল না? যাঁহারা অজ্ঞাতকুলশীল বৈপ্লবিক ভাবের অর্থাৎ সমাজের অন্তরস্থিত ভাবের প্রতি মনোযোগ না করিয়া সমাজের হৃদ্গত ভাব পরিত্যাগ করিয়া, বহিঃস্থিত ভাবের অধিক পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, যদি গৃহে উত্তম চাউলের সহিত কিঞ্চিৎ কর্দ্দম মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে কি সেই কর্দ্দম পরিষ্কার করিতে হইবে বলিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা হইতে চাউল আমদানী করিব? সাধারণ হিন্দু একেশ্বরবাদীদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজ এই নিরীশ্বর বিবাহের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহর্ষির ভবিষ্যদ্দৃষ্টিকে ধন্য যে তিনি এই নিরীশ্বর বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ রূপে বিধিবদ্ধ করিবার বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং ইহা ঈশ্বরেরই করুণা যে তিনি এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যে অসাধারণ বাগ্মীপ্রবর স্বীয় বাগ্মিতায় সভাস্থ সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, এবং যিনি প্রথম এই নিরীশ্বর বিবাহ ভ্রমক্রমে প্রবর্ত্তিত করিলেন, সেই স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন জীবনের শেষ অবস্থায় বলিয়া গেলেন যে ভারতবাসীদিগের পক্ষে উক্ত বিবাহ অনুপযুক্ত! তিনি বলেন "The act passed for the benefit of Brahmos in 1872 (Act III) discards the very name of God and tends to promote godless civil marriages for which India is not ripe.... Marriages of a godless and atheistic character ought to find no encouragement." অর্থাৎ ব্রাহ্মগণের উপকারের জন্য যে ১৮৭২ সালের ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের নাম একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে; ইহাতে নিরীশ্বর ও অধর্ম্ম্য বিবাহ প্রশ্রয়

পাইবে, ভারতবর্ষ এরূপ বিবাহ (প্রবর্ত্তন) জন্য প্রস্তুত নহেন। ... নিরীশ্বর ও নাস্তিক্ ভাবের বিবাহে উৎসাহ দেওয়া কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ চিরকাল হইতেই বিপ্লব মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সংস্কার মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছেন এবং অগত্যা তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারে বৈপ্লবিক উন্মত্ততা নাই। আদি সমাজ মনে করেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্থাৎ Theism যেমন বিশ্বজনীন ধর্ম্ম আবার তেমনি হিন্দুধর্ম্মেরই সংস্কৃত আকার; সুতরাং আদি সমাজের প্রচার কার্য্যও হিন্দুপ্রণালীতে হইয়া থাকে। ব্রাহ্মগণ যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মত আলোচনা করিয়া থাকেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন যে আদি সমাজ কি মন্ত্র অনুসারে চলেন। রামমোহন রায় তাঁহার "অনুষ্ঠানে" দশম প্রশ্নের উত্তরে বলেন "শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়, অতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে করে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়, আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রত ও যুক্তিত উভয়থা বিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরি প্রয়োগ আছে। যুক্তিতে ও দেখ, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন না করিয়া আহার ও ব্যবহার আপন আপন ইচ্ছামতে করেন তবে লোকনির্ব্বাহ অতি অল্পকালেই উচ্ছন্ন হয়, কেননা খাদ্যাখাদ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও গম্যাগম্য ইত্যাদির কোন নিয়ম তাঁহাদের নিকটে নাই, কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার নির্দ্দোষ হইবার প্রতি কারণ হয়, ইচ্ছাও সর্ব্বজনের একপ্রকার নহে, সুতরাং পরস্পর-বিরোধী নানাপ্রকার ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইলে কলহের সম্ভাবনা এবং পুনঃ পুনঃ পরস্পর কলহ দ্বারা লোকের বিনাশ শীঘ্র হইতে পারে।' আবার আদি সমাজে হিন্দু প্রণালী অবলম্বিত হওয়াতে যে কেশব বাবু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন, সেই কেশব বাবুকে বলিতে হইল যে "Brahmoism is the legitimate result of the higher teachings of the Vedas." অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ডের স্বাভাবিক ফল ব্রাহ্মধর্ম্ম। তাঁহাকে আর ও বলিতে হইল "It is extreemely desirable to have a national Church based upon the religious tastes, religious institutions, and, if possible, the religious *traditions* of a nation. Any attempt in this direction is welcome. It centralises truth, makes it successful and accessible to all, and adds to it the many sidedness of human nature. Religion is either adulterated by foreign elements or dissipated and washed out in abstraction if it is not dammed up by the peculiar bound aries of national thought and predilection." ইহার ভাবার্থ এই যে দেশীয় ভাবের দ্বারাই প্রচার করা কর্ত্তব্য এবং বিজাতীয় ভাব কোন মতেই প্রবেশ করান কর্ত্তব্য নহে। আদি সমাজের মত অতি স্পষ্টরূপে তাঁহার দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে, যখন তিনি বলেন যে "We need go to other countries for dress, for civilization, but we need not necessarily do so for truth. If we can get the nectar of truth by churning the ocean of Hindoo shastra, then not only we ourselves will drink that nectar but bless our own sons and grandsons as well as other families in the country with draughtos of the same." ইহার ভাবার্থ এই যে আমাদিগকে অন্যদেশের নিকটে অন্য যে কোন বিষয়ের জন্য যাইতে হউক কিন্তু (পারমার্থিক) সত্যের জন্য আর বিদেশে যাইতে হইবে না। তিনি যদি ইহা একটু আগে বুঝিতেন, তাহা হইলে কি আজ ব্রাহ্মসমাজের এরূপ দুরবস্থা হইত? তাহা হইলে কি পিতা পুত্রের মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের বিচ্ছেদ উপস্থিত হইত?

এখন বোধ হয় সকলে বুঝিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মন্তব্য কথা কি?—"ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মন্তব্য কথা এই যে, যে জাতির যেরূপ তজ্জাতীয় প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কেবল সেই সকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা সমূলে উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা অধিরূঢ় হউক, তাহা হইলেই ব্রহ্মোপাসক ভক্তজনগণের বিশুদ্ধ ধর্ম্মব্রত অব্যাহত থাকিবে।"

পরিশেষে কৃতবিদ্য হিন্দুসন্তানগণকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা এবং সুতরাং অপৌত্তলিক হিন্দু অনুষ্ঠান আচরণ করা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম জানিয়াও কেন বৃথা আত্মাকে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ করিয়া রাখেন? আলোক দেখিয়াও আলোকের সাহায্য গ্রহণ করেন না কেন? এবং ব্রাহ্ম সাধারণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা আর হিন্দুধর্ম্মে বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা না করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের মধ্য দিয়া, হিন্দু অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া, হিন্দু ব্যবহারের মধ্য দিয়া এবং হিন্দুভাবের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রয়াসবান্ হউন, অচিরেই তাহার শুভ ফল লাভ করিবেন। সে দিন কি আনন্দের দিন হইবে যেদিন গৃহে গৃহে ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং এর জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইবে—সে দিন কি অতুল আনন্দের দিন—ভাবিতে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ।

সনাতন গোস্বামী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপে শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতন গোস্বামীর বিবিধ তত্ত্বালাপ হইতে লাগিল। চৈতন্য বলিলেন, হে সনাতন! ভগবৎকৃপা তোমাতে পরিপূর্ণ; তুমি সকল তত্ত্বই অবগত আছ। দৃঢ়তার জন্য প্রশ্ন করা সাধুর স্বভাব। ভক্তি প্রবর্ত্তন করিবার তুমিই যোগ্য পাত্র। তথাপি তোমাকে এই সকল তত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর।

শ্রীহরির নিত্য দাসত্বই জীবের যথার্থ স্বরূপ। জীব মোহবশে আপন স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়ার অধীন হয় এবং নানা প্রকারে সংসার-দুঃখ ভোগ করে। এই বহির্ম্মুখ জীবের অশেষ দুর্গতি। অপরাধী ব্যক্তিকে রাজা যেরূপ নদীজলে ডুবায় ও উঠায়; মোহমায়া সেইরূপ ভগবদ্বিমুখ আত্মবিস্মৃত মানবকে কখনও বা স্বর্গভোগে প্রলুব্ধ করে, কখনও বা ভীষণ নরকে নিমগ্ন করে। মায়ামুগ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্যই সাধু, শাস্ত্র ও গুরুর আবশ্যকতা। শাস্ত্রের উপদেশ, ভগবদ্ভক্ত সাধু ব্যক্তির কৃপা ও পবিত্র সহবাসে জীব ঈশ্বরোন্মুখ হয় এবং মোহের অবসানে পরমেশ্বরই "প্রভু ও পরিত্রাতা" এই জ্ঞান হয়। ভক্তিশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, জ্ঞানকর্ম্ম যোগ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শুদ্ধ ভক্তি যোগে ভজনা করিলেই শ্রীহরিকে লাভ করা যায়। ধন হস্তগত হইলে যেমন পার্থিব সুখ সৌভাগ্য লাভ হয় এবং সুখ লাভ হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়; সেইরূপ বিশুদ্ধ অহৈতুকী ভক্তিতে পরমেশ্বরে প্রেম উৎপন্ন হয় ও পরমেশ্বরের প্রেমমাধুর্য্যে

চিত্ত সমাকৃষ্ট হইলে সংসার ক্লেশের শান্তি হয়। কিন্তু সংসার-তাপের শান্তিমাত্রই ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্য নহে, ভগবানকে লাভ করা ও জীবনে তাঁহাকে সম্ভোগ করাই ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। সাংসারিক সুখ দুঃখের চিন্তা ভক্তের প্রাণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। ভগবানই ভক্তের লক্ষ্য, তাঁহাকে লক্ষ্য স্থলে রাখিলে আনুসঙ্গরূপে সংসার-যন্ত্রণার শান্তি হইয়া থাকে।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান!
কৃপাতে করিল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানায়।
কৃষ্ণ মোর 'প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান॥

... ...

ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখ ভোগ ফল পায়।
সুখ ভোগ হইতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণস্বাদ হইলে ভবনাশ পায়॥
দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেম তিন মহাধন॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥"
চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড ২০অধ্যায়।

শ্রীহরির স্বরূপ অনন্ত বৈভবও অনন্ত। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তিতে তাঁহার অনন্ত শক্তি। তাঁহার অবতারও অনন্ত। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীহরির কেহ অংশাবতার, কেহ গুণাবতার, কেহ ভাবাবতার কেহ শক্ত্যবতার। * তিনি সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, আত্মার আত্মা পরমাত্মা, চিদানন্দরূপী ভগবান। এই প্রকারে ভগবানের অনন্ত মহিমা ও অনন্ত ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতে করিতে প্রেমবিহ্বল গৌরসুন্দরের মন ভগবদৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গেল। প্রেমরসে রসান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন;

"সনাতন! কৃষ্ণ মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু,
মোর মন সান্নিপাতি,সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু।
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক ব্যাপে যার পুর॥
স্মিতকিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়,অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
জগতের বলে পৈশে কাণে।

... ...

---

* বৈষ্ণবশাস্ত্র "চৈতন্য চরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার, অংশাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, যুগাবতার, লীলাবতার প্রভৃতি অবতার এবং প্রাভব ও বিলাস, তদেকাত্মরূপ, স্বয়ংরূপ আবেশরূপ ইত্যাদি বহুতর জটিল বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। স্থূলভাব মাত্র এখানে গৃহীত হইল।

লোকধর্ম্ম লজ্জাভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥
কাননের ভিতর বাসাকরে,
আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বলে আন
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড ২০ অধ্যায়।

প্রেমে গদগদ হইয়া চৈতন্য বলিলেন, সনাতন! শ্রীহরির মাধুর্য্য স্রোতে আমি ভাসিয়া যাইতেছি, আমার চিত্তভ্রম উপস্থিত, কি বলিতে কি বলিতেছি কিছুই জ্ঞান নাই। তোমার প্রতি ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ। নিজের ঐশ্বর্য্যমাধুরী তিনি আমার মুখে তোমাকে শ্রবণ করাইলেন।

"পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে,
আন কহিতে কহিল আনে,
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্তভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥
আমি ত বাউল আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য স্রোতে আমি যাই বহি ॥
তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতনে কহে ॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড ২১ অধ্যায়।

হে সনাতন! শ্রীহরিই একমাত্র সারবস্তু; ইহাই বেদশাস্ত্রের উপদেশ। হরিভক্তিই সকল শাস্ত্রের অভিধেয়। ভক্তি দ্বারাই ভগবানকে ও ভগবৎ প্রেমধন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীহরি স্বরূপশক্তিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করিতেছেন, জীব তাঁহার অংশ। জীব দুই প্রকার, মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্ত জীব শ্রীহরির সেবানন্দ সম্ভোগ করিয়া চিরসুখী, তাঁহার প্রাণমন হরিপাদারবিন্দে নিত্যকাল উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। ভগবদ্বহির্ম্মুখ সংসার-সর্ব্বস্ব বদ্ধ জীব ত্রিতাপে সদাই পরিতপ্ত ও নিরন্তর কাম ক্রোধের অত্যাচারে প্রপীড়িত। দৈবযোগে যদি কোন সাধু বৈদ্যের মন্ত্রোপদেশে মায়াপিশাচী তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে হরিভক্তি লাভ করিয়া শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম যোগ জ্ঞান সাধনের ফল অতি তুচ্ছ। ভক্তিবিনা ভগবানকে লাভ করা যায় না। ভক্তিশূন্য জ্ঞানে মুক্তি নাই। ভাগবতে কথিত হইয়াছে;

"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥"

হে বিভো! যে সকল সাধক শ্রেয়স্কর ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্ক জ্ঞান লাভার্থ যমনিয়মাদির ক্লেশ স্বীকার করে, তুষাবঘাতীর ন্যায়* তাহাদের কিছুই লাভ হয় না, কেবল ক্লেশমাত্রই সার হয়। হৃদয় মন ঈশ্বরাভিমুখ হইলে বিনাজ্ঞানেও মুক্তি লাভ হয়। অর্থাৎ প্রাণ মন ঈশ্বরোন্মুখ হইলে আপনা হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয়। বিধিবিহিত বর্ণাশ্রমাচারী হরিভক্তিবিহীন হইয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না। জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করে, কিন্তু হরিভক্তি ব্যতীত বুদ্ধি কখনও নির্ম্মল হয় না। ভাগবতে ব্যাস বলিয়াছেন, "হে পদ্মলোচন হরি, তোমাতে ভক্তির অভাব থাকিলে বুদ্ধি কখনও বিশুদ্ধ হয় না, এইরূপ অবিশুদ্ধ বুদ্ধিশালী ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ আপনাদিগকে মুক্ত মনে করিয়া থাকে।

* যে চিটা ধান আছড়ায় তাহার ন্যায়।

তাহারা পরম পদ মোক্ষের সন্নিহিত হইয়াও তোমার পদারবিন্দ অনাদর করায় তথা হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকে।

হে সনাতন! পরমেশ্বরের জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায় পুণ্যস্বরূপের নিকট মায়ার অন্ধকার কখন কি তিষ্ঠিতে পারে? যে ব্যক্তি ব্যাকুল প্রাণে "হে হরি আমি তোমার "এই বলিয়া একবার প্রার্থনা করে, সে মায়াবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হয়। কি ভোগাভিলাষী, কি মুক্তিপিপাসু, কি অন্যবিধ কামনাপরায়ণ যিনিই হউন, সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেই গাঢ় ভক্তিযোগে শ্রীহরির ভজনা করিয়া থাকেন। বিষয় কামনা করিয়া কেহ যদি ভগবানের আরাধনা করে, প্রার্থনা না করিলেও ঈশ্বর তাহাকে আপনার আশ্রয়ে গ্রহণ করেন। ভগবান বলেন,আমার ভজনা করিয়া বিষয়সুখ প্রার্থনা করা, অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষ প্রার্থনা করার ন্যায় কেবল মূর্খতা! আমি এরূপ মূর্খকে আমার চরণাশ্রয়ের পরিবর্ত্তে বিষয়বিষে কেন জর্জ্জরিত হইতে দিব। বস্তুত বিষয়লোভে ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহাতে নিবিষ্টচিত্ততা বশতঃ কথঞ্চিত প্রেমরসের আস্বাদ পাইলে সমুদায় কামনা বিসর্জ্জন করিয়া ভগবানের দাস হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতেই অভিলাষ হয়। ভক্তরাজ ধ্রুব বলিয়াছিলেন,

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে॥"

হে দেব! লোকে কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে যেমন দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমি সেইরূপ রাজসিংহাসনাভিলাষী হইয়া তপস্যা করতঃ মুনীন্দ্রদিগের দুর্ল্লভ ধন তোমাকে পাইয়াছি। হে প্রভো! কৃতার্থ হইলাম, আমার আর বর লইবার প্রয়োজন নাই।

"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বরূপ শক্তি রূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার।
... ...
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক মুক্ত নিত্য একের নিত্য সংসার॥
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা সুখ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥
কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তি সুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা কৃষ্ণ দিতে নাহি বল॥
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনাজ্ঞানে॥
কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
... ...
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণে নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥
'কৃষ্ণ তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তাঁরে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে "আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এতবড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কামছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥"

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড ২২ অধ্যায়।

নদীপ্রবাহে ভাসমান কোন কাষ্ঠখণ্ড কদাচিৎ যেমন তীর সংলগ্ন হয়, সাংসারিক জীবেরও সেই অবস্থা। কাল-নদীতে ম্রিয়মাণ জীবদিগের মধ্যে ভাগ্যবলে কদাচিৎ কেহ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। ভগবদনুগ্রহে সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সাধুসমাগম লাভ হয়। সাধুসহবাসে হৃদয় নির্ম্মল হইয়া পরমেশ্বরেতে রতির উদয় হয়। এবং কোন কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে করুণাময় ঈশ্বর অন্তর্যামী চৈত্ত্য আচার্য্যরূপেও আপনার তত্ব শিক্ষা দেন। ভাগবতে উদ্ধব ভগবানকে বলিয়াছেন,

"যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।"

হে ভগবন্! যেহেতু তুমি শরীরধারী জীবের বাহ্যাভ্যন্তর সর্ব্বপ্রকার অশুভ দূর করিবার জন্য ও তাহাদের প্রতি স্বগতি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অন্তর্যামী চৈত্ত্য আচার্য্য রূপে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেছ। সনাতন! সাধুসঙ্গের অপার মহিমা। সাধুসঙ্গ দ্বারা হরিভক্তিতে শ্রদ্ধা ও ভক্তিফল ভগবৎ প্রেম উৎপন্ন হয় ও সংসার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক সাধুকৃপা ব্যতীত, সৎবিষয়ে রতি ও ভগবানে ভক্তি দূরে থাকুক, সংসার বাসনারই অবসান হয় না। সকল শাস্ত্রেই সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতে কথিত হইয়াছে;

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

ভগবদ্ভক্ত সাধুর সহিত অত্যল্প কাল সঙ্গ হইলে যে ফল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ ও অপবর্গেরই তুলনা হইতে পারে না। মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজভোগ. সুখের সহিত কি প্রকারে তাহার তুলনা হইবে?

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহে সংসার না যায় ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবা মাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২২ অধ্যায়।

হে সনাতন! শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবানে নির্ম্মল শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে বেদবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান যোগ-সাধনার আর প্রয়োজন নাই। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। ফলতঃ প্রাণের ভোজনেই যেমন সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান অচ্যুতের আরাধনা করিলেই সকল কর্ম্ম কৃত হয়। ভাগবতে দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়াছেন। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী। শাস্ত্র যুক্তি ও জ্ঞানযোগে যাঁহার ভক্তি দৃঢ়ীভূত

হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বোত্তম ভক্ত। যিনি শাস্ত্রযুক্তি অবগত নহেন, অথচ দৃঢ় শ্রদ্ধাবান তিনিও মহাভাগ্যবান, তাঁহাকে মধ্যম বলা যায়। যাঁহার শ্রদ্ধা অতি কোমল, তিনি কনিষ্ঠ। কিন্তু ইহারাও ক্রমে ভক্তোত্তম হইবেন। রতি প্রেমের তারতম্যানুসারে ভক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভক্তিলক্ষণে কথিত হইয়াছে; যিনি সর্ব্বভূতে আপনার ভগদ্ভাব দর্শন করেন, এবং পরমাত্মার অধিষ্ঠানে সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন, তিনিই ভক্তোত্তম। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তাঁহার অনুগত ভক্ত জনে মৈত্রী অজ্ঞ জনের প্রতি কৃপা ও শত্রুর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি ভগবদ্ভক্তদিগের মধ্যে মধ্যম। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরির পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কি অন্যের পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত, ক্রমশঃ তিনিও ভক্তোত্তম হইবেন।

ক্রমশঃ।

শব্দ-ব্রহ্ম।

যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমরা সকলে গ্রহণ করিয়াছি, যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিকল্পে আমরা দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য পবিত্র পরমেশ্বরের যশ ঘোষণা করিতেছি, যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নগর গ্রামে পবিত্র উপাসনামন্দির সংস্থাপিত করিতেছি; সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম দিন দিন উন্নতি হইতে উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে দেখিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দে উৎফুল্ল হয়, কাহার অন্তঃকরণ না ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ রসে আপ্লাবিত হইয়া যায়। সেই এক চিরন্তন পরমেশ্বরের উপাসনা, সেই পিতৃপিতামহসেবিত একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের আরাধনা, যাহা বেদবেদান্ত উপনিষদের প্রতি পত্রে সুরক্ষিত হইয়াছিল; যাহা অন্ধতমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর সুগভীর অন্ধকারের মধ্যে প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় ভারতবর্ষে এককালে দীপ্তি পাইতেছিল, তাহাই কালের করাল নিয়মে প্রতিহত হইয়াও ঈশ্বরের প্রসাদে আবার এখানে সমুজ্জ্বলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা এই পরাজিত ভারতের অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে! এই জ্ঞানোন্নত ঊনবিংশ শতাব্দির জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত দেশবিদেশ যখন শিল্প-সাহিত্যের, কৃষিবিজ্ঞানের, ঐহিক সুখশান্তি বিস্তারের কৌশল উদ্ভাবনে ব্যতিব্যস্ত, তখন ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার পূজার্চ্চনার বিশুদ্ধ পদ্ধতি, অবিসংবাদী মতামত এই দীনহীন পরাজিত ভারতে স্থান পাইল ও পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় এখানে প্রথমে নির্দ্ধারিত ও পরিগৃহীত হইল। এই পতিত ভারতে ঈশ্বরের সুমহান নাম এমনই অজেয় পরাক্রমের সহিত এককালে নিনাদিত হইয়াছিল; যে বহু সহস্র বৎসর পরে ধর্ম্মভাব ঈশ্বরপ্রীতি রোগে কাতর শোকে আকুল দুর্ব্বল সন্তানগণকেও ধর্ম্মপ্রবণ করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা ঋষিকুলে পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমারদের অস্থিমজ্জায় ধর্ম্মভাব আজও অনুস্যূত রহিয়াছে। সেই বৈদিক সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমারদের এই পবিত্র ভারতে ধর্ম্মবিপ্লবের অবসান নাই। বৈদিক সময়ের পর হইতে অদ্বৈতবাদ, বৌদ্ধধর্ম্ম, পৌরাণিক তান্ত্রিক গৌরাঙ্গ মতের ঘোর তরঙ্গ চলিয়া যাইতেছে। আমারদের মধ্যে ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন আচ্ছাদন

স্থান পায় নাই। ধর্ম্মভাব ভিন্ন আর কিছুই এই চিরপরাজিত জাতিকে বিপুল পরাক্রমের সহিত উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহা ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের অল্প মাহাত্ম্যের বিষয় নহে।

যে পবিত্র একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের পূজা পূর্ব্বে অরণ্যবাসী ঋষিগণ দ্বারা নির্জ্জনে গিরিগুহায় অনুষ্ঠিত হইত, আমরা সেই পিতৃপিতামহসেবিত পুরাতন ঈশ্বরের পূজা নগর গ্রামে সজনে আনয়ন করিয়াছি। যে ঈশ্বরের পূজা এককালে নির্জ্জন কাননকে পবিত্র করিত, আমরা সেই ঋষিগণপরিসেবিত অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের পূজায় নগর গ্রাম পবিত্র করিতেছি। আমারদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যুগযুগান্ত কাল বেদবেদান্তের মধ্যে নিহিত ছিল। ইহা আমারদের স্বকপোলকল্পনা নহে।

এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের জীবনে কতদূর প্রতিফলিত করিলাম, পবিত্র পরমেশ্বরের পূজার্চ্চনা আমারদের ক্ষুদ্র যত্ন চেষ্টা সাধন তপস্যাবলে কতদূর সংসিদ্ধ হইল তাহা আলোচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমারদের আত্মার দৃষ্টি ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র আলোকে কতদূর জ্যোতিষ্মান হইল, আত্মার উন্নতি তাহার বলবীর্য্য কতদূর অর্জ্জিত হইল, তাহা নিজে নিজে প্রত্যক্ষ করিবার সময় উপস্থিত। যদি এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে আমরা প্রয়াসী হই, তবে আমরা ধর্ম্মপথে কল্যাণ পথে কতদূর অগ্রসর হইলাম—তাহা সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে দেখিতে হইবে। শুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম পবিত্র ধর্ম্ম আর্য্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিলে আমাদের কি হইবে? যদি আমারদের সম্মুখে উন্নততম জ্বলন্ত আদর্শ বিদ্যমান থাকে তাহাতে বা কি? যদি ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে আমারদের আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করিতে না পারিলাম তবে আর কি হইল।

যে জ্ঞান ঈশ্বরের পথদর্শক—সেই ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান দুই প্রকার, এক আগমোত্থ, দ্বিতীয় বিবেকোত্থ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরবিষয়ক যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম আগমজনিত জ্ঞান। ধ্যান ধারণা সমাধি দ্বারা যে জ্ঞান উদয় হয় তাহার নাম বিবেকজনিত জ্ঞান।

আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্।

বিষ্ণুপুরাণম।

আগমোত্থ জ্ঞানে শব্দ ব্রহ্ম। ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা শাস্ত্রপাঠে বক্তৃতা শ্রবণে বা তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু বিবেকজনিত জ্ঞান ঈশ্বরকে আত্মার মধ্যে জাগ্রত জীবন্তরূপে অনুভব করাইয়া দেয়। আগমোত্থ জ্ঞান—ঈশ্বরের পথের নিয়ামক; বিবেকজনিত জ্ঞান ঈশ্বরকে লাভ করিবার কারণ। আগমজনিত জ্ঞানে সাধক ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। বিবেকজনিত জ্ঞানে তাহার পরিসমাপ্তি হয়।

অন্ধতম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবং।
যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজম্।

বিষ্ণুপুরাণম্।

অজ্ঞান গাঢ় অন্ধকার স্বরূপ। শব্দ জ্ঞান অর্থাৎ উপদেশদত্ত তত্ত্বজ্ঞান প্রদীপসদৃশ। তাহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান-অন্ধকার নিরাকৃত হইতে পারে না। হে বিপ্রর্ষে! বিবেকজনিত জ্ঞান সূর্য্যস্বরূপ। তাহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমুদায় অজ্ঞান-অন্ধকার নিরাকৃত হয়।

ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মালোচনার স্থান। সামাজিক উপাসনা—বন্ধু বান্ধব আত্মীয় ও প্রতেবেশীদিগকে লইয়া একত্র ঈশ্বরের গুণ-গান তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ ব্রাহ্মসমাজে সম্ভবে। শব্দ ব্রহ্মের সাধনা বহুল পরিমাণে ঈদৃশ সামাজিক উপাসনায় সংঘটিত হইয়া থাকে। যে সামাজিক উপাসনা আমারদের মৃত ও নিৰ্জ্জীব ভাবকে প্রজ্বলিত করিয়া তোলে; যে সামাজিক উপাসনায় ধর্ম্মভাব ঈশ্বরপ্রীতি সকলের মধ্যে সংক্রমিত হয়, যে সামাজিক উপাসনায় কঠোর পাপাত্মার হৃদয়ের লৌহ কবাট ভগ্ন হইয়া যায়, যে সামাজিক উপাসনা ধৰ্ম্মশিক্ষার স্থল, যে সামাজিক উপাসনায় ঈশ্বরের প্রসাদবারি হীন মলিন আত্মাকে পবিত্র সলিলে ধৌত করিয়া তাহার মলিনতা অপসারিত করে, সে সামাজিক উপাসনা কি আমরা ছাড়িতে পারি! সামাজিক উপাসনা মৃতপ্রায় অসাড় আত্মার মৃত-সঞ্জীবন ঔষধ। সামাজিক উপাসনা সত্যধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র সরল পথ। যাঁহারা মনে করেন ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করা সাধনের পরাকাষ্ঠা, তাঁহারা সাধনের স্বরূপ কিছুই অবগত নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তারস্বরে বলিতেছেন "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব; আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, আত্মার মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য তাহার উপাসনায় যোগ দিলে তোমার লক্ষ্য সংসিদ্ধ হইবে না। ব্রাহ্মসমাজে গিয়া অক্ষয় ব্রহ্মধামে যাইবার-প্রচুর পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লও। কিন্তু পাথেয় সংগ্রহ যথেষ্ট নহে। পথশ্রম অবশ্যই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। সেই পথশ্রম আর কিছুই নহে "আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিবার চেষ্টা।" এই যে আত্মদর্শন ইহা তোমার সমাধি সাধন সাপেক্ষ। এখানে সামাজিক উপাসনা বিশেষ কোন সাহায্য প্রদান করিবে না; তোমার যত্ন চেষ্টাবলে তোমাকে একাকীই তাহা সাধন করিয়া লইতে হইবে। তবেই তুমি বিবেকজনিত ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

আমারদের সামাজিক উপাসনায় শব্দব্রহ্মের জ্ঞান অর্জ্জন করা চাই তাহার সঙ্গে বিবেকজনিত জ্ঞানলাভের জন্য সাধন তপস্যা চাই। বিবেকজনিত জ্ঞানের উপরে যেন আমারদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। এই বিবেকজনিত জ্ঞানই আমারদের পরমার্থ জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমা। এই লক্ষ্য হইতে যদি আমরা ভ্রষ্ট হই, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম কতকগুলি বাক্যের আলোচনা বা আবৃত্তি করণে পর্য্যবসিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ একেবারে নির্জীব হইয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব একেবারে বিদূরিত হয়।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বল সত্য আমারদের চক্ষুর উপরে দেদীপ্যমান থাকিলেও কেন যে আমরা আমাদের জীবনকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করিতেছি না, কেন যে আমরা আমারদের আত্মাকে বলীয়ান করিতে পারি না; কেন যে আমরা ধর্ম্মের সঙ্গে ঈশ্বর-আরাধনার সঙ্গে নানাবিধ জাতীয় বা সামাজিক সংস্কারে বিব্রত হইয়া ধর্ম্মের প্রাণ ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছি, তাহার কারণ উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই, যে আমারদের মধ্যে কেবল শব্দব্রহ্মেরই আধিক্য—বিবেকজনিত জ্ঞান যাহা নিজ নিজ প্রয়াসসাপেক্ষ তাহার অভাব হইয়া পড়িয়াছে। যাহা প্রকৃতপক্ষে আত্মার সংস্কার আত্মার উন্নতি তাহা

আমারদের নিকট হইতে বহুদূরে রহিয়াছে। নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালকেরা বিদ্যালয়ে গমন করিবার জন্য বাটী হইতে নিক্রান্ত হইয়া যেমন পথের মধ্যে ধূলিখেলা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষা লাভ করিবার কথা মন হইতে চলিয়া যায়; আমরাও সেই রূপ বিবেকজনিত ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য নিক্রান্ত হইয়া ঐহিক সুখ শান্তি বিধান ও সংস্কার সাধনে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি, এবং পরমগতি চরম কল্যাণের দিকে আমারদের ততদূর লক্ষ্য নাই। ধূলিখেলা বালকের পক্ষে হৃদ্য হইলেও পাঠে অমনোযোগ যেমন তাহারদের বিশেষ অমঙ্গলের কারণ, তেমনি ঈশ্বরের পথিক হইয়াও যদি আমারদের সেই বলবীর্য্য হীনমলিন বিষয়ে ক্ষয় করি; তবে তাহা আর আমারদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইতে পারে না। বিবেকজনিত জ্ঞানের উপরে আমারদের সমধিক আস্থা বিদ্যমান নাই বলিয়া বক্তৃতা আমারদের নিকট অধিকতর উপাদেয়; সাত্বিক আহার বিহারের প্রতি আমরা উদাসীন, সাধন তপস্যার উপরে আমারদের এত অনাদর। ব্রাহ্মধর্ম্ম পবিত্র ধর্ম্ম আছেনই কিন্তু আমারদের ঈশ্বরলাভের বিবেকজনিত জ্ঞানলাভের তাদৃশ বলবতী স্পৃহা কোথায়! চেষ্টা কোথায়! যত্ন কোথায়! শব্দব্রহ্মে যেন আমারদের সমস্ত পর্য্যবসান না হয়। যদি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিজয়ী করিতে চাই, যদি আর্য্যকুলের মানমর্য্যাদা রক্ষা করা আমারদের লক্ষ্য হয়, যদি পতিত ভারতের মুখ উজ্জ্বল করা আমারদের কার্য্য হয়, যদি ধর্ম্মভূষণে অলঙ্কৃত হওয়া আমারদের আন্তরিক কামনা হয়, যদি পবিত্র পরমেশ্বরকে আত্মার মধ্যে সন্দর্শন করা মনুষ্যত্ব বলিয়া বিবেচিত হয়, যদি পবিত্র শোণিত পুত্র পৌত্রাদির ধমনীতে সঞ্চালিত করিবার বাসনা থাকে, তবে সকলে উত্থান কর জাগ্রত হও, জ্ঞানচক্ষুকে প্রস্ফুটিত কর, সাধনবলে বিবেকজনিত জ্ঞানকে শব্দব্রহ্মের সাহায্যে প্রদীপ্ত কর। ঈশ্বরকে আত্মার চিরসখা চিরসঙ্গী বলিয়া অনুভব করিতে শিক্ষা কর, আহার বিহারে সংযত হও, দিনযামিনী ব্রহ্মকে আত্মস্থ কর। "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, অন্তরের সহিত বল "ইঁনিই অমৃত লাভের একমাত্র সেতু।" প্রদীপসদৃশ শব্দব্রহ্মের জ্ঞানে কত না আনন্দ লাভ করিতেছ, কিন্তু যখন সূর্য্যস্বরূপ বিবেকজ জ্ঞানে অন্তর্দেশকে আলোকিত করিতে সমর্থ হইবে—তখন সকলই শোভাময় সকলই জ্যোতির্ম্ময় দেখিবে, মৃত্যুর প্রতিকৃতি এই সংসারে থাকিয়াই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামের পূর্ব্বাভাস এখান হইতে সন্দর্শন করিয়া আপ্তকাম হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র রবিবার বর্ষশেষ। প্রত্যেকের জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ সোমবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্ন প্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	১৯৪৩॥/৫
পূর্ব্বকার স্থিত		৩১০০।/১৫
সমষ্টি	... ...	৫০৪৩৮/১০
ব্যয়	...	১৯৩৪॥/১০
স্থিত	... ...	৩১০৯।/১০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ১৩৯৮/০

মাসিক দান

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রধান আচার্য্য মহাশয়

ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য

১৮১২ শকের শ্রাবণ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ১৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়া ঘাটা)

১৮১২ শকের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন

১৮১২ শকের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ১৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন চৌধুরী	১০৲
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
" " আশুতোষ চৌধুরী	৫৲
" " মণিলাল মল্লিক	৪৲
" " বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
" " চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
" " অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	১৲
" " রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১৲
" " কানাইলাল পাইন	১৲
" " ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস	১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় দেব ১০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ২০৲

পরলোক গত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বণ্ডেড অয়ার হাউসের সেয়ারের ডিবিডেণ্ট ৪৫৲

দানাধারে প্রাপ্ত ৮/০

১৩৯৮/০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৭৯৮/১০
পুস্তকালয়	...	৫৫॥১/৫
যন্ত্রালয়	..	১০১৪॥ ১৫
গচ্ছিত	...	২৩১॥১/৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১১৮৵০
দাতব্য	...	১০৲
সমষ্টি		১৯৪৩॥/৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৫৩৫৮/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩১৩॥৵১৫
পুস্তকালয়	... ...	১০৫৮৵৫
যন্ত্রালয়	... ...	৭১৭ ১/১৫
গচ্ছিত	... ...	২৫১৮১/১০
দাতব্য	... ...	১০৲
সমষ্টি	.	১৯৩৪॥/১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান মাস হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারি সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।